ফাল্গুনী অমনিবাস

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ফাল্গুনী অমনিবাস

চিতা বহ্নিমান

তপতী বড় হইয়া উঠিল।

মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক যুগে অবশ্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, তথাপি একমাত্র কন্যার বিবাহটা একটু শীঘ্রই দিবার ইচ্ছা মিঃ শঙ্কর চ্যাটার্জির। সম্বন্ধও পাকা এবং দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। বাকি শুধু বিবাহটার।

তপতী এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত সে। বিবাহের নামে বাঙালী মেয়েরা যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তপতীর তাহা কিছুই হয় নাই। কেন হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে—বাপ-মা'র হাতের দেওয়া অনিবার্য শাস্তি যখন লইতেই হইবে, তখন ভাবিয়া লাভ কি! বিয়েটা হইয়া গেলেই আনন্দ-বা-নিরানন্দ যাহোক একটা করা যাইবে। এখন পরীক্ষার পড়াটা করা যাক্।

কিন্তু ইহাতে ভাবিবার কিছুই নাই। তপতীর জন্য ভদ্রবংশের জনৈক শিক্ষিত এবং সুন্দর যুবক প্রস্তুত হইতেছেন। আর তপতী তাঁহাকে দেখিয়াছেও। বিবাহের পর যুবকটিকে বিলাত পাঠানো হইবে পূর্তবিদ্যা শিখিবার জন্য, ইহাই মিষ্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জির ইচ্ছা।

এই তপতী—শিক্ষিতা, আধুনিকা এবং প্রগতিবাদিনী। উহাকে লাভ করিবার জন্য সোসাইটির কোন্ যুবক না সচেষ্ট। দিনের পর দিন তপতীকে ঘিরিয়া তাহারা গুঞ্জন তুলিয়াছে, গান করিয়াছে, গবেষণা করিয়াছে তপতীর ভবিষ্যৎ লইয়া। হ্যাঁ, তপতী অনিন্দ্যা, অনবদ্যাঙ্গী, অসাধারণীয়া। কিন্তু এহেন তপতীকে লাভ করিবে মাত্র একজন, ইহা সহ্য করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু উপায় কি, ধনী পিতা তাহার, যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহারই হাতে কন্যা দান করিবেন। অপরের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে।

মিঃ চ্যাটার্জির 'তপতী-নিবাস' নামক নবনির্মিত বিশাল প্রাসাদে মহাসমারোহে বিবাহোদ্যোগ চলিতেছে। বর এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু বরযাত্রীগণ প্রায় অনেকেই আসিয়াছেন এবং খাইতেছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, অতি মলিন বেশ ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে মাথার চুল সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিত একটি যুবক আসিয়া মিঃ চ্যাটার্জির সহিত দেখা করিতে চাহিল। বিবাহ সভায় এরূপ অতিথি কেই বা পছন্দ করে! কিন্তু যুবক দেখা করিবেই।

মিঃ চ্যাটার্জি কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিজেই খাসকামরায় নামিয়া আসিলেন।

একখানি জীর্ণ দলিল বাহির করিয়া যুবক বলিল,—আমার বাবার বাক্সে এই দলিলখানি পেয়েছি, এটা আপনার—আর সম্ভবত দরকারী। দয়া করে গ্রহণ করুন। মিঃ চ্যাটার্জি বিস্মিত হইয়া বলিলেন ;—তুমি মহাদেবের ছেলে? এত বড়ো হয়েছ! বসো বাবা, আজ আমার মেয়ের বিয়ে, এখানেই খেয়ে যাবে।

—আমার কিন্তু অন্যত্র কাজ ছিল। যুবক সবিনয়ে জানাইল।

—তা থাক, কাজ অন্যদিন করবে, বসো।

মিঃ চ্যাটার্জি দলিলখানি গ্রহণ করিলেন। সত্যই দরকারী দলিল। যুবককে আর একবার বসিতে অনুরোধ করিয়া তিনি ভেতরে গেলেন।

বর আসিয়াছে এবং বরের পিতা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ চ্যাটার্জি আসিতেই তিনি বলিলেন,—

—পণ-এর টাকাটা আমায় দিন, তারপর ছেলে আপনার, যা-খুসি করবেন তাকে নিয়ে।

—হ্যাঁ, বেয়াই-মশাই, কাল পরশুই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো।

—কেন? আজই দিয়ে ফেলুন না! ছেলেতো আমি বেচেই দিচ্ছি। নগদ কারবারই ভালো।

—এ রকম কথা কেন বলছেন বেয়াই-মশাই। মিঃ চ্যাটার্জি অত্যন্ত আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

—বলছি যে আমায় যে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার কথা সেটা দিয়ে ছেলেকে আপনার নিজস্ব করে নিন, আমি নগদ কারবারই ভালবাসি।

—কিন্তু আজই তো দেবার কথা নয়। আর এই রাত্রে অত টাকা কি করে দেওয়া যাবে বলুন! নগদ টাকাটা কাল নিলে কি ক্ষতি হবে আপনার!

—ওসব চলবে না চাটুজ্যেমশাই, টাকা না পেলে আমি পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

—উঠিয়ে নিয়ে যাবেন?

বিরাট বিবাহ সভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সভ্য, শিক্ষিত সমাজে এরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, কেহ কল্পনাও করে নাই। মিঃ চ্যাটার্জি রুদ্ধ-রোষ দমন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, যান উঠিয়ে নিয়ে, টাকা দেবো না।

—হেমেন—চলে এসো—বলিয়া বরকর্তা ডাক দিলেন। বর তৎক্ষণাৎ সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া আসিল। বরকর্তা মিঃ চ্যাটার্জিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাঁকি দিয়ে বিয়েটি সেরে নিয়ে কাল উনি আমায় কলা দেখাবেন। ওসব চলবে না, চাটুজ্যেমশাই, আমার পণ-এর টাকাটা ফেলে দিয়ে মেয়ে জামাই নিয়ে যা ইচ্ছে করুন! আপনি তো ধনী, টাকাটা না-দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

—টাকা দেবো না! মিঃ চ্যাটার্জি সরোষে বলিয়া উঠিলেন।

—আচ্ছা, তাহলে—হেমেন, চলে এসো!

বর ও বরকর্তা উঠিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলে "আঃ কি করেন ঘোষাল মশাই, বসুন", বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,---ওঁরা বেরিয়ে গেছেন? বেশ, গেট বন্ধ করে দাও আর যেন না ঢোকেন।

সকলে অবাক হইয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জি খাসকামরায় আসিয়া ডাকিলেন—তোমার বিয়ে এখনো হয়নি তো বাবা?

—আজ্ঞে না। কেন?

—এসো তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা ছিল, তোমাকে আমার জামাই করবো। এতদিন ভুলে ছিলুম, তাই ঈশ্বর আজ ঠিক দিনটিতে তোমায় পাঠিয়েছেন। এসো বাবা।

—আমি? আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য?

—নিশ্চয়! তুমিই তার যোগ্য।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসামান্যা সোসাইটি গার্ল তপতী চ্যাটার্জির সহিত এক নিতান্ত দীনহীন ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ হইয়া গেল।

তপতীর পুরুষ বন্ধুরা, যাহারা কৌশলে এই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য ঘোষাল মহাশয়কে টাকা চাহিতে বলিয়াছিল, বুঝাইয়াছিল যে মিঃ চ্যাটার্জির মতলব ভাল নয়। —তাঁহারা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তপতীকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের কাহাকেও ডাকা হইল না। সব আশায় তাহাদের ছাই পড়িল দেখিয়া তাহারা মুণ্ডিত মস্তক, রৌদ্রদগ্ধ গোবেচোরী বরের মুণ্ডপাত করিয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত রইল না।

পরদিন সকালে কুশণ্ডিকার পর বরকে জিজ্ঞাসা করা হইল—বাবাজি কতদূর পড়াশুনো করেছো? উত্তরে তপনজ্যোতি জানাইল, অকালে বিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্কুল হইতে তাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য নিজে বাড়ীতে সে তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা করিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পরবৎসরই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় সে অনাথ হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সম্প্রতি গয়ায় পিতৃতর্পণ শেষ করিবার সময় পিতার বাক্সের কাগজপত্রাদি নদীর জলে বিসর্জন দিতে গিয়া মিঃ চ্যাটার্জির দলিলখানি দেখিতে পায় এবং উহাই তাহাকে এখানে আসিতে বাধ্য করে।

শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তপতী চ্যাটার্জির মতো সুন্দরী শিক্ষিতা বি-এ পড়া মেয়ের এই কি উপযুক্ত বর! মেয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, পুরুষেরা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে—ওকে তো আর চাকরী করতে হবে না। সই করতে পারলেই চলে যাবে। তপতীর সমবয়সী বন্ধুগণ সামনে সহানুভূতি জানাইয়া অন্তরালে বলিল,—আচ্ছা হয়েছে! যেমন অহঙ্কারী মেয়ে!

তপতী নিজে কিছুই বলিল না। গত রাত্রে ব্যাপারটার আকস্মিকতা তাহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বরের সহিত আলাপ করা হইয়া উঠে নাই। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই অযোগ্যের হাতে দিবেন না, এই বিশ্বাসই তাহার ছিল, আজ কিন্তু সমস্ত শুনিয়া পিতার বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর কিছুই করিবার নাই।

মিঃ চ্যাটার্জি ও মিসেস চ্যাটার্জি দুঃখিত হইলেন। জিদের বসে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু নিরুপায়ের সান্ত্বনা স্বরূপ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার জামাতাকে তো কেরাণীগিরি করিতে হইবে না। নাইবা হইল সে বি-এ, এম. এ. পাশ। কন্যাকে ডাকিয়া তিনি শুধু বলিলেন, খুকী, তোর বাবার অপমানটা ও বাঁচিয়েছে, মনে রাখিস্।

খুকী তথাপি চুপ করিয়া রহিল এবং পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিবার জন্য পাঠগৃহে চলিয়া গেল।

তপনজ্যোতি জানাইল,—সে যেখানে থাকে তাহাদিগকে বলিয়া আসা হয় নাই, অতএব সে আজ যাইতেছে, আগামীকল্য সকালে ফিরিয়া আসিবে।

উৎসবগৃহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন বারান্দায় একখানা সোফা পুষ্প-পত্র দিয়া সাজানো হইয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া বর-বধূর অপেক্ষা করিতেছে।

তপনজ্যোতিকে আনিয়া সেখানে বসানো হইল। দুই চারজন রসিকা তাহার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টাও করিল, কিন্তু তপনজ্যোতি বিশেষ কোন সাড়া দিল না। সকলেই বুঝিল— পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কথা কহিতে জানে না। বিরক্ত হইয়া সকলে চলিয়া গেল। তপনজ্যোতি তখন ভাবিতেছিল, যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, কেমন সে, তপনজ্যোতিকে সে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না। মন তাহার এতই উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে যে অন্য কাহারও সহিত কথা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অধীর চিত্তে সে বধূর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণ তপতীকে লইয়া আসিল। তপনের হৃদয় নবোঢ়া বধূর মতোই দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তপতী কিন্তু সিঙ্গিনীগণকে দরজা হইতেই বিদায় করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যে বারান্দাটুকুতে বর বসিযাছিল, তাহাব ও ঘরের মধ্যকার দরজাটি সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া যেন তপনকে বুঝাইয়া দিল যে, শয়নকক্ষে বরের প্রবেশ নিষেধ।

কাচের সার্সির মধ্যে চাহিয়া তপন দেখিতে লাগিল, তপতী শয়নের বেশ পরিধান করিল; তারপর উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ নীল আলো জ্বালাইল এবং সটান শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

তপন স্তম্ভিত! অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, হয়ত তপতী জানে না যে, সে এখানে বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ দরজার বাহিরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তপতী! দরজাটা খোল!

তপতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল। তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—ঐখানেই থাকুন।

তপনের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম বিমূঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে তো তাহার আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে। তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার পঞ্চবিংশ বর্ষের নির্মল নিষ্কলুষ প্রেমকে তপতী এমন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল! কিন্তু কি কারণে! অর্থাভাবে সে কলেজে পড়িতে পারে নাই, কিন্তু পড়াশুনা সে যথেষ্টই করিয়াছে এবং এখনো করে। এই কথা সে আজ নিজে তপতীকে জানাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু শুরুতেই তপতী তাহাকে এমনভাবে বাধা দিল যে কিছুই আর বলিবার উপায় রহিল না। নীরবে সে ভাবিতে লাগিল, তাহাকে গ্রহণ না-করিবার কি কি কারণ তপতীর পক্ষে থাকিতে পারে। সে ডিগ্রীধারী নয়, কিন্তু পড়াশুনা সে ভালই করিয়াছে এবং সে-কথা গতকল্য যতদূর সম্ভব জানাইয়াছে। অবশ্য আত্মশ্লাঘা করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই যথাসম্ভব বিনয়েব সহিত জানাইয়াছে। দ্বিতীয়, সে পল্লীগ্রামে জন্মিয়াছে কিন্তু সে তো শহরবাসের অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছে। তৃতীয়, ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামী তাহার একটু বেশী, তপতী একথা মনে করিতে পারে—কিন্তু, বি-এ পড়া মেয়ের পক্ষে কাহাকেও কিছুমাত্র চিনিবার চেষ্টা না করিয়াই একটা বিরুদ্ধ ধারণা করা কি ঠিক! তপনের চেহারা এমন কিছুই খারাপ নয় যে তপতীর চক্ষু পীড়িত হইবে। বরং চেহারার প্রশংসাই তপন এতাবৎকাল শুনিয়াছে। তবে হইল কি?

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তপনের দুটি চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। জীবনের কত সাধ কত আশা আজই বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তপনেরই অন্তর-বেদনা যেন শিশিরে শিশিরে ঝরিতেছে। কিন্তু এই গভীর বেদনাকে এত শীঘ্র বরণ করিয়া লইবে তপন! নাঃ—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। তপন বলিতে চাহিল,—ওগো, তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা আমি নহি,—আমায় সুযোগ দাও, আমি তোমার যোগ্য হইবার চেষ্টায় জীবনপাত করিব।

তপন পুনরায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল, তপতীব শয্যালুণ্ঠিত সুকোমল দেহখানি।

তপতী ঘুমাইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ বেণী দুটি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া কোমরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, যেন দুইটি কৃষ্ণকায় সর্প তাহাকে পাহারা দিতেছে। সুখসুপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস তপনকে জানাইয়া দিল—তপতী তাহার নহে, তাহার হইলে এত সহজে, এত নিরুদ্বেগে সে এমন করিয়া ঘুমাইতে পারিত না।

চকিতে তপনের মস্তিষ্কে একটা বিদ্যুৎচিন্তা খেলিয়া গেল। তবে, তবে হয়ত যাহার সহিত তপতীর বিবাহ হইল না, তাহাকেই সে ভালোবাসে—কিম্বা—ভাবিতে গিয়া তপন অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। যুগসঞ্চিত হিন্দুসংস্কারে গঠিত তাহার মন যেন কোন অতল বিষ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। একি হইল। তাহার সুন্দর সুনির্মল জীবনে এ কার অভিশাপ! সে তো ইহা চাহে নাই। ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবার লোভ তাহার কোনদিন ছিল না। কিন্তু যাক—তপন স্থির করিয়া ফেলিল, তপতীকে কিছুই সে বলিবে না। তাহার বাঞ্ছিতকে—যদি অবশ্য তপন ব্যতীত অপর কেহ তাহার বাঞ্ছিত হয়—ফিরিয়া পাইতে তপন সাহায্যই করিবে।

তপন সেই যে ভোরে উঠিয়া গিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে শয়ন করিয়াছে, বেলা বারটা বাজিয়া গেল, এখনো ওঠে নাই। প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল, ইহা বধূর সহিত রাত্রি জাগরণজনিত অনিদ্রার আলস্য। কিন্তু তপতী দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দেহমনে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে তপন কখন ঘরে গিয়া শুয়েছে? এখনো উঠছে না কেন?

—আমি তার কি জানি। বলিয়া তপতী অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইহাকে নবোঢ়ার লজ্জা মনে করিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মা চিন্তিত মুখে তপনের ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—গা অত্যন্ত গরম—তপন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। প্রথম ফুলবাসরের পরেই জামাইয়ের জ্বর—আধুনিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও তপতীর মা'র মনের সাধারণ বাঙালী মেয়ের সংস্কার ইহাকে অমঙ্গল-সূচক মনে করিল। ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্বর কেন হলো বাবা? কখন থেকে হলো?

তপন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, শিয়রে জ্যোতির্ময়ী জননীমূর্তি। তাহার চিরদিনের স্নেহবুভুক্ষু মন কাঁদিয়া উঠিল—

"স্নেহে-বিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখিরে"।

তপন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই মা, আর ঐ তাঁর মেয়ে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার তপন জীবনে আর দেখে নাই। স্নিগ্ধ শিশুকণ্ঠে সে উত্তর দিল—একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মা, কিছু ভয়ের কারণ নাই, একটা দিন উপোষ দিলেই সেরে যাবে।

—ডাক্তার ডাকি বাবা। জননীর স্নেহ করপুট তপনের ললাটে নামিল।

—না মা ওষুধ আমি খাইনে—কিছু ভাবনা নেই আপনার। আমি কালই ভালো হয়ে যাবো মা—আপনার মঙ্গল হাতের ছোঁয়ায় অসুখ কতক্ষণ টিকতে পারে?

পুত্রবঞ্চিতা শিক্ষিতা জননী এমন করিয়া মা ডাক কোনদিন শুনেন নাই। অন্তর তাঁহার বিমল মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল।

আপনার গর্ভজাত পুত্রের স্থানেই তিনি তপনকে সেই মুহূর্তে বরণ করিয়া লইলেন, বলিলেন—কি খাবে বাবা, সাবু?

—না মা, সাবু আমি খেতে পারি নে, বেঙাচির মতো দেখতে লাগে।

—আচ্ছা বাবা, একটু গ্লাক্‌সো দিই।

—শুধু একটু গরম দুধ দেবেন মা,—এ বেলা আর কিছু খাবো না। আর আমি একা শুয়ে থাকবো—আপনার খুকীর বন্ধুরা যেন আমায় জ্বালাতন না করে এইটুকু দেখবেন।

—আচ্ছা, তাদের বারণ করে দেবো।

মা চলিয়া গেলেন, তপন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কুলহীন পারহীন চিন্তা সমুদ্রে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে। কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে আজ? এতাবৎকাল সে নিজের জীবনকে যেভাবে গঠিত করিয়াছে তাহাতে তপতীকে বিবাহ করিবার পর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা তাহার কল্পনারও অতীত, অথচ তপতীকে পাইবার সমস্ত আশাই বুঝি নির্মূল হইয়া গেল? কিন্তু মা! আশ্চর্য ঐ মহিমাময়ী নারী উহার গর্ভে জন্মিয়াছে সে, যাহাকে গত রাত্রে তপন দেখিয়াছে। যে নিষ্ঠুরা নারী শীতের রাত্রে একজনকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে! কিম্বা তপন ভুল দেখিয়াছে, সে ইঁহার কন্যা নহে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ইনিই মা এবং এই সংসারের কর্ত্রী। ইঁহারই কন্যা এত নিষ্ঠুর হইল কিরূপে? হিন্দুনারী হইয়াও আপনার স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, বুঝাইবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য যতই ভীতিপ্রদ হউক, যেমনই কদর্য হউক, তপন তাহাকে আবিষ্কার করিবে। তারপর যথা কর্তব্য করা যাইবে।

ভাবিতে গিয়া তপন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।—যদি সে দেখে তপতী অন্যাসক্তা, তপতী তাহার অন্তরে অপরের মূর্তি আঁকিয়া পূজা করিতেছে—তপন কি করিবে? ভাবিতে গিয়া তপনের মনে হইল—হয়ত তাহাই সত্য, তপনকে তাহাই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তপতীকে সুযোগ দিতে হইবে তাহার বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার জন্য। বর্তমানে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাবিবার নাই। যদি সত্যই সে কাহাকেও ভালোবাসে তবে তাহাকেই লাভ করুক। অন্যথায় তাহার কুমারী-হৃদয় একদিন তপনের কাছে ফিরিয়া আসিবে—সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করিবে তপন। যদি তাহাও না হয় তবে তপনের জীবন—সে তো চিরদিনই দুঃখের তিমির-গর্ভে চলিয়াছে, তেমনিই চলিবে।

ক্লান্ত তপন কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

শহরতলীর সর্পিল পথ ধরিয়া চলিয়াছে বিনায়ক। মন তাহার বিষাদখিন্ন। তার একমাত্র অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু তপনের অন্তরে বিষাক্ত কন্টক বিদ্ধ হইয়াছে। সে কাঁটা তুলিয়া ফেলার উপায় বাহির করা সহজ নহে, কারণ তুলিতে গেলে তপনের হৃদপিণ্ডটিকে জখম করিতে হয়। বিনায়ক ভাবিতেছে আর চলিতেছে। দিকে দিকে বাসন্তী শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে; মাঘ মাসের শেষ হইয়া আসিল। সরস্বতী পূজা, কিন্তু পূজার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তপন আসিবে না। বিনায়কের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তপনের বিরুদ্ধে। কেন সে না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেল? মিঃ চ্যাটার্জির বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তো তপনের লোভ নাই। লোভ তাহার কিছুতেই নাই। আজ দ্বাদশ বৎসর বিনায়ক তপনকে দেখিয়া আসিতেছে। অথচ সেই তপন কিনা এক কথায় মিঃ চ্যাটার্জির মেয়েকে বিবাহ করিয়া বসিল? যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে। নইলে সারা বাংলা দেশে তপনের মতো ছেলের বধূ যোগাড় করা কিছুই কঠিন ছিল না।

বিনায়ক গভীর দুঃখের মধ্যে আত্মবঞ্চনার শান্তি লাভ করিতেছে, তাহার হাসি পাইল

নিজের বোকামির জন্য। তপন কোনদিন বিনা কারণে কিছুই করে না। তপনের হৃদয়. আকাশের তপনের মতই জ্বলন্ত, জাগ্রত, জ্যোর্তিময়।

কারখানায় আসিয়া পড়িল বিনায়ক। খেলনা তৈয়ারীর ছোট কারখানা। তপনের মস্তিষ্কউদ্ভূত নানাপ্রকার খেলনা তৈরী হয় শিশুমনের উৎকর্ষতার উপযোগী করিয়া। তপনই ইহার জনক এবং বিনায়ক তাহার মালিক ও পরিচালক। তপন নিজের খাওয়া পরার যৎসামান্য খরচ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করে না। কারণ সে একা, তাহার খরচ খুবই কম, আর বিনায়কের মা-ভাই-বোন আছে, বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হয় এবং বাজার করিয়া খাইতে হয়।

বিনায়ককে একা আসিতে দেখিয়া শ্রমিকবর্গ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, ছোটদা কই বড়দাদাবাবু?

শ্রান্তকণ্ঠে বিনায়ক উত্তর দিল—অসুস্থ। তোমাদের জন্য মা'র কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দু'লাইন কবিতা পাঠিয়েছে—

"দীর্ণ জীর্ণ জীবনে তোমার বাসন্তী বিভা ছড়ায়ে দিও,
—দুঃখ-আর্ত বঞ্চিত প্রাণে নব যৌবনে আশ্বাসিও।"

এইবার এসো ভাই সব, পূজায় বসি।

সকলেই ক্ষুব্ধ হইল, উদ্বিগ্ন হইল কিন্তু পূজার সময় হইয়াছে। বিনায়ক পূজায় বসিল। করজোড়ে কর্মীগণ উপবিষ্ট রহিল।

পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করিয়া বিনায়ক বলিল—তোমাদের ছোটদা দু'চারদিন আসতে পারবে না ভাই সব, অসুখের জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। ভেবো না তোমরা।

—তিনি ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, সামান্য সর্দি মতো হয়েছে।

বিনায়ক একাকী ফিরিয়া চলিল। দুই পাশে কচুরীপানার জঙ্গল শুকাইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে দুই একটা গাছে লাল ফুল ফুটিতেছে। বাসন্তীর আগমনে সবই যেন লাল হইয়া যায়, এমন কি তপনের হৃদয়টাও আজ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বিনায়ক নিশ্বাস ফেলিল একটা।

তপন, তাহার বাল্যবন্ধু তপন—জীবনে যে কোনদিন কোনরূপ অসৎ কার্য করে নাই, কাহারও মনে বেদনা দেয় নাই, জীবন-পণ করিয়া যে পরোপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই তপনের জীবনে এমন দুর্বিপাক কেন ঘটিল? তপন না থাকিলে মাতা-ভ্রাতা-ভগিণীকে লইয়া বিনায়ক আজ ভাসিয়া যাইত। এম-এ পাশ করিয়াও যখন চল্লিশ টাকার চাকুরী জুটিল না তখন একদিন নিরাশ নয়নে গড়ের মাঠে বিনায়ক বসিয়া ভাবিতেছিল, আত্মহত্যাই তাহাকে করিতে হইবে। ঠিক সেই সময় তপন রাস্তার উপর দাঁড়ানো মোটরগাড়ীর আরোহীগণকে বিক্রয় করিতেছিল তাহার স্বহস্তের প্রস্তুত খেলনা। বিনায়ককে ক্লান্ত অবসাদখিন্ন দেখিয়া সেই তো এই কারখানার পত্তন করে নিজের হাতের আংটি বেচিয়া। সেদিন ছিল তিন টাকা ভাড়ার একটি চালাঘর এবং দুইজন শ্রমিক বিনায়ক আর তপন। সে আজ আট বৎসর পূর্বের ঘটনা। আজ এই কারখানায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রস্তুত খেলনা বিদেশী খেলনার সহিত প্রতিযোগিতা করে। নীট্ আয় মাসিক দুই শত টাকার কম নয়।

কিন্তু তপন ইহার কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মাসে পনের টাকাও সে গ্রহণ করে

নাই, বিনায়কের সংসার পালনের জন্য দান করিয়াছে। এই অসাধারণ বন্ধুবৎসল তপন আজ ভাগ্যের ফেরে ক্ষতচিহ্ন, আর্তহৃদয়—অথচ বিনায়ক তাহার কোন উপকার করিতে পারে না! হয়ত পারে! বিনায়ক দ্রুত পা চালাইয়া নিকটবর্তী একটি দোকানে আসিয়া কয়েক আনা পয়সা দিয়া ফোন করিল।

অসুস্থ তপন আসিয়া ফোনে বলিল—কি বলছিস বিনু?

—তুই আত্মপরিচয় কেন দিবিনে তপু—তাহলে সে তোকে ভালোবাসবে।

—না, তার দরকার নাই। যে আমায়, কুৎসিত দেখে ভালোবাসলে না, সে আমায় সুন্দর দেখে ভালবাসতে পারে না, যে আমায় মূর্খ ভেবে গ্রহণ করলে না, আমাকে পণ্ডিত দেখে গ্রহণ করবার তার আর অধিকার নেই। যদি সে অন্য কাউকে চায় তবে তারই হাতে ওকে তুলে দেবো।

—কিন্তু তাহলে...

—থাক বিনু—এসব ফোনে হয় না।

তপন ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে। বিনায়ক গভীর শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া যখন সে পৌঁছিল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে এবং স্নেহময়ী জননী তাহার আহার্য লইয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন।

বিনায়ক খাইতে বসিল।

তপতী চ্যাটার্জি সাবানঘষা একরাশ চুলে লাল ফিতা বাঁধিয়া বাসন্তী রং-এর কাপড় পরিয়া সেতার কোলে চলিয়াছে কলেজ-হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করিবার জন্য। সেখানে সে গাহিবে, নাচিবে এবং রূপের বিদ্যুতে সকলকে চমকিত করিয়া দিবে।

মা বলিলেন—খুকী, তপন ওঘরে সরস্বতী পূজা করছে যা প্রণাম করে আয়।

নাক বাঁকাইয়া তপতী কহিল,—তুমি যাও, আমার প্রণাম করিবার ঢের জায়গা আছে।

তপতী গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তপতীর দুই একজন বন্ধু, যাহরা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহারা কিন্তু তপনকে একবার দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। তপনের কক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, ক্ষৌম বস্ত্র-পরিহিত, উত্তরীয়-আবৃত দেহ তপন পিছন ফিরিয়া পূজা করিতেছে। তাহার মুণ্ডিত মস্তকের উপর লাউয়ের বোঁটার মতো টিকিতে একটা গাঁদা ফুল। তরুণীর দল আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা ছোট কাঁচি আনিয়া টিকিটি আমূল ছাঁটিয়া দিল। হাসির উচ্ছল শব্দে মুখ ফিরাইয়া তপন দেখিল, ঘরে চাঁদের হাট। সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া পূজা করিতে লাগিল। তাহার চন্দন-চর্চিত মুণ্ডিত মুখশ্রী আধুনিক আলোক-প্রাপ্তাদের মোটেই ভালো লাগিল না। তাহার উপর তপন কয়েকদিনের অসুস্থতার জন্য দাড়ি কামায় নাই, ইহা তাহার দ্বিতীয় অপরাধ। সর্বোপরি সে যে পুস্তকখানির উপর পুষ্পার্ঘ অর্পণ করিতেছিল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, লালচে রং-এর কাগজের মলাটে তাহার নাম লেখা "হারু ঠাকুরের পাঁচালী।"

ঐ বটতলার নিদারুণ অশ্লীল বই তপন পড়ে এবং সরস্বতী পূজার জন্য উহারই উপর পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা কদর্যতার পরিচয় আর কি হইতে পারে। উহার আর কোন বই নাই, আর কিছু পড়িবার যোগ্যতা নাই! কি হইবে উহার সহিত রসিকতা করিয়া। তরুণী দল বাহিরে আসিল মুখ টেপাটেপির হাসিতে। তপতীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে যাহারা

এতাবৎ ঈর্ষাপরায়ণা ছিল, তাহারা বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, তপনের অর্বাচীনতাটা তাহারা আজ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া তপতী বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঝঙ্কার দিয়া কহিল—এরকম দেরী করলে যাবো না আমি। রেবা মৃদু হাসিয়া বলিল—দেখে এলাম তোর বর—পাঁচালী পড়ছে। এবার সচিত্র প্রেম পত্তর আউড়ে চিঠি দেবে তোকে—"যাও পাখী বলো তারে—"

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন তপনের কর্তিত টিকিটি আনিয়াছিল, তপতীর অঞ্চল-বিদ্ধ ব্রোচটিতে সেই টিকিটি আটকাইয়া দিয়া কহিল—তোর বরের মাথার ধ্বজা—রাখ্ বুকে গুঁজে!

আবার হাসি! রাগে তপতীর যেন বাকরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; রোষকষায়িত নয়নে সে ড্রাইভারকে ধমক দিল—জল্দি চালাও—জলদি! বান্ধবীদের মধ্যে একজন সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—তপু, কি করে জীবনটা কাটাবী তুই?

অন্যজন বলিল,—রিয়েলি, উই আর সো স্যরি।

তৃতীয়া বলিল,—মন্দই বা কি ভাই! বেশ হুকুম মতো চলবে, গা-হাত পা টিপে দেবে, মাঝে মাঝে পাঁচালী পড়ে শোনাবে, দরকার হলে রান্না-বান্নাটাও—

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে আর একজন বলিল,—চেহারাটাও ঠিক রাঁধুনি বামুনের মতন।

তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিতেছে, কিন্তু উপায় নাই। ইহারা যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঐরকমই নিশ্চয়, বিরুদ্ধে তপতী কিছুই বলিতে পারে না। তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল তাহার বাবার উপর। বাবা তাহাব একি করিলেন? একটা নিতান্ত অশিক্ষিত, সভ্য সমাজে অপাংক্তেয় ছেলের সহিত তপতীর বিবাহ দিলেন। আশ্চর্য! ইহাই যদি বাবার মনে ছিল তবে তপতীকে তিনি এত লেখাপড়া শিখাইলেন কেন? তপতী তো ঠাকুরদার কাছে যতটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছিল তাহাতেই বেশ চলিত। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর তপতীকে কলিকাতায় আনিয়া তিনি কলেজে ভর্তি করিয়াছেন। তাহার জন্য গানের মাষ্টার রাখিয়াছেন, নাচের মাষ্টার রাখিয়াছেন। পাঁচটা সাতটা ক্লাবে তাহাকে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন, এক কথায় সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁদে তপতীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা কি ঐ পাঁচালী পাঠকারী টিকিওয়ালা গণ্ডমুর্খের জন্যই! বেশ—তপতী ইহার শোধ তুলিয়া তবে ছাড়িবে।

তপতীর ব্যবহার কয়েকদিন মিসেস্ চ্যাটার্জি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আজ তাহার মুখে বিদ্রোহের বাণী শুনিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া তপতী সীমাহীন তিক্ততার সহিত জানাইল, আমার বন্ধুরা তোমার জামাইয়ের কাছে যেন না যায়, বুঝেছো—তা হলে আমায় বাড়ীছাড়া হতে হবে।

—কেন? মা স্নিগ্ধকণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন।

—কেন! তপতীর কণ্ঠে অগ্ন্যুদগার হইল—কেন, তা জানো না! একটা হতভাগ্য মূর্খ লোককে ধরে এনেছো—টিকি রাখে, পাঁচালী পড়ে—আবার কেন! লজ্জা করলো না জিজ্ঞাসা করতে?

মা নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। মুহূর্তে সামলাইয়া কহিলেন,—গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে

এসেছে, তাই টিকি রয়েছে, ওটা তুই ছেঁটে দিস্।

—তুমি ছাঁটো গিয়ে, ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে—আর পাঁচালী শুনবে—।

—পাঁচালী পড়তে আমি বারণ করে দেবো, খুকী।

—কিছু তোমার করতে হবে না, শুধু এইটি করো যেন আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা না হয়, তা'হলেই বাধিত থাকবো।

তপতী রোষভরে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। মা একবার তপনের কক্ষে আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া গেলেন, ক্লান্ত অসুস্থ তপন একক শয্যায় ঘুমাইতেছে। কক্ষের মৃদু আলোক তাহার প্রশস্ত ললাটে আসিয়া পড়িয়াছে—যেন রূপকথার রাজপুত্র, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এমনি জাগিয়া উঠিবে। মিসেস্ চ্যাটার্জি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এমন সুন্দর ছেলে, লেখাপড়া কেন যে শেখে নাই। পর মুহূর্তেই মনে পড়িল তপনের দারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের কথা। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃহীন হইয়া তপনকে পাঠ্য পুস্তক বেচিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু কি-ই-বা উহার বয়স? এখনো তো পড়াশুনা করিতে পারে।

মিসেস্ চ্যাটার্জি স্বামীর কক্ষে আসিলেন। মিঃ চ্যাটার্জি এখনও তাঁহার অপেক্ষায় জাগিয়া ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—খুকী ফিরেছে?

—হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরলো।

মিঃ চ্যাটার্জি নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। মিসেস্ চ্যাটার্জি কয়েক মিনিট থামিয়া বলিলেন,—খুকী কিন্তু তপনকে মোটেই পছন্দ করছে না।

বিস্ময়ের সুরে মিঃ চ্যাটার্জি কহিলেন,—কেন! অপছন্দের কি কারণ?

ছেলেটাকে আমার তো খুব ভাল লাগছে গো, তবে লেখাপড়া ভালো জানে না, পাঁচালী, ছড়া, এইসব নাকি পড়ে। খুকী তো এই ক'দিনে একবারও তার কাছে যায়নি। কতবার বললাম, জ্বর হয়েছে, একবার যা, কাছে গিয়ে বোস, তা কথাই কানে তুললো না। আজ আবার এসে বললো, তার বন্ধুরাও যেন ওর কাছে না যায়। আমি বাবু বেশ ভালো মনে করছি না, অতবড় মেয়ে!

পত্নীর এতগুলি কথার উত্তরে মিঃ চ্যাটার্জি হাসিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন,—খুকীর পরীক্ষাটা হয়ে যাক—তারপর দেখে নিও। ও ছেলেকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, আর জানতাম ওর বাবাকে। সেই বাপের শতাংশের এক অংশও যদি পেয়ে থাকে, তা হলে ও হবে অসাধারণ।

—কিন্তু খুকী ওর সঙ্গে মিশছেই না—বলে, মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে।

—মূর্খ তো নয়ই, পাড়াগেঁয়েও নয়। আমি দু'চারটা কথা কয়েই বুঝেছি। কিছু ভেবো না তুমি, আমি ওকে পরশু থেকেই আমার ব্যবসায়ে লাগাব, আর তোমার খুকী ইতিমধ্যে পরীক্ষাটা দিয়ে নিক্। তারপর দুজনকে শিলং-এ নতুন বাড়ীটাতে দেব পাঠিয়ে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, পাঁচালী, ছড়া এসব পড়ে কেন? ইংরাজী না জানুক বাংলা ভালো বই, মাসিকপত্র, এসব তো পড়তে পরে?

তুমি বোলো সে কথা। আর ইংরাজী যে একেবারে জানে না, তা তো নয়, যা জানে তাতে আমার অফিসের কাজ চলে যাবে। আর তোমার ঐ আধুনিক সমাজের ধরণাধারণ শিখতে মাসখানেকের বেশী লাগে না। আমি ওকে আপ-টু-ডেট করে দিচ্ছি। ভেবো না তুমি।

মিসেস্ চ্যাটার্জি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন মিসেস্ চ্যাটার্জি তপনকে চা খাওয়াইতে বসাইয়া বলিলেন,—তুমি পাঁচালী কেন পড় বাবা? খুকীর বিস্তর মাসিক পত্রিকা আছে—সেইগুলো পড়ো। ভাল বাংলা বই পড়ো, বুঝলে।

উত্তরে তপন স্মিত হাস্যে কহিল,—পাঁচালী বাংলার আদি সাহিত্য মা, ওর ওপর এত রাগ কেন আপনাদের।

—না বাবা, আজকাল ওগুলো আর চলে না কিনা, তাই বলছি আধুনিক সমাজে ওর কদর নেই।

—কিন্তু আমি আধুনিক নই মা, অত্যন্ত প্রাচীন, আপনার শ্বশুরের মতন প্রাচীন। আর ঐ পাঁচালীখানা আপনার শ্বশুরমশায়ের—আপনারই বাড়িতে পেয়েছি কাল।

স্নিগ্ধ মধুর হাসিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জি বলিলেন,—ওঃ তাই বলো বাবা তুমি শ্বশুর—আবার ফিরে এলে বুঝি?

তপন মৃদু হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, এবার ছেলে হয়ে এলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি যে সমাজে বাস করেন সে সমাজে এরূপ কথার চলন বিশেষ নাই, সেখানে কথা-বার্তার স্রোত আন্তরিকতাহীন কৃত্রিমতার মধ্যে বহিয়া যায়। কিন্তু সে সব ছেঁদো কথা এমন করিয়া তো মনকে আকর্ষণ করে না, এ যেন নিমেষে আপন করিয়া লয়। তপন যেন ক্রমশ তাঁহার পুত্রহীনতার স্থানটিকে জুড়াইয়া দিতেছে। এমন সুন্দর ছেলেকে তাঁহার খুকী গ্রহণ করিবে না। নিশ্চয় করিবে। খুকীর পরীক্ষাটা হইয়া যাক—তারপর মিসেস্ চ্যাটার্জি খুকীর উপর চাপ দিবেন। তপন তো বাড়ীতেই রহিল। ব্যস্ত হইবার কিছু কারণ নাই।

পরদিন সাহেব কোম্পানীর দোকানের কোট-প্যান্টালুন পরাইয়া মিঃ চ্যাটার্জি তপনকে নিজের অফিসে লইয়া গেলেন। তপন এখন হইতে তাঁহাকে কাজ কর্মে সাহায্য করিবে।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আপনার টু-সীটার খানায় খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া তপতী স্নান করে এবং বাপের সহিত চা খাইয়া পড়িতে বসে। তপন সে সময় আপনার ঘরে স্নান করিয়া পূজা করিতে থাকে। যখন খাইতে আসে তখন একমাত্র মিসেস, চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেহই থাকে না।

খাইয়াই তপন বাহির হইয়া যায়, বহুস্থানেই তাহাদের কোম্পানীর কন্ট্রাক্টে বাড়ী নির্মিত হইতেছে, তাহাই দেখিতে। ফিরিয়া যখন আসে তখন তপতী খাইয়া বিশ্রাম করিতেছে আপনার ঘরে। তপন মধ্যাহ্নে ভোজন সারিয়া আবার বাহির হয় অফিসে। বিকাল সাড়ে পাঁচ-ছটায় ফিরিয়া আসে জল খাইবার জন্য। তপতী তখন কোনদিন বন্ধুদের লইয়া বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে, কোনদিন বা লনে টেনিস খেলিতেছে, কোনদিন হয়ত বন্ধুবান্ধবদের সহিত সঙ্গীতের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। তপনের সহিত তাহার সাক্ষাতের অবসর নাই, ইচ্ছে তো নাই-ই। দৈবাৎ উহা ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু তপতী যতখানি এড়াইয়া চলে, তপন এড়াইতে চায় ততোধিক। বৈকালিক জলযোগ সারিয়া তপন পুনরায় বাহিরে চলিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসে রাত্রি সাড়ে দশটার আগে নয়।

মিষ্টার বা মিসেস্ চ্যাটার্জি তাহাকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দিতে চান না, কিন্তু তপন মৃদু হাসিয়া বলে,—গরীবের ছেলে মা আমি খেটে খেতেই তো জন্মেছি। মিসেস চ্যাটার্জি

ক্ষুব্ধস্বরে বলেন,—সে যখন ছিলে বাবা, এখন তো তোমার কিছু অভাব নাই, এত খাটুনি কমাও তুমি। তপন আরও মধুর করিয়া উত্তর দেয়—বাবাকে একটু সাহায্য করার জন্য আমি চেষ্টা করছি মা,—আমার বিদ্যে-সাধ্যি অল্প, তাই খুব সাবধানে কাজ করি, যাতে ভুল কিছু না হয়। খাটুনি আমার কিছু লাগে না মা।

মিসেস্ চ্যাটার্জির আর কিছু কথা যোগায় না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—তোমার জন্য একটা গাড়ী কিনে দিই বাবা।

—কি দরকার মা? ট্রামে তো দিব্যি যাচ্ছি-আসছি।

কিন্তু পরদিন মিঃ চ্যাটার্জি তপনের জন্য একখানা গাড়ী কিনিয়া আনিলেন। তপন পরদিন নূতন গাড়ী চড়িয়া অফিসে গেল। বিকেলে ফিরিয়া গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় রাখিয়া সে জল খাইতে বসিয়াছে, তপতী দেখিল, নূতন গাড়ীখানা দেখিতে খুবই সুন্দর সে অন্য সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া গাড়ীটাকে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। তপন নীচে আসিয়া দারোয়ানের মুখে দিদিমণির কীর্তি শুনিয়া মৃদু হাসিল এবং ট্রামের পাশখানা পকেটে ঠিক আছে দেখিয়া লইয়া হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল।

রাত্রে ফিরতেই মিসেস চ্যাটার্জি বলিলেন,—খুকীটা বড্ড দুষ্টু বাবা, তোমার গাড়ী নিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিল। আবার বক্‌তে গেলুম, তো হাসে।

—নিক্‌ না মা ; ছেলেমানুষ, ঐ গাড়ীটা যদি ওর ভাল লাগে তো নিক—আমি ট্রামে বেশ যাতায়াত করতে পারি।

—না বাবা, তুমি এমন কিছু বুড়ো মানুষ নও। আর খুকীর তো গাড়ী রয়েছে। তুমি দিও-না ওকে তোমার গাড়ী।

উত্তরে তপন মৃদু হাসিল, কিছুই বলিল না। খাইতে খাইতে সে ভাবিতে লাগিল, তপতীর ইহা নিছক ছেলেমানুষি, নাকি ইহার অন্তরালে আরো কিছু আছে? এই দীর্ঘ পনেরদিন একটিবারও তপনের সহিত তাহার দেখা হয় নাই। দুজনেই দুজনকে এড়াইয়া চলিয়াছে ; হঠাৎ তাহার জন্য ক্রীত গাড়ীখানা লইয়া তপতীর বেড়াইতে যাইবার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায় যে তপন তাহার সহিত মিশুক, তাহার সহিত বেড়াইতে যাক্‌—কিম্বা তাহার বিপরীত। তপন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। খাওয়া শেষ করিয়া আপনার কক্ষে গিয়া শয়ন করিল।

কিন্তু ঘুম কি আসিতে চায়। তপতী তাহার পঞ্চবিংশতি বর্ষের জীবনে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। তপন এই কয়দিন লক্ষ্য করিয়াছে, যাহাদের সহিত তপতী বেড়াইতে যায়, গান করে, টেনিস খেলে, তাহারা সকলেই আধুনিক সমাজের তরুণ-তরুণী। সুশ্রী, সভ্য এবং সর্বতোভাবে তপতীর যোগ্য। এত লোককে ছাড়িয়া কেন মিঃ চ্যাটার্জি তপনের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, তপন তাহা ভাবিয়া পায় না, তাহার পিতার সহিত নাকি মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব ছিল। তপন যখন নিতান্ত ছোট তখনই নাকি মিঃ চ্যাটার্জির কন্যার সঙ্গে তপনের বিবাহের কথা হয়। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি সে কথা ভুলিয়াই বা রহিলেন কেন, আর আজ এতকাল পরে সেই অঘটনটা ঘটাইয়াই বা দিলেন কেন! কিন্তু ভাবনা, নিষ্ফল। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া স্নান পূজা যথারীতি সারিয়া সে বাহিরে যাইবার জন্য আজো তাহার গাড়িখানি লইতে আসিয়া দেখিল, তাহারই গাড়ী লইয়া তপতী প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। তপতীর গাড়ীটা অবশ্য গ্যারেজেই রহিয়াছে, কিন্তু তপনের উহা লইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। শুধু সঙ্কোচ বলিলে যথেষ্ট হয় না, হয়তো একটু ঘৃণার

ভাবও মনে আসিল তাহার। কতদিন তপন দেখিয়াছে, ঐ গাড়ীখানার চালকের স্থানে তপতী এবং পাশে মিঃ ব্যানার্জী না হয় মিঃ অধিকারী কিম্বা চৌধুরী—কোনদিন বা তিনজনই। ও গাড়ী না লওয়াই ভালো। তপন ট্রাম ধরিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

তপতী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার টু-সীটার গ্যারেজে রহিয়াছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল,—জামাইবাবু গাড়ী নেহী লিয়া?

—নেহী হুজুর—ট্রামমে চলা গিয়া।

তপতী উপরে চলিয়া আসিল এবং নিঃশব্দে আপন ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে বসিল ; মা কিন্তু সমস্তই জানিয়াছেন ; কন্যার ঘরে আসিয়া একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন,—খুকী, আজও তুই ওর গাড়ী নিয়েছিলি?

—নিলুম তো কি হলো মা? ও আমার গাড়ীটায় চড়লো না কেন? বলে দিও ঐটা নিতে। এ গাড়ীটা বেশ দেখতে, তাই নিয়েছিলুম। এই গাড়ীটাই আমি নেবো এবার থেকে।

মা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—কেন, তোর গাড়ী মন্দ?

—মন্দ কেন—এটা নতুন, বেশ রংটা আর দৌড়ায় খুব। কিন্তু আমার গাড়ীটাও খারাপ নয়—চড়ে দেখতে বলো একদিন।

তপতী মধুর হাসিল। মা ভাবিলেন, খুকী তাঁহার জামাতার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। বয়স্কা মেয়ে, লজ্জায় সব কথা খুলিয়া বলে না, আর এ-যুগের মেয়েদের চিনিবার উপায় নাই। হয়ত খুকী তপনের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু কহিয়াছে,—হয়ত ইহা ভালোরই লক্ষণ। মা খানিকটা স্বস্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ তো, দুজনে বদ্‌লাবদ্‌লি করিস।

—হ্যাঁ, তুমি বলে দিও সে কথা!

তপতী পাঠে মন দিল। মা চলিয়া আসিলেন। দুপুরে তপন খাইতে আসিলে মা বলিলেন,—তুমি খুকীর গাড়ীটাই নাও বাবা, তোমার গাড়ীর সবুজ রং ওর বড্ড পছন্দ হয়েছে, তাই তোমারটাই নিতে চাইছে।

—বেশ তো মা, ও নিক—গাড়ীর আমার কী-ই বা দরকার? তখনও যেমন চলছিলাম, এখনও তেমনি চলবো ট্রামে।

—না বাবা—না। মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহলে আমি খুকীর কাছ থেকে গাড়ীটা কেড়ে নেবো।

—ছিঃ মা, ওর এখন পড়ার সময়, মনে আঘাত পাবে। আমি কিছু মনে করছি না মা, দুটো গাড়ীই থাকলো, যখন যেটাতে খুসি ও চড়বে।

—তুমি তাহলে কি ট্রামেই চড়বে বাবা? মাতার স্বরে আতঙ্কের আভাস স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

হাসিয়া তপন বলিল—আচ্ছা মা, আমি একটা মোটর বাইক কিনে নেবো।

—বড্ড বিপদজনক গাড়ী বাবা—ভয় করে।

—কিছু ভয় নেই মা, আমার জীবনে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে না।

মা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—মেয়েটার কি যে কাণ্ড।

—আপনার খুকীর গাড়ী না হলে একদিনও চলে না, আর আমার পা-গাড়ীতে আমি পঁচিশ বছর চলে এলুম। আমার জন্য অত ভাবছেন কেন মা! তাছাড়া মোটর বাইকে চড়তে আমি ভালোবাসি।

—বেশ বাবা, তাই করো অহলে—আজই কিনে নাও একখানা মোটর বাইক।

খাওয়ার শেষে আপন কক্ষে আসিয়া তপনের হাসি পাইতে লাগিল। প্রাচুর্যের মধ্যে যাহাদের বাস তাহারা অর্থ সম্পদ দিয়াই মানুষকে বশ করিতে চায়। কিন্তু মানুষ যে অর্থের অপেক্ষা অন্য একটা জিনিসের বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ইহারা কিরূপে জানিবে? যাক্, মোটর বাইক একখানা কিনিতেই হইবে নতুবা মা ভাবিবেন, খুকীর উপর তপন রাগ করিয়াছে।

পরদিন তপন একটা মোটর বাইকে চড়িয়া বাড়ী ফিরিল।

পরীক্ষার জন্য তপতী কিছুদিন যাবৎ অত্যন্ত ব্যস্ত তাই তাহার সঠিক স্বরূপ তপন দেখিতে পাইতেছে না। তথাপি সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তপতীর নিকট তপনের কোন আশা নাই। তপতী তাহার বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও নিশ্চয় ভালোবাসে, কিম্বা এমনও হইতে পারে, তপতী আজো কাহাকেও ভালবাসিবার সুযোগ পায় নাই, তবে তপনকে যে সে কোন দিন গ্রহণ করিবে না, ইহা নানা ভাবে বুঝাইয়া দিতে চায়।

আজও তপন বাহির হইবার পূর্বে তাহার মোটর বাইকখানা লইয়া সেই যে তপতী লনের চক্রাকার পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে; নামিবার নামটি নাই। তপন নীরবে গেটের নিকট মিনিটখানেক দাঁড়াইল,—ভাবটা,—তাহাকে দেখিয়া যদি তপতী বাইক খানা ছাড়িয়া দেয়। তপন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপতী বাইকের বিকট শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। অর্থাৎ এবাড়ীর সব জিনিসেই তপতীর অধিকার, তপনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তপন হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল। তারপর সে সনাতন ট্রামেই যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল।

মা কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে মেয়েকে বলিলেন,—এসব তোর কি কাণ্ড খুকী!

উচ্ছল হাসিতে ঘর ভরাইয়া তুলিয়া খুকী জবাব দিল,—জানো মা মোটর গাড়ী সব মেয়েই চালায়, কিন্তু মোটর বাইক চালাতে বেশী মেয়ে জানে না—আমি তাদের হারিয়ে দিলাম।

মা খুশী না হইয়া বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন,—তোর বাবাকে বল, তোর জন্যে একখানা কিনে দিক ; ওরটা কেন নিলি?

—নিলুম, তাতে তোমার জামাই ধন্য হয়ে যাবে বুঝেছো!

তপতী হাসিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল একটা ইংরেজী গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে।

খুকীর মন তপনের প্রতি অনুকূল না প্রতিকূল! আপনার গর্ভজাত কন্যার অন্তররহস্য মা আজ কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের সময়ে এসব ছিল না। ধনী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন প্রথম দর্শনের দিনটি হইতেই স্বামীকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিলেন, স্বামীও তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ-যুগের আবহাওয়া কখন কোন দিক দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা বুঝিবার সাধ্য স্বয়ং মহাকালের আছে কিনা সন্দেহ।

টহা লতপন বাড়ী ফিরিলে তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—ট্রামেই তো এলে বাবা

—হ্যাঁ মা। কিন্তু আপনি এত ভাবছেন কেন! ট্রামে বিস্তর বড়লোকের ছেলে চড়ে। ট্রাম কিছু খারাপ নয় মা।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দরিদ্র এই ছেলেটি নিজেকে দরিদ্র বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এখনি হয়ত বলিয়া বসিবে, "আমি ফুটপাতের মানুষ মা, আপনার আবুহোসেনি রাজত্বে এসে নাই-বা চড়লাম মোটরে। রাজত্ব তো রয়েছে!" আর ইহাকে দেওয়া জিনিস যখন তাঁহারই মেয়ে কাড়িয়া লইয়াছে তখন বেশী কিছু বলিতে যাওয়া উচিত নয়। হয়ত মনে করিবে, নিজের মেয়েকে বলিতে পারেন না, যত কথা তাহাকেই বলা হয়। উহার ভালোমানুষির সুযোগ লইয়া খুকী কিন্তু বড়ই অন্যায় করিতেছে। একটু ভাবিয়া বলিলেন—খুকীর গাড়ীটাই বা কেন তুমি নাও না বাবা?

—গাড়ীর দরকার নেই মা, অনর্থক কেন ভাবছেন আপনি! আর দরকার যখন হবে তখন নেবো, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমরা বুঝব সে সব!

মা ভাবিলেন, হয়তো তাহাই ঠিক,—খুকীর সহিত তপনের কোনরূপ কথাবার্তা হইয়া থাকিবে। তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আহারান্তে তপন চলিয়া যাইতেছিল, মা বলিলেন,—খুকীর জন্মদিন বাবা, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো!

—চেষ্টা ক'রবো মা। বলিয়া তপন চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় বাড়ীতে মহাসমারোহ! আধুনিক সমাজে বিবাহের পূর্ব্বেই অবশ্য মেয়ের জন্মদিন-উৎসব ধুমধামে হইয়া থাকে, বিবাহের পর উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়! কারণ, জন্মদিন-উৎসবটা ছেলেদের ও মেয়েদের পরস্পর পছন্দ করিয়া বিবাহ-বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইবার দিন! কিন্তু তপতী ইহাদের একমাত্র কন্যা, তাই জন্মদিনটা এবারও হইতেছে।

তপতীর বন্ধুর দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গান গাহিতেছে একটি মেয়ে! বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তপতীকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। অনেকে মিসেস চ্যাটার্জিকে জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিসেস চ্যাটার্জি প্রত্যেককে জানাইলেন, সে জরুরী কাজে গিয়াছে, এখনি আসিবে।

মিসেস চ্যাটার্জির কথায় মিঃ অধিকারী কহিলেন—সেই বামুন ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? ভয়ে পালিয়েছেন নাকি?

মিঃ ব্যানার্জি উত্তর দিলেন—ভয় নয় ভাবনায়, আমরা তার বোকামী ধরে ফেলবো বলে!

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—রেবা দেবী সেদিন তার টিকি কেটে দিয়েছেন।

রেবা দেবী কহিলেন,—মাথাটা মুড়ানো আছে, তুই ঘোল ঢেলে দিস তপতী।

—না না না মিস চ্যাটার্জি, ঘোল নয়, ওর মাথায় কড্‌লিভার অয়েল দেবেন, চুলগুলো একটু ভিটামিন খেয়ে বাঁচবে!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিস চ্যাটার্জি আখ্যাতা তপতী কহিল,—চুপ করুন, মা শুনতে পেলে বকবেন এখুনি।

—বকবেন কি? এর জন্য দায়ী তো আপনার মা আর বাবা! আপনার মতো সর্বগুণান্বিতা মেয়েকে একটি বানরের গলায় দিতে ওঁদের বাধলো না?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণ পরে কহিল—মিঃ ব্যানার্জি তো আমায় "দুল" দিয়েছেন, মিঃ চৌধুরী দিলেন ব্রোচ, মিঃ অধিকারীর কথা ছিল যা দেবার তা না দিয়ে অন্য একটা বাজে জিনিস দিলেন, ওঁর শাস্তি হওয়া দরকার।"

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"সার্টেনলি।"

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—সে জিনিস আপনি নিলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাবো।

—নিশ্চয়ই নেবো, দিন!

—জিনিসটা কি মিঃ অধিকারী!—প্রশ্ন করিলেন মিঃ ব্যানার্জি।

—একটা ডায়মন্ড রিং। উত্তর দিল তপতী স্বয়ং।

সকলে একটু বিচলিত হইল। বিবাহিতা মেয়েকে আংটি দেওয়া চলে কি? কিন্তু তপতী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে চায়, সে আজো বিবাহিত নহে এবং এ জন্যই "মিস চ্যাটার্জি" নামে অভিহিতা হইতে আপত্তি করে না। মিঃ অধিকারী ধনীর সন্তান। তিনি তপতীর জন্য আংটি কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া তপতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তপতী তাহা পরাইয়া দিবার জন্য বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

মিঃ অধিকারীর আংটি পরানো তখনো শেষ হয় নাই, মা'র সঙ্গে তপন আসিয়া ঢুকিল, হাতে তাহার একগুচ্ছ ফুল। মা তপতীর কাণ্ড দেখিয়া মুহূর্তে থ হইয়া গেলেন, কিন্তু তপনের সামনে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া কহিলেন,—প্রণাম কর খুকী...

তপতী উঠিল না, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। তপন একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল,—থাক মা, আমি এমনি আশীর্বাদ করছি। বলিয়া সে অশোক গুচ্ছটি তপতীর হাতে দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিল,— তোমার জীবনে পবিত্র হোমশিখা জ্বলে উঠুক...

তপতী পুষ্পগুচ্ছটা টানিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল,—যাত্রা দলে প্লে করে নাকি? আশীর্বাদের ছটা দেখো!

বন্ধুদল হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই তপন মা'কে কহিল—বলুকগে মা, আমি কিছু মনে করিনি।

তপন আপন কক্ষে চলিয়া গেল। মা'ও অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত হইয়া চলিয়া গেলেন। বন্ধুর দল হাসি থামাইয়া বলিল,—সত্যি একটা ওরাংওটাং।

পরদিন সকালে আসিল শিখা, তপতীর বন্ধুদের মধ্যে নিকটতমা। আসিয়াই বলিল—কাল সবে এসেছি ভাই, তোর বর কোথায় বল—আলাপ করব।

—আলাপ করতে হবে না, সে একটা যাচ্ছেতাই।

—ওমা, সেকি? কেন?

—যা কপালে ছিল ঘটেছে আর কি। হুঁ, ঠাকুরদা নাকি গণনা করে বলেছিলেন, আমার বর হবে অদ্ভুত, তাই অদ্ভুত হয়েছে, যাত্রাদলের ভাঁড় একটা।

শিখা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন তপু ব্যাপার কিরে?

—ব্যাপার তোর মাথা! যা, দেখে আয়, ওঘরে রয়েছে!

শিখা আর কোন কথা না বলিরা তপনের কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তপন তখন পূজা শেষ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছে। পিছন ফিরিতেই শিখার সহিত চোখ মিলিল। তাহার চন্দনচর্চিত পূত দেহকান্তি, উন্নত প্রশস্ত ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা, গলায় শুভ্র উপবীত শিখাকে

মুহূর্তে যেন অভিভূত করিয়া দিল। শিখা ভুলিয়া গেল, সে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহার বন্ধুর বরের সঙ্গে। ভুলিয়া গেল উহার সহিত শিখার সম্বন্ধ কি! যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে গিয়া শিখা আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া তপনকে প্রণাম করিয়া বসিল!

মৃদু হাসিয়া তপন কহিল,—তুমি কে ভাই দিদি? এ সমাজে তোমাকে দেখবার আশা তো করিনি?

পাঁচ সাত সেকেণ্ড কণ্ঠরোধ হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল—আমি আপনার ছোট বোন আর তপতীর বন্ধু আর জাষ্টিশ মুখার্জির মেয়ে।

—ওঃ! তুমিই শিখা। কিন্তু একটা কথা আছে!

—বলুন!

—এখানে আমাকে তুমি কেমন দেখলে, কিছুই বলবে না তোমার বন্ধুর কাছে বা কারো কাছে। আজ বিকেলে আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে যা-কিছু বলবার বলবো—অনেক কথা আছে। তুমি এখন বাড়ী চলে যাও ভাই শিখা।

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?

—মা'র কাছে শুনেছি। আচ্ছা, এখন আর কথা নয়।

শিখা বাহিরে আসিয়া আপনার গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিল, তপতীর সহিত আর দেখাও করিল না।

তপনের অভ্যর্থনার জন্য শিখা পরিপাটি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। কয়েক মিনিটের দেখা তপনের কথা শিখা আজ সারাদিন ভাবিয়াছে। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। মুহূর্তে যে এমন করিয়া আপন করিয়া লইতে পারে, তপতী তাহার সম্বন্ধে কেন ওরূপ কথা বলিল! শিখা সমস্ত দিন ভাবিতেছে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। তপতীর বিবাহের গোলযোগের কথা ভাগলপুরে থাকিতেই সে শুনিয়াছিল তার মা'র চিঠিতে। আজ তপতীর সেই বরকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! শিখারা দুই বোন, দাদা বা ছোট ভাই নাই,—তপন যদি শিখার দাদা হয়,—শিখা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ, হইয়াছেনই তো।

তপতীর সহিত ফিরিবার সময় দেখা না করিয়া আসাটা ভালো হয় নাই। কিন্তু উনি যে বারণ করিলেন। ওঁর কথায় অবাধ্য তো হওয়া যায় না। তপতী রাগ করে করুক—তাহার ভাব করিতে বেশী দেরী হইবে না। ব্যাপারটা তো শোনা যাক দাদার মুখ হইতে।

তপন আসিয়া পৌঁছিল। পরনে অফিসের পোশাক, হ্যাট-কোট-প্যান্ট। শিখা আগাইয়া যাইতে হাসিমুখে বলিল, চিনতে পাচ্ছিস ভাই, দিদি?

—চিনিবার তো কথা নয় যা ভোল বদলেছো—বদলেছেন।

—থাক্, আর 'ছেন' জুড়তে হবে না। দুজনেই হাসিয়া উঠিল। শিখা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিল.—কখন্ যে মনের মধ্যে দাদার আসনখানি জুড়ে বসেছো, টেরই পাইনি। নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি বলে ফেললাম।

—তোর কাছে এমনটাই আশা ক'রছিলাম ভাই। চল, বাবা মা'কে প্রণাম করি গিয়ে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিখা তপনকে ভিতরে আনিয়া তাহার মা-বাবার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তপন হেঁট হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া উঠিয়াই বলিল,—আমি নিজে নিমন্ত্রণ নিয়েছি কাকীমা, আপনার দুষ্টু মেয়ে নিমন্ত্রণ করেনি।

হ্যাঁ, করেনি—নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ দিয়েছিলে? যাওয়া মাত্র তাড়িয়ে ছাড়ল মা। এত্তো দুষ্টু!

জাস্টিশ মুখার্জি অত্যন্ত নিরীহ এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার গাম্ভীর্য টুটাইয়া তিনি কহিলেন,—শঙ্কর বলছিল যে জামাই তাঁর খুব ভালো হ'য়েছে, তা এতো ভালো হয়েছে কে জানতো! খুব ভালো ছেলে!

—তোমার খুব ভালো লেগেছে,—নয় বাবা? এত কথা বলে ফেল্লে যে! শিখা কৌতুক হাস্যে চাহিল তার বাবার পানে।

শিখার মা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—তোমার আর একটা জোড় নেই বাবা? দুটোকেই বাঁধতুম!

শিখা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ওকি গরু নাকি মা, বাঁধতে চাইছো?

—তোর বন্ধু সেদিন স্যার রমেনের বাড়ীর পার্টিতে ব'লছিল, তার বর নাকি হ'য়েছে একটা গরু। তাই তোর জন্যেও একটা এমনি গরু আমরা খুঁজছি।

—না মা, গরুটরু বলো না, আমার দাদা যে ও। শিখা মৃদু হাসিয়া বলিল।

—নিশ্চয় আপনি বলবেন কাকীমা। আমার মা আমার শেষ দিন পর্যন্ত গরু আর গাধা ব'লতেন। তারপর থেকে আর কেউ বলেনি। আপনি বলুন তো, আপনার কণ্ঠে আমার মা'র কণ্ঠস্বর শুনে নিই আর একবার!—তপনের দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। শিখার মাতা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তুমি যদি গরু হও বাবা, তাহ'লে মানুষ কে, তাই ভাবছি। কিন্তু বাবা, অফিস থেকে আসছো তো? এসো, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে গল্প করবে'খন।

খাইতে বসিয়া তপন বলিল,—শিখার বিয়ে দিতে চান কাকীমা! আপনার কিছু ঠিক করা নেই তো?

—না বাবা, ঠিক কিছু নেই। মেয়েকে আর বড় ক'রতে ভরসা করিনে বাবা; চারিদিকে দেখছো তো, ধিঙ্গি মেয়েরা সব মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। বয়স বাড়ছে বিয়ে হ'চ্ছে না। সমাজে কত মেয়ে যে আইবুড়ো র'য়েছে তার ঠিক নেই।

—আপনাদের সমাজের তো এই রকমই গতি কাকীমা। কিন্তু সমাজের উপর আপনি চট্‌লেন কেন?

—না বাবা, আমাদের সেকালের সমাজই ভালো ছিল। বিয়ে করবে না, ধিঙ্গিপনা কবে বেড়াবে, তারপর বয়েস বাড়লে আর বিয়েই হবে না। এই তো হ'চ্চে আক্‌ছার।

—আশায় আশায় থাকে কাকীমা, মনে করে, আরো ভালো বর জুটবে, তারপর আরো ভালো, এমনি করেই বয়েস বেড়ে যায়। আর আমাদের সমাজের মতো আপনারা তো কচি মেয়ের জোর করে বিয়ে দেন না; জোর করে বিয়ে দেবার অবশ্য আমিও পক্ষপাতী নই, তবে ষোল থেকে কুড়ি একুশের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত।

শিখা এতক্ষণ নতমুখে তপনের চা তৈরী করিতেছিল, বাগ পাইয়া বলিয়া উঠিল,—তপির বয়স এখনো কুড়িও পেরোযনি, অতএব মাভৈঃ দাদা!

—তুই থাম—গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাগড়া দিস নে!

শিখা অনাবিল আনন্দে তপনের মুখের দিকে চাইল। শিখার দাদার অধিকারটি তপন অতি সহজে গ্রহণ করিয়াছে। এমন করিয়া কেহ কোনদিন তাহাকে ধমক দেয় নাই, এমন

মিষ্ট, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ। হাসি মুখে সে চা আগাইয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা, গুরুজনদের সঙ্গে কথা শেষ হ'লে ডেকো আমায়।

শিখা চলিয়া যাইতেছে, মা বলিলেন,—যাচ্ছিস কেন?

শিখা দুই পা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ভাবছো কৈন মা? ও তোমার আধুনিক যুগের চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি, ঘোষ, বোস, মিত্তির নয়। শিখা না থাকলেও ওর চলবে, বরং ভালোই চলবে। আমি কিছু বেল ফুল তুলে নিয়ে আসি।

শিখা চলিয়া গেল। তপন মধুর হাসিয়া বলিল,—কাকীমা, এই আধাবিলেতি সহরের বুকের ওপর মেয়েকে আপনারা কি করে এমন শুদ্ধাচারিণী রেখেছেন?

—আমি ওকে খুব কড়া নজরে রাখি বাবা। চারিদিকে তো দেখছি। আমি ছিলুম ভট্‌চাজ্যি বামুনের মেয়ে, একেবারে সনাতনপন্থী ; এখানকার সব দেখে মনে হয় ভালো আমাদের সমাজে অনেকেই ছিল, মন্দ যে না ছিল তা নয়, কিন্তু মন্দটা বেছে না ফেলে আমরা ভালোমন্দ সবই বিসর্জন দিয়েছি অথচ যাদের অনুকরণ করতে চাইছি, তাদের ভালোগুলো ছেড়ে মন্দগুলোই নিচ্ছি।

তপন হাসিমুখে শুনছিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—আমি দেখেই বুঝেছিলাম কাকীমা, আপনার সতী-শোণিত ওর প্রতি শিরায় বইছে। আচ্ছা কাকীমা আপনি আমার উপর নির্ভর যদি করেন তো ওর যোগ্য এবং আপনার মনের মতো ছেলে আমি ওর জন্যে এনে দেবো। কিন্তু আমি যে আপনার বাড়ী এসেছি বা মাঝে মাঝে আসবো একথা যেন কোনরূপে আমার শ্বশুরবাড়ীতে প্রকাশ না পায়। কারণ শিখার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হওয়া উচিত বলে ওঁরা মনে করেছেন, শিখা তার থেকে আমার ঢের বেশী আপনার।

—তুমি ওঁদের বলে আসনি বুঝি।

—না,—এবং কোনদিন বলে আসবো না। কারণ ওদের জামাই সম্পর্কে তো আর আমি আপনার বাড়ীতে আসছি না, আসছি আপন বোনটিকে দেখতে। আমি কায়-মন এক ক'রে কথা বলি কাকীমা, শিখার সঙ্গে আমার সহোদর বোনের আর কিছু তফাৎ নাই। আমি তো আজকালকার "দা জাতীয়" জীব নই—যাকে তাকে আমি "দাদা" বলতে অনুমতি দিই না।

—বেশ বাবা, তুমি শিখার দাদা, এ তার গৌরব। তোমার ক'টি ভাই-বোন?

—আমার কেউ নেই কাকীমা, একটা খুড়তুতো বোন আছে। এই সারা বিশ্ব-সংসারে আজ সকাল পর্যন্ত সেই একমাত্র মেয়ে ছিল যার সঙ্গে আমি যখন তখন কথা বলি, দুষ্টুমি করি। আজ থেকে হলো আমার দু'টি বোন শিখা আর সে!

শিখা আসিয়া পড়িল একটা রূপার রেকাবিতে কতকগুলি ফুটন্ত বেল ফুল লইয়া। বলিল,—পা দুটি বাড়াও তো! তোমার পায়ে শ্বেতপুষ্প ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তোমরা গল্প করো বাবা, আমি ঘরের কাজ দেখি। তিনি চলিয়া গেলেন।

তপন বলিল,—লক্ষ্মী বোনটি একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, সত্যি উত্তর দিস।

—তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না দাদা, যদিও মিথ্যে অনেক সময়ই বলি আমি।

তপন তাহার বিবাহ হওয়ার পর হইতে এই দুই মাসের ঘটনা শিখাকে বলিয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—ওর মতবল কি শিখা, ও কি কাউকে ভালোবাসে?

—তাতো জানিনে দাদা, সেরকম কিছুতো দেখিনি! দাদা, তোমায় ও ভুল বুঝেছে। আমি কালই ওকে বুঝিয়ে দেবো।

—না! তপনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়—না শিখা, তাহলে তোকে আর ভগ্নীস্নেহ দিতে পারবো না। সে আমায় ভালো যদি বাসে, এমনিই বাসবে, কারো প্ররোচনায় নয়! আমি যেমন, যেমনটি সে আমায় দেখেছে, তেমনি ভাবেই আমি তার হৃদয় জয় করতে চাই। যদি না পারি, জানবো সে আমার নয়।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটিয়া গেল। তপন পুনরায় আরম্ভ করিল—আমি তো আধুনিক কোন ককেট মেয়েকে বিয়ে করতে আসিনি শিখা, আমি ভেবেছিলুম বিয়ে ক'রছি স্বর্গীয় মহাত্মা শ্যামসুন্দর চ্যাটুজ্যের নাত্নীকে। যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া তপন সেই স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশে নতি জানাইল। তারপর বলিল,—আর শুনলাম, আমার বাবা নাকি মিঃ চ্যাটার্জিকে কথা দিয়েছিলেন, তাই পিতৃসত্য পালন আর বিপন্ন মিঃ চ্যাটার্জিকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম, আমার অনন্ত জীবনের সাথীকে হয়ত ঐ বাড়ীতেই খুঁজে পাবো।

ব্যথায় বেদনায় তপনের কণ্ঠ মলিন শুনাইতেছে। শিখা অভিভূতের মতো তপনের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখ তাহার জলে ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। এই অপরূপ সুন্দর হৃদয়বান মানুষটিকে তপতী গ্রহণ করে নাই—আশ্চর্য!

—তুমি আমায় অনুমতি করো দাদা, আমি কালই তোমার সাথীকে এনে দেবো—সে তোমায় চেনেনি!

—না, শিখা তা হয় না। আমার স্বরূপ উদঘাটিত ক'রে তার ভালোবাসা পাওয়া এখন আর আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। আমি জানি প্রত্যেক মেয়েই চায়, তার স্বামী রূপবান, জ্ঞানবান, ধনবান হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা কারো না হয়, তবে সে কি এমন করে স্বামীর অন্তর চূর্ণ করে দেবে? হিন্দু নারী সে, পবিত্র বৈদিক-মন্ত্রে তার বিয়ে হয়েছে—যে বিয়ের জের জন্ম হতে জন্মান্তরে চলে বলেই-না শাস্ত্রের বিশ্বাস—সেই ধর্মের মেয়ে হ'য়ে সে স্বামীকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিল না নিজেকে প্রকাশ করবার! আমি বুঝেছি শিখা, এই অহঙ্কারের মূলে দুটো জিনিস্ থাকতে পারে। এক, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, যাকে পেল না বলে গভীর ক্ষুব্ধ হয়েছে; নয় ত, সে আজো অন্যাসক্তা, পবিত্র আছে, কাউকেই ভালোবাসে না। যদি শেষের কারণ সত্যি হয়, তবে আমি তাকে এমনি থেকেই ফিরে পাব, আর যদি প্রথম কারণটা সত্যি হয়, তাহলে সে আমায় হাজার ভালোবাসলেও আমি তাকে গ্রহণ করবো না। আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই।

শিখা শিহরিয়া উঠিল। তপতী এ কি করিয়া বসিয়াছে। যে অদ্ভুত চরিত্রবান স্বামী সে লাভ করিয়াছে, তাহাতে তপতীকে অন্যাসক্তা ভাবিয়া ত্যাগ করা তপনের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।...গভীর স্তব্ধতার মধ্যে শিখা ভাবিতে লাগিল।

—বোনটি, আমার মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে তোর আজ কিছু তফাৎ নেই। আমার কথা রাখবি তো?

—নিশ্চয় দাদা, তোমার কথার অবাধ্য হবো যেদিন সেদিন তোমায় দাদা বলবার যোগ্যতা হারাবো যে।

তপতীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ সে আসিয়া বসিবে বন্ধুদের আসরে। উপরে প্রসাধনে সে ব্যস্ত। বন্ধুগণ আসরটা জমাইয়া তুলিতেছেন।

রেবা দেবী বলিলেন,—এবার কিন্তু তপতী বরের সঙ্গে মিশবার বিস্তর সময় পাবে

—বুঝেছো, এতকাল তো বৃথাই কাটালে সব। এখনো সে দেখেনি, কিন্তু একবার দেখলে আর রক্ষে নাই।

সমস্বরে ব্যানার্জি-চ্যাটার্জি-ঘোষ প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—কারণ ছেলেটা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সুন্দর কথা ; তপতী আবার কাব্যপ্রিয়, ওর একটা কথাতেই মুগ্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী! সে তো একটা বোকারাম, মূর্খ!

—মোটেই না! আমি মাত্র একদিন গিয়েছিলাম তার কাছে। আমায় দে'খ কি বল্লে জানো?

—কি বল্লে!

—বল্লে, আসুন। আপনি কোন্ দেশীয়া? নমস্কার না করমর্দন করবো! আমি বল্লাম একদম স্বদেশী, নাম শ্রীমতী রেবা দেবী! তা বল্লে কি জানো? বল্লে রেবা তো উপল-বিষমে বিশীর্ণা। কিন্তু আপনি তো দেখছি শীর্ণা নন!

—উত্তরে তুমি কি বল্লে?—মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন।

—বল্লাম, আমি মোটা হলে তো কিছু যায় আসে না, তপতী খুব স্লিম্।

—ও কথা তুমি বলতে গেলে কেন? তপতীর রূপ ওর না দেখাই তো দরকার।

—শোনই-না কথাটা। তপতী স্লিম্ শুনে বল্লে, বড্ড খুসী হলাম শুনে ; ওর তন্বী দেহ তরবারী দিয়ে অনেককে জবাই করতে পারবে, কি বলেন? আমি তো অবাক! বল্লুম, হাঁ আমাদেরগুলো একদম ভোঁতা।

—তাতে কি বল্লে? মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন।

—বল্লে, শান দিয়ে নিন। এত রুজ্‌পাউডার লিপষ্টিক্ রয়েছে কি জন্যে। শুনে আমি চুপ করে গেলুম। ও মুখ ফিরিয়ে 'হরু-ঠাকুরের পাঁচালী' পড়তে লাগলো। পরদিন তপতীর মা বারণ করলেন ওখানে যেতে। নইলে ওর জবাব আমি দিতাম।

—বারণ করলেন কেন?

—তা জানি না, বোধহয়, ও বিরক্ত হয়।

—বিরক্ত নয়, ভয় করে, ওর বিদ্যে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—ওর বিদ্যে প্রকাশ হলে তোমাদের বিশেষ সুবিধে হবে না। কারণ ও সত্যি বিদ্বান—তোমাদের মতো শ্যালো নয়।

ইতিমধ্যে মিঃ অধিকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। এই মিঃ অধিকারীকে এখন আর ইহারা সুনজরে দেখিতেছেন না। কারণ তপতী তাহার কাছ হইতে আংটি লইয়াছে। অধিকারীই তাহা হইলে তপতীর মন আকর্ষণ করিয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রেবা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—আসুন—মিঃ অধিকারী এবার আমাদের মেঘদূতের আপনিই তো যক্ষ!

মিঃ অধিকারী আত্মপ্রসাদের হাস্য করিলেন। ওদিকে তিন-চারটি যুবক তাহার দিকে জনান্তিকে ক্রুদ্ধ ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে। বিনয়ের সহিত অধিকারী কহিলেন,—বেশ, আমি সম্মত।

—কিন্তু সম্মতি যাঁর কাছ থেকে পাওয়া চাই, তিনি টয়লেটে ব্যস্ত ; ঐ এসে পড়েছে।

তপতী তর তর বেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। সুদীর্ঘ বেণী সর্পাকারে দুলিতেছে,

তাহার অর্ধেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ধূপছায়া রঙেব অঞ্চলপ্রান্ত পিঠের উপর দিয়া কোমরের কাছে পড়িয়াছে। সমস্ত তনুলতা ঘিরিয়া একটা স্নিগ্ধ সুরভি। সকলে তাহাকে সহাস্যে অভিবাদন করিল। একজন প্রশ্ন করিল,—পরীক্ষা নিশ্চয় ভালোদিলেন!

—হ্যাঁ, আজকার প্রোগ্রাম কি! অকাজে বসে থাকা?

—না, নিশ্চয় না। আজই আমরা ঠিক করবো আগামী মেঘদূত উৎসবে কে কি রোলে নামবেন! প্রথমে দু'একটা গান হোক একটু নাচও যদি হয় আপনার।

হাসির বিদ্যুৎ ছড়াইয়া তপতী কহিল—নাচ আজ নয়, বড় ক্লান্ত। পরশু বরং চলুন স্টিমার ভাড়া করে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

সকলে সমস্বয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—হুর্‌রে! এইতো চাই। থি চীয়ার্স ফর মিস চ্যাটার্জি।

তপতী আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অবকাশ পাইবার পূর্বেই মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন—সেই ভদ্রলোকটির খবর কি, দ্যাট গুড, ওল্ড ম্যান?

মধুর হাসিয়া তপতী বলিল,—থাক, তার কথায় কি দরকার! ওর ওপর জেলাস হবার কোন দরকার নাই, ও আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।

—গুড্। না মাড়ালেই আমরা খুশি থাকব।

তপতী এবং আরো অনেকের গান গাওয়ার পর আগামী উৎসবের কর্মসূচী প্রস্তুত হইল এবং আগামী কল্যকারও একটা খসড়া তৈরী হইল। রাত্রি অনেক হইয়াছে সকলে চলিয়া গেলে তপতী উপরে আসিয়া দেখিল, তপন খাইতে বসিয়াছে। মা সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছে। তপতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মা ডাকিলেন,—আয় খুকী খেয়ে নে। তপন ওদিকে মুখখানা এতই নীচু করিয়া দিয়াছে যে প্রায় দেখা যায় না। মা দেখিয়া বলিলেন,—খাও বাবা এত লজ্জা কেন।

তপতীর দিকে তপন পিছন ফিরিয়াই ছিল, সেই ভাবেই উত্তর দিল,—লজ্জা না মা অনভ্যাস। খাওয়া হয়ে গেছে, উঠলাম।

—দুধ খাও নি বাবা এখনো।

—আজ আর দুধ খাব না মা, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তপন মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

মিসেস চ্যাটার্জি তপতীকে বলিলেন, খাওয়ার পর তুই আজ ওর ঘরে গিয়ে শুবি খুকী।

তপতী অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—তুমিও সেকেলে হ'য়ে যাচ্ছ মা। কোন ঘরে শুতে হবে, না হবে, আমি খুব ভালো জানি। আমি আর কচি খুকীটি নই।

মিসেস্ চ্যাটার্জি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—সে কি খুকী, তোর মতলব কি তা'হলে!

ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিতেছে বুঝিতে পারিয়া তপতী সাবধান হইয়া গেল। বলিল,—তুমি মিছেমিছি অত ভাব কেন মা। দিন পালিয়ে গেল নাকি? বলিয়া তপতী হাসিয়া উঠিল।

মা ভীতভাবেই বলিলেন,—কিন্তু আজই-বা গেলি?

—না মা না, ভালো একটা দিনক্ষণ ঠিক করো। তোমার ঐ গোঁড়া বামুন জামাইয়ের কাছে কৃষ্ণপক্ষের দিনে নাই বা গেলাম।

মা খানিকটা প্রসন্না হইলেন। তাঁহারা দিনক্ষণ না-মানিলে কি হইবে তপন তো মানে। হ্যাঁ, সেই ভালো হইবে। একটা ভালো দিন তিনি ঠিক করিবেন।

তপতী আহার সারিয়া আপন কক্ষে গিয়া হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। মা'কে কত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়! কিন্তু পাঁজিতে ভালো দিনের অভাব নাই এবং মা কালই বাহির করিবেন। আচ্ছা তখন অন্য মতলব খাটানো যাইবে। তপতী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

একখানা প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া থামিল, নামিল তপন আর শিখা---বিনায়ক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া থামিয়া গেল ; কর্মিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। মীরা ব্যতীত নারী অতিথি এখানে কখনো কেহ আসে নাই। বিনায়ক কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া একটা নমস্কার করিল। অন্যান্য সকলেই তাহার অনুসরণ করিল কোন প্রকারে। কিন্তু শিখা সহজ হাসিতে সকলকে চকিত করিয়া দিয়া বলিল—সব কিন্তু খুঁটিয়ে দেখাবেন বিনায়কবাবু, চলুন আগে অফিস দেখি আপনার।

কে এ? তপন যাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সে নয় নিশ্চয়ই। তপনটা কি ফন্দিবাজ। কাহাকে লইয়া আসিতেছে কিছুমাত্র জানায় নাই। তপন বলিল—তুই ওর সঙ্গে ঘুরে সব দেখ ভাই শিখা, আমি তত্‌ক্ষণ একটা নতুন খেলনার নক্সা করি—কেমন? তপন গদীতে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা,—আসুন বিনায়কবাবু।

নিরুপায় বিনায়ক শিখাকে লইয়া কারখানা দেখাইতে গেল। ছোট ছোট যন্ত্রগুলি হাতেই চলে। একটা মাত্র বিদ্যুৎ পরিচালিত কল রহিয়াছে। যতদূর সম্ভব শিখা বুঝিতে চেষ্টা করিল। বিনায়ক ধীরে ধীরে বলিয়া গেল এই কারখানা প্রতিষ্ঠার করুণ ইতিহাস, তাহার দরিদ্র জীবনের কাহিনী। লাজুক বিনায়ক নত মুখেই কথা কহিতেছে ; বড় সুন্দর লাগিল শিখার। কোনরূপ ঔদ্ধত্য নাই, সহজ অনাড়ম্বর লোকটি। বন্ধুবাৎসল্যে চোখ দুইটি ছলছল করিতেছে। বিনায়ক বলিয়া চলিল,—তপনকে যদি না পেতাম শিখা দেবী, তা হলে হয়ত বিনায়কের অস্তিত্বও মুছে যেতো। কিন্তু তপনের কিছুই করতে পারলাম না।

—ক'রতে পারলাম না কেন! চেষ্টা করেছেন?

—কি চেষ্টা ক'রবো? তপন তো হাত পা বেঁধে দিয়েছে?

শিখাও নীরব হইয়া গেল। তপনকে সে এই কয়দিনে ভালো রকমই চিনিয়াছে।

ক্ষণিক পরে বিনায়ক জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চেনেন তাকে, কিসের অত অহঙ্কার তার।

—শুধু চিনি নয় সে আমার বিশেষ বন্ধু। আপনার মতো আমারও হাত-পা দাদা বেঁধে দিয়েছেন।

বিনায়ক শুধু বলিল,—হুঁ।

শিখা বলিল,—কিন্তু আপনি ভাববেন না বিনয়বাবু, যতদূর জানি তপতী এখনও নিষ্কলঙ্ক আছে। সে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। বিনায়ক আবার একটা হুঁ দিল।

একটি কিশোর কর্মী আসিয়া বলিল,—বড়দাদাবাবু, ছোট-দা ডাকছেন আপনাদের।

—যাচ্ছি। বলিয়া উভয়ে উঠিল। চলিতে চলিতে শিখা বলিল,—আপনারা বুঝি এদের বড়দা আর ছোট্‌দা।

হ্যাঁ, এখানে চাকর কেউ নেই। সবাই ভাই ভাই, সবাই অংশীদার।

—সব নিয়মই বুঝি আপনাদের দুজনের মস্তিষ্ক-প্রসূত?

—সবই ঐ তপনের সৃষ্টি দেবী। মাথা আমার খোলে না। ও যা বলে, তাই আমি করে যাই।

আশ্চর্য। এই লোকটির মতো বন্ধুর উপর এমন অগাধ স্নেহ আর শ্রদ্ধা একযোগে পোষণ করিতে শিখা আর কাহাকেও দেখে নাই। নিজে তিনি কেমন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র করিলেন না। বিনায়কের দিকে একটা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া শিখা হাসিয়া বলিল,—সবই'ত ওঁর বলছেন, আপনার নিজের কি কিছুই নাই?

—আছে, আমার নিজের অতুল সম্পদ আছে। ঐ বন্ধু, আমার তপন।

শিখা অভিভূত হইয়া গেল। দুজনে অফিস ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। অফিস দেখিয়া শিখার চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে। দেওয়ালে টাঙানো শিবমূর্তিগুলি যেন জীবন্ত। মেঝের আলপনাগুলি কোন্ অতীত যুগের সহিত যেন বর্তমানের যোগ স্থাপন করিতেছে। ঘরে ধূপ-সুরভীত বাতাস মন্থরমদির। চতুর্দিকে শান্তির আবহাওয়া। একটাও চেয়ার বা টেবিল নাই; থাকিলেও যেন এ ঘরে মানাইত না।

শিখা দ্বিধাহীন মনে ঠিক তপনের ছোট বোনটির মতই পলাশপাতাটা টানিয়া লইয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে বলিল—তোমাদের এখানে তো ভাই রোজ পিক্‌নিক্—আমার কিন্তু যেদিন খুসি ভাগ রইল এতে।

বিনায়ক বলিল,—খুসিটা যেন আপনার রোজই হয়।

শিখা বলিল,—আপনার ভাগে তাহ'লে কম পড়ে যাবে। দুই ভাইবোনে জুটলে আপনি পাবেন না।

হাসিতে হাসিতে বিনায়ক কহিল—না হয় হেরেই জিতবো।

—অর্থাৎ। শিখা তাকাইল।

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বিনায়ক বলিল,—অর্থাৎ এত বেশী হারবো যে হারের দিক দিয়ে আমিই হব ফার্স্ট।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

তপতী আসিয়া অনুযোগ করিল,—সকাল থেকে তিনবার ফোন করলাম মা, শিখা কিছুতেই আসছে না—আমাদের পার্টিতে যাবে না ব'লছে।

—কেন? কি হল তার? যাবে না কেন? মা নিরীহের মতো প্রশ্ন করিলেন।

—কে জানে! তোমার জামাই কিছু ব'লেছে নাকি? সেই যে সেদিন ওর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল তারপর থেকে আর শিখা আসেনি।

—জামাই কি বলবে খুকী। ওর নামে মিছেমিছি কেন বদনাম দিচ্ছিস?

মা বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, খুব বলতে পারে। যা অসভ্য। ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভদ্রতা করা কিছু বিচিত্র নয়।

—ও কথাই বলে না তো বেশী, ভদ্র কি আর অভদ্রই কি। তোদের পার্টিতে ওকে নিয়ে যাচ্ছিস তো আজ—দেখে নিস্ আমার কথা ঠিক কি না।

—ওকে নাই-বা নিয়ে গেলুম মা, বিস্তর বড় বড় লোক যাবে সেখানে যদি কিছু অসভ্যতা ক'রে বসে, গঙ্গার জলে সে লজ্জা ধোয়া যাবে না।

—সে কি খুকী, ওকে না নিয়ে গেলে ভাববে কি। লোকেই-বা ব'লবে কি? নিরুপায়

তপতী রাজি হইল, নতুবা মা হয়ত একটা 'সীন ক্রীয়েট' করিয়া বসিবেন। বলিল,—আচ্ছা, তাহলে এই জিনিস ক'টা কিনে নিয়ে যেতে বলো। তপতী একটা লিস্ট দিল।

বন্ধুবর্গের সহিত তপতী পূর্বেই যাত্রা করিল। তপনকে মা যেমনটি আদেশ করিয়াছিলেন, সে তেমনি ভাবেই গিয়া স্টিমারে উঠিল এবং জিনিসগুলি চাকরের হাতে দোতলায় তপতীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া নীচেই বসিয়া রহিল। যথাসময়ে স্টিমার ছাড়িয়া গেল।

উপর হইতে সঙ্গীতের মধুর স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে। তপন অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—ঐ সভায় গিয়া একখানি গান গাহিলেই সে তপতীকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু যে নারী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা, তাহাকে তপনের আর কোন প্রয়োজন নাই। তপনের জীবনসঙ্গিনীর স্থানে সে বসিতে পাইবে না।

তপতীর পরিচিতের সংখ্যা শতাধিক। প্রায় সকলেই আসিয়াছে। অতবড় স্টিমারখানা জুড়িয়া নানাভাবে নানা কথাবার্তা চলিতেছে। পরিচিত হিসাবে মিঃ ঘোষাল, যাঁহার সহিত তপতীর বিবাহ হইবার কথা ছিল, তিনিও আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তপতী বলিয়া উঠিল,—আসুন, বাপের লক্ষ্মী ছেলে—আছেন কেমন?—এই বিদ্রূপ সকলেই উপভোগ করিল কিন্তু মিঃ ঘোষালের বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা আনন্দের শিহরণ জাগিতেছে। বাপের ডাকে বিবাহ-সভা হইতে উঠিয়া যাওয়া তাঁহার চরম নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য তো তাহা ছিল না। তপতীর বাবাই তো যত গোল বাধাইলেন। টাকাটা ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া যাইত। মিঃ ঘোষালের জীবনে এই ব্যর্থতার ক্ষতি কোনদিন পূরণ হইবে না তথাপি আজ তিনি আনন্দিত হইলেন এই ভাবিয়া যে, তপতীর অনুযোগের অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত। তপতী সেদিন তাহাকে চাহিয়াছিল, আজো তাহাকে না পাওয়ার দুঃখ অনুভব করে। প্রীতিকণ্ঠে তিনি বলেন,—বরাতে সইলো না তপতী দেবী, আমার দোষ কি বলুন? নইলে বাবার কথাকে মান্য আমি জীবনে ঐ একবারই করেছি, আর ঐবারই শেষ বার। কিন্তু এখন তো...

—হ্যাঁ, এখনো লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে থাকুন।

যে তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়া মিঃ ঘোষালের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু যাহাদের তিনি দেখিতেছেন, সকলেই প্রায় পরিচিত, স্বল্পপরিচিত। প্রশ্ন করিলেন,—তিনি কি আসেননি—আপনার স্বামী?

"স্বামী" কথাটা উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই তপতীর মুখ লজ্জারক্ত হইয়া গেল।

—কি জানি, আছে কোথায় ওদিকে। বলিয়াই সে অর্গান লইয়া বসিল। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলে জানিল, জামাইবাবু নীচে একাই বসিয়া আছেন। চপলা তরুণীর দল তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল এবং তপনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। অতিথি বর্গ দেখিল, তাহার চোখে, একটা ঘন সবুজ রংএর ঠুলি, কপালে ও গণ্ডে চন্দনপঙ্ক। এদিকে পরনে কোট প্যান্ট এবং মাথায় হ্যাট। এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, বিরক্ত হইল এবং একটা বিজয়ের উল্লাসও অনেকেই অনুভব করিল। তপতীর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তপতী কোন দিন স্বামীর দিকে চাহে নাই, আজো চাহিল না। তরুণীর দল তপনকে লইয়া এক জায়গায় বসাইয়া দিল, বলিল,—স্বদেশী আর বিদেশীতে মেলাচ্ছেন বুঝি। কিন্তু টুপিটা খুলুন টিকি আর কাটবো না—অভয় দিচ্ছি।

তপন শান্ত করে বলিল,—ভরসা পাচ্ছিনে টিকির বদলে মাথাই যদি..

হাসিতে হাসিতে একজন বলিল,—মাথা তাহলে আছে আপনার? আমরা ভেবেছিলাম, তপতী সেটা ঘুরিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই?

তপন নিতান্ত গোবেচারার মতো বলিল,—টিকি না থাকায় ওঁর ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে।

রেবা দেবী আসিয়া বলিল,—আমি কেটেছিলাম টিকি, আমি শ্রীমতী রেবা..

—আপনি আমার বড্ড উপকার করেছেন রেবা দেবী টিকির উপর দিয়েই ফাঁড়াটা উতরে গেল! মাথাটা বাঁচতেও পারে।

—বাঁচবে না, ওটাকে আজ তপি'র পায়ে সমর্পণ করাবো।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে তপন কহিল,—ওঁর পা থেঁতলে না যায়।

তপতী ওদিক হইতে ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল,—কি ক'রছিস তোরা? এদিকে আয়না সব!

—তোর বর যে যাচ্ছে না। বলিয়াই তাহারা তপনকেও ধরিয়া আনিয়া একটা টিপয়ের কাছে বসাইয়া দিল। তাহার অদ্ভুত বেশ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মৃদুগুঞ্জন বিদ্রূপ শুরু হইয়া গিয়াছে। তপতীর কানেও দুই চারিটা কথা ভাসিয়া আসিল কিন্তু এখানে সে নিরুপায়। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে একবার তপনের দিকে আঁখিপাত করিল। চোখের ঠুলি এবং চন্দনে মুখখানা আচ্ছন্ন। লোকটা কালো কি ফর্সা তাও বোঝা যায় না। মাথায় টুপি থাকার জন্য চুলও দেখা যাইতেছে না। গঙ্গা-বক্ষে এই অপরূপ মূর্তি দেখিয়া হাসিই পাওয়া উচিত কিন্তু হাসিতে গিয়াই মনে পড়িয়া গেল, ঐ কিম্ভূত কিমাকার লোকটা তাহার স্বামী! তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। আত্মসম্বরণ করিবার জন্য সে রেলিং-এর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীরবে চা-টুকু শেষ করিয়া উঠিয়া তপন বলিল,—নমস্কার, আমি নীচেই ব'সছি গিয়ে।

তাহার রূপ, আচার, ব্যবহার দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিল, এখানে বসিবার সে যোগ্য নয়। কেহই বিশেষ কিছু বলিল না। তপতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তপন চলিয়া যাইবামাত্র মিঃ ঘোষাল কহিলেন—ওই লোকটা আপনার বর? আশ্চর্য। আপনার বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না।

অত্যন্ত উষ্মার সহিত তপতী জবাব দিল,—থাক, আমার বাবা আপনার বুদ্ধি ধার করতে যাবেন না নিশ্চয়ই।

তপতীর মনের অবস্থা বুঝিয়া সকলেই এ আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। তপতী কিন্তু আর কোন কথাই কহিল না। অপমানে তাহার সারা অন্তর জ্বলিতেছে। স্টিমার জেঠিতে ফিরিবামাত্র সে চার পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজে গাড়ী চালাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

তপন একধারে দাঁড়াইয়া দেখিল। আপন মনে হাসিল। উহাদের সে নিষ্ঠুর ভাবে ঠকাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে ট্রামে উঠিল।

তপতী গৃহে ফিরিয়া শয্যায় লুটাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। আজ তাহার ঠাকুরদা'র কথাগুলি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—"তোর যা বর হবে দিদি, তার আর জোড়া মিলবে না"—তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়তির এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিবে—কে জানিত! তপতী স্থির করিয়া ফেলিল—অপমান করিয়া ঐ বর্বরকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। সারা জীবন তপতী একা থাকিবে, সেও ভালো—তপতীর উহার সহিত এক গৃহে বাস অসম্ভব।

দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তপতীর রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে তাহার গা-হাত পা ব্যথা

করিতেছে, উঠিল না। মা আসিয়া ডাকিলেন,—শরীর খারাপ খুকী! উঠছিস না কেন?

মায়ের উপর এক চোট ঝাল ঝাড়িয়া লইতে গিয়া তপতী থামিয়া গেল। বেচারী মা, উহার কি দোষ? জামাইকে স্নেহ মমতা করা শাশুড়ীর কর্তব্য।

তপতী উঠিয়া পড়িল। স্নান সারিয়া চা খাইতে আসিয়া দেখিল, রবিবার বলিয়া তপন বাহিরে যায় নাই, চা খাইতেছে। তপতীর গলার স্বর শুনিয়াই সে মুখ নীচু করিল, যেন তপতী তাহাকে দেখিতে না পায়।

তপতী আসিয়া তপনকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষ স্বরে বলিল,—বৈরাগী আগে চা খেয়ে যাক্, তারপর আমি খাবো।

মা রাগিয়া বলিলেন,—ছিঃ খুকী, কি সব বলছিস?

তপন হাসিয়া কহিল,—ভালোই তো বলেছে মা। বৈরাগী যেন আমি হতে পারি। অনেক তপস্যায় মানুষ বৈরাগী হয় মা। বৈরাগ্য সাধনার ধন।

রোষ ভরে তপতী বলিয়া চলিল,—যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নাই! তপতী চলিয়া গেল।

মা বলিলেন—কিসব তোমাদের ব্যাপার বাবা, ঝগড়া করেছো নাকি?

—কিছু না মা, ঝগড়া আমি করি নে। আমার চন্দন তিলক ওর পছন্দ নয় ; তা কি করা যায় বলুন। কারো রুচির খাতিরে চন্দন মাখা আমি ছাড়তে পারবো না।

তপনের মুখের হাসি দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন। ছোটখাটো কিছু একটা উহাদের হইয়া থাকিবে। দম্পতীর কলহ, ভাবনারও কিছুই কারণ নাই।

তপন চা খাইয়া উঠিয়া গেলে তপতী আসিল। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। মা হাসিয়া বলিলেন,—ঝগড়া টগড়া করিস নে খুকী—ছেলেটা বড় ভালো।

—অত ভালো ভালো নয় বুঝলে মা। অত ভালো হতে ওকে বারণ করে দিও।

—তুই বারণ করিস, আমার কি দায়?

তপতী রুখিয়া উঠিল। বলিল—ঐ 'ইডিয়ট'টাকে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলতে তো দায় পড়েছিল তখন—যত সব।

কিন্তু তপতী সামলাইয়া লইল। মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, চুপ কর খুকী, স্বামীকে ওসব বলতে নেই।

তপতীর ইচ্ছা হইতেছিল, মাকে আচ্ছা করিয়া কয়েকটা কথা শুনাইয়া দেয়। বলে যে 'তোমরা যাহাকে আনিয়াছ, সে আমার পদ-সেবার যোগ্য নহে। তাহাকে আমি লইব না। তোমরা তাহাকে লইয়া যাহা খুশি করিতে পার।' কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্রী হইবে, বাবা শুনিবেন, এখনি একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়া যাইবে, অতএব সে থামিয়া গেল।

মা বলিলেন—দিন ঠিক করেছি, পয়লা বোশেখ তোদের আবার ফুলশয্যা হবে।

—আচ্ছা, পয়লা বোশেখ সে কথা ভাবা যাবে। বলিয়া তপতী চলিয়া আসিল।

শিখা কেন আসিল না কাল? তাহাকে যে তপতীর কি ভীষণ দরকার। তপতী আবার ফোন্ করিল!

শিখা ফোনে আসিয়া বলল,—কি বলছিস তপু?

—আমার বিপদে তুই চিরকাল সাহায্য করেছিস ; আজ আমার এই ঘোর দুর্দিনে কেন তুই লুকোচ্ছিস বল ত?

শিখা ভরা গলায় বলিল,—লুকোইনি তপু! আমি একজন সন্ন্যাসী দাদা পেয়েছি, তাঁর কাছেই এ কয়দিন কাটলো। এখনি আবার আসবেন তিনি।

—বেশ তো তাঁকেও নিয়ে আয়।

—যাবেন না। আলাপ-পরিচয় না হলে যাবেন কেন?

—তা হ'লে কি আমি যাবো তোদের বাড়ী?

—আসতে পারিস, তবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে না।

—কারণ?

—দাদা চট্ করে কারো সঙ্গে আলাপ করেন না। তারপরে তুই আর্যনারী হয়ে স্বামীকে গ্রহণ করিসনি শুনলে চটে যাবেন।

মুহূর্তে তপতীর অন্তর রোষরক্তিম হইয়া গেল, বলিল—থাক ভাই, সেই আর্যপুত্রের সঙ্গে আলাপ করবার আমার দরকার নাই। তাহলে আসবি নে?

—না ভাই, মাফ করিস?

—আচ্ছা, আর ডাকবো না তোকে।

তপতী ফোন ছাড়িয়া দিল। ওদিকে ফোন হাতে করিয়া শিখা বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে।

সকালবেলায় শীতল হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। একটা চাঁপাগাছের তলায় তিনখানা বেতের চেয়ার পাতিয়া শিখা অপেক্ষা করিতেছিল। মাত্র মাসখানেক হইল তপনের সহিত তাহার পরিচয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার কি অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ঐ স্পর্শমণির পরশে শিখার অন্তর যেন সোনা হইয়া গেল। কিন্তু ঐ মণিটি যাহার সে উহাকে পাথর ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। তার মতো দুর্ভাগিনী আর কেহ আছে কি না, শিখা জানে না। তপতীর জন্যে শিখার অন্তর করুণায় দ্রব হইয়া উঠিল।

তপন ও বিনায়ক আসিয়া পৌঁছিল। শিখা প্রণাম সরিয়া বলিল,—একটা কথা শোন দাদা—একটা প্রার্থনা।

—কি বল্। তোর প্রার্থনা পুরানো তো দাদার গৌরব।

—জানি। অনুচিত কিছু চাইবো না দাদা। তুমি তপতীর সঙ্গে বা তার কাছে এমন দুচারটে কথা বল, যাতে সে তোমাকে চিনবার সুযোগ পায়, অন্তত উৎসুক হয়।

—তাতে লাভ কি শিখা?

—আছে লাভ। আমার বিশ্বাস, তপতী আজো তোমার অযোগ্য হয়ে যায়নি। ওর প্রথম জীবন অত্যন্ত সুন্দর ঠাকুমা-ঠাকুরদার হাতে গড়া। ও এই সোসাইটির চার্মে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু এখনো নষ্ট সে হয়নি। তুমি ওকে বাঁচাও দাদা।

—মরণ-বাঁচনের অধিকার আমার হাতে নেই শিখা। তবে যদি সে আজো অনন্যপরায়ণা থাকে, যদি সে সতী থাকে, তাহলে তাকে পাব। তার জন্য আয়োজনের কিছু তো দরকার নেই। তবুও তোর কথা রাখবো যতটা সম্ভব।

শিখা নীরবে নত নেত্রে স্বহস্তে প্রস্তুত খাবারগুলি সাজাইতে লাগিল। বিনায়ক ফুটন্ত চাঁপা ফুলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ফুলটা ফুটিয়াছে অনেক উঁচুতে নাগাল পাওয়া যায় না। বিনায়ক একটা লাফ দিল।

শিখার করুণ মুখশ্রী হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, শুধু কারখানার হিসাবই

দেখেন না, ফুলের খবরও রাখেন না।

হাসিমুখে বিনায়ক বলিল, রাখি, কিন্তু নিজের জন্য নয়, মীরাটা বড্ড ফুল ভালোবাসে।

—আমার জন্যও একটা পাড়বেন।

বিনায়ক ত্বরিতে জবাব দিল, কেন, আপনার তো দাদা রয়েছে, দিক না পেড়ে।

ঠোঁট ফুলাইয়া শিখা কহিল, দাদা তো আছেই, আপনি বুঝি কেউ নন? কথাটা বলিয়াই শিখার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল তপন কিঞ্চিৎ দূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য ডাকিল, দাদা খাবে এসো।

বিনায়ক কিন্তু কথাটার জের ছাড়ে নাই, কহিল,—আমার সঙ্গেও তাহলে একটা সম্পর্ক আপনার হওয়া দরকার। কী সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় আপনার?

—আপাতত বন্ধু। শিখা জবাব দিয়া সরবৎ তৈরী করিতে লাগিল।

ঐ "আপাতত" কথাটির মধ্যে রহিয়াছে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাহাই ভাবিতে গিয়া শিখার হাস্যমধুর মুখের পানে চাহিয়া বিনায়ক বুঝিল, শিখাকে পাওয়া তাহার পক্ষে খুব কঠিন না-ও হইতে পারে। কিন্তু তাহার ভয় করিতেছে। তপনের দারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা তাহাকে আতঙ্কিত করিয়াছে। এই সোসাইটিতে দরিদ্র বিনায়ক আবার ঢুকিবে। শিখা তাহার আকাঙ্ক্ষাব ধন, শিখাকে পাইলে ধন্য হইয়া যাইবে বিনায়ক কিন্তু শিখাকে সে রাখিবে কোথায়?

—কি ভাবছিস্ বিনু। বলিয়া তপন ফিরিয়া আসিল।

—ভাবছেন, আমার সঙ্গে উনি কি সম্পর্ক পাতাবেন। বলিয়া শিখা গ্লাসের সরবৎ আরো বেগে নাড়িতে লাগিল। মুখে তাহার হাসি মাখানো।

তপন শিখার গায়ে একটা কৃষ্ণচূড়ার ঝরা ফুল ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—দুষ্টু আমার বন্ধুকে বিব্রত করে তুলেছিস্?

—কি করা যায় দাদা, তোমার বন্ধু যদি নিঃসম্পর্কীয় কাউকে ফুল তুলে না দেন, তাহলে, সম্পর্ক একটা পাতানো ভালো নয় কি? মীরাটা কিন্তু বড্ড দেরী করছে।

—থাম্—তার স্বামী, শাশুড়ী, শ্বশুর। সকালবেলা বিস্তর কাজ। ঐ তো এসেছে...

প্রকাণ্ড একটা গাড়ী গেটে ঢুকিতেই শিখা ছুটিয়া গিয়া মীরাকে জড়াইয়া ধরিল—আয় দুষ্টু, এত্তো দেরী করলি যে...?

—চুপ চুপ বিনুদা এক্ষুণি মার লাগাবে। ওর কারখানার পাংচুয়ালিটি বড্ড কড়া। কিন্তু বিনুদার মুখটা যেন,—কি হয়েছে বিনুদা? মীরা বিনায়কের মাথার চুলে হাতের আঙুলগুলি ডুবাইয়া নড়িতে লাগিল।

—না বোনটি, কিছু হয়নি ; আয়, তোর জন্য এই ফুলটা পেড়ে রেখেছি।

মীরা ফুলটা লইয়া খোঁপায় পরিতে পরিতে বলিল,—তোর কই শিখা?

শিখা করুণ কণ্ঠে কহিল,—আমার দাদাও দিল না, তোর বিনুদাও না।

—বা-রে! বিনুদা, ফুল পেড়ে দাও, আমার হুকুম, ওঠো।

বিনায়ক উঠিতে যাইতেই শিখা ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল,—না, না, আগে খেয়ে নিন—।

মীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমনি ভঙ্গি করিয়া বলিল,—বটে। আমার চেয়ে তোর দরদ ওর উপর বেশি? আচ্ছা। তোমাকে ওর হাতে দিয়ে দিলুম বিনুদা, বুঝে কাজ কর

এবার থেকে।

মীরা সটান তপনের পায়ের কাছে বসিয়া হাঁটুতে চিবুক রাখিয়া বলিল,—কাল কি হলো দাদা, কেঁদেছিলে সারারাত?

—না বোন্‌টি কাঁদবো কেন? তোর দাদা কি এত দুর্বল।

কথাটা বলিয়াই তপন মীরার খোঁপা হইতে চাঁপা ফুলটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে—আমি চম্পা।"

ব্যাপারটা বেশ সরস হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মীরার প্রতি উচ্চারিত তপনের শেষের কথাটি এই ক্ষুদ্র সভাটিকে সচকিত করিয়া দিল। এইখানে এমন একজন আছে, অতলান্ত সাগরের মতো যাহার বেদনা পারহীন. কূলহীন। তাহার কথা শিখা বা বিনয়ক ভুলিয়া না গেলেও খুব তীক্ষ্ম ভাবে মনে রাখে নাই।

তপনের কথায় শিখার নারী হৃদয়ের কোমলতা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল, তিরস্কারের স্বরে সে বলিল,—তুমি হয়তো খুব কঠিন দাদা, কিন্তু তুমি এমন করে কথা বলো যে পাষাণও কেঁদে ওঠে—শিখার দুই চোখ কারুণ্যে কোমল হইয়া উঠিল।

মীরা শিখার কানে আসিয়া স্নেহের মাধুর্যে কহিল,—দাদা আমার আকাশের তপনের মতই নিজেকে ক্ষয় ক'রে পৃথিবীকে আলোক দেবে। এই তার সাধনা শিখা।

—তোর ভাই বোন দু'জনেই সমান মীরা। তোদের হাসিভরা কথা শুনে জনহীন প্রান্তর কেঁদে ওঠে।

মীরা এবং তপন অপ্রস্তুতের মতো চুপ করিয়া গেল। বিনায়ক অবস্থাটাকে একটু হালকা করিবার জন্য বলিল,—কান্না মানুষের প্রথম অভিব্যক্তি।

রুখিয়া শিখা জবাব দিল,—তাই অমনি বন্ধু জুটিয়েছেন, প্রতি কথায় কাঁদবো।

বিনায়ক বলিল,—রোদনের মধ্যে দিয়েই আমরা শ্রেয়ঃ লাভ করি, শিখা দেবী।

—রাখুন আপনার ফিলজফি। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনার সমান নাও হতে পারে।

—না হতে পারে, কিন্তু হতেও তো পারে। তপন টীপ্পনি দিল।

—রাগিও না দাদা, ভালো লাগছে না। তোমার বন্ধুর শ্রেয়ঃ যদি দিনরাত কান্না দিয়ে পাওয়া যায়, তাহলে আমার তা চাইনে।

—আমরা কে কি চাই তা আমরা নিজেরাই জানিনে শিখা দেবী। বিনায়ক বলিল।

—রাখুন, রাখুন, এটা কলেজের ক্লাশরুম নয়। আমি কি চাই, তা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি।

মীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—জানিস তো চেয়ে নে-না ভাই।

রোষরক্ত নয়নে শিখা ডাকিল—মীরা ভালো হচ্ছে না।

হাসি বিকশিত মুখে মীরা বলিল,—খুব ভালোহ'চ্ছে শিখা।

দোতলার বারান্দা হইতে শিখার মা ডাকিয়া বলিলেন—রোদটা কড়া হ'য়ে উঠলো তপন, ঘরে চলে এসো বাবা তোমরা।

তপন ও মীরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। এ যাওযার উদ্দেশ্য এতই স্পষ্ট যে শিখা লজ্জানতমুখে খাবারের বাসনগুলি গুছাইতে লাগিল। বিনায়ক একটা ফুল পাড়িয়া শিখার হাতে দিয়া বলিল,—বেশ তা'হলে বন্ধুই হলেন—কেমন, রাজি।

—রাজি। শিখা নতমুখে বলিল কথাটা।

ইচ্ছা থাকিলেও বেশীক্ষণ বিনায়কের কাছে একলা থাকিতে শিখার লজ্জা করিতেছিল। উভয়ে চলিয়া আসিল ছায়াঢাকা বারান্দায়।

পয়লা বৈশাখ সকালে উঠিয়াই তপতীর মনে পড়িল, নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয় নাই। আজই বন্ধুগণকে তাহা পাঠানো উচিত। বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া হয়তো তপনের উপর তাহার মনটা একটু প্রসন্ন ছিল।

মা'কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—আমার নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয়নি মা, এখুনি যেতে হবে। সে আবার সেই কলেজ স্ট্রীট,—এ পাড়ায়, পাওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তা যা-না কলেজ স্ট্রীট, কিনে আন্‌গে।

—একা যাবো মা? ওদিকে আমি বেশী যাইনে।

মা এক মুহূর্ত কি ভাবিলেন, তারপরই হাস্যদীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, একা কেন যাবি তপনকে নিয়ে যা। যাও তো তপন, নববর্ষের কার্ড কিনে আনো গিয়ে।

এতোটা তপতীর ইচ্ছা ছিল না। ঐ অভদ্র লোকটাকে লইয়া বাজার করিতে যাইতে সে নারাজ। কিন্তু মা যেভাবে কথাটা বলিলেন তপতী আর না যাইয়া পারে নাই। সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বেশ, গাড়ীটা বের করুন।

তপন নীরবে চা পান শেষ করিয়া উঠিয়া গেল এবং গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া চালকের আসনে বসিয়া তপতীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুন্দর একটা হালকা রং-এর শাড়ী পরিয়া তপতী নামিয়া আসিল। কিন্তু ঐ সুবেশা তরুণীকে একটা চন্দন-তিলক আঁকা কিম্ভূতের পাশে দেখিলে লোকে ভাবিবে কি। দুই মুহূর্ত ভাবিয়া তপতী ভিতরে আসনে উঠিয়া বসিল—তপন গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কলেজ স্ট্রীটের একটা বড় দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ী। নামিয়া তপতী দোকানে ঢুকিল। সম্ভ্রান্ত তরুণী দেখিয়া দোকানের কর্মীরাও প্রয়োজন জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

তপতী কার্ড দেখিতে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তপন গাড়ীতে বসিয়া রাস্তার ওপারে ফুলের দোকানটায় সাজানো ফুলগুলির দিকে চাহিয়া আছে। দোকানের একজনকে তপতী আদেশ করিল,—ওকে বলুন তো দু'টাকার ফুল কিনে আনুক।

সে ব্যক্তি দোকানের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া কহিল,—এ ড্রাইভার, দু'রুপেয়াকো ফুল লে-আও।

তপন নীরবে নামিয়া ফুলের দোকানে চলিয়া গেল। তাহাকে 'ড্রাইভার' সম্বোধন করায় তপতীর প্রথমটা লজ্জাই হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, দোকানের কর্মচারীর কিছুমাত্র অপরাধ নাই। মৃদু ভাবিয়া সে কার্ড চাহিয়া লইয়া এবং মূল্য দিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া চালকের আসনে নিজে বসিল।

তপন অনেকগুলি ফুলের বোঝায় মুখ আড়াল করিয়া ফিরিতেই তপতী নিজের বাঁ-দিকের খালি জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল,—রাখুন।

তপন ফুলগুলি সেখানে রাখিয়া দেখিল, তপতীর পাশে বসিবার আর স্থান নাই। সে ভিতরের সীটে আসিয়া বসিবামাত্র তপতী গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি একটি লোককে দেখিয়া তপতী গাড়ী থামাইয়া প্রশ্ন করিল,—এখানে কোথায়?

—রুগী দেখিতে গিয়াছিলাম—ফিরছি।

—আসুন গাড়ীতে। বলিয়া ফুলগুলি তুলিয়া নিজের কোলের উপর রাখিয়া ভদ্রোলোকের বসিবার স্থান করিয়া দিল আপনার পাশে। ভদ্রলোক তপনকে চিনেন না কিন্তু তপতী পরিচয় করাইয়া না দেওয়ায় তাহার দিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন।

তপন নীরবেই বসিয়া রহিল। তাহাকে এইভাবে অপমান করিবার জন্যই তবে তপতী সঙ্গে আনিয়াছে! ভালই। ব্যথা তপনের অন্তরে জাগিতেছে কিন্তু মহাশক্তিও তাহার অসীম। ওদিকে তপতী গাড়ী চালাইতে চালাইতে কথা বলিতেছে,—এইখানেই নিমন্ত্রণ করছি, নিশ্চযই যাবেন বিকালে।

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনার হাতের লিপি না পেলে বছরটাই মিছে হবে।

—খোসামুদি খুব ভালো শিখেছেন, দেখ্ছি। কার কার স্তব করছেন আজকাল?

—স্তব করবার যোগ্য মেয়ে কমই থাকে মিস্ চ্যাটার্জি।

—যেমন আমি একজন। বলিয়াই তপতী উচ্ছলভাবে হাসিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক বিব্রত হইতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন,—কথাটা সত্যি।

—ওঃ! এইখানে নামবেন আচ্ছা—নমস্কার।

ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ির দরজায় নামিয়া গেলেন। তপতী আবার গাড়ী চালাইল। তপনকে সে যথেষ্ট অপমান আজ করিয়াছে। যদি সে মা'কে গিয়া সব কথা বলিয়া দেয়। তপতীর মাথায় এতক্ষণে একটা দুশ্চিন্তা জাগিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, তপন গাড়ীর কিনারায় মাথা রাখিয়াছে। তাহার কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশগুলি বাতাসে উড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তপতী দেখিয়াছে তপনের মুণ্ডিত মস্তক, আজ দেখিল তাহার মাথার চুলগুলি নরম রেশমের মতো থোকা থোকা হইয়া উড়িতেছে। তপতীর বুকে অকস্মাৎ একটা শিহরণ জাগিল। গাড়ী বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে। গেটে ঢুকিয়া তপতী নামিতেই দেখিতে পাইল, তপন নামিয়া দারোয়ানকে বলিতেছে,—মা'কে বলে দিও, আমি বারোটা নাগাদ ফিরবো।

তপতী কত কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বিকালে স্নান সারিয়া তপন যখন খাইতে আসিল, তপতীর বন্ধুরা তখন মহাসমারোহে আহারে বসিয়াছে। তপনকে দেখিয়া দু'একজন একটু নাক সিট্কাইল। অধিকাংশই তাহাকে চেনে না।

বন্ধুরা যে বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে, তপন তাহা পার হইয়া ওদিকের ঘরে তাহার নিত্যকার খাইবার স্থানে গিয়া বলিল,—কৈ মা, খাবার দিন।

—ওখানে বসবে না বাবা—ওদের সঙ্গে?

—না মা, আমার অসুবিধা বোধ হয়। ওদের দলের তো আমি নই মা।

তপতী উৎকর্ণ হইযা ছিল, মা'র সহিত তপনের কি কথা শুনিবার জন্য। যেটুকু সহানুভূতি আজ তপনের উপর জন্মিয়াছিল, মুহূর্তে তাহা উবিয়া গেল। উনি ওদের দলের নন—কি বাহাদুরী? উহার জন্য তবে তপতীকে বুঝি ভদ্র-সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে। রাগিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আরো কি কথা হয় শুনিবার জন্য দাঁড়াইল; মা হাসিয়া

বলিলেন—আচ্ছা বাবা, এইখানেই বোস। তিনি একটা চপ ও একটা কাটলেট তপনকে খাইতে দিলেন।

তপন নিতান্ত বিনয়ের সহিত বলিল,—ওসব আমি ভালবাসিনে মা, মাছ মাংস তো আমি খুব কম খাই, আমায় রুটি-মাখন, আর জেলি দিন।

তপতী আর শুনিল না। ঐ দারুণ বর্বরকে লইয়া তাহাকে ঘর করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা তপতী যেন মরিয়া যায়। মা জানুক সব কথা, তপতী ঐ হতভাগাকে যেমন করিয়াই হউক বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবে।

মনের ভিতরটা যেন আগুনের মতো পুড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে বন্ধুগণের প্রতি তাহার স্নেহাধিক্যে। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজ সমাধা করিল, তপতীর জয়গান করিল এবং নূতন তৈরী লন্‌টাতে খেলিবার জন্য গিয়া জমায়েত হইল।

তপনকে আর একচোট অপমান করিবার জন্য চেঁচাইয়া তপতী বলিল,—আমি খেলতে যাচ্ছি মা, বারান্দা থেকে দেখো কেমন খেলা শিখেছি।

মা বলিলেন, তুমি টেনিশ খেলবে না বাবা?

—ও খেলা আমি খেলিনে মা, ওটা বড়লোকদের খেলা, আমাদের পোষায় না।

—হলোই বা, যাও, একটু খেলা কর গিয়ে।

—না মা, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

তপন বাহির হইয়া গেল।

মা'র মন সন্তানের কল্যাণকামনায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। খুকীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মিসেস চ্যাটার্জি অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীকে সব করা খুলিয়া বলিতেও তাহার ভয় হয়—কারণ তিনি জানেন, স্বামীই এই ব্যাপারের মূল। খুকী তপনকে দেখিতে পারে না শুনিলেই তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন। আর খুকী ঠিক কি ভাবে তপনকে দেখিতেছে, তাহা মা'ও সঠিক জানিতে পারিতেছেন না। এ যুগের তরুণ-তরুণীকে লইয়া ফ্যাসাদ বড় কম নয়। যাহা হউক, আজ তিনি উহাদের ফুলশয্যার আয়োজন করিয়াছেন। খুকীর ঘরে তপনকেই আজ তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

রাত্রে খাওয়া শেষ হইলে স্নেহকোমল কণ্ঠে মা বলিলেন—খুকীর এখন আর পড়াশুনার চাপ নেই, এবার ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর বাবা।

তপন একটু চকিত হইল, তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল,—ওর মনের উপর চাপ দিচ্ছেন কেন মা? এ যুগের মেয়েরা মনের উপর চাপ সহ্য করে না।

—কিন্তু বাবা...

বাধা দিয়া তপন বলিল,—আপনি সব কথা বুঝবেন না মা, আর আমি বলতেও পারবো না। তবে আমার হাতে আপনার খুকীকে সম্প্রদান করেছেন,—এ কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে সে ভার আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনাদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। আরো কিছু দিন যাক্।

মা তপনের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর করুণকণ্ঠে কহিলেন—খুকীর ঐ বন্ধুগুলোকে আমার ভয় করে বাবা—

কিছু ভয় নেই মা, মেয়ে আপনার যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ওরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর ক্ষতি যদি হয়ে থাকে, তাহলে অনেক আগেই তা হয়েছে।

—সে কি কথা বাবা! মাতা শিহরিয়া উঠিলেন।

—না মা বিচলিত হবেন না। আপনার মেয়েকে বুঝতে সময় লাগে। তবে যতদূর মনে হয়, সে আত্মরক্ষায় সক্ষম। আমার ঘুম পাচ্ছে মা, শুইগে।

মা আর কিছুই বলিলেন না, বলিতে তাঁহার বাধিতেছিল। আপন কন্যার সম্বন্ধে আপনারই জামাই-এর সহিত কতক্ষণই বা আলোচনা করা যায় এইরকম একটি বিষয় লইয়া! তপন চলিয়া গেলে তিনি তপতীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তপতী অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া গিয়াছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু ফিরিয়া গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিত মেয়েকে তিনি অধিক আর কি বলিতে পারেন। যতদূর বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এ সমাজে এতখানিও কেহ বলে না। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খুকী জানে তপন ও-ঘরে আজ যাইবে, অথচ খুকী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল! তপনের জন্য এতটুকু উদ্বেগ, একটুখানি উৎকণ্ঠাও কি তাহার মনে জাগে না? সমস্ত ব্যাপারটা মিসেস চ্যাটার্জির অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে।

তপনই-বা কেন ওভাবে জবাব দিল? তপন যাহা বলিল, হয়ত সেই কথাই সত্য; জোর করিলে খুকীর জেদ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু জোর করিতে হয় কিসের জন্য! আজ দুই আড়াই মাস তিনি তপনকে দেখিতেছেন, তাহার মতো চোখ জুড়ানো ছেলে তিনি কমই দেখিয়াছেন। খুকী যদি তাহাকে অভদ্র বা ইডিয়ট মনে করিয়া থাকে তবে অত্যন্ত ভুল করিয়াছে—খুকীর এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মিসেস চ্যাটার্জি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন ক্রমশ।

ওদিকে পদশব্দটা ফিরিয়া যাইবা মাত্র তপতী চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, তপন নহে, মা; তপন আসিতেছে ভাবিয়াই সে ঘুমের ভান করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে মা'কে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল। হয়ত তপন আসিবে না, কিম্বা পরে আসিবে! রাত্রি তো এগারটা বাজিয়া গেল।

তপতী দরজা খোলা রাখিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। তপন তাহা হইলে আজ আসিবে না। তপতী যেন বাঁচিয়া গেল। তপন আসিলে তাহাকে একটা নির্মম আঘাত করিবার জন্য তপতী প্রস্তুত হইতেছিল,—আসিল না, ভালোই হইল। কিন্তু সত্যিই কি আসিবে না।

তপতী পা-টিপিয়া-টিপিয়া এদিকের বারান্দা পার হইয়া তপনের রুদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে নিদ্রিত ব্যক্তির ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ আসিতেছে। তপন তাহা হইলে ঘুমাইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেন? তপতী মা'র কথায় সম্মতি দেয় নাই, কিন্তু প্রতিবাদও করে নাই। যাক্, না আসিয়া ভালোই করিয়াছে। তপন তাহা হইলে বুঝিয়াছে তপতী তাহাকে চায় না। তপতী নিশ্চিন্ত হইতে গিয়া ঠিক বুঝিল না, আধুনিক যুগের বিকৃত শিক্ষা তাহার নৈরাশ্যকে নিশ্চিন্ততার রূপে দেখাইতেছে কিনা। তপতী ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। ঘুম তাহার ভালই হইবার কথা, কিন্তু অনেক—অনেকক্ষণ তপতী জাগিয়া রহিল সেদিন...।

পরদিন সকালে তপতীর ক্লান্ত-বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া মা সস্নেহে কহিলেন,—বরের সঙ্গে ভাব্‌সাব্ করগে খুকী, দেখবি, ছেলেটা খুব ভালো।

ঝঙ্কার দিয়া তপতী কহিল—তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো মা, থামো এবার!

মা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা ভয়ানক কিছু উহাদের হইয়াছে, কিন্তু কী

হইয়াছে? প্রশ্নের উত্তর মা খুঁজিয়া পাইলেন না তপতীর মুখের কোনো রেখায়। মায়ের চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া তপতী নিজের কথাটা সম্বন্ধে সচকিত হইল, মৃদু হাসিয়া কহিল,—এত বড়ো মেয়েকে কিছু শেখাতে হয় না, তোমার অত ভাবনা কেন? ভাব সাব হয়েছে আমাদের। এক ঘরে না শুলেই বুঝি আর ভাব হয় না!

তপতীর মুখের হাসি দেখিয়া মা অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। আজকালকার চালাক ছেলেমেয়ে, হয়ত মা'কে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিয়া উহারা দুজনে মিলিত হইয়াছে। তাই তপতীর জাগরণ-ক্লান্ত মুখশ্রী মা'কে অত্যন্ত আনন্দ দিল। স্নেহ বিগলিত স্বরে তিনি কহিলেন,—বেশ মা, আমার মনটা খুব চঞ্চল হয়েছিল কিনা, তাই বল্‌ছিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো তাহলে!

মধুর হাসিয়া তপতী কহিল,—একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, কিছু ভাবনার দরকার নেই তোমার।

তপন আসিয়াই ঘরের মধ্যে তপতীকে দেখিয়া দরজার কাছে থামিয়া গেল। মা ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে। তপতীর পাশ কাটাইয়া তপন ও-দিকের একটা চেয়ারে মুখ ফিরাইয়া বসিল। তপতী সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক দেখিতে চাহিল, কিছুই দেখা যায় না। কোট-প্যান্টগুলো সমস্ত দেহটা ঢাকা। উর্ধ্বাংশে তিলক এবং চোখে সবুজ ঠুলি। মুখখানা অমন ভাবে ফিরাইয়া রাখিবার হেতু কি। তপতীর আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল, মুখের ডোল্‌টা বোধ হয় ভালোনয়। হয়ত দাঁতগুলো উঁচু কিম্বা ঠোঁট দুইটা পুরু তাই তপতীকে দেখাইতে চাহে না। কিম্বা লজ্জাও হইতে পারে। তপতী মাথার চুলগুলি শুধু দেখিতে পাইতেছে! ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি পিছনদিকে উল্টাইয়া দিয়াছে, সদ্যস্নাত চুল-ঝরা একটা জলধারা ঘাড়ের পাশে গড়াইয়া আসিতেছে, ঘাড় এবং কাঁধের সংযোগস্থলে একটা ডাগর কালো তিল! পিছনটা তো খুবই সুন্দর মনে হইতেছে, আর ফিগারটাও বেশ—লম্বা দোহারা, বলিষ্ঠ!

সবই হয়ত ভাল, কিন্তু অসভ্য যে। আবার ঐ দারুণ গোঁড়ামী, তিলক-ফোঁটা, নিরামিষ খাওয়া, পাঁচালী পড়া—নাঃ, উহাকে লইয়া তপতীর চলিবে না। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল তপনের সহিত মা'র কথা শুনিবার জন্য। মা বলিতেছে,—কাল তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখলাম বাবা, ঐ ঠিক। তবে তোমরা দুটি আমাদের সর্বস্ব-ধন তোমাদের ভালোর জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তপন সহাস্যে কহিল,—আচ্ছা মা আমার দ্বারা আপনার খুকীর কিছু মন্দ হবে ব'লে কেন আপনি মনে ক'রছেন?

শুনিতে শুনিতে তপতী বিরক্ত হইয়া উঠিল। উনি তপতীর ভালো করিয়া দিবেন। কী আস্পর্ধা। মা বলিলেন,—তোমাদের দুটিকে সুখী দেখবার জন্যই বেঁচে আছি বাবা।

মা'র কণ্ঠে কল্যাণাশীষ ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অপার্থিব মাতৃমূর্তির সম্মুখে বসিয়া প্রতারণার কথা বলিতে তপনের বিবেক পীড়িত হইতেছে! সে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। তপতী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—আমায় আর এক কাপ চা দাও মা, কড়া করে!

মা অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিলেন! নিশ্চয়ই উহারা কাল মিলিত হইয়াছিল, রাত জাগার জন্য খুকীর কড়া চা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বলিলেন—আর একটু ঘুমোগে, শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, অনুভব করিল, খুকীর অভিনয় চমৎকার জমিতেছে। মা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মাতৃত্বের এই ব্যাকুল আবেদন তপনের মনকে আর্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কিছুই সে করিতে পারে না। মা'র কন্যাই যখন অভিনয় করিতেছে, তখন সে আর কি করিবে?

বিষাদক্লিষ্ট তপন বাহিরে চলিয়া গেল। তপতীও কড়া চা খাইয়া আপন কক্ষে আসিল, হাসিল খানিক আপন মনে এবং কবিতার খাতাটা টানিয়া লইয়া "বঞ্চিতের বেদনা" লিখিতে বসিল।

শিখা কয়েকটি মেয়েকে কারখানার প্রাঙ্গণে আনিয়া জড় করিয়াছে। উহাদের নিকট তাহার কি একটা প্রস্তাব আছে। বিনায়ক একধারে চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল, তপন এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। শিখা কহিল,—আচ্ছা মিতা, দাদার যদি দেরি থাকে তো আমরা আরম্ভ করি।

—বেশ তো ; করুন আরম্ভ। বিনায়ক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল। শিখা আরম্ভ করিল,—ভগ্নিগণ আমাদের অভাব এত বেশী, যে মেটাবার চেষ্টা করতেও ভয় হয়। কিন্তু ভয় করলে চলবে না। অভাব আমাদের যত অভাব বোধ তার চেয়ে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। অতএব এই ঠিক সুযোগ, যখন আমরা অভাবের প্রতিকার করতে কায়মনে লাগতে পারবো!

আমার প্রস্তাব এই যে, আপনারা দিনকয়েক এই কারখানায় খেলনাগুলো রং করতে শিখুন, ছোট ছোট পার্টসগুলোকে জোড়া দিতে শিখুন যাঁর হাত নিপুণ তিনি আরো কিছু বেশী শিখুন। তারপর সাজসরঞ্জাম নিয়ে আপনারা যাবেন অভাবগ্রস্তদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েদের এই কাজ শিখিয়ে দেবেন, তাঁদের কাঁচামাল সরবরাহ করবেন, তৈরী করাবেন এই সব খেলনা। তৈরী মাল বিক্রী করবার ভার আমাদের। মজুরী তাঁরাও পাবেন, আপনারাও পাবেন। অবসর সময়ে একাজ করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যাবে বাড়িতে বসে।

খেলনার সঙ্গে আমরা কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরী শেখাবো আর শেখাবো আয়ুর্বেদীয় নানা রকম ঔষধ আর টয়লেট তৈরী করতে, যার গুণ আপনাদের বিলিতি ঔষধ, এসঙ্গে সাবান-স্নো-পাউডার থেকে অনেক বেশী। অথচ দাম হবে বিলাতীর অর্ধেক। এসব কাজের জন্য যা কিছু দরকার সবই এখান থেকে দেওয়া হবে। আপনারা শুধু কাজ করবেন। ছয়মাস করে দেখুন, না-পোষায় ছেড়ে দেবেন।

শুধু সৌখীন শিল্প, ঘর সাজাবার উপকরণ দিয়ে দেশের কিছু হবে না। ওগুলোর দরকার আছে তরকারী হিসাবে, কিন্তু ডালভাতের দরকার আগে। অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন না করলে কিছুতেই সুসার হয় না।

এ কাজ যদি আমাদের সফল হয় ; তাহলে পরের কাজ হবে আমাদের আরো বড়—আরো ব্যাপক! সে কাজ দেশের মানুষ তৈরী করার কাজ। আমরা প্রত্যেকে শুধু দুটি-চারটি করে মানুষ গড়ে যাবো যারা নেতার আহ্বানে সাড়া দেবে, অকম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করবে শ্রেয়ঃ লাভের জন্য। আমি আপনাদের নেত্রীত্ব চাইনে, আমিও আপনাদের মতন একজন কর্মী থাকতে চাই এবং সমান কাজ করতে চাই।

তপন আসিয়া পৌঁছিল এবং হাসিমুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। শিখা বলিয়া চলিল—এই আমার দাদা, অন্তরাল থেকে উনি এবং ওঁর বন্ধু বিনায়কবাবু আমাদের সাহায্য

করবেন—দেখবেন, ক্ষতি যাতে আমাদের না হয়। ওঁরা দু'জনে এই কারবারটা গড়ে তুলেছেন ; অতএব মাড়োয়ারীজনোচিত অভিজ্ঞতা যে ওঁদের আছে তা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। আর ওঁরা বলেছেন, ক্ষতি যদি হয় ওঁদের হবে, লাভ যদি হয় তো আমাদের; আর ক্ষতিই বা হবে কেন? আসুন, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করবো।

মেয়েগুলি সত্যই অভাবগ্রস্ত পরিবারের। কাজের প্ল্যান শুনিয়া ও সমস্ত দেখিয়া তাহাদের প্রত্যয় জন্মিল! অবসর সময়ে এ কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে—তাহারা লাগিয়া গেল।

তপন শিখাকে ডাকিয়া বলিল,—বিয়ে-থা করতে হবে না বুড়ি? এই সব করবি নাকি তুই?

—বিয়ের হয়তো দরকার আছে দাদা, দিও যখন ইচ্ছে কিন্তু এ সবেরও দরকার আছে। তোমার বোন তোমার মর্যাদা রাখতে চায়।

হাসি মুখে তপন বলিল,—বেশ কথা, তবে বিয়েটাও দেব, আব এই মাসেই।

—কেন? বুড়িয়ে গেলুম নাকি দাদা?

—সেটা দেখবার ভার আমাদের উপর—তুই এখনও যা করছিস্ কর!

তপন অফিস ঘরে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর বিনায়ক বিপন্ন মুখে কহিল,—শুনছেন মিতা আপনার দাদা বড্ড জ্বালাতন করছে।

আমার দাদা কাউকে জ্বালায় না—শিখা জবাব দিল।

বিনায়ক মাথা চুলকাইয়া বলিল,—কিন্তু আমায করছে জ্বালাতন।

—কেন?

—আমি আর সব কাজ করতে পারি, লাউ-কুমড়ো কুটতে পারিনি। শিখা কলহাস্যে ঝঙ্কারিয়া উঠিল,—দাদা পারে কিন্তু...।

—আমি পারিনে যে—বিনায়কের মুখে অসহায়তার ছবি ফুটিয়া উঠিল।

শিখাব নারী হৃদয় স্নেহে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। বলিল,—তা আমায় বুঝি আপনার কাজটা করে দিতে হবে? চলুন, যাচ্ছি।

শিখা আসিয়া একটা ইঁচড় কুটিতে বসিতেই তপন গম্ভীর মুখে বলিল,—ভাল হচ্ছে না ভাই শিখা, ওর কাজ কেন তুই করবি? তোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক—?

—"মিতা"—বলিয়া শিখা হাসিয়া উঠিল!

—ওঃ, তা হলে কিন্তু—তপন হাসিমুখেই থামিয়া গেল!

—কিন্তু কি দাদা?—শিখার চোখে প্রশ্নের আকুতি!

কাঁঠালের আঠায় কুলবে না। ফুলের ফিতে দিয়ে বাঁধনটা পোক্ত করে দিতে হবে।

—যাও তুমি বড্ড ইয়ে—।

শিখা মুখ ফিরাইয়া তরকারী কুটিতে বসিল। তাহার লজ্জারক্ত মুখের পানে তাকাইয়া বিনায়ক বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তপনের ইচ্ছা শিখার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে। শিখা বিনায়ককে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু শিখাকে পাইবার যোগ্যতা কি বিনায়কের আছে! তপনের ইচ্ছায় চিরদিনই আত্মসমর্পণ করিয়াছে, বিনায়ক আজও কিছুই বলিল না।

সেদিন বৌদ্ধ-পূর্ণিমা।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তপন জাগিয়া উঠিল! দক্ষিণ দিকের চওড়া বারান্দাসংলগ্ন পূর্বদিকের ঘরটায় তপন আর ঐ বারান্দারই পশ্চিমদিকের ঘরটায় থাকে তপতী। মাঝখানে বারান্দাটা যেন একটা দুরন্ত নদী—কোন দিন পার হওয়া যাইবে না। প্রভাতের সূর্য আসিয়া তপনের কক্ষে সূর্য-কিরণ ছড়াইয়া দেয়—অস্তগামী সূর্য তপতীর ঘরের পশ্চিমের জানালাপথে উঁকি মারিয়া যায়। ইহারও মধ্যে হয়ত বিধাতার কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

মা বেশ শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। উহাদের এই কয়দিনের সংবাদ তিনি বেশী রাখেন না। বেশ বুঝিয়াছেন, বারান্দা পার হইয়া উহাদের মিলনগুঞ্জন ভালরূপেই চলিতেছে—ভাবিবার কিছু আবশ্যক নাই।

তপন বলিল,—কি ভাবছেন মা?

—কিছু না বাবা, খাও! তোমার মতো ছেলে পেয়েছি, ভাববার কি আছে?

তপনের অন্তর মুচড়াইয়া উঠিল। এই পরম স্নেহময়ী জননীকে সে প্রতারিত করিতেছে সজ্ঞানে। একবার তার ইচ্ছা হইল মাকে সব কথা বলিয়া জানায় যে তাঁহারা ভুল করিয়াছে। ডিগ্রীহীন আর্য্যধর্ম্মভক্ত তপনকে তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে। অনর্থক একটা উৎপাত, তপতীর উপর শাসন এবং আরো কিছু কেলেঙ্কারী। না, থাক, তপন কৌশলে জানিয়া লইবে তপতী কাহাকে চায়, তাহারই হাতে তপতীকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া সে নীরবে চলিয়া যাইবে। এই যে এখানে ইঁহাদের প্রচুর স্নেহমমতা সে পাইতেছে, ইহারও ঋণ তপন শেষ করিয়া যাইতে চায়—তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহারও একটা উপায় তপন ভাবিয়া রাখিয়াছে।

অস্নাতা তপতী বাসি কাপড়েই আসিয়া ঘরের চৌকাট হইতে বলিল,—মা আমার লেক-ক্লাবে সুইমিং কম্‌পিটিশন্ আছে। এখুনি যেতে হবে। নিজে গাড়ী চালিয়ে গেলে হাতের পরিশ্রম হবে মা, ড্রাইভারটা আসেনি—কি করি বলোতো?

মা হাসিমুখে বলিলেন—তপন যাক্ না গাড়ী চালিয়ে! যাওতো বাবা। —আয় খুকী, খেয়ে নে!

—আচ্ছা মা, যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তপতী আসিয়া গাড়ীর ভিতরের সীটে আসন গ্রহণ করিল। তপনের পাশে বসিল না। তপন নিরুদ্বেগে নির্বিকার চিত্তে গাড়ী চালাইয়া দিল। ক্লাবের জুনিয়র ও সিনিয়ার মেম্বারগণ একযোগে আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ীর কাছে তপতীকে অভ্যর্থনা করিতে। সুন্দরী, সুবেশা, তরুণী তপতী! তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কার না হয়!

—আসুন, আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা, সময় হয়ে গেছে।—

তপতী নামিয়া গেল। গাড়ীটা ঘুরাইয়া ষ্ট্যান্ডে লইয়া রাখিতে হইবে, তপন ঘুরাইতেছে, একজন ডাকিয়া কহিল, সুইমিং কষ্টিউমটা দিয়ে যাও তো হে!

তপতী উহা লইতে ভুলিয়া গিয়াছে, না ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া গিয়াছে কে জানে! তপন নির্বিকার চিত্তে নামিয়া কষ্টিউমটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়া আসিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা তপন গাড়ীতে বসিয়া আছে। অকস্মাৎ দেখিল, অসংখ্য নারীপুরুষ তপতীকে ঘিরিয়া ক্লাবঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীর জলসিক্ত সুদীর্ঘ বেণী সর্পের মতো দুলিতেছে। ভিজা কষ্টিউমটার উপরেই সে তাহার পাতলা শাড়িটা

জড়াইতেছে, হাতে একটা রূপার কাপ, প্রাইজ পাইয়াছে বোধ হয়। তপন কোন দিন তপতীকে ভালোকরিয়া দেখে নাই, আজও তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। মুখ নামাইয়া সে গাড়ীটা চালাইয়া দিল।

তপতী ভিতরে বসিয়া ভাবিতেছে, ঐ নির্ব্বোধটা দেখুক, তপতীর সম্মান প্রতিপত্তি! তপতীকে লাভ করিবার যোগ্যতা যে উহার কিছু মাত্র নাই ইহা যেন সে অচিরে বুঝিতে পারে। কিন্তু তপন ফিরিয়া তাকাইল না। তপতী ভাবিল, এসব ব্যাপারে মর্য্যাদা ঐ গ্রাম্য বর্ব্বর কি বুঝিবে। তিলক কাটিতে যাহার দিন ফুরাইয়া যায় তাহাকে কান ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তপতীর মূল্য কতখানি!

বাড়ি ফিরিয়া তপতী তাহার বিজয়ের নিদর্শন 'কাপ'টা অন্যান্য প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির সহিত সাজাইয়া রাখিল।

সারাদিন তপতীর মনটা আত্মপ্রসাদের আনন্দে ভরপুর রহিয়াছে। সাঁতারে সে আজ প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কত উত্তেজক কথা তাহার স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিকে দুর্দান্ত আবেগে যেন ঝঙ্কৃত করিতেছিল! সন্ধ্যা হইতে বন্ধুদের লইয়া সে গানের মজলিশ বসাইয়াছে।

অন্যদিন তপন রাত্রি সাড়ে দশটার পূর্বে ফিরে না, আজ কিন্তু নয়টার সময় ফিরিয়া আসিল। তপতীদের সঙ্গীত-চর্চ্চার ঘরটার পাশ দিয়াই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। তপন নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, ঘরের কয়েকজন তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—এই যে মিস্টার গোঁসাই, কোথায় গিয়েছিলেন?

তপন সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশ্নটা তাহাকেই করা হইতেছে বুঝিয়া শান্তস্বরে বলিল—বৌদ্ধ বিহারে গিয়েছিলাম।

—ওরে বাপ্—বৌদ্ধ বিহারের কি বোঝেন আপনি। সেখানে যান কেন?—বিদ্রূপটা স্পষ্ট।

তপন এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর শান্ত স্বরেই জবাব দিল—' মেয়েদের কাছে এক কণা প্রসাদ ভিক্ষা করার চাইতে সেটা ভালো, কিছু না বুঝলেও ভালো।

তপন চলিয়া গেল। একটি মেয়ে তপনের কথাটা শুনিয়াছিল, বলিল,—ঠিক বলেছেন উনি, আপনারা তো মেয়েদের প্রসাদ ভিক্ষাই করেন।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—করি, ভিক্ষা পাবার যোগ্যতা আছে বলে। ওকে কে ভিক্ষা দেবে শুনি?

মেয়েটি বলিল,—ভিক্ষা উনি করেন না, কোন দিন আসেননি এখানে।

—আসেননি কেন? আসার কোন্ যোগ্যতাটা আছে? বৌদ্ধ-বিহারে যাওয়ার কথাটা একটা চাল। ভাবলো, ঐ শুনে আমরা ওকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভেবে নেব। ওসব আমরা ঢের বুঝি।

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—হাঁ হাঁ, করবে কি আর, এখানে তো এসে মিশতে পারে না, তাই ঐ সব ভণ্ডামী দেখাইয়া পণ্ডিতি জাহির করিতে চায়।

তপতী উঠিল ; ভালোলাগিতেছে না তাহার। কি যেন কোথায় কাঁটার মতো বিঁধিতেছে, তপন কি সত্যিই কোন নারীর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করে না? সত্যিই কি বৌদ্ধ-বিহারে যায় সে?

শিখার কথাটা মনে পড়িয়া গেল—"আর্য্যনারী হয়ে তুই স্বামীকে গ্রহণ করিলি

না"—তপতী উঠিয়া উপরে আসিল।

তপন তখনো খাইতে আসে নাই। রাত্রি মাত্র দশটা বাজিতেছে। অন্যদিন সে সাড়ে দশটার পূর্বে ফিরে না। তপতী চাহিয়া দেখিল, মা খাবার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয় কি একটা সেলাই করিতেছে। ঘরে না ঢুকিয়া তপতী বাহিরের একটা সোফায় শুইয় অপেক্ষা করিতে লাগিল, কোটপ্যান্ট ছাড়িয়া ধুতি ফতুয়া পরিহিত তপন খড়ম পায়ে দিয় আসিয়া ঢুকিল খাবার ঘরে, হাতে শ্বেতপদ্ম। তপতী চাহিয়া দেখিল, মুখ তাহার পূর্বব ফিরানো রহিয়াছে। মুখ না দেখিয়া তপতী পায়ের দিকে চাহিল। সুন্দর সুগঠিত পা দুখানি খড়মের কালোর উপর কাঞ্চনবর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। রংটা এত সুন্দর নাকি!

—এসো বাবা, হাতে ও ফুলটি কিসের?—মা সাদর আহ্বান জানাইলেন। তপতী কা পাতিয়া রহিল তপনের উত্তর শুনিবার জন্য।

তপন বলিল, আজ বুদ্ধদেবের জন্মতিথি মা, গিয়েছিলাম দেখতে, ফুলটি নির্মাল সেখানকার।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাকে দেখলেই আমার বুদ্ধদেবের মুখ মনে পড়ে বাবা তুমিই আমার বুদ্ধদেব।

তপন ত্বরিতকণ্ঠে বলিল,—না মা, ও কথা বলবেন না। তিনি মানব-দেবতা আমি তাঁ দাসানুদাস হবার যোগ্য নই!

মা চকিত হইয়া বলিলেন,—বুদ্ধদেবকে তুমি তো খুব বেশী শ্রদ্ধা করো তপন!

—করা কি উচিত নয় মা? শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার মধ্যে তো আমরা নিজেদেরকে শ্রদ্ধাভাজন করে তুলি—শ্রদ্ধা-না করলে বুদ্ধদেবের কিছু ক্ষতি হবে না মা, আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান হবে।

মাতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তপতী বিস্মিত বিহ্বল হইয়া গেল। এই লোকটা ইডিয়ট! ইহা অপেক্ষা মানবতায় অধিকতর গৌরব-বহনকারী মানুষ তপতী তাহার জীবনে দেখে নাই চঞ্চল পদে সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

—আয়, খেয়ে নে খুকী—মা ডাকিলেন!

তপনের আনিত পদ্মটা লইয়া খোঁপায় গুঁজিতে গুঁজিতে তপতী কহিল—আমি এখনে কাপড় ছাড়িনি মা।

—যা, ছেড়ে আয় চট্ করে।

তপতী তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আজ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার সন্ধ্যাকে পরিহিত সুচারু তনিমার দিকে তপন একবার চাহিয়া দেখুক। তপন কিন্তু মুখ তুলিল না পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষার পর নিরাশ হইয়া তপতী চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে একাকী শুইয়া তপতী ভাবিতেছে, ঐ তো ওপাশের ঘরটায় সে ঘুমাইতেছে ঐ নিরহঙ্কার মানুষটি, কম খায়, কম কথা বলে, নিজেকে জাহির করে অত্যন্ত কম। খুঁজিয় ফিরিলেও উহার সাড়া প্রায় পাওয়া যায় না! যাকিছু কথা উহার মা'র সঙ্গে। তপতী তো এতদিন উহার খবর লয় নাই, বরং নির্মমভাবে উহাকে নির্যাতিত করিয়াছে প্রায় প্রাপ্য সম্মান হইতে উহাকে সে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে তথাপি সে রহিয়া গেল তপতীকে। নির্বিকারে। ভাবিতে ভাবিতে তপতী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিতে সর্পের মতে বেলা হইয়া গিয়াছে; উঠিতে গিয়া শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইল, কিন্তু শরীরে

ানিকে মনের জোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে স্নানের ঘরে ঢুকিল। পরিপাটি করিয়া স্নান সারিয়া ফিকে নীল শাড়ী পরিয়া সে বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল এক পিঠ খোলা চুল মেলিয়া, আশা জাগিতেছিল অন্তরে, তপনের সহিত যদি একবার দেখা হইয়া যায়। তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের পানে চাহিয়া দেখিল সে বাহির হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে খাবার ঘরের দরজায় আসিয়া শুনিল, মা বলিতেছে দু'লাখ—টাকা! অত টাকা করবে কি ও?

কি জানি! যা খুশী করুকগে! টাকার তো আমার অভাব নাই নীলা! বাবা উঠিয়া যাইতেছিলেন, মা বলিলেন, ভালোই হয়েছে, ছেলেটার যা নিস্পৃহ মন? টাকাকড়ি নিলে বাঁচি।

পিতা হাসিয়া বলিলেন,—নেবে, নেবে, ভাবছো কেন! শিলং-এ তাহলে পাঠাচ্ছ না।

—থাক্। ছেলে মানুষ দু'জনেই! কোথায় একলা পাঠাবো বাপু, তার চেয়ে আমার চোখের উপর দু'টিতে থাক্; পূজার সময় সবাই যাব শিলং।

কথাটা তপনের সম্বন্ধে। মুহূর্তে তপতীর অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। দুই লক্ষ টাকা সে বাবার কাছ হইতে লইয়াছে। এত টাকা দিয়া কি করিবে সে! তবে কি টাকার জন্য সে তপতীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া য্যয়। লোকটা তো আচ্ছা ধড়িবাজ। এজন্যই বুঝি তপতীর ব্যবহারের কথা বাবা মাকে একদিনও বলে নাই। দিব্যি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে তো!—আচ্ছা, দেখা যাইবে।

তপতী আসিয়া চা খাইতে বসিল! মা সস্নেহে বলিলেন,—রান্না-বান্না যে ছেড়ে দিলি বুকি, ভালোলাগে না?—মাতার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

তপতী ক্রোধ দমন করিয়াকহিল,—নিরামিষ রাঁধার জন্যে আমার হাত কামড়াচ্ছে না।

মা একটু বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন—কি করবো বাছা, মাছ-মাংস খেতে ও ভালবাসে া—তবে একেবারে যে খায় না তা তো নয়। তুই বলিস না কেন খেতে?

—আমার দায় পড়েনি—যার যা খুশী খাবে আমার কি?

তপতী চলিয়া গেল। মা বুঝিলেন, ইহা জামাতার উপর কন্যার অভিমান। মধুর হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। ভাবিলেন তপনকে মাংস খাইবার জন্য তিনি নিজেই অনুরোধ করিবেন। তপন তাহার কথা নিশ্চয় রাখিবে।

তপতী আপন ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া কত কি ভাবিল। বাবার কাছে টাকা আদায় করিবার বেশ চমৎকার ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছে লোকটা তো বেশ, নিক্ সে, টাকা লইয়া যন সরিয়া পড়ে। তপতী উহার মুখ দেখে নাই—দেখিবে না।

তপতীর অন্তরে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল! মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য মিঃ ঘাষালের মতো সুপাত্রের সহিত তপতীর বিবাহ হয় নাই, আজ তাহারই স্থান অধিকার করিয়া ঐ বর্ব্বর লোকটা দুই লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল! টাকার উপর তপতীর কছুমাত্র মায়ামমতা নাই। কিন্তু লোকটা ধূর্ত্তামী তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। সে ঃসংশয়ে বাবা আর মাকে বুঝাইয়াছে যে তপতীর সহিত আমার প্রেম নিবিড় হইয়া ঠিয়াছে, অতএব লক্ষ টাকা সে এখন পাইতে পারে। তপতীর নির্বোধ স্নেহময় বাবা-মা শ্চিন্ত মনে উহার খোস-খেয়াল মিটাইবার জন্য নগদ দুই লক্ষ টাকা উহার হাতে তুলিয়া লেন। আচ্ছা, তপতীও দেখিয়া লইবে সে কতবড় ধূর্ত্ত।

কিন্তু লোকটা মোটেই মূর্খ নয়। লেখাপড়া ভালো না জানিলেও সে নিশ্চয় বুদ্ধিমান। লে অভিনয় করিয়া কতগুলি পাকাপাকা কথা শিখিয়া রাখিয়াছে, যথাস্থানে যথোপযুক্ত

ক্ষেত্রে তাহা সে প্রয়োগ করে। মা নিতান্তই মা, তাই উহার মা ডাক শুনিয়া গলিয়া গিয়াছে। মা আবার বলে, বুদ্ধদেবের মতো সুন্দর। সুন্দর নয় বলিয়াই হয়ত বাড়াবাড়ি করিয়া বলে ঐ সব। যাক্—সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক, তপতীর আসে যায় না!

তপতী গিয়া গম্ভীরমুখে খাইতে বসিল।

শিখা কারুণ্য-কোমলকণ্ঠে ঘরে ঢুকিল—জানো মা, অমন দাদা কারোর হয় না মা! দাদা আশ্চর্য্য, দাদা অদ্ভুত। মানুষকে অমন করে ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি! কিন্তু মা আমায় এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে।

—কেন? কার অসুখ?—মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

অসুখ একটা কেরাণীর, তার গায়ে রক্ত নাই, দাদা তাই তাকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে। কারুর কথা শুনলো না মা, আমরা এতো বারণ করলাম,—বললাম, অন্য একটা লোককে তো কিছু টাকা দিলেই সে রক্ত দিতে পারে। তা বলে, তার রক্তটাও তার বোনদের কাছে এমনি দামী বুঝেছিস্ কি বলবো আর!

মা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তপন কোন একটা অজ্ঞাত কেরাণীর জন্য নিজের দেহের রক্ত দান করবে। ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—না-না শিখা, ওকে বারণ কর তোরা।

ও শুনবে না মা, কারুর কথা শুনবে না। আর যুক্তি দিয়ে ওকে হারাতে পারবে না কেউ। ওর বন্ধু বিনুবাবু সকাল থেকে সে চেষ্টা করছেন। আমায় খানিকটা দুধ আর কিছু লেবুর রস করে দাও শিগ্‌গীর।

নিরুপায় মাতা লেবুর রস তৈরী করিতে করিতে বলিলেন,—ওর শ্বশুরবাড়ির কেউ জানে না?

—না ওঁদের জানাবে না—তুমি জানিয়ে দিও না যেন।

বেলা এগারোটার সময় শিখা ও বিনায়ক তপনকে লইয়া ফিরিল। শিখা তাহার নিজের শয়নকক্ষে তপনকে শোয়াইয়া দিল; বিনায়ক তপতীর মাকে 'ফোন' করিয়া জানাইয়া দিল, তপনবাবু আজ দুপুরে অন্যত্র খাইবেন—তাঁহার যেন অপেক্ষা না করেন।

শিক্ষার মা আসিয়া অনুযোগ করিলেন—একি বাবা, নিজের রক্ত কেন তুমি দিতে গেলে?

—দিলাম তো কি হলো মা, আমি তো আপনার সুস্থ সবল ছেলে।

কিন্তু বাবা, তোমার জীবন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান!

—সে লোকটির জীবন কিছু কম মূল্যবান নয় মা, তারও মা, ভাই বোন, স্ত্রী, সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, সেই একমাত্র উপার্জনকারী তাদের।

মা চুপ করিয়াই রহিলেন! তপন আর একটু দুধ খাইয়া বলিল,—কিছু ভয় নেই বোনটি, ওবেলাই সেরে উঠবো; ঘুমুই একটু। শিখা বসিয়া বসিয়া হাওয়া করিতেছে। চোখ দু'টি জলে ছলছল করিতেছে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তপন বলিল,—কি হোলরে? কাঁদছিস?

—ভালো লাগছে না দাদা, তুমি রক্ত দিয়ে বেড়াবে নাকি?

—একা আমার রক্তে কি হবে শিখা, তবে এই আত্মসুখ সর্ব্বস্ব ক্লীব, পশুর জাতটাকে রক্ত দিয়ে বাঁচাতে হবে নইলে আর্য্যগৌরব বুঝিবা ডুবলো।

তপন পাশ ফিরিয়া শুইল। বিনায়ক ইসারায় শিখাকে নিষেধ করিল আর কথা না বলিতে।

স্নেহের যে সামান্য সূত্রটুকু ধরিয়া তপনের অন্তরে তপতী প্রবেশ করিতে পারিত, তপতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক মনের উষ্ণ চিন্তাধারায় তাহা পুড়িয়া গেল। তপনকে সে একটা অর্থশোষণকারী পরভৃতিক ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। এক একবার মনে হইতেছে, হয়ত উহার মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যাহাতে তার মা-বাবা এতটা মুগ্ধ হইতেছেন, আবার মনে হইতেছে, ইহা ঐ সুচতুর লোকটির সু-অভিনয়ের গুণ। তপতী উহাকে কঠোর পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল।

সেদিন টকটকে লাল শাড়ীখানা পড়িয়া তপতী বাহির হইয়া আসিল, যেন অগ্নিশিখা। মা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেড়াতে যাবি নাকি।

—না, মিঃ অভিনব বোস ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছি চা'য়ে। কিন্তু মা, ফুল আনা হয়নি। দাও না ফোন করে তোমার জামাইকে, ফুল কিনে আনবে।

মা, তাঁহার খুকীর দুরভিসন্ধি কিছুমাত্র অবগত নহেন। হাসিয়া বলিলেন,—নিজে বলতে পার না? লাজুক মেয়ে!

—নিজের জন্য তো নয় মা, একজন অতিথির জন্য তাই লজ্জা করছে।

মা বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, ফোন করিয়া দিলেন তপনকে। বিজয়িনীর আনন্দে তপতী ভাবিতে লাগিল, বোকা মা কিছুই বুঝিলেন না যে তাঁহাকে দিয়াই তাঁহার স্নেহপাত্রকে কেমন করিয়া তপতী অপমান করিল। ফুলগুলি লইয়া যখন সে আসিবে, তখন তাহার সম্মুখেই মিঃ বোসকে তপতী তাহারই আনা ফুল উপহার দিবে। তপতী সাজিয়া-গুজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ বোস আসিয়া পৌঁছিলেন অথচ ফুল এখনো আসিল না, তপতী অত্যন্ত চটিয়া বিরক্ত মুখে মিঃ বোসকে চা পরিবেশন করিতেছে দোতলার বারান্দায়। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তপন কাগজে মোড়া একগোছা ফুল লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দেখিয়া তপতী ত্বরিতে নিকটবর্তী হইয়া বলিল,—বড্ড দেরী হোল,—দিন,—সে হাত বাড়াইল ফুলগুলি লইবার জন্য। কাছেই একটা ছোট টিপয় ছিল, তপন নীরবে ফুলের গোছাটা সেই টিপয়ের পর রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, রাগে তপতীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, সরোষে গর্জ্জন করিয়া সে কহিল—হাতে দিতে পারেন না! একে তো আনলেন দেরী করে!

তপন ফিরে তাকাইল না, ধীরে ধীরে যাইতেছে, মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে লোকটি?

—আমার মা'র পুষ্যি—তপতী সক্রোধে জবাব দিল। তপন কথাটা শুনিল তথাপি মুখ ফিরাইল না, চলিয়া গেল। তপতীর সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেছে। ফুলের তোড়াটা তুলিয়া লইয়া সে কাগজটা ছিঁড়িয়া ফিলিয়া সবেগে আসিয়া ঢুকিল খাইবার ঘরে, যেখানে মা তপনকে খাবার দিতেছেন। তোমার জামাই ফুল কিনে এনেছে দেখো, কতকগুলো ছেঁচরো ফুল, বাসি পচা—একটা বোকে বাঁধিয়ে আনতে পারেনি!

মা তাকাইয়া দেখিলেন, সুন্দর ফুলগুলি তপতীর হাতের আছাঁড় খাইয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। রাগিয়া বলিলেন, বোকে আনতে তো তুই বলিসনি খুকী, আর ফুল তো খুবই টাটকা।

-তোমার মাথা—এই ফুল নাকি বিলেত ফেরত লোককে দেওয়া যায়! বলিয়া তপতী

সরোষে প্রস্থান করিল।

মা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—মেয়েটা বড্ড রাগী বাবা, তুমি দুঃখ করো না কিছু! ফুলগুলো তোমার ঘরেই দিয়ে আসছি।

জলতরঙ্গের মতো সুমিষ্ট হাসিতে ঘর ভরাইয়া দিয়া তপন বলিল—ঐ ফুলগুলো আপনার পায়ে দিই মা, আমার বয়ে আনা সার্থক হবে।

মা কি বলে শুনিবার জন্য তপতী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তপনের কাণ্ড দেখিয়া সে শুধু বিস্মিত নয়, বিমূঢ় হইয়া গেল। এতবড় অপমানটা ও গায়েই মাখিল না। উহারই সামনে অন্য একজন পুরুষকে অন্যত্র বসাইয়া তপতী পরম যত্নে খাওয়াইতেছে, মা যার জন্য কত বকিলেন। বিলাত ফেরত লোকের টেবিলে তপন বসিবে না বলিয়া তপতী রক্ষা পাইয়াছে। সেই অন্য পুরুষের জন্য নির্বিকার চিত্তে তপন ফুল আনিয়া দেয়. সে-ফুল না লইয়া অপমান করিলে সেই ফুল দিয়াই অপমানকারীর মা'র পূজা করে। এতবড় বিস্ময় তপতীর জীবনে আর ঘটে নাই। লোকটা হয় সাংঘাতিক ধূর্ত্ত নয়তো সবসহিষ্ণু সন্ন্যাসী।

ঠাকুরদার কথাটা তপতীর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, "তোর যে বর হবে দিদি তার আর জোড়া মিলবে না" সত্যই, উহার জোড়া মিলিবে না। কিন্তু টাকা তাহা হইলে সে লইয়াছে কেন। দুই লক্ষ টাকা লইয়া সে কি করিবে? গরীবের ছেলে, দু'লাখ টাকা কৌশলে আদায় করিয়া লইল। আরো কিছু আদায়ের ফন্দীতে আছে, তাই এমন করিয়া অপমান সহ্য করে। ইহার পর আমরা তাড়াইয়া দিলেও যাহাকে ও সুখে থাকিতে পারে তাহারই জোগাড়ে ফিরিতেছে।

তপতীর ক্রোধ কমিতে গিয়া পরবর্তী চিন্তায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কত অপমান সহ্য করিতে পারে তপতী তাহা দেখিয়া লইবে, শেষ অবধি 'প্রহারেণ ধনঞ্জন' করিয়া ঐ বেহায়া ইতর লোকটাকে তপতী তাড়াইয়া দিবে—স্থির করিল।

মিঃ বোসের সহিত চা খাইয়া তপতী বেড়াইতে চলিয়া গেল মিঃ বোসের মোটরেই তপন কোনদিনই তপতীর সহিত বেড়াইতে যায় না, বৈকালিক জলযোগের পর সে আবার বাড়ি তৈরীর কাজ দেখিতে যায় বা একাই বেড়াইতে যায়। তপতী নিত্যই তাহার বন্ধুদের সহিত টেনিস খেলে কিম্বা বেড়াইতে যায়। কিন্তু মিঃ বোসের সহিত আজ একা বেড়াইতে যাওয়াটা মা পছন্দ করিলেন না। মিঃ বোস বা তপনের সাক্ষাতে তিনি কিছু না বলিলেও ঠিক করিয়া রাখিলেন, ফিরিলে তপতীকে তিনি ভর্ৎসনা করিবেন এবং যাহাতে আর না যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মিঃ বোসের পাশে বসিয়া গাড়ীতে বায়ু সেবন করিতে করিতে তপতী ওদিকে ভাবিতেছে, ঐ লোকটাকে অপমান করিবার কতরকম ফন্দি বাহির করা যাইতে পারে!

মিঃ বোস বলিলেন,—কি ভাবছেন মিস্ চ্যাটার্জি?

তপতী বলিল—হুঁ!

—হুঁ কি? এতো বেশী ভাবছেন যে কথাই শুনতে পাচ্ছেন না!

লজ্জিত হইয়া তপতী বলিল,—হাঁ ভাবছিলাম একটা কথা। চলুন, সিনেমা যাওয়া যাক!

তৎক্ষণাৎ গাড়ী আসিয়া একটা বড় রকম সিনেমা হাউসের গেটে ঢুকিল। উভয়ে নামিয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিল ভিতরে। অন্ধকার ঘরে বসিয়া ফন্দি আঁটিতে বেশ সুবিধা

হইবে। তপতী নিঃশব্দে চেয়ারে বসিয়া আছে। মিঃ বোস কিন্তু সিনেমা দেখার চেয়ে তপতীর নয়নানন্দকর রূপ দেখার ও শ্রবনানন্দকর কথা শোনার বেশী পক্ষপাতী, কহিলেন,—সিনেমা বিস্তর দেখে এলাম। ছায়া, কায়া, দুই-ই, ছায়া আর দেখতে ইচ্ছা করে না।

কায়াও তো বিস্তর দেখেছেন—সাদা, তুষার শুভ্র, তার প্রতি অরুচি জন্মালো না যে?

—জন্মেছে। তাই কাঞ্চনকান্তি দেখতে এলাম।

—এখানে তো সব তন্বীশ্যামা : কাঞ্চনকান্তি চান তো কান্যকুব্জে যান।

—সে আবার কোন্ দেশ? মিঃ বোস প্রশ্নের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

—জিওগ্রাফি দেখতে হবে, কারণ আমিও জানিনে।

—জেনে দরকার নেই—এখানেই—পেয়েছি কাঞ্চনকান্তি!

—পাশেই বুঝি?

তপতী নিজের দিকেই ইঙ্গিত করিল। মিঃ বোসের স্বপ্ন কি তবে সত্য হইবে! তপতী, তপস্যার ধন তপতী! মিঃ বোস তপতীর একখানা হাত নিজের হাতে ধরিয়া বলিলেন,—রিয়েলি আই হ্যাভ নো হোয়ার সিন সাচ্ এ বিউটিফুল গার্ল লাইক ইউ।

তপতী আপন ঠোঁটের সহিত ঠোঁট মিলাইয়া একটা মিষ্টি শব্দ করিয়া বলিল,—ও কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

—চির পুরাতনটাই চিরদিন সুন্দর মিস্ চ্যাটার্জি!

—তা নয়, চিরসুন্দরটাই চিরদিন পুরাতন। কারণ পুরাতন হলেও তা সুন্দর না হতে পারে কিন্তু সুন্দর হলেই তা আর পুরানো হয় না। যেমন এই পৃথিবী, ঐ আকাশ, ঐ সব গ্রহ-নক্ষত্র! ওরা পুরানো বলেই সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই চির নূতন।

মিঃ বোস তাঁহার বিলাতি বিদ্যায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—প্রেমের বাণী কি পুরানো নয়?

—প্রেমের বাণী সুন্দর বলেই পুরানো নয়—পুরানো হয় না।

—তাহলে আমার কথাটাকে আপনি পুরানো বলবেন কেন?

—ওটা আপনার প্রেমের বাণী নাকি? ওতো রূপমুগ্ধ পুরুষচিত্তের একটা স্তাবকতা! প্রেমের বাণী অমন হয় না।

—কি রকম হয় তাহলে?

—তা জানিনে, আজো শুনিনি কারো কাছে।

—সিনেমা শেষ হইয়া গিয়াছে। তপতী পুনরায় বলিল—সময়টা গল্পেই কাটলো, কিছুই দেখলাম না।

—কাল আবার আসবেন?

—দেখা যাবে বলিয়া তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাড়ি ফিরিতেই মা তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্পমতো তপতীকে বকিতে গিয়া দেখিলেন,—কাপড় না ছাড়িয়া তপতী বিছানায় বসিয়া আছে, দু'টি চোখে তাহার জল টলমল করিতেছে।

মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হলো মা, খুকু?

—"জানিনে—যাও"—বলিয়া তপতী শয্যায় লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিত বেদনাহত মা অনেকক্ষণ তপতীর মাথায় হাত বুলাইয়া আবার ডাকিলেন,—হয়েছে খুকী—আমায় বলতে তোর লজ্জা কি-রে?

—কিছু না মা, ঠাকুরদার কথা মনে পড়ছিল। বুড়ো আমায় বড্ডো ঠকিয়ে গেছে

ছিঃ মনি স্বর্গগত মহাপুরুষের নামে ও কথা বলতে নেই। কি হলো কি?

তপতী খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিল—তোমার শ্বশুর তোমা কাছে মহাপুরুষ, আমার ঠাকুরদা, যা খুশী বলবো ওকে।

উঠিয়া তপতী কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল। মা বলিয়া আসিলেন—কাপড় ছেড়ে খেতে আয় রাত হয়ে গেছে মা!

তপতী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিতে লাগিল—ঠাকুরদা বলিতেন তপতীর স্বা হইবে অদ্বিতীয় প্রেমিক, অদ্বিতীয় মানুষ, যাহার জন্য তপতী সহস্র প্রলোভনের ম আজও নিজেকে অনাঘ্রাতা রাখিয়াছে। সে কি ঐ ধূর্ত অর্থালোভীটার জন্য! জ্যোতি কোনদিন সত্য হয় না!

মানুষের মন এমনভাবে গঠিত যে নিজের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে সে ভয় পায়! মনে অজ্ঞাতসারে সে এড়াইয়া যায় তাহার দুষ্কর্ম্মগুলির অপরাধ অথবা আপনার দুর্বলতা দি সে সমর্থন করে তার কৃতকর্মকে। তপতী যদি তপনের প্রতি তাহার কৃত ব্যবহারের ক একবারও ভাবিত তাহা হইলে হয়ত বুঝিতে পারিত, দোষটা সবই তপনের ন অত্যাধুনিক হইতে গিয়া সে তাহার পূর্ব সংস্কৃতি তাহার চেতনা হইতে হারাই ফেলিয়াছে; আর তাহার অবচেতন মনে জাগিয়া রহিয়াছে বংশপরম্পরায় লব্ধ সংস্কা এই দুই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের সংঘাতে তপতী নিজের অজ্ঞাতসারেই হইয়া উঠি উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। তপনের মধ্যেও যে কিছুমাত্র ভাল থাকিতে পারে, ইহা যেন সে ভাবিতে চাহে না। ভাল কিছু না থাকিলেই সে যেন খুশি হয়। মা-বাবা উহাকে এত ভালবাসে তপতী যেন ঈর্ষায় জ্বলিয়া যায়। উহাকে ভালবাসিবার কোন কারণ নাই। বার কতক মা বলিয়া ডাকিলে আর যাত্রাদলের মার্কা দেওয়া বাহবা পাওয়া বুলি আওড়াইলে কাহারও ভালবাসা পাইবার যোগ্যতা জন্মে না। উহার আলাপ করিবার সঙ্গী একম মা—তা মা'র সহিত কিই বা কথা ও কয়? কথা কহিবার আছেই বা কি? যদি বা থা বাড়িতে তো সে সব মিলাইয়া আধ ঘণ্টার বেশী থাকে না, এমন কি রবিবারেও না। ত মধ্যে ছয় ঘণ্টা ঘুম।

টাকাটা লইয়া কি যে করিল, কেহ জানিতে পর্য্যন্ত পারিল না! ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া আর কি! কাল বাবা মা'কে বলিলেন—'টাকা নিয়ে কি করছে জানতে চেও না, মদ-ভ ও খায় না'। মদ-ভাং না খাওয়া ছাড়া টাকা খরচ করিবার যেন আর পন্থা নাই? আর খর বা করিবে কেন? ভবিষ্যতের জন্য করিতেছে। ও তো নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে, তপতী উহা তাড়াইয়া দিবে। তাই যতদূর সম্ভব সাবধানে কাজ গুছাইতেছে।

তপতী ক্লান্তি অনুভব করিতেছে। এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি সে আর কতদিন ভো করিবে। উহাকে তাড়াইয়া দিলেই তো সব লেঠা চুকিয়া যায় কিন্তু তাড়াইবার উপায় বাহি করা সহজ নহে।

তপন খাইতে বসিয়াছে। কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য তপতীও গিয়া খাইতে

বসিল। তপন মুখ নত করিয়া বসিয়াছে। মা জানেন, এখনো তপনের লজ্জা ভাঙে নাই, বলিলেন—তুই একটু পরে খাবি খুকী।

—কেন। আমি তোমার ছেলের কেড়ে খেতে যাব না। খিদে পেয়েছে আমার।

সন্তান ক্ষুধা পাইতেছে বলিলে কোন মাতা আর স্থির থাকিতে পারেন না, তথাপি মা ইতস্তত করিতেছিলেন। তপতী চাপিয়া বসিল—না খাইয়া যাবে না। অগত্যা তাহাকে খাবার দিলেন।

তপন খাইতে খাইতে বলিল—ও বেলা জল খেতে আসবো না মা।

কেন বাবা? কোথায় যাবে?—মা প্রশ্ন করিলেন!

—আমার সেই ছোট বোনটির বাড়ি—তাকে নিয়ে আজ সিনেমা যেতে হবে।

মা এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—খুকীকেও নিয়ে যাবে বাবা ;—খুকী প্রতিবাদ না করিয়া বসিয়া রহিল।

তপন বলিল,—তা কি করে হবে মা? আমার বোনের বাড়ি আপনার খুকী কি করে যাবে! কুটুম্বের বাড়ি তো বিনা নিমন্ত্রণে যায় না কেউ!

মাতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ বাবা, ও কথা আমার মনে হয়নি। কোন সিনেমায় যাবে? যাবার পথে হলে তুলে নিও ওকে!

—আমি ট্রামে যাবো মা, আর যাবো ও পাড়ার দিকে ; এ পথে মোটেই পড়বে না!

তপন চলিয়া গেল। তপতী খাইয়া উঠিয়া খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিল জ্যোতি গোস্বামী নামক জনৈক লেখকের লেখা একখানা বই ওখানে আজই প্রথম আরম্ভ হইবে। সেও স্থির করিল, ঐ সিনেমায় যাইবে।

বিকালে তিন চারজন বন্দু-বান্ধবী লইয়া তপতী আসিয়া দেখিল 'হাউসফুল' টিকিট না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় মিঃ ব্যানার্জি চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন,—তপনবাবু।

তপন মুখ তুলিয়া তাকাইল,—কিছু বলছেন?

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তপনের পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে! তপতীর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ঈর্ষায় বা ইতরতায়!

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমরা টিকিট পাচ্ছি না ; আপনার কেনা হয়েছে?

তপন জিজ্ঞাসা করিল,—ক'জন আছেন আপনারা?

—পাঁচজন—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তপন বলিল—এক মিনিট দাঁড়ান, দেখছি।

সকলেই উহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপন সেই মেয়েটির হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। মিনিট দুই পরে একজন সুদর্শন যুবক আসিয়া বলিল—আসুন আপনারা।

—টিকিট পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

তাহাদের সকলকে লইয়া গিয়া বক্সে বসাইয়া দিল বিনায়ক।

তপতীদের আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে। তপন কেমন করিয়া টিকিট কিনিতে পারিল? বোধ হয় ঘুষ দিয়া তপতীর সম্মান রক্ষা করিয়া থাকিবে। টাকা তো তাহারই বাবার ; কিন্তু সে নিজে বসিল কোথায়? নিজেদের টিকিটগুলিই উহাদিগকে দিয়াছে নাকি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া

অন্বেষণ করিয়াও তপন কিংবা সেই মেয়েটির কোন সন্ধান মিলল না। তপতীর ভয়ে মেয়েটাকে লইয়া পলাইয়া গেল নাকি!

মিঃ ব্যানার্জি তপতীকে বলিলেন,—তপনবাবুকে দেখছি না। পালিয়েছে নিশ্চয়!

তপতী শুধু বলিল হুঁ!

সিনেমা আরম্ভ হইল। একটি নারী-জীবনের বেদনার ইতিহাস স্বামী বঞ্চিতা ঐ দুর্ভাগিনী নারী স্বামী আসিবে ভাবিয়া নিত্য ফুলশয্যা রচনা করে অঙ্গনে আলপনা দেয়, পথের দুর্ব্বাকে চুম্বন করিয়া বলে,—আমার প্রিয়তম যেদিন আসিবে তোমার কোমল বুকে চরণ ফেলিয়া, সেদিন হে শ্যামল দুর্বাদল, তোমায় আমি শত চুম্বন দান করিব। তথাপি তাহার প্রিয় আসিল না, আসিল তাহার বাণী : "প্রিয়া, তোমার আমার মাঝখানে চোখের জলের নদীটি যুক্ত হল। তোমার আমার মাথায় একই আকাশ সেই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি এসেছো, শুধু চোখের জলটুকুর ব্যবধান। ঐটুকু থাক—তোমায় পরিপূর্ণ করে পেয়ে ফুরাতে চাইনে—তুমি থাকো না পাওয়ার আলোকে অফুরন্ত আশা হয়ে আমার মনের গহন গভীরে।"

তপতী বিমুগ্ধ চিত্তে দেখিল। তাহার রসগ্রাহী মন স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল কে এই রূপদক্ষ কবি?

প্রশ্নটার কেহই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ চিত্রলিপিতে লেখকের কোন পরিচয় নাই। কেন যে এই অদ্ভুত নাট্যকার নিজেকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করিলেন ; তপতী ভাবিয়া পাইল না।

বাড়ি ফিরিয়াই সে তপনের ঘরের দিকে চাহিল, তপন তখনো ফেরে নাই। কোথায় গিয়াছে সেই মেয়েটাকে লইয়া? খাইতে খাইতে সে, ভাবিতে লাগিল সিনেমার কথা।

তপন আসিয়া বাহির হইতে বলিল—খেয়ে এসেছি মা, আর কিছু খাব না।

তপতীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল। ওখানে রাত্রির খাওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া হয়! তপন চলিয়া গেলে তপতী জিজ্ঞাসা করিল—ওর কি রকম বোন মা, মা'র পেটের না পাতানো!

—নারে খুড়তুতো! মেয়েটা নাকি ছেলেবেলা থেকে ওর খুব নেওটা।

ওঃ! তপতী ঠোঁটের আগায় একটা বিদ্রূপধ্বনি তুলিয়া চলিয়া গেল আপনার ঘরে।

তপতীর জীবন যেরূপভাবে গাড়য়া উঠিয়াছে, তাহাতে আধুনিক সমাজের কোন ছেলের পক্ষে তাহার মন জয় করা সহজ নয়, আবার প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী কাহারো পক্ষে তপতীকে মুগ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কারের সঞ্চয়ন হইয়াছে তাহার জীবনে কিন্তু সমন্বয় হয় নাই। তাহার ঠাকুরদার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল একদেশদর্শী, প্রাচীন—আবার তাহার পিতার শিক্ষাপদ্ধতি একান্তভাবে আধুনিক। দুইটি শিক্ষাকে একত্র মিলাইবার ক্ষীণ চেষ্টা করিতেছেন তপতীর মাতা কিন্তু প্রগতিবাদের উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে তাহার বাঁধ বাঁধাইবার দুর্বল প্রচেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছে। যেটুকু তিনি করিয়াছেন, তাহার ফল হইয়াছে বাধাপ্রাপ্ত জলস্রোতের মতো আরো উদ্দাম। চিন্তার সমুদ্রে তপতী আছাড় খাইয়াছে এ কয়দিন। তপনকে নানাভাবে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছে, আবার ভাবিয়াছে ; তাড়াইয়া কাজ নাই তপন তো তপতীর কোন ক্ষতি করে না।

কিন্তু সেদিন সিনেমায় একজন সুন্দরী নারীর সহিত তপনকে দেখার পর হইতে

তপতীর মনে আগুনের জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। ঐ মেয়েটা উহার আপন বোন নয়, হয়তো কেহই নয়, মিথ্যা করিয়া বোন বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। না হোক, তপতী তার জন্য ঈর্ষা করিবে না, ঈর্ষা করিবার কারণও নাই। তপন যে-চুলোয় খুশী যাইতে পারে কিন্তু তপতী তাহার নিজের বাড়িতে বসিয়া তাহার পিতার জনৈক অন্নদাসের নিকট এ অপমান সহ্য করিবে না। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য সে তপনকে সাংঘাতিক অপমান করিবার সঙ্কল্প করিল।

কি মতলবে যে সে এখনো এখানে বাস করিতেছে তাহা বোঝা তপতীর বুদ্ধির বাহিরে, কিন্তু মতলব তাহার যে একটা কিছু রহিয়াছে তাহা তপতী বুঝিতে পারিতেছে। টাকা সে লইয়াছে, এবার তো অনায়াসে সরিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু আরো টাকা আদায় করিবার জন্যই সে আছে নিশ্চয় অথবা ধীরে ধীরে তপতীর মনকে জয় করিতে চায় সে। সে মতলব যদি উহার থাকে তবে তপতী যেমন করিয়াই হোক উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবে। তপতীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। সে আসিয়া ফোন করিল মিঃ বোসকে। তাহার সহিত তপতী বেড়াইতে যাইবে আজ। মিঃ বোস কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিলেন ; সুসজ্জিত তপতী তাঁহাকে নীচের তলায় অভ্যর্থনা করিল, ইচ্ছাটা, তপন এখনি জলযোগের জন্য বাড়ি ফিরিয়া তপতীকে মিঃ বোসের সহিত একাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর একবার অপমানিত হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরও তপন আসিল না দেখিয়া তপতী ও মিঃ বোস বাহিরে চলিয়া গেল মিঃ বোসেরই গাড়ীতে।

রাত্রি প্রায় দশটায় তপতী স্বয়ং মিঃ বোসের গাড়ী চালাইয়া বাড়ি ফিরিতেছে, মিঃ বোসও পাশে বসিয়া আছেন—তপতী দেখিল গেটের নিকট দারোয়ানগুলোর সঙ্গে তপন কি কথা বলিতেছে। গাড়ীর হর্ণ না দিয়াই তপতী চলিয়া যাইবে কিন্তু তপন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে পাইল না। মিঃ বোস তপনকে উদ্দেশ্য করিয়া ধমক দিলেন,—রাস্তায় দাঁড়ান কেন? 'ইডিয়ট'।

তপন বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল এবং তৎক্ষণাৎ পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া দারোয়ানগুলো পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তপতী গাড়ীটা চালাইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—'ইডিয়ট' মানেই ও জানে না মিঃ বোস—অনর্থক গলা ফাটাচ্ছেন।

তপন নীরবে, নতমুখে প্রায় সাত মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল সেইখানেই স্থাণুবৎ। চলৎশক্তি তাহার যেন থামিয়া গিয়াছে। তপতী মিঃ বোসকে এক কাপ কোকো পান করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভিতরে লইয়া গেল, তপন তাহাও দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া উপরে উঠিল, ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহভার বহন করিয়া।

তপতী মিঃ বোসকে কোকো খাওয়াইয়া বিদায় করিল। মার কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন,—তপন এখনো এলো না কেন রে, জানিস?

—এসেছে তো।—বলিয়া তপতী মার পানে চাহিল হাসিমুখে।

মা ভাবিলেন, হয়তো উহারা একসঙ্গেই বেড়াইতে গিয়াছিল। তিনি তপনের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে এসো!

—আজ কিছু খাব না মা—লক্ষ্মী মা, আপনি জেদ করবেন না, বড্ড ক্লান্তি লাগছে—শুয়ে পড়েছি!—তপন উত্তর দিল।

—সে কি বাবা! একটু দুধ মিষ্টি?—মা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিলেন।

—না মা, না—আজ কিছু না—আমায় শুতে দিন একটু! তপনের স্বর এত করুণ যে মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তপতীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝগড়া টগড়া কিছু করেছিস খুকী?

—আমার অত দায় পড়েনি! আমি খেয়ে এসেছি 'ফারপো'তে। আজ আর খাব না কিছু—বলিয়া তপতী চলিয়া গেল।

মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিলেন। শেষে তিনি নিজের মনকে বুঝাইলেন, হয়তো তপন কিছু খাইয়া থাকিবে। আজ তাহার 'সাবিত্রী ব্রত' বলিয়া সারাদিন তপন উপবাসী আছে, রাত্রে ফল মিষ্টি খাইবে ভাবিয়া মা সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু খুকী হয়তো দোকানেই কিছু ফল মিষ্টি খাওয়াইয়াছে—না হইলে খুকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত!

তপতী এতক্ষণ ভাবিতেছিল—আজ সে তপনকে চরম অপমান করাইয়াছে। ইহার পরও যদি সে এ বাড়ি না ছাড়ে তবে তপতী আর কি করিতে পারে! মিঃ বোস অবশ্য জানেন না তপনের সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কি। তিনি উহাকে একজন পোষ্য মনে করিয়া এবং তপতী উহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না জানিয়া তপতীর প্রীত্যর্থেই উহাকে 'ইডিয়ট', বলিয়াছেন। তপতী বেশ কৌশলেই মিঃ বোসকে দিয়া তপনকে অপমানটা করাইয়া লইল। অন্য কেহ, যাহারা তপনের সহিত এ বাড়ির সম্বন্ধে অবগত আছে, তাহারা সাহস করিত না। তপন নিশ্চয়ই ইহার পর চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তপনের সহিত মা'র কথাগুলি তপতী শুনিয়াছে। লোকটা খাইল না কেন। তপতীর এবং মি বোসের কৃত অপমানের প্রতিকারের জন্য সে অনশন আরম্ভ করিল নাকি! আশ্চর্য্য নয়! তপন যে আজ সমস্ত দিনই খায় নাই, তপতী সে সংবাদ অবগত নয়! তপন অনশন আরম্ভ করিয়াছে, অন্ততঃ আজ রাত্রে কিছু না খাইয়া তপতীকে বুঝাইয়া দিতে চায় যে, সে অপমানিত হইয়াছে। ঐ ভণ্ড প্রবঞ্চক মনে করিয়াছে, তপতী ইহাতে ভয় পাইয়া যাইবে। না, তপতী ভয় পাইবে না। কাল সকালে যদি সে মা-বাবার নিকট সব কথা প্রকাশ করে তাহাতেও তপতীর ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। বরং সে ভালই হইবে! মা ও বাবাকে তপতী উহার স্বরূপ চিনাইয়া দিবে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া তপতীর মনে হইল,—মিঃ বোস যখন জানিবেন, তপতীর সহিত ঐ লোকটির সম্বন্ধ কি, তখন তপতীকে তিনি কি মনে করিবেন? ভালই মনে করিবেন। একান্ত অনুপযুক্ত ভাবিয়া তপতী উহাকে অপমান করিয়াছে। কিন্তু মা-বাবা যদি খুব বেশী চটিয়া যান। মা তো নিশ্চয়ই চটিয়া যাইবেন। আজই যদি তপন বলিয়া দিত, কি কারণে সে খাইল না, তাহা হইলে মা হয়ত এখনি একটা অনর্থ ঘটাইতেন। কিন্তু কেন সে কিছুই বলিল না? এখনো কি এই বাড়িতে থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করে! নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে তপতীর ভাল নিদ্রা হইল না।

সমস্ত রাত্রি আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তপন সকালে স্নান করিয়া পূজায় বসিল। দারুণ অপমানে মনটা তাহার বিকল হইয়া গিয়াছে, ধ্যানে মনঃসংযোগ হইতেছিল না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে পূজা শেষ করিয়া সে উঠিল এবং বাহিরে যাইবার বেশ না

পরিয়াই দরজা খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, তপতী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে স্নানসিক্ত চুলগুলি পিঠে ছড়াইয়া। তপনের ঘরের এত কাছে তপতী কোনদিন আসে নাই। তপন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি তপতী কিছু বলে। আশা এবং উদ্বেগে তাহার অন্তর আন্দোলিত হইতেছে।

—দেখুন মশাই—তপতী সরোষে কহিল,—এ বাড়িতে থেকে ওসব 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ফাইক' করা চলবে না। ওসব করতে হলে যেখানকার মানুষ সেখানে যান—

তপন দুই মুহূর্ত্ত বিমূঢ় হইয়া রহিল, তারপর কিছু না বলিয়াই খাইবার জন্য মা'র কাছে চলিয়া গেল। তাহার কথাটাকে এভাবে অগ্রাহ্য করার জন্য তপতীর মন উত্তপ্ত লৌহের মতো অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তপনকে খাইবার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া সে ভাবিল, হয় সে সেখানে গিয়া মা'কে সব কথা বলিবে, না হয় নির্ব্বিবাদে খাইবে। কি করে দেখিবার জন্য তপতীও তৎক্ষণাৎ খাইবার ঘরে আসিল। তপন মুখ নামাইয়া একটা চেয়ারে বসিতেই মা বলিলেন,—এসো বাবা, কাল সারা দিনরাত উপোস আছ।

—দিন মা, এবার খেতে দিন কিছু ফল মিষ্টি—নির্লিপ্তের মতো জবাব দিল!

মা তাঁহাকে ফল মিষ্টি আগাইয়া দিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন,—সাবিত্রী ব্রত তো মেয়েরা করে বাবা, তুমি কেন করেছ?

—ব্রতটা আমার মা করতেন, উদযাপনের আগেই তিনি স্বর্গে যান মা, তাই আমি শেষ করে দিচ্ছি। শাস্ত্রে এ রকম বিধান আছে!

—ও! আজো ভাত খাবে না বাবা?

—না মা—ফল জল খাবো—ভাত খাবো কাল।

তপতী বসিয়া চা খাইতেছিল। তপনের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। অপমানিত হইয়া সে তবে অনশন করে নাই, তাহার ব্রত পালনের জন্যই করিয়াছে! কিন্তু গত রাত্রে নিশ্চয়ই কিছু খাইবে বলিয়াছিল, না হইলে মা তাহাকে ডাকিতে যাইবে কেন? রাত্রের না খাওয়াটা নিশ্চয় তপতী ও মিঃ বোসের উপর রাগ করিয়া। কিন্তু মা'কে তো কথাটা সে বলিয়া দিতে পারিত। না-বলার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে গভীরতম উদ্দেশ্য—টাকা আদায় করিবার মতলব, তাহা হাসিল করিতে হইলে তপতীকে চটানো চলে না, এ বাড়ি ছাড়া চলে না, মা বাবাকে বলা চলে না যে তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না! ভাল, তপতী নিজেই মা ও বাবাকে জানাইবে—ঐ অর্থ-লোভী মতলববাজ গণ্ডমূর্খটাকে তপতী কোন দিন স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

এখনি তপতী সে-কাজটা করিতে পারিত, কিন্তু লোকটা কাল থেকে উপবাসী আছে এখনি একটা হাঙ্গামা করিবার ইচ্ছা সে কষ্টেই দমন করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল!

—আচ্ছা দাদা, তুমি তো এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারো।

—না ; শিখা, নেতার কাজ অতো সোজা নয়। মনে করলেই নেতা হওয়া যায় না।

—তা হলে নেতার লক্ষণ কি দাদা, কি দেখে চিনবো?

—নেতার ডাক হবে দুর্বার—ইরেজিস্টিবিল্। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে ব্রজগোপীরা যেমন কূল-মান বিসর্জ্জন দিয়ে ছুটে যেতো, নেতার ডাক হবে তেমনি।

—কোথায় সে নেতা পাবো দাদা?

—সেজন্য চিন্তা নেই বোনটি—যেদিন তোরা মানুষ হবি, সেদিন নেতাও আসবেন। মানুষের নীতিকে আজ যারা পদদলিত করছে, স্বেচ্ছাচারিতায় আজ যারা বনের পশুকে হারিয়ে দিচ্ছে, তাদের জন্য পাশব-শক্তিব আবির্ভাব পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু বহু যুগ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেও পশ্বেতর প্রাণী এই মানব আজো পশুধর্ম ছাড়তে পারলো না। এই পশুধর্মকে যিনি জয় করতে পারবেন, তিনি হবেন সেই নেতা!

পশুধর্ম একেবারে কি করে ছাড়া যায় দাদা—মানুষ তো পশুও!

—না শিখা, "প্রাণীও" বলতে পারিস। প্রাণধর্ম তো তাকে বিসর্জন দিতে বলা হচ্ছে না। প্রাণকে মহান করতে, বিশাল করতে বলা হচ্ছে। শিখা! আমি কতকগুলো কঠোর নিয়ম পালন করি ; দেখে হয়তো তোরা ভাবিস—দাদা তোদের গোঁড়া। কিন্তু ভেবে দেখেছিস কি—পশুর কোন বাঁধা-ধরা নীতি নেই। উদর পালনের প্রয়োজনই তার নীতি। তাছাড়া অন্যনীতি যদি কেউ পালন করতে পারে তো সে মানুষ। "সত্য কথা নিশ্চয় বলবো" এই প্রতিজ্ঞা মানুষই করতে পারে। "হিংসা করবো না"—এ নীতি মানুষেরই পালনীয়। ঈশ্বর বলে কেউ থাকুন আর নাই থাকুন—প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি দিয়েছেন,—যে কল্যাণকারী বুদ্ধিটুকু দিয়েছেন, মানুষ কেন তাকে ব্যবহার করবে না, বলতে পারিস?

শিখা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিনায়ক আসিয়া বলিল,—তোমাদের ভাই-বোনের গল্প তো আর শেষ হবে না, এদিকে রান্নাকরা খাদ্য সব ঠাণ্ডা মেরে যাচ্চে, আর পেটের খিদে গরম হয়ে উঠেছে।

শিখার দুটি চোখ দরদে ভরিয়া উঠিল,—ওঃ! এত খিদে পেয়েছে আপনার? তো ডাকলেই পারতেন আমাদের! চলুন চলুন!

তপন হাসিয়া বলিল,—না কহিতে ব্যাথাটুকু পার না বুঝিতে?

—যাও বলিয়া শিখা প্রায় ছুটিয়াই পলাইতেছে, তপন তাহার বেণীটা ধরিয়া আটকাইয়া ফেলিল, তারপর বলিল,—মিতা পাতিয়েছিস যে,—কি রকম মিতা তাহলে। খিদের সময় বুঝতে পারিস নে?

—আমি দাদারই খিদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তা মিতা।

—তা হলে ওকে আর এক ডিগ্রি প্রমোশন দে ভাই শিখা। ও খিদে মোটেই সইতে পারে না!

—মানে? কোন ক্লাসে প্রমোশন।

—মিতার উপরের ক্লাসে?

শিখা হাসিতে গিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, বিনায়ক হাসি চাপিতে গিয়া অত্যধিক গম্ভীর হইয়া গেল এবং তপন ভাতের হাঁড়িটা লইয়া পাতায় ভাত পরিবেশন করিতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইলে শিখা বলিল—তুমি দিল্লী কি জন্যে যাবে দাদা। কদিন দেরী করবে সেখানে?

—দিন দশ মাত্র। কি জন্যে যাবো সেটা এখন নাই শুনলি ভাই?

—তুমি বড্ড কথা লুকিয়ে রাখ দাদা। শুনলাম তো কি হলো ক্ষতিটা।

—প্রকাশ করে ফেলতে পারিস সেটা আমি চাইনে। কাজে সিদ্ধিলাভ করে অন্যের

মুখে সুযশ শোনা আমার শিক্ষা বোনটি! তবে মনে রাখ—মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জির স্নেহঋণ শোধ করবার জন্যই যাচ্ছি।

শিখা আর অনুরোধ করিল না, কিন্তু মনটি তাহার অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিল দেখিয়া তপন তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কহিল,—আমি নাইবা রইলাম রে, যার হাতে তোকে দিচ্ছি সে তোর অযোগ্য হবে না।

—কিন্তু সেদিনটিতে আমি তোমার আশীর্বাদ পাবো না দাদা। আর কারো আশীর্বাদে তৃপ্তি হবে না আমার।

—আশীর্বাদ আজও করছি আবার ফিরে এসেও করব। আর যতকাল বাঁচবো করবো। তোদের কল্যাণ কামনাই যে আমার জীবনের ব্রত শিখা। এই বিশাল পৃথিবীতে তুই, মীরা আর বিনায়ক ছাড়া আত্মীয় বলতে তো আমার আর কেউ...

তপন থমিয়া গেল। অসহনীয় ব্যথায় কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সংযমী তপন আত্মসংবরণ করিল কিন্তু শিখার নারীহৃদয় এ বেদনা সহিতে পারিল না, দরদর ধারায় তরল মুক্তাবিন্দু তাহার দুই গণ্ডে ঝরিয়া পরিল। বিনায়ক নীরবেই এই শোকাবহ দৃশ্য অন্যদিন দেখিয়াছে, আজো দেখিল নীরবেই।

আত্মসম্বরণ করিয়া শিখা বলিল.—তপতীর আশা কি তুমি তবে ছেড়েই দিয়েছো দাদা?

—প্রায় ; কারণ সে অন্য কাউকে ভালবাসে কি না আমি জানিনে, তবে আমায় সে গ্রহণ করবে না, এটা বহু প্রকারে জানিয়ে দিয়েছে!

---কিন্তু দাদা, তুমি সেখানে যে ভাবে থাকো. যে ছদ্মবেশে সে তোমায় দেখেছে, তাতে তার মতো একজন শিক্ষিতা তরুণীর পক্ষে তোমাকে স্বামী স্বীকার করা কঠিন তো?

—আমি তো বলছিনে শিখা, যে সহজ। কঠিন নিশ্চয়ই। তবে সেটাও সম্ভব, যদি সে আজো অনন্যপরায়না থাকে। আছে কি না জানবার জন্য আমি এত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছি। এত অপমান সহ্য করছি। আমি যদি আজ আত্মপ্রকাশ করি, তাহলে তো নিশ্চয়ই সে আমায় গ্রহণ করবে কিন্তু তাতে সে পূর্বে আর কাউকে ভাল বেসেছে কি না, তা আর আমার জানা হবে না।

—তা যদি বেসেই থাকে দাদা, তাহলে কি তুমি ওকে গ্রহণ করবে না?

—নিশ্চয় না। আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই। শিখা, আমি কোনো মানবীকে আমার সহধর্ম্মিণীর আসন দিতে চাই, যে মানবী শুধু দেহধর্ম্মিণী নয়। এর জন্য যদি শত জন্মও আমার একক জীবন কাটাতে হয়, সেও ভালো।

শিখা নীরবে তপনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—মিঃ বোসকে দিয়ে তোমায় অপমান করালো এরপর তোমার আর কিসের সন্দেহ দাদা—ছেড়ে দাও ও-বাড়ি।

দেরী আছে ভাই। মিঃ বোসকে দিয়ে আমায় অপমান করানোর জন্য কারণও থাকতে পারে, এমন কি, সে আজো নির্ম্মল আছে ঐটাই তার একটা বড় প্রমাণ।

—তা হলে আরও পরীক্ষা তাকে করবে?

—আমি কিছুই করবো না শিখা, যা-কিছু করবার সেই করবে! আমি শুধু জানতে চাইছি, কাকে সে চায়। তা যদি না জানতে পারি তাহলে ওর মা-বাবের কাছে পাওয়া

স্নেহের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ আমি শোধ করে যাবো—তারই জন্য দিল্লী যাচ্ছি!

তপন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—শিখা, এই দেশের মেয়েরাই স্বামীর নিন্দা শুনে মৃত্যু বরণ করেছে, মৃত স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে দেশে দেশে ফিরেছে, গলিত কুষ্ঠ স্বামী কাঁধে করে বয়ে বেড়িয়েছে,—আধুনিকতা তোরা ; অতটা বাড়াবাড়ি না-হয় নাই করলি! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কারো ভাগ্যে যদি মূর্খ স্বামীই জোটে তো, তাকে কি স্নেহের সুরে একটা কথাও বলবি নে? বন্ধু দিয়ে অপমান করে তাড়াবি? তার চেয়ে নিজেই কি বলা উচিত নয়, 'তুমি চলে যাও, আমি তোমায় চাইনে।' তপতী যদি বলতো, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, তাহলে আমি আনন্দে তাকে তার প্রিয়তমের হাতে তুলে দিতাম। আজো তারজন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি আমি, শিখা—কিন্তু তপতীর মনের খবর জানবার সুযোগ আমার খুবই কম। ওর মা-বাবাকে কথাটা জানালে তাঁরা অত্যন্ত আহত হবেন, তাই নিজেই সহ্য করছি। দুঃখ আমি বিস্তর সহ্য করেছি। এটাও সইতে পারবো—তোরা সুখে থাক...

তপন চলিয়া গেল—শিখা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তপতী নির্বাক হইয়া চাহিয়াছিল কার্ডখানার দিকে, শিখায় বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। তপতী এবং তপন দুজনকেই এক পত্রে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তপতীর গাত্রদাহ হইতেছিল ঐ ইতর লোকটার সহিত তাহার নাম যুক্ত হইতে দেখিয়া। কিন্তু নিরুপায় নিষ্ফল গর্জন ছাড়া তপতী আর কি করবে। সৌভাগ্য এই যে তপতী সেদিন এখানে থাকিবে না, দিল্লীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কালই তারা যাত্রা করিবে।

তপতী নীচে আসিয়া বসিল বন্ধুদের অপেক্ষায়,—অনেক কিছু আয়োজন করিবার আছে তাহাদের। মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল, রেবা সিকতা, শৈলজা ইত্যাদি আসিয়া পৌঁছিল।

রেবা বলিল,—বন্ধুর বে'তে থাকবি নে তুই? কেমন ছেলে রে? তুই জানিস?

তপতী অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—জানার দরকার? সে যখন আমায় ছাড়তে পেরেছে তখন আমিই-বা না পারবো কেন?

—ঠিক কথা। তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হচ্ছে, জানতে ইচ্ছে করে।

—জেনে আয় গিয়ে। নাম তো দেখলাম বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তপতী একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই মোচন করিল।

মিঃ ব্যানার্জি তাহার কথাটা ধরিয়া বলিলেন,—বিলেৎফেরত নাকি ; করে কি?

—জানিনে—বলিয়া তপতী অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিজের দুর্ভাগ্য আজ তাহাকে অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত করিতেছে! তপতী বুঝিতেছে, ইহা অন্যায় ; কিন্তু তাহার আয়ত্তের বাহিরে। নিজের মনের এই শোচনীয় অধোগতি আজ তপতীকে ব্যথা দিল না, বিষাক্ত করিয়া দিল। তাহার যত কিছু জ্বালা তপনের সর্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে পারিলে তপতী যেন কতকটা জুড়াইতে পারে।

মিঃ অধিকারী বলিলেন—লোকটা ব্রাহ্ম, না হিন্দু, না খৃষ্টান? জানেন?—হিন্দুই হবে বোধ হয়—শিখা কি আর অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করবে! ওর যা হিন্দুয়ানী স্বভাব! ওর বাবা তার উপর যান। আর মা যান তারো উপরে।

রেবার কথাকটি শুনিয়া সকলেই হাসিল, হাসিল না শুধু তপতী ; গম্ভীর মুখে খানিক বসিয়া থাকিয়া কহিল,—ভালই। শিখা হচ্ছে আর্যনারী।

—কেন? আমরাও তো আর্যনারী—আমরাই বা সতীর কম কি? রেবা কহিল।

—বেফাঁস কথা কেন বলিস রেবা—সতীত্বের মানে বুঝিস?

তপতীর উষ্ণ কথায় সবাই চুপ হইয়া গেল। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন---আমরাও জানিনে সতীত্বের মানে ; আপনি যদি বলেন দয়া করে? শুনে ধন্য হই।

—জানেন—কোন কালে কেউ সতী ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—কেন? সীতা সাবিত্রী, বেহুলা,—রেবা ত্বরিতে কথাটা বলিয়া তপতীর মুখের দিকে চাহিল।

কলহাস্যে তপতী ঘর ভরাইয়া দিয়া বলিল,—থাম্ থাম—সীতার মতন বোকা মেয়ে পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। আর সাবিত্রী তো এক নম্বর পলিটিসিয়ান্, আর নির্লজ্জ বেহুলার কথা বলতে ইচ্ছে করে না, একটা ফাষ্ট ক্লাস ককেট। নাচ্‌নী সেজে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফিরে এল!

সবাই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন,—সীতা বোকা, কিসে প্রমাণ হয়?

—বরাবর। প্রথম, রাবণের মতো একটা পশুপ্রকৃতির লোককে অত রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও সীতা খেলাতে পারেনি ; অশোক বনে পড়ে পড়ে মার খেলো। তারপর আগুনে পুড়ে পরীক্ষা দিয়ে নিজের আত্মার করলো অপমান। রাণী তুই না-হয় নাই হতিস বাপু, তাবলে পরীক্ষা দিবি কিসের জন্য! তিন নম্বর বোকামী তার পরের কথায় তার নিষ্ঠুর স্বামী তাকে দিল বনবাস, আর সে দিব্যি বনে চলে গেল! কেন? সেও তো একজন প্রজা, বিনা অপরাধে তার শাস্তি সে কেন মেনে নিলো?—কেন বিচার চাইল না? তাতে সে স্বামীকেও স্বধর্মের পথে চালনা করতে পারতো! সতী হবার কাঙালপনায় ঐ মেয়েটা নারীত্বের চরম অপমান ঘটিয়েছে। চতুর্থ দফায় সে করলো পাতাল প্রবেশ! আত্মহত্যার আর ভালো উপায় তখনকার দিনে ছিল কিনা আমার জানা নেই—পটাসিয়াম সায়নাইড্ তখনো বার হয়নি, কিন্তু আত্মহত্যা ও করলো কেন? এই কাপুরুষত্ব আই মিন কা-নারীত্ব—সবাই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তপতী ধমক দিয়া কহিল,—থামুন হাসি কেন অত? এই কা-নারীত্ব আমি কিছুতেই সমর্থন করিনে। সীতার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো তাহলে রামের গড়া সোনার সীতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে বলতে-পারতো, আমি পরীক্ষাও দেব না আত্মহত্যাও করবো না। তুমি আমায় বিয়ে করেছে বনে যদি যেতে হয়, চল দুজনেই। তোমার বোকামীর জন্য আমার একা কেন শাস্তি হবে? তুমি গিয়েছিলে কেন সোনার হরিণ ধরতে? কেন তুমি রাবণের বাড়ি থাকার সময়েই আমায় আত্মহত্যা করতে বলনি? কেন তুমি অগ্নি পরীক্ষাটা এখানেই এনে করলে না? কেনইবা তুমি বিনাবিচারে আমায় বনে পাঠালে? নিজে যেমন তুমি নির্বুদ্ধিতা করে একটা বুড়ো স্ত্রৈণ লোকের কথা রাখবার জন্য বনে গিয়েছিলে তেমনি কি সবাই বোকা নাকি? কিন্তু সীতা এত বোকা ছিল আর ছিল সতীত্বের নামে কাঙাল যে এ-সব কথা ওর মাথায় একদম ঢোকেনি।

আলোচনাটা অত্যন্ত সরল এবং উপভোগ্য ভাবিয়া মিঃ অধিকারী কহিলেন,—আচ্ছা, —সাবিত্রী সম্বন্ধে কি আপনার বক্তব্য?

—সি ওয়াজ এ গ্রেট পলিটিসিয়ান্। সাবিত্রী সতী কিনা বলতে পারি না, তবে সীতার চেয়ে সে হাজারগুণ বুদ্ধিমতী। যম রাজার মতো ঘড়িয়াল লোককে সে সাতঘাটের জল খাইয়ে দিল! নারীত্বের সম্মান সে কিছুটা রেখেছে, এই জন্য ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। দেখুন না রাজার মেয়ে তো, চেহারা নিশ্চয় ভাল ছিল, যম রাজাও এসে গেছে, আর সাবিত্রী আরম্ভ করেছে নানারকম কথার প্যাঁচ। পুরুষমানুষের মাথা ঘুলিয়ে দিতে কতক্ষণ! শেষ যখন বললো, তার একশ' ছেলে চাই, তখন যম ভাবলো আহা বেচারা, এই বয়সে সেক্স-আকাঙক্ষাটা মিটোবার বায়না ধরেছে, অস্বাভাবিক তো কিছু নয়! দিয়ে দিলো বর। সাবিত্রী যে পলিশি করে ওর প্রার্থনার মধ্যে "সত্যবানের দ্বারা" কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, রূপমুগ্ধ যমের তখন আর সেদিকে খেয়াল নেই! কেমন কৌশলে বর নিল বলুন তো? একশ' ছেলে, বছরে একটা হলেও স্বামী তার অন্তত একশ' বছর বাঁচবে। ছেলের আর কিছু দরকার ছিল বলে তো মনে হয় না, দরকার যা ছিল তার সে ঠিক আদায় করে নিয়েছে। এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে যদি সতী বলা চলে, তাহলে অবশ্য সাবিত্রী সতীই।

মিঃ—সান্যাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বেহুলার কথাটাও বলুন একটু—

—ও আর বলে কাজ নেই। ও যখন দেখলো যে দেবতারা তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারে তখন সেখানে গিয়ে নাচ গান যা কিছু করা দরকার, করে স্বামীর জীবনটাকে ফিরিয়ে নিল, আধুনিক যেসব মেয়েকে চাঁদা আদায় করতে পাঠানো হয়, বেহুলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের ককেট।

তপতীর প্রত্যেক কথা হাস্যোদ্রেক করিলেও তাহার চিন্তাশীলতার গম্ভীরতা অন্যান্য সকলকে অভিভূত করিতেছিল, হাসিতে গিয়াও তাহারা ভাবিতেছিল, তপতীর চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে বহিয়া চলে। আর তপতী ভাবিতেছিল, ভারতের চিরবরেণ্যা কয়জন মহামানবীর চরিত্রের যে সমালোচনা সে আজ করিতেছে, তাহা শুনিলে তাহার ঠাকুরদা হয়তো মূর্চ্ছা যাইতেন। তপতীর মনে বেশ একটা তীব্র সুরার আনন্দ অনুভূত হইতেছে। ঠাকুরদার মৃত আত্মা যদি কোথাও থাকেন তো শুনুন, তাঁহার নাতনী ঠাকুরদার চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে!

মিঃ সান্যাল এবার বেশ জোরে হাসিয়া কহিলেন,—আপনার অভিধানে তাহলে সতী কথাটা নেই, কেমন?

—থাকবে না কেন? 'সৎ' কথাটার স্ত্রীলিঙ্গ 'সতী'! কিন্তু সৎ কাকে বলে তা বুঝতে হলে অভিধান দরকার। ঠাকুরদা বলতেন সৎ চিরস্থায়ী আর অপরিবর্তনীয়, কিন্তু এরকম কোন কিছু আমি তো খুঁজে পাইনে। ভগবান যদিবা থাকেন তো তিনি দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে পরিবর্তিত হন, অর্থাৎ তিনি নেই, আছে মানুষের কল্পনা যার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী!

—ভগবান না থাকাই ভালো, অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। আর থেকেই বা উনি কি করছেন আমাদের?—কথাটা বলিয়াই মিঃ ব্যানার্জি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—তাঁর থাকার ভয়ানক দরকার, নইলে মানুষ তার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তিগুলো দেবে কাকে? চৈতন্যের মতন খোল বাজিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি কেবল ঐ নির্বিকার ভগবান সইতে পারেন। ঐ তাণ্ডব কোন মানুষের উপর চালালে সেও যে নির্বিকার পাথর বনে যাবে। তপতীর কথায় আবার সকলে হাসিয়া উঠল।

অকস্মাৎ তপতীর ঠাকুরদার হাতে-গড়া মন চীৎকার করিয়া উঠিল : এ সত্য নয়,

তপতী আত্মবঞ্চনা করিতেছে। নিজেকে সংশোধন করিবার জন্যই যেন সে বলিয়া উঠিল,—ঐ নির্বিকার ভগবান আছে, ও থাক্—ওকে মানুষের বড় দরকার। যে কথা নিজের কাছেও বলতে মানুষ কুণ্ঠিত হয়, সে কথাও ওর কাছে বলে খানিকটা হাল্কা হওয়া যায়। জীবনে এমন দুঃসময় আসে, যখন একটা অচেতন কিছুকে চেতন ভেবে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলতে ভাল লাগে, ভালো লাগে নিজের আরোপিত স্নেহকেই তার কাছ থেকে ফিরে পেতে। নিজের ক্ষুদ্রতাকে মানুষ নিজের কল্পনায় বিশালতার মধ্যে অনুভব করতে চায়!—তপতী কথাগুলো বলিয়া যেন দম লইতেছে।

—তা হলে ভগবানকে মেনে নিলেন আপনি?—মিঃ ব্যানার্জি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

—মানা মা-মানায় ওঁর কিছু এসে যায় না, ওঁকে দরকার হলে ডাকবো, না-হলে ডাকবার দরকার নেই, এমন সুবিধার জিনিস না ত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ। চলুন এখন সব গোছগাছ করে নিতে হবে।

তপতী উঠিল এবং বাধ্য হইয়া অন্য সকলেও উঠিল।

পরদিন বিকালের ট্রেনে তপতীদের দল মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া যথাসময়ে হাওড়ায় পৌঁছিয়া রিজার্ভ ফার্ষ্ট ক্লাসের দুইটি কক্ষে স্থান গ্রহণ করিল। ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় তপন একজন কুলির মাথায় সুটকেশ ও বেডিং লইয়া তপতীদের কামরার সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—তপনবাবুও যাচ্ছে নাকি?

তপতী লক্ষ্য করে নাই ; মিঃ ব্যানার্জির কথায় চাহিয়া দেখিল, তপন যে গাড়িতে উঠিতেছে, তাহার দরজাটায় একটা বড় অক্ষরের 'তিন' নম্বর।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—কি রকম! থার্ড ক্লাশে যাচ্ছে যে?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বিস্ময় ও লজ্জায় তাহার মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যালকে কহিল,—ও যে আমাদের কেউ, একথা যেন এখানে আর কেউ না শোনে, বুঝলেন! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন,—আমরা এত নির্বোধ নই, মিস্ চ্যাটার্জি? কিন্তু লোকটা কী ধড়িবাজ। আপনার বাবার কাছে নিশ্চয় ফার্ষ্ট ক্লাসের ভাড়া ও আদায় করেছে,—টাকাটা জমিয়ে নিল।

ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে। বাবা নিশ্চয় জামাইকে থার্ড ক্লাসে পাঠাইবেন না। কোটিপতি লোকের জামাই তপন থার্ড ক্লাসে যাইতেছে, শুনিলে লোকে কী ভাবিবে! রাগে দুঃখে তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। স্থির করিল ফিরিয়া বাবাকে বলিয়া ইহার প্রতিকার সে করিবেই। তখনকার মতো তপতী বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের ভিতর যেন একটা আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার ধূমায়িত শিখায় তপতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। ঐ লোকটার সীমাহীন অর্থলোলুপতা তপতীর পিতাকে পর্যন্ত অপদস্থ করিতেছে। ধনীর দুলালী আভিজাত্য গৌরবে গরবিণী তপতী ভাবিতেই পারে না, থার্ড ক্লাসে যাইতেছে তাহার স্বামী—তাহারই পিতার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক!

নির্বাক তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,

—আর দেরী করায় লাভ কি মিস্ চ্যাটার্জি? আপনার বাবাকে বলে ওকে তাড়িয়ে দিন বাড়ি থেকে!

—হুঁ—

—আপনার মত মেয়েকে পাওয়া যে-কোন উচ্চ শিক্ষিত যুবকের অহঙ্কারের বিষয়।

—হুঁ—

—অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের দলিলটা রেজিষ্টারী করিয়ে নিতে হবে তার আগে! তপতী এবারও একটা হুঁ দিয়া অন্য দিকে সরিয়া জানালায় মুখ বাড়াইল।

নিখিল-ভারত-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ লাভ করিতে গিয়া তপতীর মন বিষাদে পূর্ণ লইয়া গেল। এই গান তাহার শুনিবে কে? কার জন্য তপতীর এই সাধনা! সে কি ঐ নিতান্ত অপদার্থ একটা গণ্ডমূর্খের জন্য? তপতীর বিষবাষ্প তপনকে এই মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া দিতে চায়! যেন মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যাল তপতীর মনের গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য কবিতেছেন।

তাহাদের কাজ হাসিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ। তপতীর নিকট আসিয়া কহিলেন,

—চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—হুমায়ুনের কবর দেখে আসি গে!

তপতী আপত্তি করিল না। একটু বাহিরে গিয়া আপনার চিত্তবেগ প্রশমিত করিতে তাহারও ইচ্ছা জাগিতেছিল। ট্যাক্সি চড়িয়া সকলে যাত্রা করিল। পৃথ্বীরাজ রোডের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। দুইপাশে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি তাহার উপর বাব্‌লা বন,—যেন সুদূর অতীতের পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহার পৃথ্বীরাজরেই রাজত্বে!

তপতী হঠাৎ কহিল,—সংযুক্তার কথা মনে পড়ছে। যোগ্য স্বামীকে পাবার জন্য বাপ-মাকে ছাড়তে সে দ্বিধা করেনি—অদ্ভুত মেয়ে।

মিঃ ব্যানার্জি তাহাকে উস্কাইবার জন্য কহিলেন,—আপনার মনের শক্তিও কিছু কম নয়। আজ দীর্ঘ সাতমাস আপনি মা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

তপতী একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—যুদ্ধ এখনো করিনি মিঃ ব্যানার্জি এ কেবল সমরায়োজন চলছে। কিন্তু সংযুক্তার মতো ভাগ্য তো আমার নয়, আমার পৃথ্বীরাজ এখনো আসেননি!

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল চকিত হইয়া উঠিতেছেন! তপতীর মনটাকে তাহারা আজো আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তবে! কে তবে উহাকে লাভ করিবে। এখনি সেটা জানিয়া লওয়া দরকার, বলিলেন,—আপনার পৃথ্বীরাজ কিভাবে আসবেন, বলতে পারেন মিস্ চ্যাটার্জি?

না! যেদিন আসবেন সেদিন বলতে পারবো! আজ শুধু জানি যারা এতদিন আসছেন তাঁরা কেউ-ই পৃথ্বীরাজ নন! তাঁদের মধ্যে অনেক ঘোরী আছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ নেই।

তপতীর ইঙ্গিত ব্যঙ্গের কাছে ঘেঁষিয়া মিঃ ব্যানার্জিদের পীড়িত করিতেছে। মিঃ ব্যানার্জি আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন কহিলেন,

—ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটেছিল, বীরত্ব তার কম ছিল না মিস্ চ্যাচার্জি?

দুর্ভাগ্য সংযুক্তার—বাবা তার জয়চন্দ্র আর সৌভাগ্য সংযুক্তার স্বামী তার মৃত্যুঞ্জয়ী। ঘোরীর বীরত্ব দেশজয় করতে সক্ষম, নারী হৃদয় নয়, কারণ নারী নিজে ছলনাময়ী বলে ছলনা কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। নারী নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তাকে বুকের পদ্মটিতে গন্ধ

হয়ে ফোটে যে-পুরুষ আপন পৌরুষ মহিমায় মৃত্যুপথকে উজ্জ্বল করে তুলবে ; চালাকিতে নয়, ছলনায় নয়, কপটতায় নয়। নারী নিজে সাংঘাতিক কপট তাই অন্যের কপটতা সহজে বুঝতে পারে।

—আপনি কি বলতে চান যে আমরা আপনার সঙ্গে কপটতা করি?

—হাঁ, তাই। তার প্রমাণ আপনার এই প্রশ্নটি। আপনি যদি অকপট হতেন তাহলে এ প্রশ্ন আপনার মনে আসতো না। আমি তো কোন ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিনি। আপনি নিজেই ধরা পড়লেন! তপতী হাসির বিদ্যুৎ হানিল।

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল মুষড়াইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মিঃ সান্যাল কানে কানে মিঃ ব্যানার্জিকে বলেন,—আধুনিক সাইকোলজি বলে : "মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তাকেই ঐ রকম আক্রমণ করে ; অতএব ভাবনার কিছু নাই।"

কথাটা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জি প্রীত হইয়া কহিলেন, কপটকে কপটতা দিয়েই তো জয় করা যায়।

তপতী মধুর হাসিল, একটু থামিয়া বলিল,—জয়ীর লক্ষণ হচ্ছে বিজিতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা—পারবেন তো?

—নিশ্চয়। বলুন কি আকাঙ্ক্ষা। মিঃ ব্যানার্জি সাগ্রহে চাহিলেন তপতীর দিকে!

—উপস্থিত যৎসামান্য। ঐ-যে লোকটা বসে আছে, পিছনের চুলগুলো ঠিক তপনবাবুর মতো, দেখে আসুন তো, ও সেই কি না? আপনাকে আশা করি চিনতে পারবে না।

—সম্ভব নয়—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। হুমায়ুনের কবরের নিকট এক টুকরো ঘাসে-ভরা জমির উপর তপন নিশ্চল-ভাবে বসিয়া ছিল। মিঃ ব্যানার্জি গিয়া দেখিলেন, এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি বাঙালী দেখছি—

—হ্যাঁ—বলিয়া তপন তাহার মুখের পানে তাকাইল। মিঃ ব্যানার্জিদের সহিত তাহার পরিচয় নাই। ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেড়াতে এসেছেন বুঝি? ক'দিন থাকবেন? উত্তরে তপন জানাইল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, কাল সে আগ্রা যাইবে পরশু বৃন্দাবনধাম দর্শন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিবে। মিঃ ব্যানার্জি হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তপন উঠিয়া নমস্কার করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান টাঙ্গায় চড়িয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া তপতীকে সব কথা জানাইয়া শেষে কহিলেন,—ভদ্রলোক দেখলেই ও ভয় পায়।

—পায় হয়তো। চলুন ; কাল আমরাও আগ্রা যাই।

এভাবে কেন তপনের পিছনে ঘুরিয়া মরিবে, জিজ্ঞাসার উত্তরে তপতী জানাইল, উহার পিছনে একটু গোয়েন্দাগিরি করা দরকার, নতুবা বাবা-মা'কে কি বলিয়া সে বুঝাইবে যে তপনকে বাড়িতে রাখা যায় না। আগ্রায় এবং বৃন্দাবনে সে কি করে জানিতে হইবে। এই সঙ্গে আগ্রা সহরটাও দেখা হইয়া যাইবে আর একবার!

পরদিন নিউ-দিল্লী স্টেশনে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসিয়া উঠিল তপতীদের দল। তপনকে তাহারা অনেক খুঁজিয়াও দেখিতে পাইল না। তপতী সেই দীর্ঘ পথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—হয়তো তপন এ-গাড়ীতে আসে নাই, কিম্বা কোন থার্ডক্লাসের ভিড়ে লুকাইয়া গিয়াছে। যদি না আসে তবে তপতীদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। তপতী জানিতে

চায়, এতদূরে আসিয়া ঐ অদ্ভুত লোকটা কী করিতেছে।

বেলা বারটায় গাড়ী আসিয়া থামিল। জিনিসপত্র গুছাইয়া সিসিল হোটেলের লোকদের সহিত গাড়ীতে উঠিতে গিয়া মিঃ ব্যানার্জি দেখাইলেন, একটা টাঙ্গায় সুটকেশ ও বেডিং হাতে তপন উঠিয়া চলিয়া গেল। হয়তো কম দামের কোন হোটেলে উঠিবে। এইভাবে পয়সা বাঁচাইতে গিয়া তপন যে তাহার সম্মানিত পিতার কতখানি অপমান করিতেছে তাহা ঐ ইডিয়ট্ বোঝে না। তপতীর সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল!

হোটেলে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া সকলেই বলিল,—ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা ফোর্ট, ইৎমাৎ-উদ্দৌলা ইত্যাদি দেখিতে যাইবে। তপতীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া হোটেলেই পড়িয়া রহিল। আগ্রা সে পূর্বে দুইবার দেখিয়াছে। অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর তপতী ভাবিতে বসিল তাহার জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতার ইতিহাস। তপনকে ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা সে তাহার মনের অলিগলিতে ঘুরিয়াও কুড়াইয়া পাইল না। ঐ লোকটার উপর বিতৃষ্ণাই কেবল জাগিয়া উঠে এবং বিতৃষ্ণার কথা ভাবিতে গিয়া ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। উহার হাত হইতে উদ্ধার লাভের কি কোন উপায় নাই। সারাদিন চিন্তার পর ক্লান্ত তপতীর মনে হইল, প্রেমের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তাজমহলটা একবার দেখিয়া আসিবে! হোটেলের গাড়ী আনাইয়া তপতী উঠিয়া বসিল।

আশ্চর্য! তাজমহলের সম্মুখে ঝাউবীথি-বেষ্টিত প্রকাণ্ড চত্বরে বসিয়া আছে তপন—দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। তাজের শুভ্র মর্ম্মরমূর্তিকে যেন সে ধ্যান করিতেছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী ভালভাবেই চিনিত—ঘাড়ের পাশেই সেই কালো তিলটি, লম্বা গভীর কালো কোঁকড়ানো চুল লতাইয়া পড়িয়াছে যেখানে। সামনে গেলে পাছে তপতীকে দেখিয়া তপন চলিয়া যায়, এই ভয়ে তপতী পাশ্চাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।...সন্ধ্যা হইতেছে। আষাঢ় পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিরহী সম্রাটের প্রেমদ্যুতি যেন ভাষা লাভ করিতেছে!

তপন উঠিয়া তাজমহলের মধ্যে আসিল। তপতী তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে কে কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলিতেছে তপন লক্ষ্যমাত্র করিল না। সম্রাট সম্রাজ্ঞীর সমাধিপার্শ্বে আসিয়া সে হাতের ফুলগুলি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করিল :

"হে সম্রাট কবি, এই তব জীবনের ছবি—
এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব্ব—অদ্ভুত,
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া—
'ভুলি নাই—ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া'..."

তপতীর বিস্ময় সীমাতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই তপন! সত্যই তপন তো? কিম্বা তপতী অন্য কাহাকেও তপন ভাবিয়াছে। না, তপতীর ভুল হয় নাই। ও-যে তপন, তাহার পরিচয় রহিয়াছে উহার পোষাকে। ঐ পোষাকে সে দিল্লীতেও পরিয়াছিল—ঐ রং—ঐরকম কোট।

তপন প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল। তপতী পিছনে পিছনে আসিয়াছে বরাবর। তাজমহলের সুবিস্তৃত আঙ্গিনা পার হইয়া তপন বাহিরের গাড়ী থামিবার জায়গায় আসিল। তাহার টাঙ্গাওয়ালা কহিল,—আইয়ে!

তপতী ত্বরিতে তপনের নিকট আসিয়া বলিল,

—আমায় একটু পৌঁছে দেবেন?

তপন এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া বলিল,

—একা এসেছেন? চলুন, কোথায় যাবেন?

—সিসিল হোটেল—বলিয়া তপতী চাহিল জ্যোৎস্নালোক-দীপ্ত তপনের মুখের পানে। ভাল দেখা যায় না, তথাপি তপতীর মনে হইল—এমন সুন্দর সে আর দেখে নাই! টাঙ্গার সামনেকার আসনে তপতী উঠিয়া বসিল, তপন বসিল পিছনে!

—এদিকে আসুন!—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে তাহার পাশে বসিতে।

—থাক্—আমি বেশ আছি—বলিয়া তপন আদেশ করিল গাড়ী চালাইতে।

—কেন? এখানে আসবেন না?—তপতীর কণ্ঠে অজস্র বিস্ময়!

—মাফ করবেন, আমি অনাত্মীয়া মেয়েদের পাশে বসি নে—তপনের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

—অনাত্মীয়া! আমি আপনার অনাত্মীয়া নাকি? এই, রোখো!—তপতী কঠোর আদেশ করিল চালককে।

রাগে তপতীর আপাদমস্তক ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিয়াছে। লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সক্রোধে কহিল,—আমিও অনাত্মীয় পুরুষের গাড়ীতে চড়ি না—বলিয়াই অপেক্ষামাত্র না করিয়া তপতী হোটেলের গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

ব্যাপারটা কি ঘটিল, কেন উনি এভাবে চলিয়া গেলেন—তপন কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিব্রতভাবে চাহিল। কোন নারীর মুখের পানে সে পারতপক্ষে তাকায় না। ইহাকেও চাহিয়া দেখে নাই। একক কোনো মহিলা পৌঁছাইয়া দিতে বলিতেছেন, তপনের অন্তরের কাছে ইহাই যথেষ্ট আবেদন। সমস্ত ব্যাপারটা তপনের দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে।

গাড়ীতে উঠিয়া উত্তেজনার আতিশয্যে তপতী কয়েক মুহূর্ত প্রায় কোন চিন্তাই করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, তপন তাহাকে এত বেশী অসম্মান করিয়াছে যাহা পৃথিবীর কোন মেয়েকে কোন পুরুষ কখনও করে নাই। কিন্তু সন্ধ্যার শীতল বায়ুর স্পর্শে এবং তপনের সুন্দর মুখের মোহমদিরার যাদু-মহিমায় তপতী যেন কিছুটা কোমল হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল—তপতী যে এখানে আসিয়াছে ইহা তপন তো জানে না। অনাত্মীয়া মনে করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ দীর্ঘ সাত মাস তপন একই বাড়িতে তপতীর সহিত বাস করিতেছে, এতকালেও কি সে তাহাকে চেনে নাই? নিজে তপন মুখ ফিরাইয়া থাকে, চোখে ঠুলি পরে, তথাপি তপতীর তাহাকে চিনিতে ভুল হইল না; আর তপন তাহাকে অত কাছে দেখিয়াও চিনিল না। তপন নিশ্চয়ই তাহাকে ঠকাইয়াছে। এইভাবে তপতীকে অপমানিত করিয়া সে তপতীর অপমানের শোধ লইল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে তো সেরূপ মনে হইল না!

এই মুহূর্তে তপতীর মনে প্রশ্ন জাগিল, তপন তাহাকে 'অনাত্মীয়' বলায় সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিম্বা অপমানিত বোধ করিতেছে। তপতীর পিতার অন্নদাস একটা দরিদ্র ভিক্ষুক—তপতীর আত্মীয়তাকে অস্বীকার করিবার শক্তি তপন পাইবে কোথায়? কোন্ সাহসে? বিবাহের বন্ধনগ্রন্থী আধুনিক কালে এমন কিছুই জটিল নয়, যাহা খুলিতে তপতীর খুব বেশী আটকাইতে পারে। কিন্তু কেন তবে লোকটা তপতীকে অপমান করিল? সে কি সত্যই তবে তপতীকে চেনে নাই? না চেনাই সম্ভব। এমন অস্থিরভাবে গাড়ী হইতে না নামিয়া আসিলেই ভাল হইত। বলিল যে, অনাত্মীয়া মেয়ের পাশে বসে না। আচ্ছা পরীক্ষা

করিতে হইবে। অনাত্মীয়া মেয়ে বসিতে আহ্বান করিলেও বসিবে না, এমন সুদুঃসহ গোঁড়ামির মূল কোথায় তপতী তাহা দেখিয়া লইবে!

হোটেলে আসিয়াই তপতী আবদার ধরিল, কাল বৃন্দাবন যাইবে। তপতীর অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর। সকলে হোটেলের দুইখানা 'কার' লইয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল। সেই বৃন্দাবন, যেখানে বংশীরবে যমুনা বহিত উজান ; বাঁধনহারা ব্রজগোপিগণ ছুটিয়া আসিত কোন অন্তর প্রেমসাগরে আত্মবিসর্জন করিতে—কালো কৃষ্ণ যেখানে কালাতীত হইয়াছে, প্রেমের আলোয়। সারাদিন, শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ দর্শনে কাটিল। গৌরাঙ্গ কোনো পুরুষ দেখলেই তপতীর মনে হয়, ঐ বুঝি তপন! কিন্তু পরক্ষেণেই ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। তপনকে কোথাও দেখা যাইতেছে না! তবে কি সে আসে নাই! তপতীকে অপমান করিয়া ফিরিয়া গেল নাকি? তপতী চতুর্দিকে অন্বেষণ করে। মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যালও তপনকে খুঁজিতেছেন। তাঁহাদের মনে একটা আশা জাগিতেছে, তপনকে কোনো একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে দেখাইয়া দিতে পারিলেই তপতীর অন্তর হইতে তাহাকে চিরনির্বাসিত করা যাইবে। কোন একটা ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে যদি তপনকে দেখা যায় তবে এখনই প্রমাণ হইয়া যায় যে তপন শুধু অর্থলোভীই নয়, অসচ্চরিত্রও। তপনকে না তাড়াইতে পারিলে তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বহুস্থান ঘুরিয়া সকলেই প্রায় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিতেছে,—একটা স্থানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছে দেখিয়া তপতীর দল গাড়ী থামাইল। এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি পাখি কিনিতে চান ; তিনি কহিলেন,—'আমি দু'টাকা দেবো' তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে যে উত্তর দিল সবিস্ময়ে চাহিয়া তপতীর দল দেখিল, সে তপন ;—বলিল, 'আমি চার টাকা দিচ্ছি'। তপনের পরিহিত পোশাক ধূলিমলিন, গায়ে এত ধূলা লাগিয়াছে যে প্রায় চেনা যায় না। সারাদিন রোদে ঘুরিয়া মুখকান্তি মলিন এবং অসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে. ঐ ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রীকে তাহার অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল! তপন বলিল,—'দাও পাখিটা।' সে চারটা টাকা দিয়া পাখিওয়ালার নিকট হইতে পাখিটা লইল। একটু বয়স্ক হইলেও ভারী সুন্দর রং পাখিটার। ধরা পড়িয়া মুক্তির জন্য পাখিটা করুণভাবে কাঁদিতেছে আর ডানা ঝাপটাইতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছিল, তপনের হাত হইতে সে এখনি উহা লইয়া আসে, কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল ছাড়া কেহই তপনকে চেনে না। তাহারা কি ভাবিবে। তারপর ঐ নিতান্ত কদর্য পোশাক-পরিহিত দরিদ্রমূর্তিকে তপতী স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না। সে থামিয়া গেল।

প্রথমে যে ভদ্রলোক পাখিটি কিনিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শুষ্কমুখে কহিলেন,—অতবড় বুড়ো পাখি, পোষ মানবে না মনে হচ্ছে—

—ঠিক মানবে। এই দেখুন না—বলিয়া তপন পাখিটাকে মুক্ত আকাশে উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,—মুক্তির মধ্যেই প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

—করলেন কি মশাই! বলিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—ওকে ভালবাসি কিনা, তাই মুক্তি দিলাম—বলিয়াই তপন চলিয়া গেল।

চোখের জল লুকাইবার জন্য তপতী তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমাদের দেখে কি-রকম অভিনয়টা করলো।

জলভরা চোখে তপতীর রোষবহ্নি গর্জিয়া উঠিল,—থামুন! যথাযোগ্য স্থানে

যথাযোগ্য কথার ব্যবহারের যোগ্যতা পৃথিবীতে কম অভিনেতারই থাকে! ও যদি অভিনেতা হয় তো, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি—ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

গাড়ীস্থ সকলেই একমুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল তপতীর কথা শুনিয়া।

তপতীর সারা অন্তরখানি স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ছাইয়া গেছে। গাড়ীতে সারা পথ সে বিশেষ কিছু কথা বলে নাই, সর্বক্ষণ তপনের কথা ভাবিয়াছে আর বিস্মিত হইয়াছে। যে মানুষ অর্থ বাঁচাইবার জন্য থার্ড-ক্লাসে দূর পথের যাত্রী হয়, মুটে খরচের ভয়ে স্বয়ং বাক্স-বিছানা বহন করে ; পোষাকের কদর্য্যতায় পর্যন্ত যাহার কৃপণতা পরিস্ফুট—সেই কিনা দুই টাকার পাখি চার টাকা দিয়া কিনিয়া আকাশে উড়াইয়া দেয়, আবার বলে 'ওকে ভালবাসি, তাই উড়াইয়া দিলাম'। ইহা অপেক্ষা মানবতার প্রকৃষ্টতম পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিঃ ব্যানার্জি বলেন, উহা তপনের অভিনয়। হউক উহা অভিনয়, তথাপি আজ প্রেমের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমের যে নবীনতম বাণী তপনের মুখে শুনিয়াছে, তাহা তপতীর জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে। আর অভিনয়ইবা হইবে কেন? তপন তো জানিত না তাহারা ওখানে দাঁড়াইয়া আছে। তপতী স্থির করিল, তপনকে লইয়া সে একবার অভিনয় করিবে। প্রেমের অভিনয়।

পরদিন বিকালে হাওড়ায় গাড়ী থামিলে তপতী নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বাড়ি ফিরিল! মা তাহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তপন নামেনি খুকী? ওরও তো নামবার কথা এই ট্রেনে।

—নেমেছে, আমি দেখা না করে চলে এসেছি! ও আসছে ঘোড়ার গাড়ীতে, আমার যাওয়ার কথা ওকে বলোনো মা—তুমি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করো থার্ড-ক্লাসে কেন ও যায়?

তপতী স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নানাদি সেরে সে আবার আসিয়া বসিল এমন স্থানে যেখান হইতে মা'র সহিত তপনের কথা শুনা যাইতে পারে।

তপন ফিরিয়া আসিল একটা ফিটনে। 'মা' বলিয়া ডাকিতেই মা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তপনের মূর্তি দেখিয়া দুঃখে তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—কী চেহারাই করেছ বাবা। মাথায় এত ধূলো যে ধান চাষ করা চলে—

সুমিষ্ট হাসিতে ঘরখানা পূর্ণ হইয়া গেল। তপনের হাসির আওয়াজ যে এত মিষ্টি তপতী তাহা কোনদিন জানে না। তপন কহিল,—মাথাটা তাহলে ধান চাষের যোগ্য হয়েছে মা! ধানের জমি সব থেকে দামী।

মা আরো ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—রাখো বাবা, তোমার হাসি দেখে আমার রাগ বাড়ছে। থার্ড-ক্লাসে কেন তুমি যাবে, বলো তো?

কোটটা খুলিয়া কামিজের বোতাম খুলিতে খুলিতে তপন জবাব দিল,—কেন মা থার্ড-ক্লাসে তো মানুষই যায়—গরু ছাগল তো যায় না!

মা এবার হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসেও যায় মানুষ—

—সে বড় মানুষ। আপনার ছেলে তো বড়মানুষ নয়, মা! গরীব ছেলে আপনার—

—না বাবা, না। ওরকম করো না তুমি। মা'র মনে দুঃখ দিতে নাই, জান তো?

—দুঃখ কেন পাবেন, মা? আপনার সক্ষম ছেলে যে-কোনো অবস্থায় নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে—এ তো আপনার সুখেরই কারণ হওয়া উচিত?

কিন্তু আমাদের ক্ষমতা যখন আছে, বাবা—তখন ফার্স্ট-ক্লাসেই—

বাধা দিয়া তপন বলিল,—ক্ষমতার সংযত ব্যবহারটাই মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় মা। এতেই তার মহিমা বাড়ে! মানুষের অক্ষমতাকে ভেংচিয়ে ক্ষমতার জাহির নাই-বা করলাম?

তপন স্নানাগারে ঢুকিল। মা তপনের কথা কয়টি আপনার মনে পুনরাবৃত্তি করিয়া বাহিরে আসিলেন। তপতী বিহ্বল দৃষ্টিতে মাঠের পানে তাকাইয়া আছে। সস্নেহে মা ডাকিলেন,—আয় খুকী, খেয়ে নে কিছু।

—আসছি—বলিয়া তপতী আপনার ঘরে চলিয়া গেল। তপনের কথা বলার আশ্চর্য্য ভাঙ্গিটি আজ তপতীকে যেন ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে। এই সুকুমার দর্শন যুবকটি মূর্খ, উহাকে তপতী উৎপীড়িত করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে,—অতিষ্ঠ করিয়াছে,—তথাপি সে যায় নাই! কিন্তু কেন যায় নাই, সে-কথা ভাবিতে গিয়াই তপতী আর একবার শিহরিয়া উঠিল। সত্যই কি তপন অর্থলোভী? সত্যই কি সে তপতীর জন্য এত অত্যাচার সহ্য করে নাই, তুচ্ছ অর্থের জন্যই করিয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে তপতীর অন্তর ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। হে ঈশ্বর! যদি তপতী কখনও তোমায় ডাকিয়া থাকে, তবে বলিয়া দাও তপতীর জন্যই তপন এত অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। এইটাই যেন সত্য হয় তপতী তাহার জীবনে আর কিছুই তোমার নিকট চাহিবে না।

মায়ের দ্বিতীয় ডাকে ক্লান্ত তপতী যখন খাইতে আসিল, তখনও তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে। মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—কি হল রে, মা! কাঁদছিস?

অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম মা, ঠাকুরদার সঙ্গে সেই গিয়েছিলাম। আজ তিনি নাই—বলিতে বলিতে তপতী অজস্র ধারায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। বি এ. পড়া শিক্ষিত মেয়ের এরূপ অসাধারণ দুর্ব্বলতা দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইলেন ততোধিক। তপতী আবার তাঁহার পূর্বের তপতীর মতোই হইয়া উঠিতেছে? চোখের জলে মানুষের মনের ময়লা ধুইয়া যায়—তপতী আবার সুন্দর হইয়া উঠুক, তাহার তপতী নাম সার্থক হোক!

মায়ের কল্যাণাশীষের স্পর্শে তপতীর অন্তর সেদিন জুড়াইয়া গেল।

পরদিন সকালেই তপতী আয়োজন করিল বন্ধুদিগকে ভোজ দিবার। বি. এ. পরীক্ষায় সে পাশ করিয়াছে, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছে, এবং সর্বোপরি যাহা সে লাভ করিয়াছে—তাহা তপনের সঠিক পরিচয়! এমন দিনে সে খাওয়াইবে না তো কবে খাওয়াইবে? তপতী টেলিফোনে সকলকে নিমন্ত্রণ করিল এবং মাকে বলিল.—ওকে বলে দিয়ো মা, সবার সঙ্গে বসে যেন আজ খায়—

মা হাসিয়া কহিলেন—নিজে বলতে পারিস্ নে খুকু? কি লাজুক মেয়ে তুই!

—না মা, ও ছুতো করে এড়িয়ে যায়—জানো তো. কি রকম দুষ্টু!

তপতী চলিয়া গেল। মাব কাছে তপনের সম্বন্ধে দুষ্টুমির আরোপ তাহাকে লজ্জিতই করিয়াছে। তাহার নারী-হৃদয় ঐ কথাটুকু বলিয়াই যে এত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, তপতী তাহা কখনও ভাবে নাই। হউক লজ্জা, তথাপি তপতীব আনন্দ যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে!

নির্দিষ্ট সময়ে সকলেই আসিল—আসিল না শুধু তপন। তপতীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন,—সাড়ে পাঁচটার আগে সে তো ফেরে না—ঠিক সময়েই ফিরবে।

নিরুপায় তপতী অন্যান্য সকলকে খাইতে দিল। সাড়ে পাঁচটায় তপন আসিতেই মা তাহাকে সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। তপতী স্বহস্তে পরিবেশন করিল চপ-কাট্‌লেট্‌ ইত্যাদি।

নিরুপায়ভাবে কিছুক্ষণ খাদ্যগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তপন কহিল মাংস খেতে আমি ভালবাসিনে—আমায় একটু রুটি-মাখন দিলে ভাল হয়—

মা বলিলেন.—একটু খাও বাবা, রুটি মাখন আজ নাই-বা খেলে? তুমি তো বৌদ্ধ নও যে অহিংস হচ্ছ।

তপন হাসিয়া বলিল,—মাংস না খেলেই অহিংস হয় না. মাংস তো খাদ্যই। ও খাওয়ায় হিংসাও হয় না। তবে আমার প্রয়োজনাভাব।

মিঃ ব্যানার্জি তপনকে আক্রমণের জন্যে যেন ওৎ পাতিয়া ছিলেন, কহিলেন,—চপ-কাটলেট-ডিম খাওয়া কাঁটা-চামচেতে খাওয়া আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ একটা—তপন চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইলে মিঃ ব্যানার্জি অপমান বোধ করিবেন ভাবিয়া মা বলিলেন.—ওর কথাটির জবাব দাও তো বাবা!

হাসিয়া তপন বলিল,—'সভ্যতা' কথাটা আপেক্ষিক, মা। বিলাতের লোক আমাদের অসভ্য বলে, আমরা আবার আমাদের থেকে অসভ্য বাছাই করে নিজের সভ্যতা প্রমাণ করতে চাই। দেশ আর পাত্র এবং রুচি ভেদে ওর পরিবর্তন হয়।

তপতী এতক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, মানুষকে যুগোপযোগী হতে হবে—তপন নির্লিপ্তের মতো বলিল—এটাও অপেক্ষিক শব্দ। আমার সমাজে এই যুগেই আমি বেশ উপযোগী আছি, আবার সাঁওতালরা তাদের সমাজে এই বিংশ-শতাব্দীতেই বেশ উপযোগী রয়েছে!

কিন্তু আপনি তো এসে পড়েছেন আমাদের সমাজে? মিঃ অধিকারী ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন।

—আপনাদের সঙ্গে আমার পবিচয় আজই প্রথম, এর মধ্যে আপনাদের সমাজে এসে পড়লুম কেমন করে, বুঝলুম না তো?—তপন প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে চাহিল।

তপতীকে বিয়ে করে।—রেবা উত্তর দিল হাসির মাধুর্য্য দিয়া।

তপন কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া কহিল,—আমার ধারণা ছিল—বিয়ে করে মানুষ তার নিজের সমাজেই স্ত্রীকে নিয়ে যায়। আপনাদের বুঝি উল্টা হয় জানতুম না তো!

এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি তপতীকে স্পর্শ করিল গভীরভাবে। জেলিমাখা রুটিটা তপনের দিকে আগাইয়া দিতে-দিতে সে কহিল,—সব স্ত্রী যদি সে সমাজে না মিশতে পারে? না সইতে পারে সে সমাজকে?

তপন নিঃশব্দে কাপের চা-টুকু পান করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল,—সে তবে স্ত্রী নয়, সহধর্মিণী নয়—সে শুধু বিলাস সঙ্গিনী। সব স্বামীরও তাকে সইবার ক্ষমতা না থাকতে পারে।

—তপন চলিয়া গেল সকলকে নমস্কার জানাইয়া। চির অসহিষ্ণু তপতী শান্তস্নিগ্ধ

ঔদার্য্যে চাহিয়া রহিল তপনের গমন পথের পানে—দৃষ্টিতে তাহার কোন সুদূর অতীত যুগের উজ্জ্বলতা ছড়ানো।

অতিথিদের সকলেই চলিয়া যাইবার পরেও রহিল রেবা, মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল। তপতী উঠি উঠি করিতেছে, ভদ্রতার খাতিরে পারিতেছে না। মিঃ ব্যানার্জি এবং অন্যরা যাহারা এতদিন তপনকে পাড়াগেঁয়ে গণ্ড মূর্খ বর্বর ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, তাহারা আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, তপন মূর্খ তো নহেই, উপরন্তু উহার কথা বলার কায়দা অসাধারণ। উহারা বেশ বুঝিল—তপতী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'কর্ণের' শেষ অস্ত্র ত্যাগের মতো মিঃ ব্যানার্জি বলিয়া উঠিল,—পাঁচালি ছড়া পড়লেও অনেক কিছু শেখা যায়, দেখছি!

মিঃ অধিকারী তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল,—গোঁড়ামি দিয়েও আধুনিকদের বশ করা যায় দেখা যাচ্ছে!

রেবা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল—সুযোগ বুঝিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বশ কাকে হতে দেখলেন আপনারা? কথাটার নূতনত্ব আমাদিগকে একটু চমকে দিয়েছে মাত্র। ভেবে দেখতে গেলে, তপনবাবু সেই প্রাচীন কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরটাই তপতীর ঘাড়ে বসাতে চান, বোঝা যাচ্ছে! অর্থাৎ উনি চান, তপতী তার সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে ওর সঙ্গে সেই ঘোমটা-টানা বৌ হয়ে থাক্। যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড লোকটার।

মিঃ সান্যাল কহিল,—নিশ্চয়ই তাই, নইলে ঐ সহধর্মিণী হওয়া কথাটা তুলবে কেন? সহধর্মিণীর যুগ আর নেই বাপু সখীত্বের যুগ চলছে—

উহারা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তপতী কোন কথাই বলিল না, যদিও রেবার কথাগুলি তাহার বুকে গভীর আলোড়ন তুলিয়াছে। সকলে চলিয়া যাওয়ার পরেও তপতী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—সমাজ-সংস্কার ছাড়িলে তো তাহার চলিবে না, তপনকে লইয়া কি সে বনে গিয়া বাস করিবে? তপন যদি আমাদের সমাজে না মিশতে পারে তবে তো তপতীর পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা! তপতী প্ল্যান আঁটিয়া রাখিল আগামী পরশু তাহার সহপাঠিনী টুকুর বিবাহে তপনকে সঙ্গে লইয়া সে বরাহনগর যাইবে। তপনকে তাহাদের সমাজের যোগ্য করিয়া লইতেই হইবে, নতুবা তপতীর উপায় নাই।

নির্দিষ্ট দিনে দুপুর বেলা তপন খাইতে আসিতেই মা বলিলেন,—আজ খুকীর এক বন্ধুর বিয়ে বাবা, ওর সঙ্গে তোমায় যেতে হবে সন্ধ্যেবেলা বুঝলে?

তপন ভাতের গ্রাসটা গিলিয়া কহিল,—আমি নাই-বা গেলাম মা! আমার যে অন্যত্র কাজ রয়েছে। আগে বললে সময় করে রাখতাম আমি।

—সে কাজ পরে করো, বাবা! মা সস্নেহে আদেশ করিলেন—

—তা হয় না, মা আমি কথা দিয়েছি—আমার কথা আমি রাখবোই। একটা উপহার আমি এনে দেবো, আপনার খুকীর সেটা নিয়ে গেলেই হবে। আমার না যাওয়ায় ক্ষতি হবে না।

তপতী আড়ালেই ছিল।—তপন যাওয়াটা এড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল,—'যেতে—ভয় করে' বললেই সত্যি বলা হয়। না-যাবার হেতু?

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, তপতীর কথাটার জবাবমাত্র না দিয়া সে আঁচাইবার

জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। রুদ্ধ অপমানে তপতীর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া গেল। একে তো আজ যাচিয়া তপনের সহিত যাইতে চাহিয়াছে,—তার উপর মাকে দিয়া সে-ই অনুরোধ করাইয়াছে, আবার নিজে আসিয়া প্রস্তাব করিল, আর ঐ ইতর কিনা ভদ্রভাবে একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না! তপতীর প্রশ্নটাও যে ভদ্রজনোচিত হয় নাই, ইহা তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। তপনের পিছনে গিয়া সে আদেশের সুরে কহিল,—যেতেই হবে বুঝেছেন?

মুখ ধুইয়া মশলা কয়টা মুখে ফেলিবার পূর্বে তপন অতি ধীর শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—যেতে পারবো না—মাফ চাইছি—

উত্তর দিয়াই তপন চলিয়া গিয়াছে, তপতী যখন বুঝিল, তখন যুগপৎ ক্রোধ এবং অপমান তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই তপন একটি ভেলভেটের কেসে একটি মূল্যবান ব্রোচ কিনিয়া মা'র হাতে দিয়া বলিল,—এইটা নিয়ে গেলেই আমার না যাওয়ার অসৌজন্য হবে না, মা। মুখ্য-সুখ্য মানুষ, আমার না যাওয়াই ভালো।

—হ্যাঁ, ভালোই—তপতীও তাহা সমর্থন করিল এবং তপনের বদলে তাহার প্রদত্ত উপরাহটা লইয়া বিবাহ-বাড়ি চলিয়া গেল। সেখানে বহু লোকের উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তপনের দেওয়া ব্রোচটা তুলিয়া দেখা গেল লেখা আছে : 'আপনাদের জীবন বসন্তের বনফুলের মতো বিকশিত হোক, বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মতো পরিপূর্ণ হোক—শরতের শস্যের মতো সুন্দর আর সার্থক হোক!...

তপনের আশীর্বাণী। যিনি পড়িলেন, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। কহিলেন—বেশ আশীর্বাদটি, বৎসরের শ্রেষ্ঠ তিনটি ঋতুর আশিস যেন ঐ কথা ক'টিতে ভরে দিয়েছে! চমৎকার লাগলো।

তপনের না-আসার জন্য অনেকেই ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার আশীর্বাদের প্রশংসা করিল সকলেই। দু'চারজন কিন্তু বলিতে ছাড়িল না—'জামাই মূর্খ, তাই তপতী সঙ্গে আনে না। ও আশিস কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।'

কথাটা তপতী শুনিল ; লজ্জায় সে রাঙা হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু বলিবার মতো কথা আজ তার জুটিতেছে না। যত শীঘ্র সম্ভব সে পলাইয়া আসিল।

সমস্ত রাত্রি তপতীর ভালো নিদ্রা হইল না। গত সন্ধ্যায় বিবাহ বাড়িতে সে রীতিমতো অপমানিত হইয়াছে। তপন কেন তাহার সঙ্গে গেল না? ভালো ইংরাজি জানে না সে, নাই বা জানিল। তপতী সামলাইয়া লইত। মাছ-মাংস খায় না বলিলেই কাঁটা-চামচের হাঙ্গামা ঘটিত না। তপনের না যাইবার কী কারণ থাকিতে পারে? কোনদিনই সে কোথাও যায় নাই অবশ্য তপতীও ডাকে নাই। কিন্তু ডাকিলেও যাইবে না, এমন কি গুরুতর কাজ তাহার থাকিতে পারে? বিদ্যা তো অতি সামান্য। সারা দিন-রাত্রি কী এতো তাহার কাজ? না যাইবার অছিলায় সে ঐভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়—কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহে না। তপতী আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল—কতকগুলি পাকাপাকা কথা তপন বলিতে পারে, ভদ্রতা বা অভদ্রতা, অপমান বা সম্মান সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। তাহাকে এই বাড়িতে থাকিতে হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। সে বুঝিয়াছে তপতীকে সে পাইবে না, এখন টাকাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু কাল তো তপতী তাহাকে আত্মদান করিতে প্রস্তুতই ছিল,

তথাপি তপন কেন গেল না? তপতীর আন্তরিকতার অভাব সে কোথায় দেখিল?

ভোরে উঠিয়াই তপতী স্নান করিয়া এলোচুল ছড়াইয়া বসিল খাইবার ঘরে। তাহার অঙ্গের স্নিগ্ধ সুরভি ঘরের বাতাসকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। পূজা করিয়া তপন চা খাইতে আসিল! মা দুজনকে খাবার দিয়া বসিয়া আছেন। তপতী যেন আপন মনেই বলিল,—আজ বিকেলে আমি সিনেমায় যাবো, নিয়ে যেতে হবে আমায়।

মা হাসিয়া করিলেন,—শুনেছো বাবা, ওকে আজ যেন নিয়ে যেয়ো—

তপন মৃদুস্বরে কহিল, আজ থাক্, মা, আমার ছোট বোনটিকে আজ একটু দেখতে যাব—যদি বলেন তো কাল সিনেমায় যেতে পারি!

রাগে তপতীর সর্বাঙ্গ কাঁপিতে ছিল। তাহার অসংযত মন বিদ্রোহের সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—থাক, কাল আর যেতে হবে না! বোনকে নিয়ে থাকুন গে! বোনের বাড়ি থাকলেই পারতেন!

মা ধমক দিয়া উঠিলেন,—কী সব বলছিস, খুকী? চুপ কর্।

—থামো তুমি মা—কাজিন-এর উপর অত দরদের অর্থ তুমি বুঝবে না। তুমি থামো।

তপন চায়ের কাপটা চুমুক দিতে যাইতেছিল—নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মা, ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, উঠলে যে বাবা, বসো!

তপন বাহিরে যাইতে যাইতে শুধু বলিল,—আপনার খুকীকে বলে দেবেন মা, আমি আধুনিক যুগের তরুণ নই—আমার বোন 'বোন'ই!—তপন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পথ ধরিল। মা বিপন্না বোধ করিয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

তপতী রুখিয়া নীচে নামিতে নামিতে পিছন হইতে তপনকে বলিল,—যান চলে যান, আসবেন না আর।

তপন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমি চলে যাই এই কি চান আপনি?

—হ্যাঁ, চাই—চাই—চাই, আজই চলে যান, এক্ষুণি চলে যান।

তপনের দুই চোখে সীমাহারা বেদনা ঘনাইয়া উঠিল, নির্বাক স্তব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যঙ্গ করিয়া তপতী বলিল,—দু'লাখ তো নিয়েছেন, আরো কিছু যদি পারেন তো দেখেছেন—কেমন?

বিস্মিত তপনের কথা ফুটিল ; কহিল,—শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাতনী সামান্য দু'লাখ টাকার সন্ধানও রাখেন দেখছি?

ক্রোধে আত্মহারা তপতীর অভিজাত্যে আঘাত লাগিল। সক্রোধে সে জবাব দিল—শ্যামসুন্দরের নাতনীর বাবাকে কোনো জোচ্চোর ঠকিয়ে দু'লাখ টাকা নিয়ে যাবে, এ সে সইবে না মনে রাখবেন। যাবার আগে টাকাটার হিসেব দিয়ে যাবেন যেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তপতী চলিয়া আসিল। মা ভাবিয়াছিলেন তপতী তপনকে ডাকিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া ব্যগ্র ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন,—তপন কই খুকী?

—'জানিনে—চুলোয় গ্যাছে।' বলিয়া তপতী আপন ঘরে চলিয়া গেল।

বিপন্না মাতা উহাদের কলহের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। খুকীর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—কি বলে গেলো রে, না খেয়েই গেল যে!

তপতীর রাগ তখনও পড়ে নাই, তথাপি সংযত কণ্ঠেই উত্তর দিল ;—আসবে

এক্ষুণি—ভাবছো কেন তুমি।

—কি সব বলিস বাবু তুই—রাগের মাথায় ওরকম বিশ্রী কথা কেন তুই বলিস খুকী?

তপতী এবার আর রাগ দমন করিতে না পারিয়া কহিল.—বেশ করেছি, বলেছি! কী এমন বললাম যে, না খেয়ে গেলেন—ভারী তো...!

মা ভাবিলেন দম্পতীর কলহ, চিরশান্ত তপন নিশ্চয়ই রাগ করিয়া যায় নাই। কিন্তু ভয় তাঁহার জাগিয়াই রহিল মনের মধ্যে।

বেলা প্রায় বারোটার সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই উৎকণ্ঠিতা তপতী ছুটিয়া গিয়া ফোন ধরিল। মা-ও তখনি আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। তপতী শুনিল পুরুষকণ্ঠে কে বলিতেছেন—তপনবাবু আজ বাড়ি ফিরবেন না, কাল সকালে ফিরবেন।

—'কেন? কোথায় থাকবেন?' তপতী প্রশ্ন করিল।

কিন্তু উত্তরদাতা ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে।

মা ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন.—কে ফোন করছে রে? তপন?

—হ্যাঁ, আজ আসবে না, বোনের বাড়ি থাকবে বলিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ফিরিয়া কহিল,—রাগ করেনি মা, কাল ঠিক আসবে আমায় বললে ; ভেবো না তুমি।

মা নিশ্চিন্ত হইলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তপতী ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল—কোথায় আর যাইবে, যাইবার জায়গা তো ঐ ফুটপাত, আর তপতীরই বাপের দুই লক্ষ টাকা—টাকার হিসাব দিতে হইলেই চক্ষু চড়কগাছ হইয়া যাইবে। ও ভাবিয়াছে, 'যাইবে' বলিলেই তপতী ভয়ে কাঁদিয়া পড়িবে পায়ে! তপতীর অদৃষ্টে তাহা কখনও লেখে নাই, কিছুতেই না, তপতীর হাসি পাইল! তাহার পিতামহের গোঁড়ামী কম ছিল না, কিন্তু তাহার পিছনে ছিল যুক্তি—তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত! আর তপন কতকগুলি বাছা বাছা বুলি কপচাইয়া ভাবিয়াছে তপতীর অন্তর জিনিয়া লইল! অত সহজ নয়—তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না।

বিকালে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া তপতী মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যালের সহিত বেড়াইতে বাহির হইল যথারীতি।

পরদিন সকালেই তপন ফিরিয়া আসিল ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রী লইয়া।

তপতীর সহিত তাহার কি কথা হইয়াছিল, মা কিছুই জানিতেন না ; তিনি তপনকে স্বাগত সম্ভাষণে সস্নেহে বলিলেন,—শরীর ভলো তো বাবা! বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ, মা, শরীর ভালোই আছে—খেতে দিন কিছু—বলিয়া তপন খাইতে বসিল।

তপতী আপন ঘরে বসিয়া দেখিল, তপন ফিরিয়াছে এবং নির্লজ্জের মতো খাইতেছে। অদ্ভুত এই লোকটা। এতবড় অপমান করার পরেও সে নির্বিকার? কোন্ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এইরূপ অপমান সহিতেছে, তপতীর আর তাহা অজানা নাই। ভালো, উহার ভণ্ডামীর শেষ কোথায় দেখা যাক্।

দিন দুই তপনের আর কোন খোঁজ না-লইবার ভান করিল তপতী। সে দেখিতে চাহিতেছে, তপনের দিক্ হইতে কোনো আবেদন আসে কিনা। কিন্তু তপন পূর্বের মতোই নির্বিকার , আসে, খায়, চলিয়া যায়! তৃতীয় দিনে তপতী ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এমন করিয়া

সে আর পারে না! তপন আসে, খায়, মা'র সহিত পূর্বের ন্যায় দুই-একটা কথা যাহা কহিত তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দুইদিন তপতী সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, সুবিধা হয় নাই। তপন যেন আপনাকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—অথচ নির্লজ্জের মতো খাওয়া আর থাকাটা তো তেমনই রহিল। এতই যদি উহার সম্মান-জ্ঞান, তবে চলিয়া গেল না কেন? তপতী নিশ্চয় জানে যে-কোন লোক নিতান্ত অপদার্থও, এই অপমানের পর চলিয়া যাইত। তপনের না-যাওয়ার কারণটা এতদিনে বেশ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তপতী সেদিন আগুনের খেলা খেলিয়া বসিল।

মিঃ ব্যানার্জিকে লইয়া সিঁড়ির পাশের ঘরে একটা সোফায় তপতী বসিয়া বেহালা বাজাইতেছে—তপন এখনি আসিবে, তাহাকে দেখানো দরকার যে, তপনের থাকা-না থাকায় বা রাগ-অভিমানে তপতীর কিছুই আসে যায় না।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তপন প্রবেশ করিল। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—ভালো আছেন? টিকি-ই দেখা যায় না!

—টিকি নেই, ধন্যবাদ—বলিয়াই তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, তপতী বেহালার ছড়িটা দিয়া তপনকে খোঁচাইয়া কহিল,—ভদ্রভাবে জবাব দিতে পার না উল্লুক!

—আঃ করেন কি মিস চ্যাটার্জি!—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি তাহার হাতটা ধরিলেন।

তপন চোখের কোণে দৃষ্টিপাতও করিল না, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে—শুনিতে পাইল তপতী বলিতেছে,—ওকে লাথি মারলে যাবে না, জুতো মারলেও যাবে না—সত্যি কি না মেরে দেখুন।

তপনের হৃৎপিণ্ডে কে যেন একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ হুল ফুটাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নামিয়া আসিয়া তপন পূর্ণদৃষ্টিতে তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কি আমার কাছে মুক্তিই চাইছেন?

তপতী নিজের মাথাটা মিঃ ব্যানার্জির কাঁধে রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—চাইছি দাও তো? দেখি তোমার কত ঔদার্য্য!

সত্যি চাইছেন?—তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল।

মিঃ ব্যানার্জির একখানা হাত নিজের মসৃণ ললাটে ঘষিতে ঘষিতে তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—হাঁ—হাঁ—হাঁ, চাইছি! দাও আমায় মুক্তি। পারবে দিতে?

—দিলাম। আজ থেকে আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন...

তপন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।—তপতীর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল—ঐ অদ্ভুত লোক, যে দুই টাকার পাখি চার টাকার কিনিয়া আকাশে উড়াইয়া দেয়, তাহাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া গেল! তপতীর সহিত তাহার আর কোনো সম্বন্ধ রহিল না। না—না—না, তাহা কি হইতে পারে? তপতীকে সে বিবাহ করিয়াছে। এত সহজে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। ওটা একটা কথার কথা। ও তো এখনি আবার বাইরে যাইবে, তখন জিজ্ঞাসা করিবে তপতী 'দুই লক্ষের উপর আরো কত টাকা সে গুছাইয়াছে'।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—লোকটার ধাপ্পা দেবার শক্তি অসাধারণ!

তপতী এতক্ষণে আবিষ্কার করিল, সে এখনও মিঃ ব্যানার্জির কোলে পড়িয়া আছে। এখনি কেহ দেখিয়া ফেলিবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাজনাটা লইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ অতীত হইল, তপন নামিতেছে না কেন? আজ আর বাহিরে যাইবে না কি?

আগ্রহান্বিতা তপতী একটি ছুতা করিয়া উপরে গিয়া দাঁড়াইল তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের জানালা-পার্শ্বে। দেখিল পরম বিস্ময়ের সহিত, তপন, ভণ্ড, অর্থ লোভী তপন উপুড় হইয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে তাহার পূজার বেদীমূলে। উহার হইল কি? ও কি এমনি ভাবেই কাঁদিয়াই তপতীকে হার মানাইবে? এখনি মা দেখিবেন, বাবা জানিতে পারিবেন, একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়া যাইবে। তপতীর ভয় করিতে লাগিল। এত অপমানেও যাহার এতটুকু বিমর্ষতা তপতী দেখে নাই, আজ অতি সামান্য কারণেই সে কেন কাঁদিতেছে। ওঃ, তপতী মিঃ ব্যানার্জির কোলে শুইয়াছিল বলিয়া উহার 'জেলাসি' জাগিয়াছে। নিশ্চয়ই। হাসিতে তপতীর দম আটকাইয়া যাইবার জো হইল। মিঃ ব্যানার্জি—যাহাকে তপতী জুতার ডগায় মাড়াইয়া চলে। নীচে না গিয়া আপন ঘরে আসিয়া তপতী খুব খানিক হাসিল—ঐ লোকটাও তবে 'জেলাস' হইতে পারে! আশ্চর্য্য, উহারও এ বোধ আছে নাকি। থাকিবে না কেন? ও তো নির্বোধ নয়। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপমান সহ্য করিতেছে। তপতীকে ও নাকি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিবে! তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভালোই হইয়াছে ঈর্ষায় উহার অন্তরটাকে তপতী ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে। দেখিবে তপতী—কত সহ্যশক্তি উহার আছে।

তপতী মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—তপন এখনও ফিরছে না কেনরে—জানিস কিছু?

মা জানেন না তপন ফিরিয়াছে। নিঃশব্দে আসিয়া তপনের দরজায় তপতী একটা জোর ধাক্কা দিল। তপন সম্বিত লাভ করিয়া যখন চোখ-মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিল তখন তপতী সরিয়া গিয়াছে। মা'র সহিত কি কথা হয় শুনিতে হইবে, তপতী আড়ালে দাঁড়াইল। মা তপনের মুখ দেখিয়া বলিলেন—কী হল বাবা! মুখ তোমার...

—বিশেষ কিছু না, মা, খেতে দিন।

খাবার দিতে দিতে মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যি বলো, বাবা, কি তোমার হয়েছে—বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

—এক জায়গায় একটু আঘাত পেয়েছি, মা—তা প্রায় সামলে নিলাম।

—কী আঘাত বাবা, কোথায় আঘাত লাগলো?—মা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

—শারীরিক না মা—মানসিক ; শারীরিক আঘাত আমি সবই প্রায় সইতে পারি মা, মানসিক সব আঘাত এখনও সইতে পারি না, তবু সয়ে যাবো, মা! আমার অন্তর—"নহে তা পাষাণ-মতো, তাহলে ফাটিয়া যেতো।"

বুকের গভীর দীর্ঘশ্বাসটা তপন কিছুতেই চাপিতে পারিল না!

এত কি হইয়াছে! তপতী আশ্চর্য হইয়া গেল। মা প্রায় কান্নাভরা কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—হ্যাঁ বাবা, খুকী কিছু বলেছে?

—থাক্ মা—সব কথা মা'দের বলা যায় না—দিন চা আর-একটু।

মা নিশ্চিত বুঝিলেন, খুকী তাহার কিছু বলিয়াছে। নতুবা তপন তো কোন দিন এমন বিহ্বল হয় নাই। আশ্চর্য্য চরিত্র ঐ ছেলেটির। তপন চলিয়া গেলে মা তপতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী তুই বলেছিস—বল খুকী আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে—

—ভাবনার কিছু নেই। তোমার অপদার্থ জোচ্চোর জামাইকে ঠেঙালেও তোমার বাড়ি

ছেড়ে যাবে না—ভয় নেই তোমার—!

—খুকী!—মা ধমকাইয়া উঠিলেন!

একটা সামান্য ব্যাপারকে এতখানা বাড়াইয়া তোলার জন্য তপনের উপর তপতী তিক্তই হইয়াছিল। মার ধমক খাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উত্তর দিল,—ওকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি—শুন্‌লে—!

তপতী চলিয়া গেল। নিঃসহায় মাতা বি. এ. পাস মেয়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বাসিয়া রহিলেন।

শরাহত বিহঙ্গীর ন্যায় ব্যথিত-হৃদয়ে শিখা ও মীরা শুনিল তপনের মুখে তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী। মীরা উদাস দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে, আর শিখার দুই গণ্ড বহিয়া নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা! শিখাই কথা কহিল,

—তাহলে তোমার জীবনটা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল, দাদা?

—না ভাই এই-ই ভালো হয়েছে। আজ ঈশ্বরকে বলতে ইচ্ছে করছে :

"এই করেছো ভালো...

এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো!

আমার এ ধূপ না পোড়ালে..."

শিখা তপনের ব্যথা-করুণ গান সহিতে পারিল না, মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল,—থামো দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, থামো! তোমার ঈশ্বর তোমার থাক্‌—আমাদের তাঁকে দরকার নেই। যে নিষ্ঠুর বিধাতা পবিত্র জীবনকে এমন করে নষ্ট—শিখা আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মীরা কহিল,—চুপ কর্‌, শিখা—মানুষের কান্নায় ভগবান অবিচল! তাঁর কাজ তিনি করবেনই।

বিনায়ক দূরে বসিয়া উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল : আগাইয়া আসিয়া বলিল—তাহলে কবে যাচ্ছিস? একুশেই যাবি তো?

—হ্যাঁ ভাই। আমি না-ফেরা পর্যন্ত তোদের কাজ যেন ঠিক চল্‌তে থাকে। মীরা জিজ্ঞাসা করিল,—সেখানে তোমার কত দেরী হবে, দাদা!—খুব বেশী!

—তা জানিনে বোন্‌টি! এখন আমার কাজ সহজ হয়ে গেছে। আর তো কোন বন্ধন নেই। মুক্তি সে স্বেচ্ছায় চেয়ে নিল।—তোরা সুখে আছিস—আমি এবার সেখানে যতদিন থাকি না—খবর দেবো তোদের—ভাবনা কেন?

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শিখা পুনরায় প্রশ্ন করিল ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে—তুমি কি তবে দেশান্তরী হয়ে যাবে, দাদা?

—না, বোন্‌টি! আমার মাতৃভূমি বাংলা ছেড়ে যাবো কোথায়? আমি একনিষ্ঠা পত্নী চেয়েছিলাম—নিজে হয়তো একনিষ্ঠ হাতে পারিনি তাই বঞ্চিত হলাম। এবার যোগ্য হতে হবে।

—তুমি কি তাহলে তপতীকে এখনও ভালোবাসো দাদা?

—বাসি। আত্মবঞ্চনায় কোনো লাভ নেই। ভালবাসি বলেই তাকে অত সহজে মুক্তি দিতে পারলাম। তার বুকের বোঝা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করলো না। আমার মনের আসনে

ওর স্মৃতি আমি বহন করবো, শিখা, আমার চোখের জলে নিত্য ধুইয়ে দেবো সেই আসন।

—ও যদি আবার তোমায় ফিরে চায়, দাদা?—মীরা প্রশ্ন করিল তপনকে।

—সে আর হয় না, বোনটি। আমার সত্য চিরদিন অবিচল। কিছুর জন্য সে ভাঙে না। কিন্তু তোরা এমনি বসে থাকলে কি করে চলবে রে? চল্ সব, কাগজপত্রগুলো ঠিক করে ফেলি। বিনায়ক। তুই তোর কারখানা চালা ভাই, আমি আমার কাজের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করবো এবার।

বিনায়ক নতমুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শিখা বলিল,—তোমার কাজটা কি দাদা?

মানুষ গড়ার কাজ, বোনটি—তোমাদেরও সাহায্য চাই। পৃথিবী থেকে মানবতার সাধারণ সূত্রটি লোপ পেতে বসেছে। আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাই, পশু থেকে মানুষ কোথায় ভিন্ন। পাশবত্ব আর মানবত্বের মাঝখানে সে সূক্ষ্ম ব্যবধান রেখা রয়েছে, তাকেই স্পষ্টতর করা হবে আমার কাজ।

—তোমর 'জ্যোতির্গর্ম্ময়' বইখানা হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে পুরস্কার পেল, আর বাংলাদেশে মোটে বুঝলেই না, এদেশের মানুষকে কি দিয়ে তুমি গড়বে, দাদা?

বিদেশ থেকে গড়া আরম্ভ করবো। যে কোন বিষয়কে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা বাঙালীর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এ স্বভাব সহজে যাবার নয়। কিন্তু আয় তোরা—তপন সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল।

বিনায়ক মৃদুস্বরে কহিল, আমিও সঙ্গে গেলে হোত-না তপু? একা যদি অতদূর?

—হাঁ একাই যাবো—সঙ্গী যার হবার কথা ছিল সে যখন সরে গেল...

শিখা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার নারীচিত্ত তপনের বেদনার গভীরতাকে মাপিতেছে না। শান্ত শুদ্ধ তপন বারংবার বিচলিত হইয়া উঠিতেছে কোন্ অসহনীর যন্ত্রণায়, শিখা যেন তাহা নিজের বুকেই অনুভব করিতেছে।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে সে কহিল,—লক্ষ্মী দাদা আমার, আজন্ম ব্রহ্মচারী তুমি—আমাদের ভগ্নী স্নেহ নিয়েই কি তুমি চালাতে পারবে না?

—ঠিক চলে যাবে, দিদি, কিছু না থাকলেও চলতো—নিরবধি কাল কোথাও আটকায় না।

—কিন্তু তুমি বড্ড ব্যথা পেয়েছ, দাদা!

—নিজের জন্য নয়, বোনটি—ওর জন্য। ও কেমন করে এতবড় জীবনটা কাটাবে।

—ও আবার বিয়ে করবে।

—আহা, তাই করুক—ও বিয়ে করে সুখী হোক, শিখা, আমি কায়মনে আশীর্বাদ করছি।

—কিন্তু দাদা তুমি এবার আত্মপ্রকাশ করো—ও বুঝুক, কী ধন হারালো।

—ছিঃ বোনটি। ওর উপর কি আমার প্রতিহিংসা নেবার কথা? ও-যে আমার—এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

—তাহলে তুমি মুক্তি দিলে কেন, দাদা? তোমাকেই-বা ও চিনলো না কেন?

—ওর শিক্ষা ওকে বিকৃত করেছে, শিখা, মুক্তি না দিলে ও কোনদিন আমায় চিনবে না। অনেকদিন তো অপেক্ষা করে দেখলাম। ওকে ওর মা-বাবা যেভাবে গড়েছেন, তেমনিই

তো সে চলবে। তবে সে যদি আমার হয় তাহলে আমি তাকে পাবোই। একটা জন্ম কেন তার জন্য লক্ষ-জন্ম আমি অপেক্ষা করতে পারবো।

—তুমি তাহলে আত্মপ্রকাশ করবে না?

না। তাহলে তো এখুনি ও আমায় চাইবে। আর সে চাওয়া হবে—আমাকে নয় আমার মর্য্যাদাকে। তেমন করে ওকে পেতে আমি চাইনে। আমি দরিদ্র তপন, মুর্খ তপন, ভণ্ড এবং অর্থলোভী তপন—এই তার ধারণা। এ ধারণাটা বদলাবার চেষ্টাও সে করলো না ; কারণ, সে সর্বান্তকরণে আমাকে অমনি ভেবে ত্যাগ করতে চায়।

—বিয়ে যদি না করে? শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাতনীর দ্বিতীয় বিবাহ সহজ হবে না।

—আমি তার কি করবো, শিখা! আর, কঠিনই-বা কেন হবে? ওর বাবার একমাত্র মেয়ের সুখের জন্য নিশ্চয় করবে। তবে তপতী যদি নিজেই বিয়ে না করে তো অন্য কথা।

—তাহলে কি করবে তুমি?

—কিছু না, শিখা—আমার সঙ্গে তার এ-জন্মের সম্পর্ক চুকে গেছে। আমি 'কায়েমনসা' কথা বলি ছলনা করি মুক্তি দেবার ভণ্ডামী আমি করি না। প্রয়োজন হলেই রেজিষ্টারী করে দেব।

সকলে অফিস-ঘরে আসিল।

স্নেহাস্পদ জামাতাকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলায় মা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তপতীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তপন তো সত্যই চলিয়া যাইতেছে না? আশ্চর্য, এতবড় অপমানটা সে সহিয়া গেল! যাইলেই বরং তপতী বাঁচিয়া যাইত। বিদেশে থাকিলে লোকের কাছে তবু বলা যায়, বাড়িতে নেই। ঘরে থাকিয়াও পার্টিতে যোগ না দিলে লোকে যে কথা বলে! পার্টিতে যোগ দিবার যোগ্যতা যে উহার নাই, লোকে তো তাহা বোঝে না।

তপতী স্থির করিল, তপনকে অপমান সে আর করিবে না, যাহা খুশী করুক, তপতীর অদৃষ্টে স্বামীসুখ নাই—কি আর করা যাইবে! তপনকে লইয়া ঘর করা তাহার অসাধ্য।

তপতী তিন-চারদিন একবারও এদিকে আসে নাই। তপন নিয়মিত সময়ে আসে খায়—এবং চলিয়া যায়—ইহার সংবাদ তপতী রাখিয়াছে। ঐ নির্লজ্জ লোকটা আবার মুক্তি দিবার ছলে তাহাকে শাসাইতে আসে,—বলে, 'তুমি মুক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র।' লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু কি উহার অভিধানে একেবারে লেখে না! কিন্তু সেদিন অত কাঁদিল কেন? তপতী উহার কোনোই কিনারা করিতে পারিল না ভাবিয়া।

পঞ্চম দিন সকালে সে আসিয়া মাকে বলিল,—আমি তাহলে আজই ভর্তি হচ্ছি গিয়ে, মা, এম এ ক্লাসে।

তপন খাইতেছিল। মা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি বলো বাবা, তপন?

তপন উত্তর দিল—আমার মতের কি মূল্য, মা। ওর যা ইচ্ছে করবে। তবে অর্থাভাবে আমি পড়তে পারি নি, অর্থ থাকতেও কেউ না পড়লে আমার দুঃখ হয়।

—না বাবা, পড়ুক—বলিয়া মা তপতীকেও খাইতে দিলেন।

তপতী ভাবিতে লাগিল, সে পড়িবে শুনিয়া তপন খুশীই তো হইল। পড়াশুনার দিকে

উহার আগ্রহ বেশীই আছে। মাকে বলিল,—আমার ক'খানা বই কিনতে হবে. মা—দোকানে একা যেতে চাইনে।

—বেশ তো তপন সঙ্গে যাক্। যাও তো বাবা, ওর সঙ্গে একটু। গাড়ী বার করো।

—আচ্ছা মা যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিল। গ্যারেজ হইতে গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইল। বেশ-বাস করিয়া তপতী আসিয়া উঠিল তপনের পাশেই। তপন নীরবে গাড়ী চালাইতেছে। মুখে তো কথা নাই-ই ; এমন কি মুখখানা যথাসম্ভব নীচু করিয়া এবং ঘাড় ফিরাইয়া রহিয়াছে। তপতী নির্নিমেষ নেত্রে তাহার লতানো চুলগুলোর পানে চাহিয়া রহিল!' নাঃ, তপন মুখ তুলিল না! গাড়ী গিয়া দাঁড়াইল পুস্তকের দোকানের সামনে। তপতী নামিয়া দোকানে ঢুকিল, তপন বসিয়া রহিল গাড়ীতেই। বই কিনিয়া তপতী ফিরিয়া আসিল। গাড়ীতে বসিয়াই বলিল,

—একটু মার্কেটে দরকার ছিল—কথাটা বাতাসকে বলা হইলেও তপন মার্কেটের সম্মুখে গাড়ী থামাইল। নামিয়া তপতী পিছন দিকে চাহিল, ইচ্ছা—তপন আসুক! কিন্তু ডাকিতে তাহার লজ্জা করিতেছে। এত কাণ্ডের পর তপনকে ডাকা সম্ভব হয় কেমন করিয়া। দোকানে ঢুকিয়া সে একটি কর্ম্মচারীকে বলিল তপনকে ডাকিয়া আনিতে। তপন গাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তপতী সাহস করিয়া কহিল একটি কর্ম্মচারীকে, কোন সেন্টটা নেবো ওঁকে দেখান তো?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—ও সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আচ্ছা লোককেই তপতী সেন্ট্ বাছাই করিতে বলিতেছে। তপতীরই বোকামী। একটা 'লিলি' লইয়া সে ফুলের দোকানে আসিল, পিছনে তপন। বিক্রেতা তপতীকে চেনে, বলিল—আসুন, কী ফুল দেবো? একটা ভালো গোড়ে দিই 'যুঁই' এর?

—দিন। ভালো ফুল তো? বাসি হবে না নিশ্চয়ই?

আপনাকে দেবো বাসি ফুল। সেদিনকার মালাটা কি বাসি ছিল?

তপতী লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। অতি অল্পদিন পূর্বেই যে সে এখানে মালা কিনিয়াছে, তপন তাহা বুঝিতে পারিল। বেশী কথা না বাড়াইয়া সে মালা চাহিল এবং আড়চোখে তপনের দিকেই চাহিল। তপন নির্বিকার নিশ্চল দাঁড়াইয়া... মুখের ভাব তেমনি, চোখে ঠুলি। মালাটা তপনের হাতে দিতে বলিয়া তপতী আগাইয়া গেল, গাড়ীর দিকে। কাগজ দিয়া মালাখানি জড়াইয়া দিলে তপন তাহা আনিয়া তপতী ও তাহার মধ্যকার স্থানে রাখিয়া গাড়ী চালাইল। তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই—কপালে এতটুকু কুঞ্চন-রেখা পড়ে নাই। গতিশীল গাড়ীটাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্যই যেন তাহার সব মনটাই সংযুক্ত। তপতী আশ্চর্যান্বিত হইল। এতক্ষণ তপতী পাশে বসিয়া আছে, তপন একবার চাহিল না পর্য্যন্ত! এতটা ঔদাসিন্যের হেতু কি? কিম্বা উহার স্বভাবই এমনি! তপতীকে একবার দেখিলে ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, এ খবর তপতীর অজানা নাই। কিন্তু এই লোকটার কি তপতীকে দেখিতেও কিছুমাত্র আগ্রহ জাগে না! কিম্বা সেদিনকার ব্যাপারটায় এখনও সে রাগ করিয়া আছে।

গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল! তপতী নামিয়া যাইতেই তপন দারোয়ানকে কহিল 'আমি একটা নাগাদ ফিরবো, মাকে বলো।' সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল পায়ে হাঁটিয়া ; ট্রামে চড়িবে হয়ত। তপতীর হাতের মালাটা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। কি করিবে সে উহা

লইয়া আর? তপনকে দিবার জন্য সে উহা কেনে নাই! কিন্তু গাড়ীতে আসিবার সময় ইচ্ছ হইয়াছিল মালাটা উহাকেই দিবে এবং ফেরৎ পাইবে ; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মাল লইয়া আজ আর করিবে কি সে? এখনি কলেজে যাইতে হইবে।

'ওবেলা দেখা যাইবে' ভাবিয়া তপতী মালাটা রাখিয়া আহারান্তে—কলেজে চলিয় গেল। তপন তাহার দেওয়া মালার কদর কি বুঝিবে ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্ট করিল, কিন্তু বারম্বার মনে হইতেছে—না-বুঝিবার কারণ নাই। তপন অশিক্ষিত নয়—বর অনেকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত।

এই কয়েক মাসের ঘটনাগুলো আলোচনা করিতে গিয়া তপতীর ভয় করিতে লাগিল কী দুঃসহ অপমানই না তপতী করিয়াছে তপনকে! ও যদি একটু রাগিয়াই থাকে, তাহাে অন্যায় কিছুই হইবে না। কিন্তু রাগিয়াছে কিনা তাহারই বা প্রমাণ কই।

বৈকালবেলা তপতী মা'র কাছে আসিয়া খাবার তৈরী করিতে বসিল। বহুদিন আে নাই—মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন তপনকে খাওয়াইবার জন্য খুকী তাহা রান্নাঘরে আসিয়াছে। মা তাহাকে নিরামিষ চপ-কাট্‌লেট তৈয়ারীর মশলা যোগাইয় দিলেন। তপনের জন্য রান্না করিতে তপতীর লজ্জা করিতেছিল, তাই বলিল,—মি বোসকে আসিতে বলেছি, মা একটু আমিষও রাঁধবো।

মা বিষাদিতা হইয়া উঠিলেন। খুকী আজও তপনের জন্য কিছু করে না। কিন্তু তাহা কিই-বা বলিবার আছে? তপতী রান্না চড়াইয়া লুকাইয়া মিঃ বোসকে ফোন করিল চ খাইতে আসিবার জন্য।

মিঃ বোস আসিবার পূর্বেই আসিল তপন। মা বলিলেন,—বোস সাহেব তো এখন এল না খুকী, তপনকে খেতে দে—

—এখনি এসে পড়বে, মা—একুট বসতে বলো, তপতী আবদার ধরিল। তপন কিছু বলিল না। নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মিঃ বোস আসিতেই সুসজ্জিত সকালের মালাটা বাঁ হাে জড়াইয়া বাহিরে আসিল নমস্কার করিতে। মিঃ বোস নমস্কার করিয়া বলিলে হাসিমুখে,—সুন্দর! আপনাকে এমন চমৎকার মানিয়েছে আজ!

—বসুন বসুন! ওসব বাজে কথা কইতে হবে না—বলিয়া তপতী একটা কৃত্রিম ধম দিয়া খাবারের প্লেট আগাইয়া দিল দুজনকেই। তপন নীরবে নতমুখে একটুকরা ভাঙ্গিয় যেন চুষিতে লাগিল। মা চলিয়া গিয়াছিলেন—তপতী নিজেই যখন খাওয়াইতেছে, তখ তাহার আর থাকার কী দরকার। তপতী লক্ষ্য করিল তপনের না-খাওয়া। মিঃ বোস না কথা বলিতেছেন—হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙিল, এমন ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—ও নমস্কার সেদিনকার ব্যবহারটার জন্য আমি লজ্জিত। মাফ করুন!

বিস্মিত তপন বলিল,—মাফ চাওয়ায় কী কারণ ঘটলো বুঝলাম না তো।

—সেদিন না জেনে আপনাকে একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছিলাম।

—ওঃ সেই 'ইডিয়েট'! তাতে কি হয়েছে? আমি কিছু মনে করিনি! নমস্কার।

তপন উঠিয়া পড়িল। তপতী ভাবিতে লাগিল, তপনের জন্য খাবার করিতে আসিয় সে তপনের অসম্মানকারীকেই তাহার পাশে খাইতে বসাইয়াছে, কথাটা তপতীর আগে মনে ছিল না। মিঃ বোসকে না ডাকিলেই হইত। তপন হয়তো সেজন্যই খাইল না।

মা আসিয়া দেখিলেন তপন চলিয়া গিয়াছে। বলিলেন—কিছুই সে খায়নি রে! ওস

ভালবাসে না তপন। রুটি-জেলি দিলিনে কেন?

তপতী উত্তর দিবার পূর্বেই মিঃ বোস বলিলেন,—খেতে শেখান, মাসিমা—মেয়েকে যে জলে ফেলে দিয়েছেন।

রাগে মা'র সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে তিনি শুধু চুপ করিয়া রহিলেন।

তপতী কিন্তু কহিল,—থাক্—আপনাদের তুলতে ডাকা হবে না।

নিজে তপতী ভাবিতেছে, তাহাকে জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু অন্যের মুখে সে-কথা তপতী আর শুনিতে চাহে না।

মিঃ বোস শোধরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন,—কথাটা আমি খারাপ ভেবে বলিনি—আহার-বিহার, আচার-আচরণ না শিখলে সমাজে মিশবেন কি করে। তার জন্যেই বলছিলাম।

মিঃ বোস অতিথি, তাই তপতী চুপ করিয়াই রহিল ; কিন্তু আজ তাহার মনে হইতেছে, পরের মুখে তপনের নিন্দা শুনিতে তাহার আর ভালো লাগে না।

অসুস্থতার ছুতা করিয়া তপতী মিঃ বোসের সহিত সেদিন আর বেড়াইতে গেল না।

তপনের মনের গঠন হয়তো কিছু অদ্ভুত। সে কোনদিন কাহাকেও আঘাত করে না—এমন কি আঘাতের প্রতিঘাত করে না। ইচ্ছা করিলে তপতীকে সে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু কাহাকেও আঘাত দিয়া কিম্বা জোর করিয়া ভালবাসা আদায় করিবার লোক তপন নহে। সে আপনাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে বিকশিত করিতে চায়—ইহাই তাহার সাধনা। তাহার বিষয়-বৈরাগী মন শুধু চাহিয়াছিল একজন সাথী, যাহাকে সে জীবনের পথে দোসর ভাবিতে পারে। কিন্তু অদৃষ্ট তাহার অন্যরূপ। দুঃখ সে পাইয়াছে, কিন্তু সে-দুঃখ সহিবার শক্তিও তাহার আছে।

আজ রিক্ত সর্বস্ব হইয়া মন প্রসারিত হইয়া পড়িল জন-কল্যাণের বিপুলায়তনে। মুক্তির মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইল বন্ধনের ইঙ্গিত। সকালে খাইতে বসিয়া তপন কহিল,—আমি একুশে শ্রাবণ একটু মাদ্রাজের ওদিকে যাব, মা, কন্যাকুমারিকা তীর্থের দিকেও যেতে হবে।

—মাদ্রাজ? —অতদূরে তোমার কি কাজ, বাবা? মা ম্লানমুখে প্রশ্ন করিলেন।

তপন হাসিয়া বলিল,—দূর আর কোথায় মা? তারপর একটু থামিয়াই বলল,—

> "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
> রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করোনি!'

তপতী চা খাইতেছিল। কথাটা সে শুনিয়া কিছু উন্মনা হইলা পড়িল।

—কতদিন দেরী করবে, বাবা? মা সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

—দেরী একটু হবে বইকি, মা—কাজটা শেষ করবো তবে তো?

আর কোনো কথা না বলিয়া তপন চা-পান শেষ করিল—এবং উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

তপতী একটু ইতস্তত করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ও মুখ্যু মানুষ, মাদ্রাজে গিয়ে কি করবে, মা? আমাদের অফিসের কাজ কিছু?

—কি করে জানবো, বাছা, তুই তো জিজ্ঞেস করলেই পারিস। আর মুখ্যু ও মোটেই

নয়, এটা এতদিনেও বুঝতে পারলিনে তুই। তোর বাবা ওর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তপতী চুপ করিয়া রইল। মা বিরক্ত হইয়াছেন। আর কোনো কথা না বলাই উচিত। তপন যে মূর্খ নয় ইহা তপতীও জানে, আর জানে, মাদ্রাজ যাওয়ার অছিলায় আরো কিছু টাকা তপন বাগাইবে। তা নিক, টাকা তাহার বাবার যথেষ্ট আছে, তপন তো সকলেরই মালিক হইবে একদিন, কিম্বা হয়তো সত্যই কোনো কাজ আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তপতী কহিল—আমায় আজ একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে বোলো, মা! আমি বললে ও এড়িয়ে যায়।

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা বলো দেবো। কিন্তু এড়িয়ে যেতে দিস কেন তুই?

উত্তর না দিয়া তপতী আসিল আপন ঘরে। বিকালে সে আজ তপনকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে—দেখিবে তাহার অন্তরে তপতীর স্থান কোথায়। বৈকালিক জলযোগের জন্য তপন আসিবার পূর্বেই তপতী রক্তাম্বরা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তপন আসিতেই মা তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলেন,—খুকী বললে তুমি নাকি এড়িয়ে যাও বাবা—তাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে।

—আচ্ছা মা যাচ্ছি। আমার কাজ থাকে, দু'একদিন আগে বললে সময় করে রাখি।

তপন গিয়া গাড়ীতে বসিল—তপতী আসিয়া বসিল পাশে। গাড়ী চলিতেছে। নির্বাক চোখের ঠুলিটার মধ্য দিয়া সোজা সামনের রাস্তায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—বামে যে একটা সুসজ্জিতা নারী অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অস্তিত্বও যেন তপন ভুলিয়া গিয়াছে। তপতী উসখুস করিতে লাগিল। সোজা কোনো কথা জিজ্ঞেসা করিতেও তাহার বাধিতেছে, কথাই-বা কহিবে কিরূপে। যাহাকে সে অপমানে, আঘাতে বিদলিত করিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত এভাবে বেড়াইতে আসাই তো চরম নির্লজ্জতা! কিন্তু তপন তো আসিল, এতটুকু অসম্মতি জানাইল না? অন্যদিনও সে আসিবে তাহার স্বীকৃতি ছিল—অথচ কোনো কথা বলে না কেন! বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তপতী আপনার ডান হাতটা তপনের দুই হাতের ফাঁকে চালাইয়া দিয়া ষ্টিয়ারিংটা ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—এই দিকে যাবো—

অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত গাড়ীটার ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া তপতীর নির্দেশমতো পথেই তপন গাড়ী চালাইল। একটু দূরে কয়েকজন কলেজের মেয়ে বেড়াইতেছে, স্থানটা বেশ ফাঁকা।

তপতী বলিল,—এখানেই নামা যাক একটু—কেমন?

তপন গাড়ী থামাইল। নিজে নামিয়া তপতী ভাবিল, তপনও নিশ্চয় নামিবে ; কিন্তু তপন গাড়ীতেই বসিয়া আছে মাথা নিচু করিয়া। তপতীর কেমন লজ্জা করিতে লাগিল তপনকে সঙ্গে আসিতে বলিতে। সে খানিকটা চলিয়া গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—একা যাবো নাকি?

তপন নিঃশব্দে নামিয়া তাহার অনুগমন করিতেছে। তপতী যা-হোক একটা কিছু বলিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল,—ঐগুলো বুঝি গাংচিল? নয়?

—হ্যাঁ—বলিয়াই তপন নীরব রইল।

এই নিষ্ঠুর ঔদাসিন্য তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। তাহার কলকাকলির স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যেন। তপনকে কথা কহিবার অধিকার দেওয়ার পরও তাহার এতটা নীরবতা

হেতু কী! তপতী আবার বলিল,—ঐ নৌকোটা কোথায় যাচ্ছে?

—তা তো জানিনে।

তপন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা একটিও বলিবে না? নৌকোটা কোথায় কোন্ চুলোয় যাইতেছে, কে তাহা জানিতে চায়! তপন কেন বোঝে না?—'মানুষের যাত্রাপথও এমনি—কোথায় যাবে জানে না'—তপতী পুনর্বার হাসিমুখেই বলিল।

তপন কোনোই উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিল। তপতী ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কথাই যদি না বলে তো সঙ্গে বেড়াইবে কিরূপে! কিন্তু হয়তো তপন এখনও রাগিয়া আছে। অপমানটা তো কম হয় নাই! তপতী কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য সোজা প্রশ্ন করিল,—মাদ্রাজে ক'দিন দেরী হবে?

ঠিক বলতে পারিনে—মাস দুই তো নিশ্চয়ই।

দু'মাস! এতদিন কি করিবে সে? কিন্তু প্রশ্ন করিলে যদি তপন ভাবে তাহার কর্ম্মের অযোগ্যতা লইয়া তপতী ব্যঙ্গ করিতেছে। তপতী আর প্রশ্ন করিল না। কিন্তু তপনের রাগ করার প্রমাণ সে পাইতেছে না। কী কথা আরম্ভ করিবে তপতী? কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রশ্ন করিল,—জামা-কাপড়গুলো তো আর একটু—ভালো করলেই হয়?

তপন মৃদুস্বরেই উত্তর দিল,—জীবনে অনেক-কিছু না পেয়ে প্রাপ্ত বস্তুর উপরও আর শ্রদ্ধা নেই!

তপতী রাগিয়া উঠিল, ভণ্ডামীর আর জায়গা নেই যেন! কিন্তু রাগ চাপিয়াই হাসিয়া বলিল,—'ওঃ বুদ্ধদেব! ত্যাগ শেখা হচ্ছে?'—তপতীর কণ্ঠে সুস্পষ্ট ব্যাঙ্গের সুর ধ্বনিয়া উঠিল।

বিস্ময়ের সুরে তপন কহিল,—বুদ্ধদেব তো কিছু ত্যাগ করেননি! তিনি তাঁর পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য ছেড়ে অগণ্য মানবের হৃদয়-সিংহাসনে রাজ্য বিস্তার করেছেন। ত্যাগ কোথায়?

বিমূঢ় তপতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল তপনের দিকে তারপর বলিল—ত্যাগ তবে কাকে বলে?

—ত্যাগ বলে কোনো বস্তু তো নেই। আমরা যাকে ত্যাগ বলি, সেটার মানে এড়িয়ে যাওয়া। আর সত্যকার ত্যাগ মানে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি অর্থাৎ বিস্তার, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, লঘিষ্ঠ থেকে গরীয়ানে।

তপতীর বিস্ময় বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রতি কথায় তপনের মুখ হইতে একি বাণী ঝঙ্কারিয়া উঠে! তপতী এতটা পড়িয়াছে—এমন করিয়া তো ভাবে নাই। এই লোক কি মূর্খ হইতে পারে? অশিক্ষিত হইতে পারে? তপতী আরো কি কথা বলিবে ভাবিতেছে।

কয়েকটি কলেজের মেয়ে আসিয়া তপতীকে নমস্কার জানাইয়া বলিল,—ভাল তো মিস চ্যাটার্জি।

তপনের সম্মুখে সে তাহাকে 'মিস' বলিয়া সম্বোধন করায় তপতীর লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু আরো কিছু অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি—'ভালোই আছি' বলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে চায়।

একটি মেয়ে তপনকে লক্ষ্য করিয়া, হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার সঙ্গীর পরিচয়টা।

তপতীকে কিছু বলিবার জন্য ইতস্তত করিতে দেখিয়া তপন কহিল—আমি সামান্য ব্যক্তি, নাম তপনজ্যোতি।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—তপন মানে সূর্য্য—উনি কিন্তু বরাবর বড়লোক ; কখনও সামান্য নন।

—আমি বড়লোক? কিসে বুঝলেন?

—ঠিক বুঝেছি। যে প্রকাণ্ড গাড়ীখানা!

—গাড়ী দেখেই বুঝি আপনারা বড়লোক ঠাওরান? আমরা, ছেলেরাও তাই শাড়ী দেখে বড়লোক ভাবি?

—ছেলেরা কিন্তু ভুল করে। কারণ, বাড়ী আর গাড়ীতে পয়সা লাগে—শাড়ীর দাম আর কত?

—ছেলেরা মেয়েদের সম্বন্ধে বরাবর ভুলই করে থাকে—কথাটা বলিয়া তপন নিঃশব্দে হাসিল।

—কেন? আপনি কিছু ভুল করেছেন নাকি—মেয়েটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কথাটা বলিল।

—না—আমি মেয়েদের এড়িয়ে চলি যথাসম্ভব।

—ভয় করে বুঝি?

—আগে করতো। এখন টিকা নিয়ে ফেলেছি—বসন্ত আর হবে না।

—মেয়েরা বুঝি আপনার কাছে বসন্ত।

—মারীভয়! তাকে কে ভয় না করে বলুন? প্রমাণ তো ইতিহাসে যথেষ্ট রয়েছে ট্রয়ের ধ্বংস, লঙ্কার দহন।

—কিন্তু ভালোও তো বাসেন দেখছি!

—বাসি। মানুষ যাকে ভয় করে, তাকে ভালোও বাসে। প্রমাণ ভূত। ভূতকে ভয় করি বলেই তার গল্প অবধি শুনতে ভালবাসি আমরা। কিন্তু ভূতকে এড়িয়ে যেতে চাই।

আপনার যুক্তি কাটাতে না পারলেও কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছিনে।

—আমি নিরুপায়—বলিয়া তপন নমস্কার জানাইল।

অতি সাধারণ কথাতেও তপন যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারে, তপতী আজই প্রথম তপনকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে ; দেখিল, সুশিক্ষিতা কলেজের মেয়েদের সহিত আলাপে তপনের কোথাও জড়তা নাই। কেন তপতী এতদিন উহাকে লইয়া বেড়াইতে আসে নাই? তপনকে লইয়া তো তাহাকে অপদস্থ হইতে হইত না।

মোটরে গিয়া তপতী চালকের আসনে বসিল। সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিদল কুলায় ফিরিতেছে। তপন সেই দিকে চাহিয়া আপন জীবনের কথা ভাবিতেছে—আর তপতী ভাবিতেছে উহার সহিত ভাব করিবার কী কৌশল আবিষ্কার করা যায়। হঠাৎ তপতী ব্রেক কসিয়া থামাইয়া দিল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথের দু'ধারে ফুটিয়া আছে অজস্র বন্য কুসুম—তপতী নামিয়া তাহাই কতকগুলি তুলিয়া লইল আঁচলে। একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—আপনি চালান, আমি ফুল পরবো—তপতী উঠিতেই তপন নিঃশব্দে চালকের আসনে সরিয়া গিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এই নিতান্ত নির্লিপ্ততা তপতীর অন্তরকে জাগ্রত করিতেছে। তাহার আধুনিক মন ভাবিতেছিল ফুলগুলি তপন স্বহস্তে তাহাকে পরাইয়া দিবে, কিন্তু ও তপতীর সহিত অসহযোগ আরম্ভ করিল নাকি? তপতী বার বার চাহিয়া দেখিল—তপন অনড়—দৃষ্টি

সম্মুখের দিকে হইতে একচুল নড়ে নাই। আপনার সুদীর্ঘ বেণীতে পুষ্পগুচ্ছ গুঁজিয়া তপতী বেণীটাকে এমনভাবে ফেলিয়া দিল যাহাতে তপনের বাম বাহুতে উহা পড়িতে পারে। তপন নির্বিকার। তপতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। এই কঠিন পাষাণ-মূর্তিকে লইয়া সে করিবে কি? রাগই যদি তপনের হইয়া থাকে, তবে না-হয় দু'চার কথা শুনাইয়া দিক্—তপতী সহ্য করিবে। কিন্তু এই নীরবতা একান্ত অসহ্য। তপতী ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল,—কথা তো ভালোই বলতে পারেন চুপ করে কেন আছেন এখন।

—কথা না বলেও তো অনেক কথা বলা যায়—যেমন কথা বলে ঐ পুষ্পিত শাখা—

কিন্তু আমি শাখা নই, আমি মানুষ—কথা বলবার জন্য আমার ভাষা আছে। আর ভাষাকে সুন্দর করবার জন্য আমি অনেক তপস্যা করেছি—

—আমার মৌনতাকে আমি সুন্দর করতে চাই—তাই হোক আমার তপস্যা।

—অর্থাৎ আমি যা চাই তার উল্টোটা, কেমন? চমৎকার!

তপন চুপ করিয়া রহিল। দিকে দিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সুষমা গান গাহিয়া উঠিতেছে মৌন মহিমায়। মৌনতার এই সুগভীর সৌন্দর্য্য একান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্যেই যেন অনুভব করা যায়। তপতী অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—কাল আসতে হবে বেড়াতে, বুঝলেন? পালাবেন না যেন?

—কাল আমার বোনের বাড়ি যাবো, আসতে পারবো না।

তপতী বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। ঐ বোনটাই তপতীর সর্বনাশ করিতেছে। কোনরূপে ক্রোধ দমন করিয়া সে কহিল—আমি যাবো—নিয়ে যাবেন আমায়? আমি দেখতে চাই, তার সঙ্গে আপনার সত্যিকার সম্পর্কটা কী।

তপন সজোরে গাড়ীটার ব্রেক কষিয়া থামাইয়া দিল। তপতী লাফাইয়া উঠিল স্প্রিং-এর গদিতে। তপন ধীরে শান্ত স্বরে কহিল,—তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যাই হোক, মিস্ চ্যাটার্জি আপনার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। অনর্থক আঘাত করায় কি আপনার লাভ হচ্ছে? আমার সঙ্গে সব সম্পর্কই তো আপনি ছিন্ন করেছেন! আজ আবার বলছি—'আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন! আপনার উপর কোন দাবী আর রাখিনে। আশা করি, আপনিও আমার উপর রাখবেন না।'

তপন তীরবেগে গাড়ীটা চালাইয়া দিল। তপতী বসিয়া রহিল বাক্যহারা ব্রততীর মতো।

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া তপতী হঠাৎ বলিল; সত্যি তাহলে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন?

—হ্যাঁ। আমি আপনার জীবন থেকে অস্ত গিয়েছি।

—অস্ত-সূর্যটি কিন্তু প্রতি সকালে উদিত হন—তপতীর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম হইয়া উঠিল।

—তার জন্য থাকে রাত্রির সুদীর্ঘ সাধনা—ধীরে উত্তর দিল তপন।

—ভালো! রাত্রি সাধনাই করবে!—তপতী আবার বিদ্রূপ করিল।

—আমি কিন্তু সূর্য নই। আমি দূর নীহারিকাপুঞ্জের এক নগণ্য নক্ষত্র, অস্ত গেলে বহু শতাব্দীর পরেও পুনরুদয়ের সম্ভাবনা কম থাকে।...

গাড়ী বাড়ি পৌঁছিল। তপন দরজা খুলিয়া তপতীর নামিবার পথ করিয়া দিল এবং সে নামিয়া গেলে নিজেও ধীরে ধীরে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত্রিটাই দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল তপতীর। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ যেন

আছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার মনের উপকূলে। তপনের সহিত তাহার এই কয়মাসের ব্যবহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া তপতী কুড়াইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, যাহা কিছু দেখে, সর্বত্রই তপন নির্বিকার, নির্দোষ সে না হইতে পারে কিন্তু নির্লিপ্ততা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে! তপতীর বারম্বার অসম্মানের আঘাতেও তপন অবিচল রহিয়া গিয়াছে—আর আজ সেই আঘাতগুলিই তপতীর অপরিসীম লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

তপন তাহাকে মুক্তি দিয়াছে? সত্যিই কি সে আজ তপনের সহিত বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত? বেশ—ভালো কথাই তো। কিন্তু কেন যেন আনন্দ আসিতেছে না। এতদিন যে লোকটিকে কেন্দ্র করিয়া তপতী তাহার দুঃখের বিলাস-কুঞ্জ রচনা করিতেছিল, আজ যেন সে কুঞ্জ সমূলে ধ্বসিয়া গিয়াছে। অবাধ অসীম বিস্তারের মধ্যে আজ তপতী যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে—তপন আর কিছুই বলিবে না। সে বলিয়াছে—'তপতীর উপর তাহার আর কোনো দাবী নাই।' নিতান্ত নিস্পৃহের ন্যায় সহজ সুরেই তপন আজ কথা কয়টা বলিয়াছে। সত্যই কি তাহাকে মুক্তি দিয়াছে তপন? হ্যাঁ দিয়াছে। তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল—শুধু চাহিয়াছিলই নয়, মিঃ ব্যানার্জির কাঁধে মাথা রাখিয়া তপনকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে চাহে না—তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না। এতদিনের এত আঘাতেও যে তপন এতটুকু বিচলিত হয় নাই, সেদিন সেই তপন শরাহত মৃগশিশুর মতো কাঁদিয়াছে,—অজস্র উদ্বেলিত অশ্রুধারায় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে তাহার পূজার বেদীমূল, আর তপতী নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতায় সে কান্না দেখিয়াছে—বিদ্রূপ করিয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে।

তপনকে আজ বলিবার মতো তপতীর আর কি থাকিতে পারে? হয়তো ক্ষমা চাহিবার অধিকারটুকুও তাহার লুপ্ত হইয়া গেছে। হ্যাঁ, তপতী আজ সত্যই মুক্ত, স্বাধীন, স্বাতন্ত্র। কিন্তু তপন আজও রহিয়াছে কেন? সুদীর্ঘকাল বারম্বার অপমান সহ্য করিয়াও যে-লোক এ গৃহ ত্যাগ করে নাই, সে নিশ্চয়ই এত সহজে তপতীকে ত্যাগ করিবে না। না—না—না—তপতী বৃথাই ভাবিয়া মরিতেছে।

আশ্বস্ত হইয়া তপতী খানিকটা ঝিমাইয়া লইল। তপনের চলিয়া যাওয়াটা তাহার পক্ষে কত বড় ক্ষতি ইহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; কিন্তু তাহার থাকায় যে কিছু লাভ আছে; ইহা যেন তপতীর আজ বার বার মনে হইতেছে মা-বাবা উহাকে স্নেহ করেন সে নিশ্চয়ই এই বাড়িতেই থাকিবে। আপাতত তপতীকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছে—'মুক্তি দিলাম'। মুক্তি অত সহজ কিনা? এ-তো আর চার টাকায়-কেনা পাখি নয়! আর যদিই-বা মুক্তি দেয় তো ক্ষতিটা কি? তপতী উহার জন্য কাঁদিয়া মরিয়া যাইবে না। বাড়িতে আছে, থাক্—আরো কিছু টাকা লইতে চায়, লউক! তপতী উহাকে আর বিরক্ত করিবে না। দুজনেই তাহারা আজ হইতে স্বাধীনভাবে চলিবে।

তপতী হাসিয়া ফেলিল। তপন তো তাহার স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করে নাই। তপতী চিরদিনই স্বাধীনা আছে, এবং থাকিবে।

ভোর হইয়া গিয়াছে। বীতবর্ষণ আকাশের কোমল আলোক তপতীর চোখে বড় সুন্দর লাগিতেছিল। উঠিয়া সে স্নান করিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায়; তপনের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল দরজা খোলা। ত্রস্ত তপতী ত্বরিতে আসিয়া

দেখিল তপন পূজায় বসিয়াছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী বহুবার দেখিয়াছে কিন্তু মুখ ভালো করিয়া দেখে নাই। আত্মবিস্মৃতা তপতী ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, জীবনের এই প্রথম। প্রেমাভিসারের এই ক্ষুদ্র আয়োজনটুকুতেই হয়তো তার অনেক সময় ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু আজ একান্ত অকস্মাৎ তাহা ঘটিয়া গেল।

তপনের দুই আঁখি ধ্যানস্তিমিত। শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে যে শান্ত সৌম্য শ্রী, তাহাতে তপতী বুদ্ধদেব ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারে না। তপতী দাঁড়াইয়া রহিল। তপনের স্নানসিক্ত চুল হইতে তখনও জল ঝরিতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছে আপনার বুকের অঞ্চল দিয়া তপনের মাথাটি মুছিয়া দেয়।

তপন চক্ষু মেলিয়াই বিস্মিত হইল। অত্যন্তই সহজ সুরেই প্রশ্ন করিল, কিছু বলতে চান?

—না—কিছু না বলিয়া বিমূঢ় তপতী দাঁড়াইয়া রহিল ; প্রণাম শেষ করিয়া তপন চলিয়া গেল খাইবার জন্য মা'র কাছে, এবং খাইয়া বাহিরে।

সমস্ত দিনই তপন ঘরে ফিরিল না। সেই সকালে গিয়াছে—তপতী অত্যন্ত উসখুস করিতেছে, মাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল বিকালে নিশ্চয় জল খাইতে আসিবে। কিন্তু বিকাল হইয়া গেল, ছয়টা বাজিল, তপন আসিল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কাল তপন বলিয়াছিল বোনের বাড়ি যাইবে। তবে কি আজ আর মোটেই আসিবে না? মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতি বন্ধুগণ তপতীকে বহুক্ষণ হইতে ডাকিতেছেন—নিরাশ হইয়া তপতী নীচে নামিল।

মিঃ বানার্জি কহিলেন,—কী ব্যাপার? যক্ষবধূর মতো চেহারা যে মিস চ্যাটার্জি?

—আমি মিসেস্ গোস্বামী—আজ থেকে মনে রাখবেন—বলিয়া তপতী ওধারে ফুলবীথিকায় চলে গেল।

মিঃ অধিকারী ডাকিয়া কহিলেন,—খেলবেন না একটু?

না—তপতীর কণ্ঠস্বর এত দৃঢ় শুনাইল যে সকলেই থামিয়া গেল।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ফিরিয়া আসিল তপন। মা প্রশ্ন করিলেন,—কি কি খেলে, বাবা বোনের বাড়িতে?

—এই—পাটিসাপ্টা, সরুচাকলী, পানিফলের কি সব—আরো কত-কি খেলাম-মা—

তপতী আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। মা কহিলেন,—বেশ বাবা বোনের বাড়ি তো বেশ খাও—আর এখানে খেতে দিলেই বলবে, 'ভালবাসিনে, মা!'—

বিস্ময়ের সুরে তপন বলিল, কেন মা, আপনি যেদিন যা দিয়েছেন খেয়েছি তো? তবে আমি পরিমাণে কম খাই।

মা পুনরায় কহিলেন,—কিন্তু বাবা, খুকী সেদিন যা-কিছু রান্না করলে, তুমি খেলে না।

তপন অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল! বাহিরে তপতী সাগ্রহে কান খাড়া করিয়া আছে, তপন কি বলে শুনিবার জন্য। তপন ধীরে ধীরে বলিল, কথাটার জবাব দিতে চাইনে মা, ব্যথা পাবেন আপনি।

বিস্মিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—তা হোক বাবা, তুমি বলো,—বলো কিজন্যে তুমি খাওনি? বলো, শুনতে চাই আমি—

—মা'র মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়, মা—তাই বলতে চাইছি নে।

'না বাবা, তোমায় বলতেই হবে।'—মার নির্বন্ধাতিশয্য বাড়িয়া গেল!

নিরুপায় তপন কোমল কণ্ঠে কহিল,—আপনার খুকী তো আমার জন্য কিছু কোনদিন রান্না করেনি,—মা—যেদিন যা-কিছু করেছে, সবই তার বন্ধুদের জন্য। আর আমার বোন আমার জন্য পাটিসাপ্‌টা তৈরী করে আঁচল ঢেকে বসে থাকে—যেতে দু'মিনিট দেরী হলে চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়।—তার সঙ্গে আপনার খুকীর তুলনা করবেন না, মা—সে তো প্রগতিশীলা তরুণী নয়, ভাইএর বোন সে—

মা একেবারে মুক হইয়া গেলেন। বাহিরে তপতীর অন্তর বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এতবেশী 'সেন্টিমেন্টাল' ও! এতো তীক্ষ্ণ লক্ষ্য উহার!

কিছুক্ষণ সামলাইয়া মা কহিলেন,—খুকী বড্ড ছেলেমানুষ, বাবা—বোঝে না।

কলহাস্যে ঘরের বিষাক্ত হওয়াটা উড়াইয়া দিয়া তপন অতি সহজকণ্ঠে কহিল, —আমি কি বলেছি, মা, সে বুড়ো মানুষ। আপনি তো বেশ উল্টো চার্জ্জে ফেলেন। খাওয়া হইয়া গিয়াছে, তপন উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে আসিয়াই তপন করুণ কণ্ঠে কহিল,—কাল আপনাকে কথাগুলো বলে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি মা—সত্যি বলুন, আপনি দুঃখ পাননি?

—তুমি আমার বড় উপকার করেছ, তপন, দুঃখ পাবার আমার দরকার ছিল।

—খুব বড় কথা বললেন, মা—দুঃখ পাবার মানুষের দরকার থাকে। এই পৃথিবীতে দুঃখের চাকায় আমাদের মন-মাটি মানুষের মূর্তিতে গড়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো"

তপন খাইতে আরম্ভ করিল। মা দেখিতে লাগিলেন, দরজার আড়ালে তপতীর অঞ্চলপ্রান্ত দুলিতেছে। ডাকিলেন, আয় খুকী—খাবি আয়।

তপতী আসিতে আজ সঙ্কুচিত হইতেছে। মা বলিলেন, লজ্জা দেখো মেয়ের! আয়। ও কাল কি বললো জানো বাবা, তপন? বললো, তোমার জামাইএর জন্য খাবার করবো বলতে আমার লজ্জা করে—জামাই তোমার বোঝে না কেন?

বিস্ময়ে হতবাক তপন দুই মুহূর্ত পরে উত্তর দিল,—লজ্জার একটা সুমিষ্ট সৌরভ আছে, মা, আপনার খুকীর আচরণে এযাবৎ সেটা পাইনি। কিন্তু মা ও কথা এবার বন্ধ করুন! অপ্রিয় আলোচনা না করাই ভালো, মা।

—হ্যাঁ বাবা, থাক—পাছে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে উঠিয়া পড়ে, ভয়ে মা আর কোন কথাই তুলিলেন না। তপন চলিয়া গেলে তপতীকে কহিলেন,—তোর কিন্তু এতোটুকু বুদ্ধি নেই খুকী, মিছেই লেখাপড়া শিখছিস।

তপতী আজ এই ভর্ৎসনা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার জন্মার্জ্জিত সংস্কার আজ যেন তাহাকে চাবুক মারিয়া বুঝাইতেছে, আপনার স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত সে এত বিদ্যাতেও অর্জন করে নাই। মা'র কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া তপতী হাসিল—এবং আপন ঘরে গিয়া সারাদিন ভাবিয়া একটা প্ল্যান খাড়া করিয়া ফেলিল!

বিকালে জলযোগের জন্য তপন আসিতেই মা কহিলেন—খুকীর বড্ড মাথা ধরেছে, বাবা, ভীষণ কাতরাচ্ছে। ওকে একটু বেড়িয়ে আনো—

—মাথা ধরেছে? কিন্তু আমার সঙ্গে বেড়িয়ে ও বিশেষ কিছু আনন্দ পাবে না, মা—ওর বন্ধুদেব সঙ্গে যেতে বলুন না? গল্প করলে মাথা ধরা সেরে যাবে শিগ্রী।

তপতী সোফায় শুইয়া সব শুনিতেছিল। নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল—থাক মা যেতে হবে না—ওর হয়তো কাজ আছে। না হোক বেড়ানো আমার—

তপন বিস্মিত হইয়া কহিল,—আমি না গেলে বেড়ানো হবে না কেন, বুঝতে পারছি না, মা—রোজই তো বেড়াতে যায়।

তপতীর আর বলিবার মতো কথা ফুটিতেছে না। মা ব্যাপারটা বুঝিলেন। কহিলেন,—এতকাল ছেলেমানুষ ছিল, বাবা, চিরকাল কি আর বন্ধুদের সঙ্গে যায়?

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিষ্ট হাস্যে সারা বাড়িটা মুখরিত হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ যা-হোক, মা, গতকালই বলেছেন, আপনার খুকী ছেলেমানুষ—আর আজই বড় হয়ে গেল! আপনার বাপের বাড়িতে তাই হয় বুঝি? ঝিঙে, বেগুন, করলা দুইবেলা কিন্তু বাড়ে, মা—আপনার খুকী কি তাহলে...

তপনের বলার ভঙ্গীতে খুকী অবধি হাসিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন, দুষ্টুমি কোরো না, বাবা—যাও দুজনে বেড়িয়ে এসো গে—

—আচ্ছা, মা—যথাদেশ—বলিয়া তপন গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট মাইল বেগে গাড়ী চলিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। তপতী বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া বসিয়া আছে। তপনের দৃষ্টি দূর দিক্‌চক্রে সমাহিত। হুড্-শূন্য গাড়ীর উপর দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তপতী মাথাটা টিপিয়া বার দুই 'উঃ-আঃ' করিল। তপন নির্বিকারে গাড়ী চালাইতেছে। তপতী মাথার চুলগুলো এলাইয়া দিল। তপনের চোখে-মুখে লাগিতেছে—তপন মুখটা সরাইয়া লইল। ঘাড়টা কাত করিয়া তপতী পিছনের ঠেসায় রাখিল, তপনের বাম বাহুতে তাহার মাথা ঠেকিতেছে—তপন নির্বিকারে গাড়ীর গতিটা বাড়াইয়া দিল। তপতী 'ওগো, মাগো' বলিয়া মাথাটা তপনের বুকের অত্যন্ত নিকটে আনিয়া ফেলিয়েছে—তপনের নিঃশ্বাস তাহার ললাট স্পর্শ করিবে—তপন অকস্মাৎ গাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্দ করিয়া দিল, এবং একটু পরেই থামাইয়া ফেলিল। ঘাড় তুলিয়া তপতী চাহিয়া দেখিল, গঙ্গার কূলেই তাহারা আসিয়াছে।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া তপন নামিয়া পড়িল। তপতী বিস্মিতা, ব্যথিতা, বিপন্না বোধ করিতে লাগিল। আপনাকে এতখানি অসহায় তাহার কোনদিন মনে হয় নাই। চাহিয়া দেখিল, তপন গঙ্গার জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীও নামিল এবং একটা আকন্দগাছ হইতে ফুলগুচ্ছ ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে দিতে কহিল—'ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায় তার নামটি কি! বলুন তো?'

তপন পিছন ফিরিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তপতীর এই নির্লজ্জ ন্যাকামী তাহার চির-সহিষ্ণু অন্তরকেও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে। যে নারী দিনের পর দিন বিবাহিত স্বামীর অন্তরকে অপমানে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—একবার ফিরিয়া দেখে নাই কতখানি শোণিত ক্ষরণ হইল, যে স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের অঙ্গে শয়ন করিয়া স্বামীর কাছে মুক্তি মাগিয়া লয়—আজ আবার কোন্ সাহসে সে স্বামীর সঙ্গে রঙ্গ করিতে আসে!

ইহাই কি আধুনিকার প্রগতি! কিন্তু তপন কাহাকেও আঘাত করে না—তপতীকেও কিছু বলিল না।

তপতী আশা করিয়াছিল, তাহার কবিতার উত্তরে তপন বলিয়া উঠিবে—তার নাম 'তপতী'। কিছুই তপন বলিল না, এমন কি মুখও ফিরাইল না দেখিয়া তপতী অত্যন্ত

মুষড়াইয়া পড়িল। তাহার এতক্ষণকার ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। নিরুপায়ের শেষ অবলম্বনের মতো সে শুধু বলিল,—বসবেন না একটু?

তপন নীরবে আসিয়া একটু দূরেই বসিল। সবুজ তৃণমণ্ডিত মাঠে একান্ত আত্মীয় দুইটি মানবের একান্ত নীরবতা বুঝি প্রকৃতিকেও পীড়িত করিতেছে—কোথায় একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—'পিউ কাঁহা?' তপতী নির্ভুলভাবেই বুঝিয়াছে, তপন আর কথা কহিবে না! উপায়হীনা তপতী 'উঃ' বলিয়া সেই ঘাসের উপরই তপনের হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

হয়তো সত্যিই উহার কষ্ট হইতেছে! কারুণ্য কোমল তপন সস্নেহে হাত দিল তপতীর ললাটে। মাথা ধরার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই, দিব্যি শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ কপাল, রগ-দুটি যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই টিপটিপ করিতেছে। এই মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী নারীকে তপন বিবাহ করিয়াছে! ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু কিছুই সে বলিল না, তপতীর শীতল মসৃণ কপালে তাহার নিপুণ অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। আরামে তপতীর চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এক এক বার সে ভাবিতেছে তপনের হাঁটুর উপর মাথাটা তুলিয়া দিলে কেমন হয়—কিন্তু থাক, অতটা বাড়াবাড়ি দরকার নাই—যদি নিজেই তুলিয়া লয় তো আরো ভালো হইবে।

—নমস্কার—

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল মিঃ বোস তপনকে নমস্কার করিতেছে। তপতীকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই কহিল,—মাসিমার কাছে শুনলাম আপনার মাথাব্যথা, তাই এলাম সন্ধান করে করে। কেমন বোধ করছেন এখন? অ্যাসপিরিন খাবেন?

মিঃ বোসের এত কথার জবাবে তপতী কিছু না বলিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। তাহার অত্যন্ত রাগ হইতেছে—কি জন্য আসে সেই মিষ্টার বোস? সে স্বামীর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে, মাথা ধরুক আর মরিয়া যাক্—তিনি দেখিয়া লইবেন; মিঃ বোসের অ্যাসপিরিন লইয়া দরদ দেখাইতে আসিবার কী প্রয়োজন! কিন্তু তপতীর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—কাঁটার যে জাল সে এতকাল ধরিয়া নিজের চারিদিকে বয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে হাতপা এক-আধটু ছড়িয়া যাইবেই। অন্য কোনো অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় তপতী কথাই কহিল না। চতুর মিঃ বোস তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে স্বামীর সহিত বেড়াইতে না আসিলে লোকে মন্দ বলিবে! তপতীর আজিকার অভিনয় একটা বিশেষ ধাপ্পা। কহিলেন,

—ওয়েল, মিঃ গোস্বামী, আমি আবার মার্জ্জনা চাইছি আপনার কাছে।

—কি হেতু?—তপন পরম ঔদাসীন্যের সহিত প্রশ্ন করিল।

—সেইদিনকার ব্যাপারটার জন্য সত্যিই আমি লজ্জিত।

তপনের মনটা একেই তো তপতীর লজ্জাকর অভিনয়ে তিক্ততায় ভরিয়া ছিল, তার উপর মিঃ বোসের আগমনের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে চতুরা তপতীর কোনো উদ্দেশ্য যুক্ত আছে কিনা সে বুঝিতে পারিতেছে না—যথা সংযত হইয়াই উত্তর দিল, সে কথা আর নাই-বা বললেন, মিঃ বোস। আর অপরাধ তো আপনার কিছু নয়—ওর

পিছনে ছিল যাঁর সমর্থন, অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে তো, সে তাঁর। কিন্তু যারই হোক—আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। বার বার এক কথা বলার দুঃখ থেকে আমায় রেহাই দিন—এই মিনতি করছি আমি।

তপতীর মাথাটা ভূমি হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া পড়িল। তপন এমনি করিয়া ভাবিতে পারে। মিঃ বোসের কৃত আচরণের অন্তরালে রহিয়াছে তপতীর সমর্থন! তপনের মননশীলতাকে তপতী আজ কি বলিয়া মিথ্যা প্রমাণ করিবে? আর, মিথ্যা তো নয়! তপতীর সমর্থন না পাইলে মিঃ বোসের সাধ্য কি যে তপনের অসম্মান করে। তপতী চাহিল তপনের মুখের দিকে। মুখ অন্যদিকে ফিরানো রহিয়াছে—তপতী বুঝিল, সে মুখে রাগ বা দ্বেষের কোনো চিহ্ন নাই।

মিঃ বোস বড় থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন! একটু সামলাইয়া কহিলেন, আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম, মিঃ গোস্বামী। আজ কিন্তু সত্যিই আপনাকে আমরা বন্ধুভাবে পেতে চাই—নাউ উই মাষ্ট বি ফ্রেন্ডস্।

তপন চুপ করিয়া রহিল। তপতীর মাথায় হাত তাহার সমানে চলিতেছে।

—চুপ করে আছেন যে মিঃ গোস্বামী? আমার বন্ধুত্ব আপনি স্বীকার করলেন তো?

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ বোস—আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কি করে সম্ভব হতে পারে! আমি দীন, দরিদ্র, নগন্য, অশিক্ষিত মানুষ—আপনারা অভিজাত ; আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলা আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয় শুধু, অসম্ভব—

—কিন্তু আমি সেটা প্রার্থনা করছি। আমি চাইছি আপনার বন্ধুত্ব।

—ক্ষমা করবেন মিঃ বোস—আমি জীবনে অসত্য কথা উচ্চারণ করিনি ; আমার অভিধানের 'অত্যাগ সহনো বন্ধু' সঠিক অর্থে আপনাকে পাচ্ছিনে—আপনাকে 'বন্ধু' ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মিঃ বোস নীরব হইয়া গেলেন। অপমানিত বোধ করলেন তিনি। মুখখানি তাঁহার কালো হইয়া গেল। তপন পুনরায় কহিল,—হয়তো আপনি দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? আমার নীতি জগতের কিছুর জন্যই বদলায় না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দু'দিন পড়লো আজই। এর মধ্যে এমন কিছু হয়নি যে, আমার বিরহে আপনি বুক ফাটাবেন বা আপনার জন্য আমি বুক ফাটাবো। অবশ্য, বন্ধু না বলে আলাপী বলা যেতে পারে!

মিঃ বোস যেন বিদ্রূপ করিবার জন্য বলিলেন—এরকম বুক ফাটা বন্ধু আপনার ক'জন আছেন, মিঃ গোস্বামী?

বিদ্রূপটাকে গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া তপন উত্তর দিল,—বেশী তো পাওয়া যায় না, মাত্র একজন আছে।

—আশা করি তিনিও আপনার মতো সংস্কৃত সূত্র মিলিয়ে বন্ধুত্ব করেন?

—তিনি কী করেন, আমার তো জানার দরকার নেই, মিঃ বোস। আমি যা করি তাই আপনাকে বললাম—তপন উঠিয়া গিয়া তপতীর ললাট-আহৃত ক্রীম্‌টার তৈলাক্ত পদার্থটা গঙ্গার জলে ধুইতে বসিল।

মিঃ বোস চাহিলেন তপতীর দিকে সহাস্যে। স্মিতমুখে বলিলেন এমন অদ্ভুত গোঁড়ামী আর দেখেছেন, মিস চ্যাটার্জি? ধন্য আপনার ধৈর্য্য, ওর সঙ্গে এতক্ষণ বসে রয়েছেন।

—আপনার অধৈর্য্য বোধ হয়ে থাকে তো চলে যান—বলিয়া তপতী উঠিয়া বসিল

এবং তপনের অত্যন্ত নিকটে গিয়া বলিল,—চলুন, বাড়ী যাই—ভালো লাগছে না এখানে।

নিস্পৃহের মতো তপন গাড়ীতে আসিয়া বসিল, তপতী পাশে বসিয়াই বলিল,—চলুন, খুব জোরে চালাবেন না লক্ষ্মীটি! ভয় করে।

মিঃ বোস যে ওখানে তখনও বসিয়া আছে তপতী লক্ষ্যমাত্র করিল না। সারা পথ সে তপনের বাম বাহুতে মাথা রাখিয়া চুপ বসিয়া রহিল—তপন একটা কথাও কহিল না, একবারও জিজ্ঞাসা করিল না তপতীর ব্যথাটা সারিয়াছে কিনা।

গাড়ী গেটে ঢুকিতে দেখিয়া তপতী মাথা তুলিল। বুকের আটকানো নিশ্বাসটা যেন তাহাকে রিক্ত-সর্ব্বস্ব করিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছে!

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিতেই মা বলিলেন,—আয় খুকী, কিছু রান্না কর দেখি?

তপতী কুণ্ঠিতপদে আসিয়া কহিল,—আজ থাক মা—ও ভাববে, তুমি আমায় প্ররোচিত করেছ, নিজের ইচ্ছায় আমি রান্না করিনি—দু'দিন যাক্ তারপর রাঁধবো।

মা কথাটার মূল্য উপলব্ধি করিলেন।

তপতী কহিল,—ও তো রবিবারে যাবে, মা, শনিবার একটা পার্টি আছে, ও না গেলে কিন্তু আমি যাবো না—লোকে বড্ড কথা বলে।

—তা তুই বলিস্‌নে কেন? অত লাজুক তো তুই নোস্ খুকী?

—লজ্জা নয়, মা, ও এড়িয়ে যায় নানা ছুতোয়—তুমি তো জানো না—বড্ড চালাক ও! আর দেখো মা, এবার যেন ও থার্ড-ক্লাসে না যায়, বলে দিয়ো তুমি—তপতী একটা বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলিতেছিল। মাকে বলিল,—এটা ওর বিছানার সঙ্গে দিতে হবে, মা, কী লিখবো বলো তো?

মা হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা মেয়ে তুই, কী লিখবি আমি তার কি জানি? নিজে না জানিস, ওকেই জিজ্ঞাসা করিস।

—ও কথাই বলতে চায় না—গম্ভীর মেজাজ! ভয় করে আমার।

মোটে গম্ভীর নয়, খুকী তবে এই ক'দিন বোধ হয় একটু ব্যস্ত আছে, তাই—তপন আসিয়া ঢুকিল খাইবার জন্য। মা হাসিয়া বলিলেন,—তুমি কেন এত গম্ভীর হচ্ছো বাবা, তপন? এর মধ্যে এমন বুড়ো তুমি কিছু হওনি! বড্ড কাজের মানুষ হয়েছো, না? কথা বলো না কেন?

উচ্চহাস্য করিয়া তপন বলিল,—আমাদের বয়সের কাঁটাটা আপনার ঘড়িতে ঠিক আপনার প্রয়োজন মতোই চলে—না মা? কিন্তু কী কথা শুনতে চান—বলুন?

—যে কোন কথা বলো, বাবা—গম্ভীর-হওয়া তোমার মানায় না।

আচ্ছা—"মা যদি তুই আকাশ হতিস, আমি চাঁপার গাছ—

তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হোত কথার নাচ!"

শুনলেন কথা : আপনি আকাশ তো আছেনই, আমি চাঁপা গাছ হতে পারবো বলে মনে হচ্ছে—বোশেখের খররোদে ফুটবে আমার ফুল, যখন আর সব ফুলের মেলা শেষ হয়ে যাবে, সাঙ্গ হয়ে যাবে বাসন্তী-উৎসব।

—মা তপনের বেদনাহত চিত্তের সন্ধান জানেন না ; কিন্তু তপতীর অন্তর আলোড়িত করিয়া আজ অশ্রুসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তপন স্মিতমুখেই খাইতে বসিয়াছে।

মা বলিলেন,—মাদ্রাজে যাবে বাবা, তোমার বিছানাপত্র সব ঠিক করতে হবে। খুকী একটা ওয়াড় তৈরী করছে—কী লিখবে, ওকে বলে দাও তো।

—কিছু তো দরকার নেই বিছানা আমার ঠিক আছে। কিছু লাগবে না, মা!

কোথায় ঠিক আছে, বাবা! তোমার বোনের বাড়ি? তাহলে ওয়াড়টাই নিয়ো শুধু।

ঘরের জিনিস বাইরে কেন নিয়ে যাব, মা—বাইরের জিনিস ঘরে আনাই তো দরকার।

তপতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল! তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রী দেখিয়া মা অত্যন্ত কষ্টবোধ করিলেন, কিন্তু তপনের সহিত বেশী কথা বলিতে তাঁহার ভয় করে। আজন্ম সত্যনিষ্ঠ এই ছেলেটি একবার 'না' বলিয়া বসিলে চেষ্টাতেও 'হাঁ' হইবে না। অন্য কথার জন্য মা বলিলেন,—এবার কিন্তু তোমার রিজার্ভ-গাড়ীতে যেতে হবে, বাবা, কথা শুনো মায়ের।

—ওরে বাপরে! রিজার্ভ-গাড়ীতে তো রোগী আর ভোগীরা যায়, মা! আমি ভোগী তো-নই-ই, আপনার আশীর্বাদে রোগও নেই কিছু আমার।

—দুষ্টুমি কোরো না, বাবা, আজই গাড়ী রিজার্ভ করো গিয়ে ; টাকা নিয়ে যাও।

—আমি তো অফিসের কাজে যাচ্ছি না, মা। নিজের কাজে যাচ্ছি।

—হোলই বা তোমার নিজের কাজ। টাকা নাও—নইলে আমি বড্ড দুঃখ পাবো।

তপন বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। সত্য বলিলে মা বেশী দুঃখ পাইবেন। এই স্নেহশীলা নারীর ব্যথা চোখের সম্মুখে তপন দেখিতে পারে না,—কী জবাব দিবে? ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল,—নিজের কাজটা নিজের টাকায় করা কি বেশী পৌরুষের কথা নয়, মা? সন্তানগর্ব তাতে তো মায়ের বাড়াই উচিত—তপন হাসিয়া উঠিল।

মা নিরুত্তর রহিলেন। এ কথার পর কিছু বলতে যাওয়া চলে না। একটু ভাবিয়া কহিলেন,—কিন্তু থার্ড-ক্লাসে গেলে আমাদের যে অসম্মান হয়, বাবা! তোমার শ্বশুরের দিকটাও তো তোমার দেখা উচিত?

—আচ্ছা মা সেকেন্ড ক্লাসে যাবো—কেমন, খুশী হয়েছেন?

মা চুপ করিয়া রহিলেন। তপতী বুঝিতে পারিল না, মা কেন টাকা লইবার জন্য তপনকে এত ব্যাকুল হয়ে সাধছেন। মা'র কোলের কাছে ঘেঁসিয়া সে কহিল,—পার্টিটার কথাও তুমি বলো মা।

—তুই কেন বলতে পারিসনে, খুকী? শুনছো বাবা, শনিবার তোমাদের একটা পার্টি আছে—যেতে হবে তোমায়, বুঝলে?

—আমার না-গেলে হয় না, মা?-আমি তো কোনদিন যাইনি।

না বাবা, যাও না বলে আমাদের কথা শুনতে হয়। লোকে বলে জামাইকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি। তুমি তো লুকোবার মতো জামাই নও, বাবা—আমাদের সম্মান তুমি রক্ষা করবে তো—

তপন নীরবে খাইতে লাগিল। মা আবার বলিতে লাগিলেন,—এখানে না-থাকলেও অবশ্য কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে থেকেও তুমি সমাজে মুখ দেখাবে না, এ আমাদের বড় লজ্জার কথা। খুকী দুঃখ করে।

আচ্ছা, মা, যাবো—বলিয়া তপন উঠিল।

তপন বাহিরে যাওয়ার পর তপতী মাকে প্রশ্ন করিল,—কিছুই কি নিতে চায় না মা? টাকা নেবার জন্য তুমি এত সাধাসাধি কেন করছো?

—না খুকী, কিছুই নেয় না। ওর দু'শ টাকা মাসোহারার সব টাকাই আমার কাছে জ
রয়েছে, একটি পয়সা কোনদিন নেয়নি।

—তাহলে দু'লাখ টাকা নিয়েছে, শুনলাম যে? সে কথা মিথ্যে?

—না। দু'লাখ টাকা ও নিয়েছে, কিন্তু কি যে করলো সে-টাকা নিয়ে তার কোন খ
পাচ্ছি না আমরা। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়, বাছা—ও অদ্ভুত ছেলে। যদি অপমান বে
করে বলে বসে—'চল্লুম আপনার বাড়ি থেকে', তাহলে নিশ্চয় তখুনি চলে যাবে।

কি করে বুঝলে তুমি? টাকা দু'লাখ নিশ্চয় নিয়েছে মা, নইলে ওর এইসব হিল্লী দিল্লী
যাওয়ার খরচ জুটছে কোথা থেকে?

—ও টাকা সে নিজের জন্য নেয়নি, খুকী। আমায় কতবার বলেছে, 'আপনার স্নেহঋণ
কি করে শুধবো তাই ভাবছি, মা, টাকা নিয়ে আর ঋণভার বাড়াতে চাইনে'। কারও দান
গ্রহণ করে না, কখনও মিথ্যা বলে না ও। একদিন এসে বলল—"দিন মা ভাত।" ভাত
রান্না হয়নি বলে বললাম, 'ভাত তো, রাধিনি বাবা'। তাতে বললে কি জানিস,—বললে
'রান্না তবে করুন, মা—নাহলে চাকরদের ভাত আনিয়ে দিন। ভাত খাব বলেছি, ভাতই
খেতে হবে, নইলে মিথ্যা কথা বলা হবে।' সেই রাত্রে চাকরদের ভাত ওকে দিতে হল
খেয়ে আবার বললে, 'আপনার বাড়িতে চাকররা কেমন খায়, মা, সেটা দেখে নিলুম কেমন
কৌশলে—আপনি বুঝতেই পারলেন না।'

তপতী বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর করুণ কণ্ঠে কহিল,—এসব
কথা তুমি আমায় একদিনও তো বল নি, মা!

—তুই-যে কিছু খবর রাখিস না, তা আমি কেমন করে জানবো, বাছা?

তপতী আর কথা না বাড়াইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ভুল তাহার হইয়া গিয়াছে
অত্যন্ত সাংঘাতিক ভুল, সংশোধনের উপায় আছে কিনা কে জানে!

তপতী সারারাত্রি বসিয়াই কাটাইয়া দিল।

জীবনের ধারাই যেন বদলাইয়া যাইতেছে তপতীর। স্নান সারিয়াই সে আসিয়া
দাঁড়াইল তপনের কক্ষের সম্মুখে! পূজারত তপন স্তোত্র পাঠ করিতেছে,—'শরণাগত
দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে, সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে'। তপতীও সঙ্গে সঙ্গে
আবৃত্তি করিয়া গেল মনে মনে। এমনি কত-কিছুই সে তাহার ঠাকুরদার কাছে শিখিয়াছিল
সবই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এই মহার্ঘ রত্নগুলি রহিয়াছে তাহারই স্বামীর কণ্ঠে। হ্যাঁ
স্বামী! তপতীর যে আজ তপনকে স্বামী ভাবিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছে। কেন সে
এতদিন দেখে নাই তপনকে? কেন এতবড় ভুল করিল। ঐ-যে সুমিষ্ট কণ্ঠের প্রণতি
ঝরিতেছে—

'অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গ-জটাধরায়,
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।।'

কী অপরূপ সুন্দর ঐ শ্লোক-মালা! শেলী, কীটস, বায়রণ, টেনিসন সুন্দর সন্দেহ নাই
কিন্তু ঐ যে—অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি'—উহাই
কি কিছু কম সুন্দর, কম আন্তরিকতাপূর্ণ!

তপতীর মনে হইল, ঠাকুরদা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আজ এই দুর্গতি হইত না। কিন্তু
ঠাকুরদা তাঁহার কাজ যথাসম্ভব করিয়া গিয়াছেন, ষোল বৎসর পর্যন্ত তিনি তপতীকে

শিখাইয়া গিয়াছেন আর্য্যনারীর কর্তব্য—স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি, সমাজের প্রতি। আধুনিক সমাজের সহিত সে পদ্ধতি হয়তো মিলে না কিন্তু তপতী সমন্বয় করিতে পারিল না কেন? কেন সে ঠাকুরদার এতদিনের শিক্ষা একেবারে ভুলিয়া গেল।

তপতীর মনে হইল তাহার পিতামাতাই ইহার জন্য দায়ী। একদিন তপতীর অন্তর ছিল শুদ্ধ হোমাগ্নির মতো পবিত্র, আজ তাহা বাড়বাগ্নি হইয়া উঠিয়াছে। দুটাই অগ্নি, কিন্তু তফাৎ আছে; কত বেশী তফাত তাহা হোমশিখা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। তপতীর মনে পড়িল—জন্মদিনে তপন তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিল—'জীবনে তোমার হোমশিখা জ্বলে উঠুক'—হয়তো আজ তাই হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঋত্বিক্ তো আসিতেছে না! আসিবে, আসিবে, তপতীর জীবনে তাহার পিতামহের আশীর্বাণী ব্যর্থ হইবে না।

তপন উঠিয়া কখন খাইতে গিয়াছে। তপতীও বুঝিতে পারিয়াই খাবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল! মা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—খেয়ে একটু ঘুমো গিয়ে, মা—মা মৃদু হাসিলেন।—লজ্জায় তপতী লাল হইয়া উঠিল। মা হয়তো ভাবিয়াছেন, তপনের সহিত তপতী রাত্রি-জাগরণ করিয়াছে। মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তপতী। কথাটা সত্য হইলে আজিকার লজ্জাটা তপতীর আনন্দেরই দ্যোতক হইতে পারিত ; কিন্তু সত্য নয়। কবে যে সত্য হইবে তাহাও তপতী জানে না। তাহার শ্বাস ভারী হইয়া উঠিল। তপতীর দিকে না চাহিয়াই তপন কহিল,—অধ্যয়ন একটা তপস্যা, মা ভালো করে ওকে পড়তে বলুন—

—হাঁ বাবা, পড়ছে তো, আর তুমি কি করবে, বাবা?—মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

তপন হাসিয়াই জবাব দিল,—'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞবিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ'। ও বিদ্যার চিন্তা করুক, মা, আমি অর্থ চিন্তা করছি। ওর তো অর্থের অভাব নেই।

—তোমার বুঝি বড্ড অভাব? মা প্রশ্নটা করিলেন অভিমানাহত স্বরে।

—অর্থের অর্থটা অত্যন্ত ব্যাপক, মা, তার অভাব আমারও আছে বৈকী। ধরুন—পুরুষার্থ, পৌরুষার্থ, পরমার্থ—অর্থের মানে তো শুধু টাকা নয়।

মা চুপ করিয়া রহিলেন ; তপতী মাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন অত্যন্ত নিম্নস্বরে কহিল,—অনর্থের মূল হয় অর্থটা সময় সময়—

ব্যবহার না জানলেই হয়। ব্যবহারের গুণে বিষও অমৃত হয়ে ওঠে—উত্তরটা তপনই দিল।

তপতী চুপচাপ বসিয়া ভাবিতেছে—তপন তাহার কথায় উত্তর দিয়াছে। আরো কিছু কথা বলিয়া দেখিবে কি, তপতীর উপর উহার মনের ভাব কিরূপ? বলিল,—অনেক সময় বিষকেও আবার অমৃত বলে ভ্রম হয়।

—বিষকে বিষ বলে চিনবার শক্তিটা মানুষ লাভ করে জন্মার্জিত সংস্কার থেকে, আর শিক্ষা দ্বারা অর্জন করে তাকে অমৃতরূপে ব্যবহার করার শক্তি।

মা উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন ; আনন্দিত স্বরে প্রশ্ন করিলে,—বিষ আর অমৃতে তাহলে তফাৎ কোথায় বাবা?

—শুধু ব্যবহারে, মা, আর কোন তফাত নেই। সব-ভালো আর মন্দর অতীত এই বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, পাত্র ভেদে সে বিষ হয়, আবার অমৃতও

হয় ; যেমন—নারী, কোথাও বিলাসের ধ্বংসমূর্ত্তি কোথাও কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তি।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, উঠিয়া যাইতেছিল, তপতী কহিল ধ্বংসমূর্ত্তিকে কল্যাণী-মূর্ত্তি করে গড়ে তোলার ভার থাকে শিল্পীর হাতে।

—হ্যাঁ। কিন্তু শিল্পীর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত লইবার জন্য মূর্ত্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয় বলিয়াই তপন চলিয়া গেল। কিন্তু কী সে বলিয়া গেল। তপতীকে কি তাহার নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত সহ্য করিতে হইবে? হয় হোক,—তপতী সহ্য করিবে। কথায় কথায় যে-লোক বাক্যের এমন ফুলঝুরি ফুটাইতে পারে, অত্যন্ত সহজ ভাষায় অতিশয় আন্তরিকতা দিয়া যে বলিতে পারে—আমি শিল্পী আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই আমার নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে তোমায় নিখুঁত করিয়া তুলিব, তপতী তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে আসুক ঐ রূপকার, আঘাতে আঘাতে তপতীর সমস্ত কুশ্রীতা ঝরাইয়া দিক, ফুটাইয়া তুলুক তপতীর সারা দেহ-মনে অপরূপের মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্য!

তপতীর চোখে দুইবিন্দু জল টলমল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল মা কাছ হইতে। আশ্চর্য্য! এমন না হইলে মা-বাবা উহাকে কেন এত ভালবাসিবেন? তপতী কেন এতকাল দেখে নাই? কেন সে বন্ধুদের কথা শুনিয়া আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকে এমন করিয়া অবহেলা করিয়াছে!

কালই মাদ্রাজ চলিয়া যাইবে। আজ বিকেলে উহাকে পার্টিতে লইয়া যাইতে হইবে দেখিবে সকলে, তপতীর স্বামী অপরূপ, অত্যাশ্চর্য্য!

বিকেলে সুসজ্জিত তপতী অপেক্ষা করিতেছিল, তপন আসিতেই তাহাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং গাড়ী চালাইয়া চলিল। মুখখানি তাহার হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে তাহার অন্তর আজ প্রেমের রক্তিমায়। যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার সহিত তপন ও তপতীকে বসনো হইল। তপন ভাবিতেছে, তাহাকে এভাবে এখানে লইয়া আসিবার কী কারণ থাকিতে পারে তপতীর পক্ষে! তপতী কি আজ এতকাল পরে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল নাকি! না—লোকের কথা বলা বন্ধ করিবার জন্যই তপতী এ খেলা খেলিতেছে! আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য তপতীর মতো মেয়ে সবই করিতে পারে। কিন্তু তপতীর অদ্যাকার আচরণ অত্যন্ত আন্তরিক। তপন নীরবে ভাবিতে লাগিল।

একটি মেয়ে বলিল,—আপনি নিরামিষ খান—এখানে অসুবিধা হবে না তো?

—না, কিছু না। মাংস ছুঁলেই আমাব জাত যায় না।

—তাহলে খান না কেন? গোঁড়া তো আপনি নন দেখছি।

—অনেকগুলো কারণ আছে না-খাবার। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কারণটা হচ্ছে—বহু যুগ ধরে সিদ্ধকরা খাদ্য খেয়ে আর শাকশব্জি খেয়ে মানুষের পাকস্থলী বেশী মাংস খাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। যে-কোন মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলীর সঙ্গে মানুষের পাকস্থলীর তুলনা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

—অন্য কারণটা কি?

—পৃথিবীতে ফল-মূল-শস্যের তো অভাব নেই—মাংস খাওয়া নিষ্প্রয়োজন, অন্ততঃ আমাদের গরম দেশে অলস কর্ম্ম-জীবনে দরকার হয় না মাংস খাবার।

—মাংস কিন্তু শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে!

—ওটা ভুল ধারণা। ঘোড়ার থেকে বেশি শক্তি নেই বাঘের ; থাবা থাকলে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধে বাঘ নিশ্চয় হেরে যেতো। ঘোড়া মাংস খায় না।

তপনের যুক্তির উৎকৃষ্টতা সকলকে আকৃষ্ট করিল। মেয়েটি বলিল,—আরো কোনো কারণ আছে কি আপনার মাংস না-খাবার?

হ্যাঁ, মনের সাত্ত্বিকতা ওতে ক্ষুণ্ণ হয়। মনকে যারা লালন করতে চায় মানুষের মতো করে, এই উষ্ণ দেশে তাদের মাংস না খাওয়াই উচিত। পার্থিব চিন্তার ধারা হয়তো ওতে বিকৃত না হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ওপারের বিষয়ও চিন্তা করে এমন লোকের অভাব নেই।

আলোচনাটা গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে, তরল করিবার জন্য একজন কহিল,—আপনি এতকাল আমাদের কাছে আসেননি কেন বলুন তো? ভয়ে?

অপরাধটা তপতীরই। সে তপনকে লইয়া অসিবার জন্য কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তপন কি বলে, শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল। তপন হাসিয়া উত্তর দিল—অত্যন্ত বেমানান ঠেকবে বলে। পলাশফুল বনেই থাকে—মার্কেটের কাচের ঘরে ওকে মানায় না।

কথাটায় তপনের বিনায়াতিশয্যের সহিত তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ মিশিয়া আছে।

—আমরা বুঝি কাচের ঘরে থাকি।—আমাদের এমনি অসম্মান করবেন নাকি আপনি?—মেয়েটি বলিল।

—ঐ ভয়েই তো আসিনি। আপনাদের সম্মান এবং অসম্মানের দেওয়ালগুলো এত ঠন্‌কো যে ঢুকতে ভয় করে। অতি সাবধানে টেলিফোন করে বলতে হয়—চার ডজন গোলাপ, দু' ডজন ক্রীসান্থীমাম, পাঁচ ডজন কস্‌মস্‌...

তপনের বলার ভঙ্গীতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু যে মেয়েটি অসম্মানের কথা তুলিযাছিল, সে বলিল বিদ্রূপ করিয়া—আর বনে গিয়ে আপনার ঘাড় মট্‌কে আনতে হয়, কেমন?—তপন নিঃশব্দে হাসিল। মেয়েটি পুনরায় বলিল,—আমরা যে কাচের ঘরের সাজানো ফুল, সেটা আপনি প্রমাণ করুন, নইলে ছাড়ছি না।

—না-ছাড়লে অসুবিধা হবে না, কাচের ঘরে ঢুকতে সাধ হয় মাঝে মাঝে।

—তা হলে এবার ঢুকে পড়লেন—কেমন—? মেয়েটি তপনকে ঠকাইয়াছে।

আমার ঢুকবার অনুমতি দিয়ে এবার কিন্তু আপনিই প্রমাণ করলেন যে, এটা কাচের ঘর।—তপন হাসিল।

মেয়েটি আপনার বাক্যজালে জড়িত হইয়া এমন নির্বোধের মতো ঠকিয়া গেল দেখিয়া সকলেই বলিল—যা যা, কথা কহিতে জানিস নে।—লজ্জিত হইয়া মেয়েটিও হাসিতে লাগিল! তপতীর অন্তর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে। এই তপন—তাহার স্বামী যাহার সহিত কথায় পাল্লা দিতে পারে এমন মেয়ে এখানে একটিও নাই?

মিঃ অধিকারী এবং মিঃ বোস আসিয়া দর্শন দিলেন তপনের আসনের পার্শ্বে। মিঃ বোস ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—পুজোর সঙ্গে পার্টির মিক্সচারের ঋষি-সূত্রটা কি তপনবাবু?

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া তপন উত্তর দিল,—মোগলের সঙ্গে খানা-খাওয়া।

মিঃ বোসকে পরাজিত দেখিয়া মিঃ অধিকারী আরম্ভ করিলেন,—টিকির মাহাত্ম্যটা একটু বর্ণনা করবেন, তপনবাবু—আপনার পাঁচালী থেকে?

সদাহাস্যময় তপন তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—

টিকির মাহাত্ম্য-কথা করিব বর্ণন,
অবধান করো সব টিকিহীন জন!
টিকিটি রাখিবে যেবা জয় হবে তার,
টিকি না-থাকায় হারে জজ-ব্যারিষ্টার!
কহিল টিকির কথা বেচারা তপন,
টিকিতে বাঁধিয়া নিয়ো রমণীর মন!

হা হা করিয়া তরুণীর দল কলহাস্যে সভা মুখরিত করিয়া তুলিল। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস রোষে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন—মিঃ বোস কহিলেন,—অত উৎফুল্ল হবেন না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, 'ফুল্‌স রাশ ইন হোয়্যার এঞ্জেল্‌স...মিঃ বোস থামিলেন।

ক্রোধে তপতীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহার স্বামীকে তাহারই সম্মুখে ইহারা 'ফুল' বলিবে এবং তাহা তাহারই জন্য? কিন্তু তপন জবাব দিল, দেবদূতরা বেশী সাবধানী, তাদের পথ গোনাগাঁথার গলিতে, আর বোকাদের পথ দরাজ বড় রাস্তা—তাই এসব ব্যাপারে বোকারাই জয়ী হয় চিরদিন। জয়ী না হলেও তারা মরতে পিছোয় না, চালাক দেবদূতদের মতো লাভ আর লোকসান খতিয়ে দেখবার বুদ্ধি তাদের নেই।

মুখের মতো জবাব হইয়া গিয়াছে। নির্ভীক তপন নিঃসঙ্কোচে নিজেকে 'বোকা মানিয়া লইয়াই যাহা জবাব দিল, তরুণীর দল তাহার প্রশংসা না করিয়াই পারে না।

জনৈকা মহিলা কহিলেন—আপনি বোকা? চালাক কে তবে!

—যাদের 'লাক্' চা-চকোলেট আর চপ খেয়ে দিনে দিনে ফুলে ওঠে। তপন উত্তর দিল।

কথাটার মধ্যে যে হুল ছিল, তাহার বিষ তপতীকে পর্যন্ত কুণ্ঠিত করিয়া দিল। মিঃ অধিকারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—আপনি আর আমাদের চা-চপ খেতে ডাকবেন না, তপতী দেবী, উনি সইতে পারেন না বোঝা যাচ্ছে—

তপতী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—আমি বড্ড লজ্জা পেলাম, মিঃ অধিকারী আমিই আপনাদের কাছে মাপ চাইছি এর জন্যে।—তপতী হাতজোড় করিল।

যেন কোন মহার্ঘ্য বস্তু লাভ করিয়াছে, তপন এমনি ভাবে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, আমিও মাপ চাইছি, মিঃ অধিকারী। কিন্তু রসিকতা করে আঘাত করতে এলে প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এই কথা আমাদের বোকার অভিধানে লেখে। আর আমি শুধু প্রমাণ করে দিলাম যে, বোকা অসুররা মাঝে মাঝে জয়লাভ করলেও স্বর্গরাজ্য পরিণামে দেবতাদেরই, কারণ বোকা অসুররা সেটা রক্ষা করতে পারে না—এ কথা জেনেও তারা স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য হাত বাড়ায়—বোকা কিনা, তাই! স্বর্গ কিন্তু দেবতাদের পথ তাকিয়েই থাকে।

মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস খুসী হইয়া উঠিয়াছেন তপতীর সহানুভূতি পাইয়া। তপন বলিয়া চলিয়াছে তখনও,—আপনারা আমার এই ইচ্ছাকৃত অপরাধটা ক্ষমা না করলেও জয়ী আপনারাই।

তপন কী বলিতে চাহিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস তাকাইয়া রহিলেন। তপতী কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন সে মরতে সহানুভূতি

দেখাইতে গেল! মিঃ অধিকারীরা চটিলে তাহার কি বহিয়া যাইবে? কিছু একটা বলা উচিত ভাবিয়া সে বলিল, খাওয়ার খোঁটা দেওয়া খুব অন্যায়।

তপন কহিল,—চা-চপ-খাদকদের চালাক আর 'লাকী' বলায় কোনো ব্যক্তিকে খোঁটা দেওয়া হয়, আমার ধারণা ছিল না!

—অন্য ক্ষেত্রে হয়তো কথাটা দোষের নয়, এক্ষেত্রে অত্যন্ত অভদ্র শোনাচ্ছে।

তপন নির্বিকার চিত্তে তপতীর কথার উত্তরে মিঃ অধিকারীকে হাসিয়া কহিল,—ভদ্র তো আমি নই, মিঃ অধিকারী—বুদ্ধিও নেই। আমার কথাটা তো আপনাদের সুবুদ্ধি হেসেই উড়িয়ে দিতে পারতো।

একটি তরুণী বলিল,—রিয়েলি! রসিকতা করতে এসে রাগ করা চলে না। আপনারা 'ফুল' বলায় উনি কত সুন্দর করে জবাব দিলেন, আর উনি এমন কিছুই বলেননি যাতে আপনাদের চটে যাওয়া চলে।

মিঃ অধিকারী এতক্ষণে বুঝিলেন, চটিয়া যাওয়া তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। কহিলেন,—আপনাকে এরকম কথা বললে আপনি কী করতেন?

তপন বলিল,—আমার বোকা বুদ্ধিতে চা আর চপ বেশী করে খেয়ে 'লাকী' হতাম।

তপনের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ বোস কহিলেন,—আচ্ছা, যেতে দিন—আসুন, চা-ই খাওয়া যাক আর এক কাপ।

একটি মেয়ে বলিল, তা হলে আপনি সত্যই চালাক হতে চান?

মিঃ অধিকারীর মুখখানা তখনও গম্ভীর ছিল ; বলিলেন,—দিন, খেয়েছি কিন্তু—

তপন হাসিয়া কহিল,—কিছু কিন্তু না, মিঃ অধিকারী, অধিকন্তুটা অনেক সময় আরাম দেয়! যেমন ধরুন—চশমার উপর সান্-গ্লাস, চিবুকের নীচে নেকটাই ; পাঞ্জাবীর উপর চাদর, চামড়ার উপর উল্কী, চায়ের উপর চাঁদমুখ...

হাসিতেছে সকলেই। মিঃ অধিকারীও আর না হাসিয়া পারিল না।

স্মিতমুখে কহিলেন,—রিয়েলি, বাংলা ভাষাটা আপনার আশ্চর্য্য রকম আয়ত্তে—

মিঃ বোস কহিলে,—কিন্তু উনি আমাদের বন্ধু হতে চান না—'সো স্যরি'।

—সার্টেনলি হি উইল বি। নইলে আমরা ওঁকে ছাড়বো না—মিঃ অধিকারী কহিলেন।

তপতী নীরবে চা খাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই যে কঠিন পরিস্থিতির সে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইতে সে মুক্তিলাভ করিল এতক্ষণে। তপতীর মনে এখনও ইহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তপন বুঝিল, ইহাদের এতটুকু অসম্মান আজও তপতী সহিতে পারে না। আর তপনের বেলায়?—'আমাকে এবার যেতে হবে, অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন!" তপন আবেদন করিল।

—না—না—না, ভারী সুন্দর লাগছে আপনার কথা, এখনি কেন যাবেন?

তরুণীর দল তপনকে ছাড়িতে চাহে না। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগকে অসম্মান করিয়াই লোকটা তরুণীমহলে খাতির জমাইয়া ফেলিতেছে! মিঃ বোস কহিলেন, কারও কথায় ওঁর নীতি বদলায় না শুনেছি। অনুরোধ বৃথা!

মিঃ অধিকারীও কথাটায় সায় দিয়া কহিলেন, কাজের মানুষদের আটকাতে নেই।

তরুণীদের একজন চটিয়া বলিল,—আপনারা চান যে, উনি চলে যান, নয়?—রাগটা

সামলাইতে গিয়া মিঃ বোস ও মিঃ অধিকারী চুপ হইয়া গেলেন!—সমস্ত অবস্থাকে সামলাইবার জন্য তপতী কহিল,—না রে, কাজ আছে—যাই আমরা—

—তুই থাম্ তো তপি! ওকে এতকাল কিসের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলি বল?

তপতী কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই তপন হাসিয়া কহিল,—অচল টাকা বার করা বোকামী—লুকিয়ে রাখতে হয় নিতান্ত ফেলে দিতে না পারলে।

তপন উঠিল ; তপতীর মন আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বেদনার সুর। তপনকে সে অচল টাকাই মনে করিয়াছে। বারম্বার আঘাত করিয়াছে হাতুড়ী দিয়া—নখের কোণায় বাজাইয়া দেখে নাই।

গাড়ী চলিতে চলিতে তপন একটা কথাও বলিতেছে না। তপতীর মন বিষাদ সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। কেন সে মিঃ অধিকারীদের সহানুভূতি দেখাইতে গেল? যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়কে অনায়াসে আয়ত্তে আনিবার শক্তি যে তপনের অসাধারণ, ইহা তপতী আজ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। তপন নিজেই তো সমস্ত সামলাইয়া লইল। বরং রসিকতা করিতে আসিয়া চটিয়া যাওয়ার জন্য মিঃ অধিকারী লজ্জাই পাইলেন। কিন্তু তপন কী ভাবিতেছে তপতীর সম্বন্ধে? হয়তো ভাবিতেছে, তপতী আজও উহাদের জান্য তপনকে অভদ্র বলে। এখনও তপতী উহাদের অসম্মান সহিতে পারে না। তপতীর মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

গেটে গাড়ীটা ঢুকাইয়া দিয়া তপন পুনরায় বাহির হইয়া গেল।

প্রেম যখন অন্তরে সত্য-সত্যই জাগিয়া উঠে তখন অনেক কথাই বলি-বলি করিয়া বলা হয় না। সমস্ত রাত্রি তপতী জাগিয়া রহিয়াছে, এতটা সময় চলিয়া গেল, অথচ কিছুই তাহার বলা হইল না তপনকে। কতবার তপতী ভাবিল—ঐ তো ও-ঘরে তপন ঘুমাইতেছে, তপতী গিয়া ডাকিলেই পারে ; কিন্তু লজ্জায় পা চলিতেছে না। এত কাণ্ডের পর তপতী আজ কি করিয়া তপনকে ভালবাসার কথা বলিবে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তপতী আপনাকে নিঃশেষে তপনের কাছে মুক্ত করিযা দিবার কোনো পথই খুঁজিয়া পাইতেছে না! তপন যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়! যদি বলে —কেন এ ছলনা করিতে আসিয়াছ? তপতী সে অপমানও সহ্য করিতে পারে ; কিন্তু তপন হয়তো কিছুই বলিবে না, নীরবে শুনিবে এবং নির্লিপ্তের মতো চলিয়া যাইবে। তথাপি তপতী একবার চেষ্টা করিবেই ; রাত্রিতে আর উঠাইবার কাজ নাই, ঘুমাক, সকালে সময় পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

প্রত্যুষে স্নান সারিয়া তপতী গিয়া দাঁড়াইল খাইবার ঘরে! মাও আসিলেন—তপনের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে।

—কাল পার্টিতে তপনকে দেখে সবাই কি বললো রে খুকী?—মাতার প্রশ্নের উত্তরে তপতী হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর বলিল,—সবাই খুব ভালো বললো।

মা মধুর হাসিয়া বলিলেন,—আমার কথা ঠিক তো? দেখ এবার—

তপতী কিছু বলিল না ; হাসিমুখে লুচি বেলিতে লাগিল। তপন আসিয়া ঢুকিল। এত সকালে আসিবে, মা তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন,—আটটার ট্রেন, বাবা, এত তাড়া কেন তোমার? ছটা তো বাজলো।

—সাতটায় বেরবো, মা,—খাবো, কাপড় পরবো,—একঘণ্টা তো সময়। দিন!

তপন খাইতে বসিল! তাহার ললাটের ত্রিপুণ্ড রেখায় আজ রক্তচন্দনের আভা, পরণে ক্ষৌমবস্ত্র, গলায় উত্তরীয়। তপতী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল এই অসাধারণ পবিত্রতার দিকে। তপন কথা বলিতেছে না দেখিয়া মা কহিলেন,—পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবা, ভুলো না যেন।

না মা, চিঠি দেবো পৌঁছেই!

—খুকী তো স্টেশন যাচ্ছিস 'সী-অফ' করতে?

—না মা, ও কিজন্যে কষ্ট করে যাবে? ফিরতে বেলা হয়ে যাবে অনর্থক। তাছাড়া আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি, বাড়ির গাড়ী নিলাম না—বলিয়া খাইতে লাগিল। তপতী কিছুই বলিতে পারিল না।

বাকী যাহা বলিবার তপতী বলিবে ভাবিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। তপন নীরবে খাইয়া উঠিয়া গেলে মা তপতীকে চা ও খাবার দিয়া বলিলেন,—সুটকেশগুলো গুছিয়ে দিয়েছিস?

দারুণ মানসিক উর্ত্তেজনায় তপতীর সে কথা মনেই ছিল না।

—যাচ্ছি—বলিয়া তপতী তাড়াতাড়ি খাইয়া তপনের ঘরে আসিল, সুটকেস গুছানো এবং চাবিবন্ধ রহিয়াছে। তপনের কাপড় পরাও হইয়া গিয়াছে, একটা চাকর তাহার জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিল। অন্য একজন সুটকেস-দুইটি গাড়ীতে লইয়া গেল। তপনও বাহিরে যাইতেছে,—সম্মুখে তপতীকে দেখিয়া বলিল আচ্ছা—চল্লাম—নমস্কার। তপন চলিয়া গেল মাকে প্রণাম করিতে ; পরে মিঃ চ্যাটার্জিকেও প্রণাম করিল—এবং নীচে নামিয়া গেল।

সম্বিৎলব্ধা তপতী ছুটিয়া নীচে আসিবার পূর্বেই তপনের গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে।

কিছুই বলা হইল না...না, বলিতেই হইবে। তপতী তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী আনাইয়া স্টেশনে ছুটিল। ট্রেন ছাড়িতে মাত্র কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। তপতী ছুটিতে ছুটিতে গিয়া প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াই দেখিল—বোনটির হাত ধরিয়া তপতী দাঁড়াইয়া আছে। মনটা তাহার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু সবলে সমস্ত দৌর্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া তপতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল...মেয়েটা কাঁদিতেছে—উদ্বেল আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। তপন বলিতেছে তাহাকে,—লক্ষ্মী বোনটি, এমন করে কাঁদে না—যাও, স্বামীর কাছে যাও, স্বামীর চেয়ে বড় বস্তু নারীজীবনের আর কিছু নেই, এই কথা তোকে আমি আজন্ম শিখিয়ে এসেছি—ওরে ধর ওকে!—একটি সুন্দর যুবক আগাইয়া আসিল। মেয়েটা কিছুতেই তপনকে ছাড়িতেছে না, হু হু করিয়া কাঁদিতেছে। তপন তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল,—ছি মীরা, এতকালের শিক্ষা আমার সব পণ্ড করে দিবি তুই? চুপ কর্—আয়, ওঠ্, ধরিত্রির মতো সহিষ্ণু হোস্—আকাশের মতো উদার হোস—সূর্যালোকের মতো পবিত্র থাকিস্...

গাড়ী ছাড়িতেছে। তপন পা-দানিতে উঠিয়া পড়িল। চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি মেয়েটা তাকাইয়া আছে, অপসৃয়মান গাড়ীটার দিকে। তপতী যে এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে উহাকে কেহ দেখিলই না। তপন এ মুখে ফিরে নাই, আর ইহারা তপতীকে চেনে না! কিন্তু কেন ও এত কাঁদিতেছে? মাদ্রাজ গেল, কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে, তাহার জন্য এত কান্নার বাড়াবাড়ি কেন। তপতী বিস্মিতা ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কী গভীর কারণ থাকিতে পারে ঐ কান্নার? ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া সে সহানুভূতি

জানাইতে মীরার হাতটা ধরিতে গেল, চমকাইয়া মীরা কহিল,—কে আপনি? তৎক্ষণাৎ তপতীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—ও, লজ্জা করে না আমায় ছুঁতে—হাতখানা মীরা টানিয়া লইল!

তাহার স্বামী বলিল,—ছিঃ ছিঃ, ওরকম করে বলতে আছে?

মীরা সরোষে গর্জিয়া উঠিল,—জুতোর ঠোক্করে নাক ভেঙে দেবো না। দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল, আবার 'লাভার'-এর দেওয়া আংটি হাতে পরে 'সী-অফ' করতে এসেছে। চলো, চলো—ওর মুখ দেখলে গঙ্গা-নাইতে হয়!—মীরা তৎক্ষণাৎ স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

যে কথা কেহ কোনদিন বলে নাই, বলিবার কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারে না, মীরা তাহাই বলিয়া গিয়াছে। তপতীর সমস্ত আভিজাত্য সমস্ত অহঙ্কার ধরার ধুলায় লুটাইয়া দিয়া গেল। 'লাভার'-এর দেওয়া অংটি' হাতে প'রে...তপতী শিহরিয়া আপনার বাম হাতের অনামিকার দিকে চাহিল—মিঃ অধিকারীর প্রদত্ত আংটির হীরকখণ্ডটি জ্বলজ্বল করিতেছে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। আপনার অজ্ঞাতসারেই তপতী আংটি খুলিয়া ফেলিল।

তপন যাহা কোনদিন বলে নাই, মীরা তাহাই নিতান্ত সহজে বলিয়া দিল! বিরুদ্ধে তপতীর কিছু বলিবার নাই। আজ দীর্ঘ পাঁচমাস সে ঐ আংটি পরিয়া আছে। তপতীর চরিত্রের বিরুদ্ধে ঐ জ্বলন্ত জাগ্রত প্রমাণকে লুপ্ত করিবার শক্তি আজ আর কাহারও নাই।

মৃত্যু-পাণ্ডুর তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

—ওর বোনের ঠিকানাটা তুমি জানো মা? তপতী মাকে প্রশ্ন করিল।

—না রে—কেন, তুই জানিস নে? দেখিস্‌নি তাকে তুই?—মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন।

—দেখেছি সেদিন স্টেশনে! কিন্তু ঠিকানা জানবার আগেই চলে গেল।

—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে মা! ওকে একদিন তোর গিয়ে আনা উচিত ছিল।

—তুমিও তো বলোনি মা, আজ বলছো অন্যায় হয়েছে।—তপতীর কণ্ঠস্বর ব্যথা করুণ শুনাইতেছে।

স্বামী বিরহ-বিধুরা কন্যার কথা শুনিয়া মা সস্নেহে বলিলেন,—তপন ফিরে এলেই যাবি একদিন,—আজ বোধ হয় তার চিঠি পাবি তুই।

বিষণ্ণা তপতী বিশুষ্ক মুখে চলিয়া গেল। সে চিঠি পাইবে। এতবড় ভাগ্য সে অর্জন করে নাই আজও। এই দীর্ঘ সাতদিন প্রতিটি মুহূর্ত তপতীর অন্তর ধ্যান করিয়াছে তপনের মূর্তি—কিন্তু তাহার অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে। শুধু দেরী হইলেই হয়তো ক্ষতি হইত না, তপতীর অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার তপনকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে তপতীর অন্তর হইতে তাহার অন্তরতমকে। ভাবিয়া ভাবিয়া তপতী ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পুণ্যশ্লোক ঠাকুরদা যেন তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলেন,—"অ্যাতো শেখালাম, খুকী—সব পণ্ড করে দিলি!" কিন্তু কেন সে এত ভাবিতেছে? তপন তো কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে। মীরা বলিয়াছে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ কথা, কিন্তু তপন তো কোনদিন কিছু বলে নাই। যেদিন সে মিঃ ব্যানার্জীর কোলে শুইয়া তপনের কাছে মুক্তি-ভিক্ষা চাহিয়াছিল, সেদিন...হ্যাঁ, সেদিন কিন্তু তপন অসহ্য বেদনায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

সময় আর কাটিতে চাহে না—কতক্ষণে 'ডাক' আসিবে। তপতী জানে তপন তাহাকে

চিঠি লিখিবে না—কিন্তু মা'র পত্রে খবরটা জানা যাইবে। অতদূর রাস্তা, ইন্টার-ক্লাসে গিয়াছে, ভালোয় ভালোয় পৌঁছাইলেই ভালো।

মা ডাকিলেন,—আয় খুকী—চিঠি এসেছে, পড়—

তপতী পড়িল,—'মা' আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি ; আছি সমুদ্রের কিনারে। এ নীড় কালই ছাড়তে হবে। গতরাত্রে শুনেছি সাগরের অশান্ত কল্লোল ; মনে হচ্ছিল, দুহিতা ভারতের দুর্দশায় বিগলিত-হৃদয় মহাসিন্ধুর আর্তনাদ বুঝি আর থামবে না।

আমার কোটি কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি—তপন।'

সামান্য কয়েকটি লাইন মাত্র। কিন্তু তপতীর মনে হইল, দুহিতা ভারতের দুর্দশায় বুঝি কোনো হৃদয়-সমুদ্র-ক্রন্দনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মাকে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া তপতী আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বিকালে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ বোস, মিঃ অধিকারী ইত্যাদি সব আসিয়াছেন। তপতী যাইতে পারিবে না বলিয়া দিল। মা মেয়েকে একটু অন্যমনা করিবার জন্য বলিলেন,—যা না, মা একটু গল্প কর গিয়ে—না-হয় খেলা করগে একটু—

তপতী অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, যাবো না, যাও।

মা তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া নীরবেই চলিয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন সেই তপতী, যে দিনরাত হাসিখুসি আর গল্প লইয়া মাতিয়া থাকিত, সেই কিনা স্বামী বিরহে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার আনন্দ হইল, হাসিও পাইল। ভাবিলেন, তপন খুকীকে আলাদা পত্র না-দেওয়ায় উহার অভিমানটা হয়তো বেশী হইয়াছে। যা রাগী মেয়ে। তপন যে খুব ব্যস্ত রহিয়াছে সেখানে, ইহা খুকী কেন বুঝিতেছে না।

কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, প্রায় পনের দিন কাটিল, না-আসিল খুকীর চিঠি, না-বা মার চিঠি। মা-ও এখন ভাবিতেছেন। স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনিও তপনের কোনো পত্র পান নাই। তপতীকে ডাকিয়া কহিলেন,—তোকে কি বলে গেছে রে খুকী?

—মাস দুই দেরী হবে, বলেছে, মা। তপতী মৃদুস্বরে উত্তর দিল।

মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তপতী অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া মা আর কোনো কথা তুলিলেন না।

তপতীর কিন্তু মনে পড়িয়া গিয়াছে মীরার কথাটা—'দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল!' সত্যিই কি তাই? সত্যই কি তপন আর আসিবে না? তারই জন্য কি মীরা সেদিন অত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতেছিল? হয়তো তাই—হয়তো তপতীকে সত্য-সত্যই তপন মুক্তি দিয়া গিয়াছে!

তপতী আর অধিক ভাবিতে ভরসা পাইতেছে না। ভাবনার সূত্র ধরিয়া উঠিয়া আসিতেছে মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ বোস, মিঃ সান্যাল—তপনকে অপমান করিতে তপতী যাহাদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে। যাহারা বলিয়াছে,—তপন নির্লজ্জ, উহার মান-অপমান জ্ঞান নাই—তাহারাই আজ অজস্র অবহেলা সহ্য করিয়া তপতীর দরজায় ধরণা দেয়। আর তপন, প্রত্যেকটি কথায় যাহার অনুভূতির মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া যাহার বিনয়ের

মধ্যেও জাগিয়া থাকে যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আভিজাত্য, অপমানকে যে নীলকণ্ঠের মতো আত্মসাৎ করিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া যায়—সেই ঋষির মতো স্বামী তপনকে সে অপমান করাইয়াছে ঐসব পথের কুকুর দিয়া!...বেদনায় তপতীর অন্তর অসাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কী করিবার আছে। ঠিকানা পর্যন্ত দিল না। বোনের ঠিকানাটাও জানিয়া লওয়া হয় নাই। তপতী চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

মিঃ চ্যাটার্জী আসিয়া কহিলেন,—ওগো শুনছো, তোমার জামাই-এর কাণ্ড দ্যাখো—

তপতী তৎক্ষণাৎ কান খাড়া করিল। মা-বলিলেন,—খবর পেয়েছ?

—না। খুকী চিঠি পায় নি?—মিঃ চ্যাটার্জী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

—না।—বলিয়া তপতীর মাতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন! পুনরায় বলিলেন, —কী কাণ্ড তবে?

—অফিসের একটা কেরানীর অসুখ ছিল প্রায় তিন-চারমাস। তপন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। আজ সে ফিরে এসে আমার পায়ে আছড়ে পড়ে বললে—তার অ্যানিমিক্ হয়েছিল, তপন তাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে।

—রক্ত!—তপতী শিহরিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ রে—তুইও জানিস না তাহলে। তারপর হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছে, ঐ রকম রোগীদের কিনে রক্ত দেবার জন্যে। সেই দু'লাখ টাকায় এসবই করেছে বোধ হয়। আমায় বলেছিল—'ভালো কাজেই টাকাটা লাগাবো বাবা!'

দু'লাখ কেন, দশ লাখ তপন খরচ করুক সর্বস্ব বিলাইয়া দিক কিন্তু নিজের রক্ত কেন দিল! কবে সে করিল এ কাজ! তপতীর সারা মন ব্যথা-কন্টকিত হইয়া আসিতেছে। কারুণ্যে শীতলতম স্রোতে অবগাহন করিতেছে, তাহার হৃদয়টা বুঝি-বা ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ একা বসিয়া থাকার পর অকস্মাৎ তপতী উঠিয়া মা'র কাছে গিয়া বলিল,—ওর ঘরের চাবিটা দাও তো, মা?

মা চাবি বাহির করিয়া দিলেন। তপতী আসিয়া ঘরটা খুলিয়া ফেলিল! একটা ছোট টেবিল রহিয়াছে, উপরে মোটা কাচের আবরণের প্যাড। কাচটার নীচে একখণ্ড কার্ড-এ কী লেখা আছে টানিয়া পড়িল তপতী—'আমার বিদায়-অশ্রু রাখিলাম, লহো নমস্কার!'

তপতীর স্নায়ুতন্ত্রী অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সামলাইবার জন্য সে টেবিলের উপরেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল তপনেরই চেয়ারটায়।

কতক্ষণ কাটিয়াছে খেয়াল নাই তাহার মা স্নেহভরা তিরস্কার করিয়া ঢুকিলেন—কি তুই করছিস্, খুকী! স্বামী সবারই বিদেশে যায়, অমনি করে কাঁদে নাকি তার জন্যে? আয় খেতে আয়।

—কাঁদিনি মা, যাচ্ছি—তুমি যাও—যাচ্ছি আমি—

তপতীর কণ্ঠস্বরে মা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িলেন। প্রশ্ন করিলেন,—এমন করে কথা বলছিস্? চিঠি না-পেলে কি অত করে কাঁদে?

—ঠাকুরদা আমায় ঠকায়নি, মা—ঠকায়নি গো, ঠকায়নি!—বলিতে বলিতে তপতী ছুটিয়া গিয়া পড়িল পিতামহের প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিংটার পদপ্রান্তে।

বিমূঢ়া মাতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যথিত মনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্নেহময় পিতা

ছুটিয়া আসিয়া হাজার প্রশ্নে তপতীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিলেন--কিন্তু তপতীর মুখ হইতে শুধু একটিমাত্র কথাই বাহির হইল,—ও আর আসবে না মা, আসবে না!...

দিনের পর দিন করিয়া দীর্ঘ দুইমাস অতীত হইয়া গেল, না আসিল তপন, না-বা তাহার চিঠি। প্রতীক্ষমানা তপতী ম্লান হইতে ম্লানতরা হইয়া উঠিয়াছে। বিশুষ্কা বিবর্ণা হইয়া উঠিয়াছে তাহার রক্তাভ কপোলতল। তপতী আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তপনের, মিঃ চ্যাটার্জীও আর আশা করেন না, কিন্তু তপতীর মা এখনও আশার বুক বাঁধিয়া আছেন—তপন তাঁহার ফিরিয়া আসিবে। এমন ছেলে, হৃদয়ে যাহার অতখানি কোমলতা, সে কি তাহার বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে! নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। হয়তো কোনো বিপাকে পড়িয়াছে। হয়তো অসুস্থ হইয়াছে—হয়তো... না, মা আর অধিক ভাবিতে পারেন না।

তপতীকে প্রশ্ন করা বৃথা ; সে কাঁদে না পর্যন্ত, উদাসদৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে। বাবা একদিন ডাকিয়া বলিলেন,—চল্ খুকী পূজার বন্ধে শিলং যাই, নূতন বাড়িটা দেখস্নি তুই—!

তড়িতাহতের মতো তপতী চমকিয়া উঠিল। ঐ বাড়িতে তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনেব কথা ছিল। নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস কি!

বুদ্ধিমতী তপতী বুঝিতে পারিয়াছে, পিতামাতার হৃদয়ে যে কী দারুণ শেল বিঁধিয়াইছে। তপন তো যাইত না তপতী যে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, একথা কেমন করিয়া সে বলিবে! শত অপমান সহ্য করিয়াও তপন যায় নাই, গিয়াছে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া। কিন্তু যেদিন সে গেল, সেদিন তো তপতী তাহাকে চাহিয়াছিল। তপনের মতো আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছেলে কেন সে কথা বুঝিল না!

চিন্তার কূল-কিনারা নাই। কলেজ হইতে ফিরিয়া সেই-যে তপতী ঘরে ঢোকে, আবার বাহির হয় রাত্রে খাইবার সময়। বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কাহারও সহিত কথা পর্যন্ত বলিতে চাহে না। মা সেদিন বহু কষ্টে তাহাকে বাহির করিয়া 'লেকে' বেড়াইতে লইয়া গেলেন। তপতী জলের ধারে গিয়া বসিতে যাইতেছে, হাসির শব্দে চাহিয়া দেখিল, শিখা এবং মীরা বসিয়া আছে অদূরে একটা বেঞ্চে। তপতী ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল মীরাই বটে। মাকে বলিল, ঐ শিখার কাছে বসে রয়েছে, মা ওর বোন।—মাতা সাগ্রহে বলিলেন,—আয় তবে দেখি—আয় শীগ্গীর—মা তপতীকে টানিতেছেন। কিন্তু তপতীর ভয় করিতেছে। যদি মা'র সম্মুখেই মীরা তাহাকে অপমান করে! করিবেই তো! তপতী যাইতে চাহিতেছে না। মা কিন্তু টানিয়া লইয়া গেলেন। তপতী ধীরে ধীরে করুণ কণ্ঠে ডাকিল শিখা? উভয়েই চকিত চাহিল। শিখা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—আয় বোস।—মীরা কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন,—তুমি তপনের বোন? তোমার দাদার খবর...

—তার তো আর কিছু দরকার নেই। মেয়ের বিয়ে দিন-গে আবার। দাদা এসে মুক্তিপত্রটা রেজেষ্টারী করে দেবেন, যেদিন বলবেন আপনারা।

মা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন,—সেকি কথা মা! কী বলছো তুমি?

অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিল মীরা, কহিল—আপনার খেলুড়ে মেয়ে বুঝি কিছুই বলেনি আপনাকে। বেশ, বেশ, আমি বলে দিচ্ছি। আপনার মেয়ে আমার দাদার কাছে মুক্তি চেয়ে নিয়েছে—স্থির চিত্তেই—যাকে বলে 'কুল ব্রেনে'। দীর্ঘ সাতমাস ধরে দাদা তাকে

ভাববার সময় দিয়েছিল আর সেই সাতমাস আপনার গুণবতী কন্যা আমার দেবতার মতো দাদাকে নিজে অপমান করেছে, বন্ধু দিয়ে অপমান করিয়েছে, শেষকালে একজন বন্ধুর কোলে শুয়ে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছে মুক্তি। যান, এখন সেই বন্ধুটিকে কিম্বা যাকে ইচ্ছে জামাই করুন গিয়ে।—মীরা খানিকটা দূরে চলিয়া গেল। শিখা নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে তপতীর দেহের সমস্ত রক্ত যেন শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছে। মা'র কিছুক্ষণ সময় লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে, কিন্তু তপতীর এই দুই মাসের আচরণ তাঁহাকে চকিত করিয়া দিল—ইহা সত্য, অতিরঞ্জন নহে।

—খুকী!—মা ডাকিলেন। তপতী সাড়া দিতে পারিতেছে না।—এমন সর্বনাশ তুই করেছিস, খুকী? বল—উত্তর দে।—তপতী কাঁপিতেছিল শিখা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। অস্থির হইয়া মা মীরাকে গিয়া ধরিলেন,—তোমার দাদা কি ফিরেছে, মা।

—না, ফিরতে দেরী আছে। কিন্তু তার ফেরায় আপনার আর কী কাজ? আমার দাদা আপনার মেয়ের যোগ্যপাত্র নয় ; যোগ্যপাত্র দেখুন গিয়ে—

কী কথা বলিবেন, মা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। মীরাকে এতটুকু চটানো তাঁর ইচ্ছা নয়। অত্যন্ত সাবধানে তিনি বলিলেন,—মুক্তি চাইলেই কি হয় মা? আমরা ওকে তপনের হাতে দিয়েছি—ও ছেলেমানুষ—যদিই-বা—

মীরা আবার সজোরে হাসিয়া উঠিল,—ছেলেমানুষ! বেশ মা, আপনার ছেলেমানুষ খুকীকে জিজ্ঞাসা করুন তো, রাত বারটার সময় ক্যাসানোভায় ব'সে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণ করার মতলব আঁটা কোনদেশী ছেলেমানুষী?

তপতী রুদ্ধশ্বাসে মীরার কথা শুনিতেছিল ; সরোষে কহিল,—মিথ্যা।

—চুপ কর শয়তানী। আজন্ম সত্যসিদ্ধ তপনের বোন শ্রীমতী মীরা কোনকালে মিথ্যে বলে না। ডাইরীতে তারিখ অবধি লিখে রেখেছি, তোদের দু'জনের ফটো পর্যন্ত তোলা হয়ে গেছে। আর চাস্ প্রমাণ।

মা বুঝিলেন, তপতী বহু দূর আগাইয়া গিয়াছে। তপতী করুণকণ্ঠে কহিল,—প্ল্যানটা আমার নয়, মা, মিঃ ব্যানার্জি বলেছিলেন একদিন—

—বেশ! রাজী হোন-গে এবার—মীরা আরো খানিকটা চলিয়া গেল।

মা মীরাকে কোনরূপে একবার তপতীর বাবার নিকট লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া বলিলেন,—তুমি একবার আমার বাড়ি চলো, মা, ওর বাবাকে সব কথা বলো গিয়ে—

—কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, মা, যার সঙ্গে খুশি আপনার খুকীর বিয়ে দিন-গে—

—হিন্দুমেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয়, মা?

—খুব হয়। আপনাদের আবার হিন্দুত্ব। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান—আপনারা কিছু নন।

—যাবে না, মা একবার? চলো—লক্ষ্মী মেয়ে আমার, চলো!

—যেতে পারবো না—মাপ করবেন। যে বাড়িতে আমার দাদার অসম্মান হয়, সে বাড়ির ছায়াও আমি মাড়াইনে।

—তোমার দাদা তাহলে নিশ্চয় ফিরবে না?

—আমার দাদা আপনার ধন-দৌলতের প্রত্যাশী নয়। আপনার সঙ্গে আর কী সম্পর্ক তার?

ক্রোধে অকস্মাৎ তপতী জ্ঞানহারা হইয়া উঠিল। এই ভণ্ডামী তাহার অসহ্য

বলিল—দু'লাখ টাকা বুঝি খোলাম-কুচি? সেটা গ্রহণ করতে তো বাধেনি?

হাসিতে মীরা ফাটিয়া যাইবে কেন! হাসি থামিলে—বলিল—ঐ দু'লাখ টাকা আপনার দ্বিতীয়-বিয়েতে যৌতুক দিয়ে আসবো গিয়ে!

শিখা ম্লানকণ্ঠে কহিল,—ছিঃ তপি, টাকার কথাটা তুলতে তোর লজ্জা করলো না?

মীরা গিয়ে গাড়ীতে উঠিয়া ডাকিল—আয় রে শিখা? শিখাও চলিয়া যাইতেছে! মা ছুটিয়া আসিয়া তপতীকে কহিলেন,—তুই নিজে একবার ডাক, খুকী! যন্ত্রচালিতের মতো তপতী গিয়া মীরার হাত ধরিল ; বলিল—আসুন—চলুন আমাদের ওখানে—

সরোষে মীরা গর্জন করিয়া উঠিল, ছেড়ে দিন! আপনাকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয়। অকস্মাৎ ক্রোধে তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কী এমন সে করিয়াছে যাহাতে তাহাকে ছুঁলে গঙ্গা-নাইতে হইবে?

সক্রোধে সে বলিয়া উঠিল,—যান যান, আপনার দাদা না এলেও আমার চলবে। গাড়ীটায় ষ্টার্ট দিয়া ষ্টিয়ারিংটা ধরিয়া মীরা অত্যন্ত সহজ সুরে কহিল,—তাই চলুক—

"তোমার যে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়
ভালো-মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিয়ো তুমি বলি!...

মীরা কি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছে! তাহার শান্ত কণ্ঠস্বর তপতীকে অভিভূত করিয়া দিল। এই অত্যন্ত কোপন স্বভাবা মেয়েটি এত সহজে তাহাকে কবিতা বলিয়া আশীর্বাদ করিতে পারে। মীরার হাতটা পুনরায় ধরিতে গিয়া তপতী বলিল,—যাবেন না একবার?

হাতটা সরাইয়া গাড়ীখানা চালাইয়া দিতে দিতে মীরা কহিল,—না, এখনও আমার সময় হয়নি। 'সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে!'

শিখা ও মীরা এক গাড়ীতেই চলিয়া গেল। মা তপতীর সঙ্গে কথা বলিতেও বিরক্তি বোধ করিতেছেন আজ। কী ভয়ানক কাণ্ড তপতী করিয়াছে, অথচ কিছুই তাঁহারা জানেন না। তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া এককোণে বসিল। মা বুঝিলেন, কথা সে আর কহিবে না। বাড়ি যাইবার জন্য তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে শিখা কহিল,—তপতী কিন্তু একেবারে বদলে গেছে, মীরা—বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা।

একটুও বদলায়নি। তুই জানিস কঁচু। ও মেয়ে অত শীগ্‌গীর বদলাবে!

—কিন্তু যদি সত্যি বদলায়, তাহলে কি দাদা নেবে ওকে আবার?—না সে অসম্ভব। ও অন্য কাউকে বিয়ে করলেই আমাদের ভালো হয়।

শিখা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কহিল, দাদা যে নীল গোলাপ ফুটালো—যার জন্য কৃষি-প্রদর্শনী ওকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে, সে গোলাপের নাম 'নীল গোলাপ' কেন দিল জানিস্?

—না ভাই, জানি না তো!—মীরা চাহিল শিখার দিকে।

—তপতীর মার নাম নীলা ওঁর নামটা দাদা অমর করে দিল।

—ওঃ! দাদা একদিন বলেছিল,—শাশুড়ীর স্নেহঋণ কি দিয়ে শুধবো, মীরা—তাই চাষ করতে আরম্ভ করেছি। তাই বুঝি 'নীল গোলাপ'।

উভয়েই চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। মীরাই কথা কহিল,—পুরস্কারের টাকাটা দাদা বোটানী শিক্ষায় দান করেছে।

—আমাকে লিখেছে চিঠিতে। কিন্তু বিদেশে দাদা আর কতদিন থাকবে রে?

—কাজ হয়ে গেছে। এবার ফিরবে, এই মাসেই ; দুজনে একসঙ্গে দেশে যাবো।

মীরার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইতে গিয়া করুণ হইয়া গেল। বলিল, ঐ হতভাগীটাও যেতে পারতো। শিখা, আজ 'ঠাট্টা করে উড়াই সখী, নিজের কথাটাই ! ...কেঁদে কি করবো বল? আমার কতদিনের সাধ, দাদা গল্প বলবে, তার ডানদিকে থাকবো আমি বাঁদিকে বৌদিদি—দুজনায় ঝগড়া করবো আবার ভাব করবো!...সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা মীরা আর চাপিতে পারিল না।

শিখার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। মুছিয়া আস্তে কহিল,—বিয়ের সময় আমি থাকলে এমনটা হোত না। ওর বন্ধুগুলোই ওকে ভুলপথে চালিয়েছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু আমার আশা ছিল, ওর মা ওকে সামলে নেবেন।

—ছন্নমতিকে কেউ সামলাতে পারে না, শিখা। ওর পতন বোধহয় বিয়ের পূর্বেই হয়েছে—ও আর পবিত্র নেই, মনে হয়।

—আমি কিন্তু তা মনে করিনে, মীরা! ওর বাল্যজীবন বড় সুন্দর। আর ও বন্ধুদের কেবল খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতো। কেউ ওর মন কোনদিন এতটুকুও টানতে পারেনি। আজও যে ও কাউকে ভালবাসে তা বিশ্বাস হয় না...হয়তো সে...

বাধা দিয়ে মীরা বলিল,—তাতে ক্ষতি বেশী আমাদের। ও বিয়ে না করলে দাদা শান্তি পাবে না। দাদা ওকে নেবে না, এ সূর্যের মতো সত্য—ভালবেসে ও মরে গেলেও নয়। দাদার সত্য কিছুর জন্য ভাঙে না, শিখা, এ-কথা তুই-ও তো জেনেছিস।

—হুঁ, বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিল,—দাদা মুক্তিটা না দিলেই পারতো। অত শীগ্‌গীর কেন দিল ভাই?

—তুই বন্ধুর দিকটা বেশী মমতায় দেখছিস্ শিখা, দাদার দিকটা তেমনি দ্যাখ্ দেখি। মিঃ ব্যানার্জির কোলে মাথা রেখে সে দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মুক্তিই সে চায়, দাদাকে চায় না। সেদিনের সে-চাওয়ায় তার কোনো ছলনা ছিল না। ছিল সত্য, সহজ চাওয়া।

—কিন্তু আজ সে আবার দাদাকে চাইছে কেন? ভালবাসছে বলেই তো।

—ও প্রেম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, শিখা। দাদা চলে যাওয়ায় ওর নারী গর্বে আঘাত লেগেছে। দাদাকে ও বশ করতে পারলো না বলেই এই আকুতি ওর! তুই এত পড়াশুনা করেছিস এসব কিছু বুঝিস নে। উপেক্ষা সইতে পারে না নারী-হৃদয়। দাদাকে পেলে ও আবার অপমান করবে।

—কিন্তু এবার বিরহের আগুনে খাঁটি হয়ে ও দাদাকে সত্যি ভালবাসতে পারে তো?

—সেদিন যেন না আসে, শিখা, সে-কামনা আর করিস নে। ও যাক্!

শিখা চুপ করিয়া গেল। তপতীর অদৃষ্টের নির্ম্মমতা তাহাকে অত্যন্ত বিমনা করিয়া তুলিছে। তপনের জন্যও মন কাঁদে,—কিন্তু তপন অসাধারণ শক্তিমান মানুষ, সমস্ত দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিবে ; কিন্তু তপতী—যদি সত্যিই সে তপনকে আবার ভালবাসে তবে তাহার জীবন দুঃখের অমানিশার চেয়ে কালো।

—বিনুদার খবর কি রে? কত গরু হলো তোর গোয়ালে? ..মীরা প্রশ্ন করিল।

—তা হাজারখানেক। আমি রোজই যাই ওঁর সঙ্গে দমদম। আজ তুই আসবি বলে গেলাম না।

—দুজনেই তোরা অত গরুর যত্ন করিস্! দুধটা কি করিস ভাই?

—যত্ন করবার লোক রয়েছে। দুধটা বিক্রী করা হয়, এক-চতুর্থাংশ বিলি করা হয় শিশু আর রোগীদের। গোবরে হয় দাদার চাষ-বাড়ির সার। খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না বলে দুধের চাষ করা, ভাই! দেশের লোক দুধ খেয়ে বাঁচুক।

আমার ওঁকে দাদা আদেশ করেছেন, বিনে-মাইনের স্কুল-কলেজ করতে। খরচ অবশ্য দাদার সমস্ত উপার্জন, আমাদের আয় আর দেশের বড়লোকদের তহবিল থেকে আসবে। কিন্তু পড়ানো হবে খাঁটি বৈদিক প্রথায়, আর ছাত্র হবে যাদের এক পয়সা দেবার সমর্থ নেই। আর নারী-বিভাগের কর্মী হবে তুই আর আমি। দাদার মনে কষ্ট আছে, পয়সার অভাবে কলেজে পড়তে পায়নি। তাই গরীবদের জন্যই তার স্কুল কলেজ, কোনো বড়লোকের ছেলেমেয়ে সেখানে ঠাঁই পাবে না!

শিখাও কথাটার কিছু কিছু জানিত। বলিল, আরম্ভ হোক, আমরা তো আছি-ই।

—হয়ে গেছে আরম্ভ। শিবপুরে আমাদের যে হাজার বিঘে পতিত জমি ছিল, সেখানে পাঁচশো খোলার কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়েছে। গেটে লেখা হয়েছে—

'সবার উপর মানুষ সত্য,—তাহার উপর নাই।
মানুষের মাঝে, হে মানুষ—তুমি সত্যেরে দিয়ো ঠাঁই।

শেষের লাইনটা অবশ্য দাদার রচনা—মীরা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

শিখা মীরার মনের তল পাইতেছে না! তপতী-ভাগ্য-বিপর্যয়ে ব্যথিত শিখা মীরার হাস্য শুনিয়া কহিল,—মীরা, দাদা মহীয়ান্, এ কথা তুই জানিস্, আমিও জানি। কিন্তু তপতীর জন্য তোর মন কি এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না আজ?

মীরা মিনিটখানের চুপ করিয়া রহিল ; তারপর বলিল,—সে কথা তোকে অনেকক্ষণ বলেছি সখী, ঠাট্টা করেই আজ ওড়াতে চাইছি আমার সেই একান্ত আপনার কথাটা!—তাহার কণ্ঠস্বরে শিখা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, মীরার দুই গণ্ড অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে!

মা'র মনে যে আশাটুকুও ছিল, তাহা একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। স্বামীকে সমস্ত জানাইতে তিনিও কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তপতী মা-বাবার সম্মুখে আসাটা এড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু এমন করিয়া দিন চলা কঠিন। পূজায় কলেজ বন্ধ হইলে পিতা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—যা হবার হয়ে গেছে ; তুই ভালো করে পড়াশুনা কর। যদি নিতান্তই সে না ফেরে, তখন অন্য পথ দেখা যাবে...

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বাবা তপনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ইহা সে জানে। বাবা আবার বলিলেন,—তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে, তোর সুখের জন্য আমরা সবই করিতে পারি, খুকী—তোর আবার বিয়ে দেব—

কথাটা বলিয়া যেন মিঃ চ্যাটার্জী চমকিয়া উঠিলেন।

তপতী এখন কোনো কথা কহিল না দেখিয়া তিনি 'আঙুর ফল টক' এই নীতি অনুসরণ করিবার জন্যই বোধহয়, এবং তপতীর নিকট তপনকে এখন খাটো করিবার জন্যই হয়তো

বলিয়া উঠিলেন,—এতো গোঁয়ার সে জানলে কি বিয়ে দিতাম। আমারই বোকামী।

মা কথাটা কিন্তু সমর্থন করিতে পারিলেন না, নীরবেই বসিয়া রহিলেন।

—'কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তপতী শিলং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। নাই যদি' আসে তপন, কী সে করিতে পারে! তপনকে পাইলে হয়তো সে সুখীই হইতে পারিত, কিন্তু যদি একান্তই না পাওয়া যায় তো তপতী কি তাহার পিতামাতার বুকে শেলাঘাত করিয়া বিধবার মতো বসিয়া রহিবে! এই কয়দিন ধরিয়া তপতী বারংবার এই চিন্তাই করিয়াছে। যে লোক একটা দিনের জন্য এতটুকু রাগ দেখায় নাই, একটু প্রতিবাদমাত্র করে নাই, সে কিনা একেবারে অকস্মাৎ সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল! তপতী ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহার পিতার কোটি মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি, তাহার অতুলনীয় রূপগুণ, তাহার মাতার এত যত্ন আদর—কিছুই কি তপনকে এখানে ফিরিয়া আনিতে পারে না। থাক, ফিরিবার দরকার নাই, তপতী তাহার ভাগ্য বিধাতার উপরেই নির্ভর করিয়া চলিবে। কিছুই ভয়ঙ্কর অপরাধ তপতী করে নাই, যাহার জন্য তপন তাহাকে এমনভাবে ত্যাগ করিতে পারে। অকস্মাৎ তপতীর মনে পড়িল তপনের কথাটা—'ত্যাগ মানে মুক্তি, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে লঘিষ্ঠ থেকে গরীয়ানে'। হ্যাঁ, মুক্তিই সে তাহাকে দিয়া গেছে! বেশ তপতীও চলিয়া যাইবে।

শিলং-এ আসিয়াই আলাপ হইল মিঃ রায়ের সহিত। রূপবান্ যুবক। সঙ্গীতে তাঁহার অসমান্য অনুরাগ ; আই-এ-এস্ পাশ করিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্রই কার্যে যোগদান করিবেন।

মিঃ চ্যাটার্জী সাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তপতী মাকে বলিয়াছে,—যদি সে একান্তই না আসে মা—আমাকে বিবাহিতা বলে পরিচয় দেবার কি দরকার এখানে—মা-বাবা কোনো উত্তর দেন নাই। তপতী মিস চ্যাটার্জী নামেই সম্বোধিতা হইতেছে। মিঃ রায়ও তাহাই জানিয়া রহিলেন।

কয়েদিনের মধ্যেই মিঃ রায়-এর অসামান্য বাক্‌পটুতা, অনুপম সঙ্গীত কুশলতা এবং বিলাতী ধরণধারণের গুণে তপতীর জ্বরাক্রান্ত মনটা শীতলতার দিকে নামিতে লাগিল। রোজই তাহারা দল বাঁধিয়ে বেড়াইতে যায়—পাহাড়ের গাম্ভীর্য, ঝরণার চাপল্য, পাইন বনের শ্যামল সুষমা চোখ জুড়াইয়া দেয়, মন ভরাইয়া তুলে।

পূজার সময় শিলং-প্রবাসী বাঙালীগণ একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তপতী দুদিনেই তাহার নেত্রী হইয়া পড়িল। এসব কাজে সে চিরদিন দক্ষ। তাহার পটুতা মিঃ রায় দুই চোখ ভরিয়া দেখেন আর বলেন—'দি এঞ্জেল অব পাইন-বন-দি ডিভাইন নাইটিংগেল ..

তপতী রুমাল দিয়া তাঁর গায়ে হাল্কা আঘাত করিয়া বলে 'নটি বয়!...

অভিনয়ের আয়োজন সমারোহে চলিতেছে ; বিজয়ার দিন অভিনয়। কল্যাণী দেবী কহিল,—মিস চ্যাটার্জীর সঙ্গে মিঃ রায়ের বিয়ের দৃশ্যটা বড্ড হাসির।

—কেন?—প্রশ্ন করিল তপতী।

—মিঃ রায় বিলেতে কিছু করে এসেছেন কিনা, কে জানে।

—অভিনয়ে তার কি ক্ষতি হবে?—তপতী রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

—অভিনয়টা মাঝে মাঝে সত্য হয়ে ওঠে কিনা?—কথাটা বলিয়া কল্যাণী হাসিল।

—আপনার কথাটাকে সত্যের মর্যাদা যদি উনি দেন, কল্যাণী দেবী, তাহলে আমি আপনাকে নিজের খরচে বিলেত পাঠাব এনকোয়ারী করতে—বলিলেন মিঃ রায়।

মিঃ রায়ের এই কথায় সবাই হাসিল।

কল্যাণী কহিল,—আপনি তো বেশ চালাক। আমার কথাটাকে ঘুরিয়ে ওর কাছে 'প্রপোজ' করে বসলেন? বুদ্ধি আপনার সত্যি হাকিমের মতো।

অতসী কহিল,—হাকিমের আর দরকার হবে না, হুকুম তামিল করবেন এবার থেকে।

তপতী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল ; হঠাৎ একটু তীক্ষ্মস্বরেই কহিল,—ঠাকুরদা বলতো—'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই?' আপনাদের দেখছি সেই অবস্থা! কিন্তু আমার একটা কথা আছে।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল—কি?

—বিয়ের দৃশ্যটা বাদ না দিলে নাটকের মর্যাদা থাকবে না। বিয়ের বন্ধনে ঐ নায়ক-নায়িকাকে বাঁধা যায় না। নাট্যকার বিয়ের কথাটা মোটে লেখেননি।

—নাটকটা ভালো বলেই আমরা নিয়েছি। কিন্তু পুজোর দিন একটা করুণ নাটক!

তপতী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—এই জগতে বহু মানুষের মনে ওর থেকে ঢের বেশী করুণ নাটকের অভিনয় হচ্ছে—

প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। অর্থাৎ তপতীর কথার প্রতিবাদ করিতে কেহউ উৎসাহ দেখাইল না। তপতীর এরকম কথার উদ্দেশ্য কিন্তু মিঃ রায় বুঝিলেন না। মিলনের দৃশ্যটা তিনিই লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অংশটুকুকেই তপতী পরিত্যাগ করিল কেন?

তপতীকে বাড়ী পৌঁছাইবার পথে একখণ্ড শিলাসনে বসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বিয়ের দৃশ্যটা কেন বাদ দিলেন, মিস চ্যাটার্জী?

তপতী আর্টের দোহাই দিয়া কহিল,—ও বই কেন ধরলেন? আর কি বই ছিল না? জ্যোতি গোস্বামীর বই অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন।

বহুদিনের বিরহের পর প্রিয় মিলনের দৃশ্যটা ভালই জমতো।

না, জমতো না। যাদের এতটুকু কলারস জ্ঞান আছে, তারা বলবে নাটকটাকে খুন করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ মিঃ রায় চুপ করিয়া রহিলেন। বহুদিন তিনি বিলাতে থাকায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না ; প্রশ্ন করিলেন, জ্যোতি গোস্বামী পুরুষ না মেয়ে? খুব ভালো লেখে বুঝি?

জানি না। কিন্তু লেখে অদ্ভুত। বই এর নামও অদ্ভুত 'মুক্তির বন্ধন'।

মিঃ রায় আশ্বস্ত হইলেন। আর্ট না ক্ষুণ্ণ করার জন্যই বোধ হয়, তপতী তাঁহার লিখিত অংশটি ছাঁটিয়া দিল, তপতীর হাতের মালা তিনি সেদিন পাইবেন না। 'বাট্ ইফ্ গ্রেশাস গড্ উইল্‌স'...

বাড়ি ফিরিয়া আপন কক্ষে একাকী বসিয়া তপতী ভাবিতে লাগিল, মিঃ রায় বেশ সুন্দর ছেলে। উহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, অবশ্য তার পূর্বে তপনের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইন-সিদ্ধ করা দরকার। যে আশা সে এতকাল পোষণ করিয়াছে, তপনকে তাড়াইয়া তাহাই ফলবতী হইয়া উঠিল! এ ভালোই হইল। তপনের মতো একজন নিতান্ত গোঁড়া অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক লইয়া সে করিবে কি? তাহার বর্তমানের শিক্ষা-দীক্ষা মোটেই

তপনের উপযুক্ত নয়। মিঃ রায়ই তাহার ভালো।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার কি আছে? কলিকাতা গিয়া আগে বিবাহ বিচ্ছেদটি পাকা করিয়া লওয়া যাক্—তারপর মিঃ রায়কে আরো একটু ভালো করিয়া বোঝা যাক্, এম. এ পড়াটাও শেষ হইয়া যাক্—পরে দেখা যাইবে।

মিঃ রায় কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। আজই তো তিনি প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার মূলে শুধুই কী তপতীর রূপগুণ? না, আরো কিছু আছে, তাহার বাবার টাকা, যে, টাকার জন্য তপনকে তাড়াইয়া দিয়াছে তপতী! কিন্তু এ ভাবনাও ভাবিয়া লাভ নাই। যে তাহাকে বিবাহ করিবে, সেই তাহার বাবার টাকা পাইবে। মিঃ রায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি তো অশিক্ষিত তপন নন! টাকার তোয়াক্কা তিনি নিশ্চয়ই রাখেন না! মুখে পাউডারের পাফটা আর-একবার বুলাইয়া লইয়া তপতী মা'র কাছে আসিল।

মা কন্যার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে, কহিলেন,—তোর গলায় ইংরাজী গানগুলো বেশ মিষ্টি লাগে, খুকী! ক'টা শিখলি?

—শিখেছি তিন চারটা। মিঃ রায়ের শেখাবার পদ্ধতিটা বেশ মা, চট্‌পট্ শেখা যায়।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বেশ ছেলেটি। কথাবার্তা চালচলন চমৎকার!

তপতী বিদ্রুপ করিয়া কহিল, তোমার তপনের চেয়ে নাকি!

মা ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—তার কথা কেন, খুকী। সে তো সব ছেড়ে চলে গেছে'

তপতী বলিল—এখনও বিচ্ছেদটা কোর্ট থেকে পাকা হয়নি। তুমি তো বোকা মেয়ে, বোঝো কচু। দু'লাখ টাকায় ওর পেট ভরেনি, আরো অত্যন্ত লাখ-খানেক চায়—তাই মুক্তিপত্রটা এখনও হাতে রেখে দিয়েছে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—যাক্‌গে খুকী—যেতে দে।

টাকাটাই ওর লক্ষ্য ছিল, মা। আমি যে ওকে নেবো না, সে-কথা ওকে প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ঘর থেকে বার করে দিয়ে। লোকটা এতবেশী চালাক যে, সাত মাস ধরে অভিনয় করে তোমাদের ঠকিয়ে গেল। মাসোহারার টাকাটা তোমার কাছে জমা রেখে ও বোঝালে, কারও দান ও নেয় না,—আর বোকা তোমরা দু'লাখ টাকা দিয়ে দিলে—একটা হিসাব পর্যন্ত চাইলে না।

—কিন্তু অফিসের কেরানীটাকে রক্ত দেওয়া?

তপতীর একটা খটকা লাগিল। পরমুহূর্তেই তাহার তীক্ষ্মবুদ্ধি তাহাকে সাহায্য করিল, কহিল,—ও একটা মস্ত চাল! অফিসের টাকায় তাকে হাসপাতালে রেখেছে—শিখিয়ে দিয়েছে ঐ কথা বলতে, কিংবা দিয়েছে একটু রক্ত, তাতেই কি! শরীরটায় তো রক্তের তার অভাব নেই—যা খাওয়া তুমি খাওয়াতে ওকে!—তপতী আপনার কথায় আপনি হাসিয়া উঠিল।

মারও মনে হইতেছে, হয়তো ইহাই সত্য হইবে। তথাপি তিনি বললেন—না চলে গেলেও পারতো?

—না, ধরা ও পড়াতেই ; তাই জেলে যাবার ভয়ে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। বিস্তর বাংলা বই ও পড়েছে, বুঝলে মা? বাংলা কথা কইলে ওকে কিছুতেই ধরা যায় না।

মা সত্যই আজ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তপন কি তাঁহাদের এমনি ভাবে সত্যই ঠকাইয়াছে।

তপতী আহার সারিয়া শয়নকক্ষে গেল। শয়নের বেশ পরিধান করিতে গিয়া সে আপনাকে বারবার নিরীক্ষণ করিল দর্পণে। নিটোল কপোল আবার রক্তাভ হইয়া উঠিতেছে। কটাক্ষের বিদ্যুত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে পূর্বের মতো! মসৃণ বাহুতে তরঙ্গায়িত হইতেছে দেহের দ্যুতি। রক্তরাঙা ঠোঁটা উল্টাইয়া তপতী আপন মনে বলিল—এই ওষ্ঠে যে প্রথম প্রেমচুম্বন আঁকিবে সে তপন নয়..

ওঃ কি দারুণ ভুল সে করিতে বসিয়াছিল! শরীরটা তাহার ভাঙিয়া গিয়াছিল আর কি! প্রথম জীবনের প্রণয়োচ্ছাস! বোকামী আর কাহাকে বলে? সেই ভণ্ডটার জন্য জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছিল তপতী। গান গাহিতে গাহিতে তপতী শুইয়া পড়িল—'হোয়েন দাই বিলাভেড্ কামস...'

অভিনয়ের দিন আর-একবার মিঃ রায় অনুরোধ করিলেন শেষ দৃশ্যটা জুড়িয়া দেবার জন্য। কিন্তু তপতী দৃঢ়স্বরে কহিল,—না। তাহলে আমি অভিনয় করবো না—বিয়ের বন্ধন আমি সইতে পারিনে।

সকলেই আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া কহিলেন,—অর্থাৎ! বিয়ে আপনি করবেন না নাকি?

কলহাস্যে সকলকে চমকাইয়া দিয়া তপতী কহিল,—বিয়ের চেয়ে বড় কিছু আমি করতে চাই।

মিঃ রায় কহিলেন,—আইডিয়াটা চমৎকার, কিন্তু কী সেটা?

—যিনি আমার বিয়ে করবেন, তিনিই সেটা আমায় বলবেন...

মিঃ রায় ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তা কি হইতে পারে? বিবাহের চেয়ে বড় তো প্রেম! কহিলেন,—প্রেম!

—আমি পাদরী নই যে যিশুকে প্রেম নিবেদন করব।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায় আরো খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—বুঝেছি। আপনার ইচ্ছে 'কম্প্যানিয়েট ম্যারেজ'।

হো হো করিয়া হাসিয়া তপতী কহিল,—আপনার বুদ্ধিতে কুলোবে না, মিঃ রায়, চুপ করুন।

চারদিক অন্ধকার দেখিয়া মিঃ রায় থামিয়া গেলেন।

তপতী কহিল, আমিই বলে দিচ্ছি, শুনুন। বিবাহের চেয়ে বড় হচ্ছে অবিবাহিত ছেলেদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাওয়া!

হাসিয়া কল্যাণী কহিল,—ওটা বুঝি এখন আস্বাদন করছিস?

—চুপ কর, লক্ষ্মীছাড়ি! ওর মাথায় গোবরের গন্ধ!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায়ও হাসিলেন। কিন্তু তপতীকে তাঁহার অত্যন্ত দুর্বোধ বোধ হইতেছে। উহার মনের ইচ্ছাটা কী?

অভিনয় হইয়া গেলে তিনি খানিকটা পথ তপতীর সহিত আসিতে আসিতে কহিলেন,—বিয়ে কি আপনি সত্য করবেন না মিস্ চ্যাটার্জী?

—আমার বাবার ঠিক করা আছে একটি ছেলে। তাকে যদি বিয়ে না করি তো, আপনার কথাটা তখন ভেবে দেখব।

মিঃ রায় কথা শুনিয়া দমিয়া গেলেন। আরো কিছুটা আসিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

তপতী হাসিয়া উঠিল আপন মনে। এক ঢিলে দুই পাখী সে মারিয়াছে। কৌশলে সে

মিঃ রায়কে জানাইয়া দিলো, বিবাহিতা না হইলেও, স্বামী তাহার ঠিক করা আছে—তপনের কথাটা প্রকাশ পাইলেও আর বেশী ভয়ের কারণ থাকিবে না ; দ্বিতীয়ত, মিঃ রায়ের অন্তরে তপতী আরো গভীর ভাবে আসন গড়িবে কিংবা মিঃ রায় তাহাকে ভুলিতে চাহিবেন। তপতী পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। আর সে ঠকিবে না। অবশ্য মিঃ রায়কে বিবাহ করিতে তপতীর কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না ; তথাপি মিঃ রায়ের দিকটাও সে ভালো করিয়া জানিয়া লইতে চায়! কারণ এ বিবাহ অন্তরের নয় বাহিরের।

পরদিন সকালে আসিল একখানি চিঠি—মার নামে—

"বিজয়ার সংখ্যাতীত প্রণামান্তে, নিবেদন, মা, আপনাদের অপরিশোধ্য স্নেহঋণের বিনিময়ে কিছুই আমি দিতে পারিনি। অভাগা ছেলেকে মার্জনা করিবেন।

ইতি—প্রণতঃ তপন

মা চিঠিখানার দিকে চাহিয়াই রহিলেন। কলকাতার একটা ঠিকানা রহিয়াছে! ঐখানে হয়তো আছে সে। উঠিয়া তিনি স্বামীকে গিয়া কহিলেন—আসতে টেলিগ্রাম করে দাও, খুকীর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক্। আর, মুক্তিনামাও তো লিখিয়ে নেওয়া চাই একটা?

মিঃ চ্যাটার্জী খানিক ভাবিয়া বলিলেন—খুকীকে জিজ্ঞাসা করেছো? কী বলে সে?

—না, ওকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। 'টেলি' করে দাও এক্ষুনি প্রি-পেড।

তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করা হইল। উত্তরে তপন জানাইল যে সে ত্রয়োদশীর দিন শিলং আসিবে, কিন্তু উঠিবে হোটেলে।

মা তপতীকে খবরটা জানাইলেন না। আগে আসুক তপন, মা তাহার সহিত কথা বলিবেন, তার পর যাহা হয় করা যাইবে। সত্য বলিতে কি, এখনও তপনের দিকে মন তাঁহার স্নেহাতুর হইয়া রহিয়াছে।

প্রতিদিন সকালে মিঃ রায় আসেন তপতীর সহিত বেড়াইবার জন্য। সেদিনও তপতী সাজিয়া-গুজিয়া মিঃ রায়ের সহিত বেড়াইতে গেল।

পথের ধারে একটা গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, মিঃ রায় একটা ডাল নোয়াইয়া ধরিলেন—তপতী ফুল তুলিয়া খোঁপায় গুঁজিতে লাগিল আর দুই-চারিটা ফুল ছুড়িয়া মিঃ রায়কে মারিতে লাগিল। মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন,—বড্ড বেশী সুইট্...

তপতী আর একগোছা ফুল ছুড়িয়া দিয়া কহিল,—দেখছি কতখানি আমার ইডিয়টের উইট্?

কে একজন মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে খুব কাছে! তপতী যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—তপন। নীরবে তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের বিদ্রূপ-হাসিটা বিদ্যুতের মতোই তপতীর চোখে লাগিল। তপতী চাহিয়াই রহিল তপনের দিকে। মিঃ রায় কহিলেন,—চেনেন নাকি।

—হাঁ—বলিয়া তপতী একটা উঁচু পাথরের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল তপন কোন দিকে যায়। কিন্তু পথের বাঁকে তপন অদৃশ্য হইয়াছে। নিশ্চয় তাহাদের বাড়ি যাইতেছে। তপতী ভাবিতে ভাবিতে আরো খানিক বেড়াইল। ও কেন এখানে আসিল? আর আসিয়াই দেখিল, তপতী মিঃ রায়ের সহিত কেমন স্বচ্ছন্দে খেলা করিতেছে! যদি দেখিয়াছে তো ভালো করিয়াই দেখুক। যে বিদ্রূপের হাসি সে হাসিয়া গেল, তপতী তাহাকে গ্রাহ্যমাত্র করে

না। হয়তো সে ভাবিয়াছিল, তাহার বিরহে তপতী বুক ফাটিয়া মরিবে! হায়রে কপাল!

তপতী মিঃ রায়কে লইয়াই গৃহে ফিরিল। ইচ্ছাটা, তপনকে ভালো করিয়াই দেখাইয়া দিবে, তপতী তাহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই ;—তাহার জীবনে সাথীর স্থান অনায়াসে পূরণ করিয়া লইতে পারে।

—কৈ মা, তোমার সেই ভণ্ড ছেলেটিকে লুকালে কোথায়? বার করো!

মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—তপন এল নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু কৈ সে? এখানে আসেনি?

—না, হোটেলে উঠবে বলেছে। এখানে কাল আসবে বিজয়ার প্রণাম করতে।

তপতী অত্যন্ত বিস্মিতা হইল। হোটেলে উঠবে কেন? এখানে আসতে তো কেহ বারণ করে নাই। মাকে শুধাইল, তুমি জানতে ও আসবে?

—হ্যাঁ, আমিই তো টেলিগ্রাম করেছিলাম আসতে। তোর সঙ্গে একটা পাকাপাকি কথা হয়ে যাক্—আর মুক্তিনামাটাও করিয়েনি।

—বেশ! কিন্তু বলে রাখছি, কথা যা কইবার আমি বলবো।

মা কিছু বলিলেন না। বিকালে তপতী সুসজ্জিত হইয়া মিঃ রায় সমভিব্যাহারে চলিল তপনের সহিত দেখা করিতে হোটেলে। তাহার আর সবুর সহিতেছিল না। মিঃ রায়কে লইয়া গিয়া তপতী এখনি দেখাইয়া দিবে যে কত সহজে তাহার যোগ্য স্বামী সে লাভ করিতে পারে।

তপন একটা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পাইন-বনের দিকে চাহিয়া ছিল।

নমস্কার, তপনবাবু! প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের ওখানে না-ওঠার জন্য। অনর্থক একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট্ না-করে ভালোই করেছেন!

তপন ফিরিয়া চাহিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন! মীরার কাছে শুনেছিলাম আপনি অসুস্থা। আশা করি ভালো আছেন এখন?

হ্যাঁ ভালো। আসুন মিঃ রায়, আলাপ করিয়ে দিই। এর সঙ্গে আমার হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিল একদিন। আর তপনবাবু, ইনি মিঃ বি. সি. রায়, আই-সি-এস বাঙলায় অনুবাদ হচ্ছে বোকা চন্দ্র রায়—তপতী হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ওঁর সঙ্গে আমার ভাবী সম্বন্ধটা আশা করি আপনি অনুমান করতে পারছেন?

মৃদুহাসির সহিত নমস্কার করিয়া তপন বলিল, বড্ড সুখী হলুম, মিঃ রায়। প্রার্থনা করি আপনাদের জীবনে যেন নেমে আসে পাইন বনের শীতল শান্তি, আর এই নির্ঝরিণীর নন্দিত কল্লোল। বসুন, চা খান একটু।

তপন বয়কে চা আনিতে বলিল।

আশ্চর্য! বাংলা ভাষাটা উহার কণ্ঠে কী বিদ্যুতের মতোই খেলিতে থাকে। কী কবিত্বময় ভাষা!

তপন মিঃ রায়কে বলিল, কোথায় কর্মস্থান হলো আপনার? বাঙলার বাহিরের নয় তো?

না, নদীয়ায়। বড্ড ম্যালেরিয়ার দেশ। তাই ভাবছি—

ম্যালেরিয়া বুভুক্ষু ব্যাধি। আপনাদের তো কিছু ভয়ের কারণ নেই?

অনুপ্রাস না দিয়ে কি আপনি কথা বলেন না, তপনবাবু? তপতী প্রশ্ন করিল।

অনুপ্রাসটা চ্যবনপ্রাসের মতো উপাদেয় আর উপকারী। তপন মৃদু হাসিল।

কথা বলার আর্টটি আপনি চমৎকার আয়ত্ত করেছেন! তপতীও মৃদু হাসিল।

চা আসিলে তপন স্বহস্তে তিন পাত্র প্রস্তুত করিয়া মিঃ রায়কে ও তপতীকে দুই পাত্র দিয়া নিজে এক পাত্র লইয়া। কি কথা বলিবেন মিঃ রায় বুঝিতে পারিতেছেন না। তপতীও কিছুটা উন্মনা হইয়া রহিয়াছে।

তপন কহিল,—মীরা আপনার কাছে বড্ড অন্যায় করেছে, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। আপনি শিক্ষিতা, ওর মতো একটা পল্লী-মেয়ের দোষ নেবেন না।

তপতীর বিস্ময় ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। তপনের ইহাও কি ভণ্ডামী? সংযতকণ্ঠে কহিল, না, কিছু মনে করিনি। আপনি আমাদের ওখানে যাবেন না?

আজ একটু খাসিয়া-পল্লীতে যাবার কথা আছে, এখনি বেরুবো।

সেখানে কী দরকার? চলুন তাহ'লে আমরাও যাবো ঐদিকে।

তপন বিস্মিত হইল তপতীর এই আহ্বানে। কিছু না বলিয়া সে বাহির হইল উহাদের সঙ্গে। তিনজনেই নির্বাক চলিতেছে; প্রত্যেকের মন যেন একটা গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

পথের ধারে একটা উঁচু ডালে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া আছে। তপতী মিঃ রায়কে বলিল,—দিন না ফুলটা পেড়ে?—মিঃ রায় দু'একবার লাফ দিয়াও ডালটা ধরিতে পারিলেন না। আপনার চাদরের খুঁটে একটা ছোট পাথর বাঁধিয়া তপন ডালের উপর ছুঁড়িল। সরু ডালটা নুইয়া পড়িতেই মিঃ রায়কে ডাকিয়া বলিল—তুলে নিন ফুলটা—মিঃ রায় ঘাড় উঁচু করিয়া ফুলটি তুলিতে যাইতেই তাঁহার চোখে পড়িল ডালের ঝরা একটা কুটা। মিঃ রায় ফুল না তুলিয়াই চোখে রুমাল চাপিয়া মাথা নীচু করিলেন। তপনই নিজেই শাখা-সমেত ফুলটি ছিঁড়িয়া আলগোছা তপতীর হাতে ফেলিয়া দিল, তারপর পরম যত্নে রায়ের চোখের উপরের পাতাটি নীচের পাতার মধ্যে ঢুকাইয়া চোখ মর্দন করিয়া দিতেই কুটাটা বাহির হইয়া আসিল।

এখনও তপন তাহাদের উপর এতটা সহানুভূতি কেন দেখায়—তপতী ভাবিয়া পাইতেছে না। মিঃ রায়কে সে লইয়া আসিল তপনকে আঘাত করিতে, আর তপন কিনা পরম যত্নে তাহারই সেবা করিতেছে। এতটুকু বিচলিত হইল না, লোকটা আশ্চর্য!

—পাইন-বন আপনার কি রকম লাগছে?—তপতী প্রশ্ন করিল নীরবতাটা অসহ্য বোধ করিয়া।

সহাস্যে তপন উত্তর দিল,—মায়ের মুখের প্রশান্ত-স্নিগ্ধতার মতো স্নেহমাখা।

দূরের একটা আবছা পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তপতী কহিল—ঐ পাহাড়টা?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতির মতো বিষাদময়।

কয়েকটা পুষ্পিত বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া তপতী বলিল,—ঐ ফুলবীথিকা?

রূপসী মেয়ের সিঁথির মতোই সুন্দর সুকুমার, ওদের সীমান্তের শোভা অক্ষয় হোক! তপতী হার মানিয়া গেল।

একটা নির্ঝরিণীর দিকে আঙ্গুল তুলিয়া তপতী মিঃ রায়কে কহিল—এবার আপনি বলুন ঐ ঝরণাটা কেমন লাগছে।

মিঃ রায় কহিলেন—আপনার দোদুল্যমান বেণীর মতন।

হাসিয়া তপতী কহিল,—'ইউনিভার্স্যাল' হলো না। আপনি বলুন তো তপনবাবু!

—মৌন গিরিরাজের মুখর বাণী, বিষণ্ণা বনানীর আনন্দ-কলগান, স্থিরা ধরিত্রীর অস্থির আঁখিজল...

একটা খাসিয়া মেয়ে দূরে বসিয়া আছে, তপতী কহিল,—বলুন মিঃ রায় ঐ মেয়েকে কেমন লাগছে?

মিঃ রায় বলিলেন,—ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তবু বলছি—নির্জন পাহাড়ের পটভূমিকায় যেন একখানি জীবন্ত ছবি।

তপতী খুসী হইয়া কহিল,—খুব নতুন না হলেও সুন্দর। এবং আপনারটা বলুন!—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে।

তপন কহিল,—কিন্তু আপনারও একটা বলবার আছে আশাকরি, বলুন সেটা!

তপতী কহিল—অলকার অলিন্দে বিরহিনী বধূ—এবার আপনারটা বলুন।

তপন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল চমৎকার। আমারটা আর থাক্।

—না বলুন—বলতেই হবে—তপতী খুকীর মতো আবদার ধরিল।

আমি যদি অদ্ভুত কিছু বলি?—তপন মৃদুমধুর হাসিল।

তাই বলুন—যা আপনার ইচ্ছে বলুন! তপতীর আগ্রহ অদমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

তপন বলিল,—মরণের বীথিকায় জীবনের উচ্ছ্বাস, জীবনেব যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী—

সরু রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে খাসিয়া-পল্লীর দিকে। তপন হাসিমুখে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। তপতী পরমাশ্চর্য্যের সহিত কবিতাটির টীকা করিতে আরম্ভ করিল মনে মনে। কী বলিয়া গেল তপন ঐ কবিতার মধ্যে? তপতী চিন্তা করিতেছে দেখিয়া মিঃ রায় কহিলেন,—ওর কবিত্ব আপনাকে মুগ্ধ করলো নাকি, মিস চ্যাটার্জী?

—জেলাস হবেন না, মিঃ রায়। ওর কবিতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আর ও জেলাস হয় না।

—না, না, জেলাসি কিসের? ও তো আপনাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছে, ও কি যোগ্য আপনার?

তপতী তড়িতাহত হইয়া উঠিল। স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়াছে। না তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল। চাহিবার পূর্বে সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও তপন তাহাকে মুক্তির কথা বলে নাই। মুক্তি দিবার সময় ও বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এবং মুক্তি দিয়া অজস্র উদ্বেলিত ক্রন্দনে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল তাহার পূজার বেদীমূল!

তপনের অযোগ্যতা কোথায়! ঐ সুন্দর আনন্দশ্রী, ঐ অদৃষ্টপূর্ব সংযম, ঐ হীরকদীপ্ত বাক্যালাপ—তপতীর অন্তর যেন জুড়াইয়া যাইতেছে। একমাত্র অপরাধ তপনের, সে দুই লক্ষ টাকার হিসাব দেয় নাই। নাই দিল—টাকা তো সে চুরি করিয়া লয় নাই, চাহিয়া লইয়াছে!..

তপতী বাড়ি ফিরিতে চাহিল। মিঃ রায় আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। তপনকে তাঁহার অত্যন্ত ভয় করিতেছে। লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির—হিমাচলের মতো অবিচল, আবার সাগরের মতো সঙ্গীতময়। কহিলেন তিনি,—আর একটু বেড়ানো যাক্-না—আসুন ঐদিকে—তপতীর ভালো লাগিতেছে না। নিতান্ত নিশ্চিন্ততায় সে যে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে এমন করিয়া নিঃশেষে মুছিয়া দিতে পারে, সে কে! মানুষ না পাথর—না দেবতা?

—আর বেড়ানো না, মিঃ রায়—চলুন! বাড়ি যেতে হবে আমায়—বলিয়াই তপতী

ফেরার পথ ধরিল। অগত্যা মিঃ রায়ও ফিরিলেন। সারা পথ নীরবে তপতী হাঁটিয়া আসিল: মিঃ রায়ও কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

রাত্রি গভীর।

আপন কক্ষে বসিয়া তপতী চিন্তা করিতে লাগিল তপনের প্রত্যেকটি ব্যবহার, প্রত্যেকটি কথা—যতদূর মনে পড়ে। মনে পড়ল, তাহাকে জন্মদিনে দেওয়া অশোকগুচ্ছের সহিত ঋষিজনোচিত আশীর্বাদ ; মনে পড়িতেছে অদ্যকার কবিত্বময় আশীর্বাণী ; মনে পড়িয়া গেল—'জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী' কি বলিয়া গেল তপন ঐ কথাটার মধ্যে? তপতীর বিরহে তপন এতটুকু ব্যথা পাইয়াছে, তাহা তো তপতীর কোনদিন মনে হয় নাই। কিন্তু আজিকার ঐ কথাটা হ্যাঁ, উহাই তপনের অন্তরবেদনার আত্ম প্রকাশ—মধুরতম, করুণতম কিন্তু বিষাক্ত জ্বালাময়।

তপতীর অন্তর তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তপনের মর্মমাঝে তবে আজও আছে তাহার আসন!

ঠাকুরদা যদি একবার আসিয়া তপতীকে বলিয়া যান—প্রেমের নবীনতম বাণী তাহাকে শুনাইবে ঐ তপন, তবে তাঁহার আদরের তপতী আজ, বাঁচিয়াই যাইবে!—তপতী আচ্ছন্নের মতো শয্যায় পড়িয়া রহিল। চিন্তাশক্তি তাহার বিলুপ্ত হইয়াছে যেন!

সকালে নিয়মিত সময়ে মিঃ রায় আসিবামাত্র তপতী জানাইল, বেড়াইতে যাইবে না।

মিঃ রায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—বেড়াইবার জন্যই তো এখানে আসা মিস চ্যাটার্জি।

—সেটা আপনাদের পক্ষে। আমার আসা অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

—কে করেছে অপমান আপনাকে? মিঃ রায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

—ঐ তপন! ও আমার নারীত্বকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছে ; আমার প্রেমধারাকে পাষাণের মতো প্রতিহত করছে, আমার বন্ধনকে বিদায়ের নমস্কারে বঞ্চিত করেছে...বলে গেছে—'আমার বিদায় অশ্রু রাখিলাম, লহো নমস্কার।'

তপতী হু হু করে কাঁদিয়া ফেলিল। বিস্ময়-সমুদ্রে নিমজ্জিত মিঃ রায় নির্বাক হইয়া গেলেন। তপতী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—বিকালে আসবেন, মিঃ রায়! ও আসবে সেই সময়। আর শুনে রাখুন, ওকে আমি আজও ভালবাসি, আমার শিরার শোণিতের মতো—বুকের স্পন্দনের মতো,—জীবনের যাতনার মতো।

তপতী চলিয়া গেল অন্যত্র। মিঃ রায় মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন, তপতী তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বিকালে সুসজ্জিতা তপতী বেণী দোলাইয়া বসিয়া রহিল তপনের অপেক্ষায়। কয়েকটি নারী এবং পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মিঃ রায়ও শেষ চেষ্টা দেখিতে আসিয়াছেন। তপতী বললে,—ওকে যে ঠকাতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবো।

সলিলা বলিল,—ভারি তো! একটা পুরুষকে ভেড়া বানাতে কতক্ষণ লাগে?

মাধুরী বলিল,—অত্যন্ত সহজে জব্দ করে দিচ্ছি—দাঁড়া।

মিনতি বলিল,—পদ্মবনে পথভ্রান্ত পথিক করে ছাড়বো ওকে। কাঁটার ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবে।

—তপতী বলিল,—ও কিন্তু তপন, পদ্মরাই ওর পানে চেয়ে থাকে।

মিঃ রায় ভ্রূকুটি করিলেন তপতীর শ্রদ্ধাভরা কথা শুনিয়া। বলিলেন,—গোলাপবাগে গুব্‌রে পোকার মতো করতে পারলে তবে জানি।

তপতী মিঃ রায়ের অন্তরের ঈর্ষ্যা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, গোলাপবাগের ও গোপন

মধুকর, গুব্‌রে পোকার মতো ও ভ্যান্‌ভ্যানায় না! ও থাকে গোপন অন্তঃপুরে!

এমনভাবে কথা বলিতে পারিয়া তপতী যেন অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমনই দেখাইতেছে তাহার চোখ দুটি। আপনার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কণ্ঠে যেন আজ তপনের ভাষার মাধুরি ঝরিতেছে। ইহাই কি বৈষ্ণব সাহিত্যের 'অনুখন মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই'।

মিঃ রায় বিপদ বুঝিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তপন আসিয়া প্রথমেই বাড়ি ঢুকিয়া মিঃ চ্যাটার্জী ও মিসেস চ্যাটার্জীর পাদবন্দনা করিল। অতঃপর সকলকে বিনীত নমস্কার জানাইয়া আসনে বসিল।

প্রথমালাপের পর সলিলা বলিল, আপনার কথা অনেক শুনেছি, চোখে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যাদুকর।

—আমার ভাগ্যটাকে অন্যের ঈর্ষার বস্তু করে তুলবেন না, মিস গুপ্তা, জগতে যাদুকরের আদর এখনও রয়েছে।

কিন্তু আপনিই-বা অনাদৃত কিসে?

—না—তবে, আদরটা আমার সহ্য হয় না—তুষারের পরে যথা রৌদের আদর উত্তপ্ত বালুতে যথা আদর অশ্রুর।

কথাটার কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। একটা হাসির কিছু আলোচনা হইলেই ভালো হয়। মাধুরী বলিল, ওসব কথা থাক, চায়ের মজলিসে হাসির গল্পই জমে ভালো।

মিঃ রায়ের পটুতা এ-বিষয়ে সর্বজনবিদিত ; কহিলেন, রাইট, হাসি সব সময়ে কাম্য।

অন্যপ্রান্ত হইতে তপতী কহিল, সবারই মন সমান নয়। মানুষকে মানুষ করতে কান্নাই সক্ষম। আপনার মতটা কি বলুন তো? তপতী সাগ্রহে চাহিল তপনের পানে।

বিস্মিত তপন ভাবিয়া পাইল না, তপতী তাহাকে লইয়া আজ কী খেলা খেলিবে। তপতী আজ অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মৃদুহাস্য সহকারে সে কহিল ওঁর মতটাকেই তো প্রাধান্য দেওয়া উচিত আপনার।

সুমিষ্ট একটা ধমক দিয়া তপতী কহিল, চুপ। আমার মত কারও মতের অপেক্ষা রাখে না। আমার মত আমার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত, মুক্ত স্বাধীন,—বলুন এবার আপনারটা—

আরো বিস্মিত হইয়া তপন ধীরে ধীরে কহিল, আমার মতে, হাসির মধ্যে কান্না আর কান্নার মধ্যে হাসিকে দেখতে শেখাই কাম্য। পৃথিবীর তিনভাগ অশ্রু-সাগর মাত্র এক ভাগ হাসির দ্বীপপুঞ্জ। আপাতদৃষ্টিতে মনোরম কিন্তু কুমীরের মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে আসার মতো আনন্দদায়ক হলেও অস্বাভাবিক। হাসির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু কান্নার প্রয়োজন ততোধিক, আনন্দ থেকেই হাসির উদ্ভব, কিন্তু গভীরতম আনন্দ কান্নাতেই প্রকাশ পায়। তাই মনে হয়, হাসি-কান্নাতে মূলত কোন তফাত নেই।

মিনতী বলিয়া উঠিল, বড্ড দার্শনিক প্রবন্ধের মতো শোনাচ্ছে। সহজ হাসি চাইছি আমরা।

তপন বলিল,—সহজ কথাটা পাত্রভেদে বদলায়। যেমন কাঠবিড়ালের গাছে ওঠা আর উদ্‌বিড়ালের জলে নামা।

মিনতী পুনরায় কহিল—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আমাদের চেয়ে আপনি উৎকৃষ্ট পাত্র?

তপন কহিল, উৎকৃষ্টতার প্রশ্ন অবান্তর। পৃথিবীর কাঞ্চনের প্রয়োজন থেকে কাচের প্রয়োজন কম নয়। এমন কি, ক্ষুদ্র কেঁচোরও প্রয়োজন আছে।

মুখ-টেপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তপতী। কাচ-ভ্রমে সে তপনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। সে কহিল, আছে, কাগজি লেবু থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁচকলার অবধি প্রয়োজন আছে।

সকলেই মৃদুস্বরে হাসিতেছে। তপনের ভাষাটাকে এভাবে অনুকরণ করিয়া তপনকে সমর্থন করার জন্য মিঃ রায় ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কথার হুল ফুটাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, কাচপোকারাও—কেমন?

তপতীর দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আজ তপনকে অনুসরণ করিতেছে—কিন্তু মিঃ রায় যে ইহা সহিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝিতে তপতীর মুহূর্ত বিলম্ব হইল না! কহিল, হ্যাঁ, কাচপোকাও ভালো যেমন ভালো কাচের কুঁজোর জলের থেকে কৃষ্ণসাগরের কালো জল।

তপতীর এই উচ্ছ্বাসময় বাণী বিহ্বল করিয়া গিয়াছে সকলকেই। তপন সমস্তই বুঝিল। তাহার দৃষ্টি নিবিড় বেদনায় নির্নিমেষ হইয়া উঠিয়াছে। মৃদুস্বরে কহিল,—ক'কারে কথা কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে তপতী দেবী।

মৃদু হাসিয়া তপতী উত্তর দিল,—কাপুরুষের গায়ে কাদাই ছিটানো উচিত। তাঁহাকেই কাপুরুষ বলা হইতেছে ভাবিয়া মিঃ রায় ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—কাপুরুষের উল্টো লোকটি কে এখানে, মিস চ্যাটার্জী?

তপতী কহিল, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যারা সম্মুখ-যুদ্ধে পিছোয় না, যেমন আপনি।

আমি! তাহলে কাপুরুষটি কে আবার?

তপনের দিকে আঙুল তুলিয়া কহিল,—ঐ ইডিয়ট, ঐ ভণ্ড, ঐ জোচ্চর।

সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। মিঃ রায় আনন্দিত হইতে গিয়াও যেন ধোঁকায় পড়িয়া কহিলেন,—ছিঃ ছিঃ, মিস চ্যাটার্জী, কি সব বলছেন আপনি?

আপনাকে বারণ করেছি না আমায় 'মিস চ্যাটার্জী বলতে? বলবেন না আর।

কিন্তু আপনি ওঁকে অত্যন্ত অপমান করছেন, মিস চ্যাটার্জী...

মিঃ রায় বাধা পাইলেন। তপতী সজোরে ধমক দিল, শাট্ আপ! ফের মিস চ্যাটার্জী?

তপতীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, খুকী হয়তো তপনের সহিত কিছু একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া তপন কুণ্ঠিত স্বরে কহিল—ওঁরা অতিথি, ওঁদের অসম্মান করতে নেই। মা, ওঁকে বারণ করুন!—তপন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল মা'র পানে।

অকস্মাৎ তপতী চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ বেণীটাকে চাবুকের মতো ব্যবহার করিল তপনের বাম বাহুতে—সপাৎ সপাৎ! চীৎকার করিয়া বলিল,—ওরা তোমার অতিথি, তুমি ওদের সম্মান করবে...আর তোমার বিবাহিতা পত্নীকে ওরা বার বার অসম্মান করবে 'মিস, বলে—নিশ্চিন্ত বসে দেখবে তুমি।...কেন? কিসের জন্য বলো—তপতী আবো একটা আঘাত করিল সজোরে।

এই অকস্মিকতার আঘাতে নিথর হইয়া গেছে রঙ্গভূমি। তপনের সুগৌর বাহুতে প্রত্যেকটি আঘাত রক্তলেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। মা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—কি তুই করলি, খুকী।

ক্রোধ-কম্পিত তপতী চাহিয়া দেখিল তপনের শোণিতাক্ত বাহু! উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহার সীমান্ত লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তের উপর—তপতী যেন আজ ঐ রক্ত দিয়াই তাহার

শুভ্র সীমান্ত রঞ্জিত করিয়া লইবে! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—বড্ড জ্বালা করছে না?

তপতীর আকুল কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট নিরুপায় তপন নির্লিপ্তের মতোই যেন বলিল,—এমন কিছু না। কাঁদবার কি হয়েছে? সেরে যাবে—তারপর তপতীর মাথাটি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া মাকে বলিল,—মা, ধরুন ওকে,—পড়ে যাবে এখুনি—

মা গিয়া তপতীকে ধরিলেন। তপতী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে! একটা নীরব নমস্কার জানাইয়া তপন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে—তপতী ছুটিয়া গিয়া তাহার পথরোধ করিল,—যাচ্ছ যে?

—আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি, তোমায় গ্রহণ করবার সাধ্য আর আমার নেই।

বিস্ময়ে তপতীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল—মুক্তি দিয়েছো?'

—হ্যাঁ। আমার সত্য বজ্রের চেয়ে কঠোর, মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর। সত্যভঙ্গ করে তোমায় আমার সহধর্ম্মিণীর আসনে আর বসাতে পারবো না—

তপন চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমূঢ়া তপতী পড়িয়া যাইবে, তপন ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া স্নেহের শীতলতম মাধুর্য্যে কহিল,—এতদিন পরে এমন করে কেন তুমি আজ এলে তপতী? তুমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীল আকাশের বিপুল বিস্তারে পাখা মেলো—আমার ধরার ধুলিতে পড়বে এসে তার ছায়া—একটি মুহূর্তের তরে যেখানে তুমি গ্রহণ করলে তোমার আসন! মুক্তির সেই অবাধ অধিকারে রইল আমাদের চিরমিলনের আকুতি...

তপন চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ তপতীর আর্ত চীৎকারে দিগ্‌প্রান্তধ্বনিত হইয়া উঠিল,— ঠাকুরদা—ঠাকুরদা...

দিন, মাস, বর্ষ চলিয়া যাইতেছে...

বিশাল 'তপতী নিবাসে,' তপনের পরিত্যক্ত কক্ষটিতে বসিয়া থাকে তপতী—একা, আত্ম-সমাহিতা কুণ্ঠিত পিতা আসিয়া বলেন—তোর আবার বিয়ে দেবো, খুকী, তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে...

নিয়তির মতো নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে তপতী উচ্চারণ করে—তাই বুঝি ঠাকুরদার সৃষ্ট দেবমূর্ত্তিকে দানবী করে তুলেছিলে? কিন্তু ওর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাতে আবার তাকে দেবী করে দিয়ে গেছে বাবা!—এ-মন্দিরে আর কারও প্রবেশ নেই।—যাও।

স্নেহ-দুর্বল পিতা পুনরায় বলেন—আমার কাছে দু'লাখ টাকা নিয়ে আমারই বাবার নামে 'শ্যামসুন্দর ভিক্ষুকাশ্রম' করেছে, এতে-বড়ো হৃদয়বান সে! খুকী, চল্ ওকে ডেকে আনি।

হাস্যদৃঢ় কণ্ঠে তপতী উত্তর করে,—ওর সহধর্ম্মিণী আমি হয়েছি, বাবা, সত্যভঙ্গ করিয়া বিলাস সঙ্গিনী হতে আর চাইনে!

মা আসিয়া স্নেহ-সজল স্বরে কহেন,—এমন করে কতদিন তুই থাকবি খুকী?

তপতী স্নিগ্ধ ঔদার্য্যে আত্মপ্রকাশ করে,—এমনি করে আমরণ রাখবো আমার বিরহের চিতা-বহ্নিমান!—

গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে তপনের শূন্যশয্যা-প্রান্তে নতজানু তপতীর করুণ মধুর কণ্ঠঝঙ্কার শোনা যায় :

—'তোমায়-আমায় মিলেছি, প্রিয়, শুধু চোখের জলের ব্যবধানটুকু রইল।'

চরণ দিলাম রাঙায়ে

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। জনহীন প্রান্তর পার হইয়া আসিতেছে একখানি পাল্কী। চারজন বাহক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পাল্কীর বোল বলিতেছে 'হিঞ্জোরো—বাঁহাবোরা'—ইত্যাদি। আরোহী ভিতর হইতে বলিলেন,

—নামারে, এইখানে রাখ একটু।

বাহকেরা একটা বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়া বসিল। আরোহী একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়! বাহিরে আসিয়া অস্ত সূর্যের বিদায়লিপির পানে চাহিয়া বলিলেন,

—"তারা—তারা আনন্দময়ী মা—"

বিপরীত দিক হইতে যন্ত্র হস্তে একজন শ্রান্ত পথিক আসিতেছিল, এইখানে আসিয়া থামিয়া গেল।

আরোহী প্রশ্ন করিলেন—কোথায় যাবে হে এই সন্ধ্যাবেলা?

—নূপুরে একটা গানের মজলিস আছে বাবু মশায়!

—পৌঁছুবে কি ক'রে? সামনে যে অমাবস্যার রাত।

—যেতেই হবে হুজুর, বায়না নিয়েছি পাঁচ টাকা।

—সব শুদ্ধ কত টাকা পাবে?

—দু'দিনে বারো টাকা হুজুর!

—যেতে হবে না, আমার মেয়েকে নাচ গান শেখাবে চলো, মাসে কুড়ি টাকা পাবে।

—এমন চাকরী পেলে বেঁচে যাই হুজুর, কিন্তু ওদের যে কথা দিয়েছি, পরশু আমি—

চুলোয় যাক তোমার কথা, টাকা ফিরিয়ে দেবো—চলো, এই ওঠা পাল্কী—

আরোহী যেন পথিককে আদেশই করিয়া পাল্কীতে উঠিতে যাইতেছেন।

—তা কি হয় হুজুর, আমি কথা দিয়েছি, না গেলে ওঁদের সব মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

পথির নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আরোহী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

—ওদের আবার মান-সম্ভ্রম কি? বারোয়ারীর হরিসভা। ফেরো, ওখানে যাওয়া হবে না।

পথিক একটু থামিল, পরে করজোড়ে বলিল—

—তা হয় না হুজুর, আমার কথা আমাকে রাখতে হবে। পরশু আমি আসবো আপনার বাড়ি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল! আরোহী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রইলেন। পথিকের মূর্তি দূরে মিলাইয়া যাইতেই তিনি পাল্কীতে উঠিয়া বসিলেন। বাহকেরা পাল্কী তুলিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। বাহকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। আরোহী পাল্কী হইতে বাহির হইবেন কিনা ভাবিতেছেন! অকস্মাৎ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—হেঁটে যাও হে রামেশ্বর—হেঁটে

যাও। মানুষের কাঁধে চ'ড়ে যাওয়ার বড় মানুষী আর করো না হে, আজ থেকে হেঁটে যাও।

—কে তুমি—কে কথা বলছো?

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় এক মূর্তি দেখা গেল।

আমি শ্রীমান রাজীবলোচন অধিকারী। চমকে উঠলে নাকি রামেশ্বর? চিনতে পারছো না?

—না, চিনবার দরকার নেই, অনর্থক মানুষ খুন করবার চেষ্টা করছো কেন?

—হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি আবার খুন জখমের জন্যে অভিযোগ করছো নাকি হে?

—আমি বিনা কারণে কিছু করিনে!

—কারণ একটা অবশ্য আমারো আছে।—তোমাকে পায়ে হেঁটে বাড়ি পাঠানো। যাক্—শোন, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, যাকে গুলী ক'রে মারবার কারণ ঘটেছিল—আমি যাকে ভালবাসতাম—তার মেয়েটাকে রেখেছ কোথায়? এসো হে—বাইরে এসো, ভয় নাই, তোমায় গুলী করবো না।

—ভয় রামেশ্বর রায় কাউকে করে না। যাক্, সে মেয়ের খোঁজে তোমার দরকার?

রামেশ্বর বাহিরে আসিলেন।

রাজীব বলিলেন—দরকার? ও! আমার দরকার—সে আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের খোঁজ করবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে, বিশেষত তার মা যখন জীবন দিয়ে তোমার সঙ্গে তার বিবাহ-ঋণ চুকিয়ে দিয়ে গেছে। শুনলে?

—না, শুনিনি, শুনতে চাইনে, তোমার মতো এক শয়তানের থেকে—

—হাঃ হাঃ হাঃ চমৎকার রামেশ্বর! শয়তান তুমি নও তা হলে! ঈশ্বর তোমাকে বুঝি শয়তানেরও বড়ো করে বানিয়েছেন? জয় হোক তাঁর। কিন্তু কোথায় সে মেয়ে?

—বলবো না; বেশী খোঁজাখুজি কর তো তাকেও তার মার সাথী ক'রে দেব—যাও?

রামেশ্বর হঠাৎ রিভলভার বাহির করিলেন।

রাজীব উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,

—আচ্ছা যাও, হেঁটেই যাও আজ!

রাজীব যেন মুহূর্তে অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন! আকাশের আলো ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল, অন্ধকার হইয়া যাইতেছে, শুধু রামেশ্বরের মূর্তিটি আবছা দেখা যাইতেছে। রামেশ্বর সম্মুখের পথ ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া বাহকেরা পলাইয়াছে।

কত কথা আজ মনে পড়িতেছে! কলকাতা সহর। কলেজ-হোস্টেল। সহপাঠি ক্রীড়া-সঙ্গী, পাঠ্যপুস্তক! বন্ধু—না, বন্ধুত্ব তো কারো সঙ্গে হয় নাই রামেশ্বরের। বন্ধু কোথায়? শত্রু? পরম শত্রু ঐ রাজীব। বুদ্ধিমান বিদ্বান রাজীবকে তার সঙ্গী করিয়াছিলেন রামেশ্বর ছাত্রজীবনে। কিন্তু কি হইল? রাজীব তার চোখে ধূলো দিয়াছে—কথাটা কিন্তু সত্য নয়। রাজীবেরই চোখে ধূলো দিয়া জমিদারপুত্র রামেশ্বর ভদ্রাকে আপনার করিয়াছিলেন। না—ঠিক আপনার করা যায় নাই তাকে। জীবন দিল তবু রামেশ্বরের কেউ হইল না। না হোক—রামেশ্বরকে সে একটি অমূল্য রত্ন দিয়া গেছে—তার মেয়ে মীনাক্ষীকে। কিন্তু—এসব কি ভাবিতেছ রামেশ্বর। মীনাক্ষী তো রামেশ্বরের মেয়ে নয়। কেউ-ই নয় সে রামেশ্বরের। না—কেউ নয়।

কিন্তু কেন নয়। তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে মীনাক্ষী। পূর্বকালে নাকি নিয়োগপ্রথা ছিল? রামেশ্বর তাই মানিয়া লইবে। মানিয়া লইয়াছে তো! নইলে এতো স্নেহে মীনাক্ষীকে কেন মানুষ করিল রামেশ্বর?

রামেশ্বরের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সে। সারা বিশ্ব জানে, মীনু রামেশ্বরের কন্যা। তার সর্বস্বের উত্তরাধিকারিণী—কিন্তু রামেশ্বর জানে মীনু তার কেউ নয়—মীনু ঐ রাজিবের কন্যা! তার সর্ব অবয়বে রাজিবের রক্ত—হ্যাঁ—তাই।

নিয়োগপ্রথা! দূর করো। ভাবিয়া সান্ত্বনা পায় না। রামেশ্বরের চোখদুটো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। বীভৎস রূপ ধারণ করিল শান্ত স্নেহশীল রামেশ্বরের মুখখানা।

রামেশ্বর হাঁটিয়া চলিয়াছেন—হাতের আঙ্গুলে ছয়ঘরা রিভালভারটা নিসপিস করিতেছে।

গ্রামের সীমানায় আসিতেছেন রামেশ্বর রায়। দূরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের আলোগুলি নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইতেছে কিন্তু রাত্রি অন্ধকার! পথ বাহিয়া রামেশ্বর আসিতেছেন। বলিলেন,

—উঃ—পা দু'টো ভারি হয়ে উঠলো। বহুকাল পথ হাঁটিনি—রাজীব এর মূলে! আচ্ছা. দেখে নেব রাজিব কত বড় শয়তান।

প্রাসাদ হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে।

রামেশ্বর এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। তারপর যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পা চালাইয়া দিলেন বাড়ির দিকে।

প্রাসাদের একটি আলোকজ্জ্বল কক্ষে অর্গ্যানের সম্মুখে বসিয়া মীনা গান গাহিতেছে।

(গান)

প্রজাপতি সাক্ষী আছে ফুলপরীরা এসেছিলো!
সবুজ ঘাসের আসর জুড়ে হাসি তাদের হেসেছিলো।
এসেছিল গোপাল-কলি পাতায় আড়ে মুখ লুকিয়ে,
এসেছিল কেয়াবধূ দীঘল পাতার ঘোমটা দিয়ে,
গন্ধা ঝরা তাদের বুকে ঘুমিয়ে আমি ছিলাম সুখে
অশোকবীথির কচি পাতা আমায় ভাল বেসেছিল।
জেগে দেখি নাই কোন ফুল, লুটিয়ে কাঁদে সকল লতা,
কে তাহাদের তাড়িয়ে দিল, কে বলেছে নিঠুর কথা!
তরুবীথি বলছে মোরে, ঝরাপাতা বলছে মোরে,
কালো ভ্রমর বলছে মোরে, কেউ কাঁদেনি ওদের তরে,
প্রজাপতি বলছে শুধু বাতাস নাকি শ্বসেছিলো।

গান তখনো শেষ হয় নাই। রামেশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মীনা তাহাকে দেখার পরেও শেষ কলিটা শেষ করিতে করিতে নিকটে আসিল, সস্নেহে হাত দুটি ধরিয়া বলিল—

—বড্ড যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাবা! বসো বাবা! কপালটা ঘেমে উঠেছে যে।

রামেশ্বরকে কৌচে বসাইয়া দিয়া মীনা আঁচল দিয়া তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া বলিল,

—আর একটা গান গাইছি বাবা, শোন -

(ছড়া)

বাবা আমার বাড়ি এলো নিয়ে এলো চন্দনা,
আজ কি দিয়ে করবো আমি বাবার চরণ বন্দনা?
কুন্দ আছে, কেয়া আছে, চাঁপাও ফুটে আছে গাছে,
চুয়াতে আর চন্দনেতে বন্দনা হয় মন্দ না।
কিন্তু আমার মাথার চুলে বাবার চরণ রাখলে তুলে,
হাত বুলোবার সাথে জাগে আনন্দ—না—না...

রামেশ্বর পা টানিয়া লইতেছেন। মীনা গানের শেষের 'না' কথাটায় জোর দিয়া বলিল—

—না—না—না—বাবা, না। মীনা রামেশ্বরের পা চাপিয়া ধরিল, রামেশ্বর মীনার ললাটে স্নেহস্পর্শ বুলাইতে গিয়া একবার থামিয়া গেলেন। পর মুহূর্তে দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মীনার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পা টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—

—মায়াবিনী মেয়ে! তোকে দেখি আর মনে হয়—কি যে মনে হয়—ক্লান্ত কণ্ঠে থামিলেন।

—না বাবা, তুমি ওরকম করে কথা বলো না। তুমি যেন মাঝে মাঝে কি রকম হয়ে যাও বাবা, কি যেন স্বপ্ন দেখ! আমাকে বলবে না বাবা?

বলবো, তোকেই বলবো মানু! তার আগে তোর চন্দনা নিয়ে আসি। তার হাতে তোকে দিয়ে সব কথাই বলে যাব।

—থাক বাবা, আমি জানতে চাইনে! কি দরকার আমার? চল, কাপড় ছাড়, হাত-মুখ ধোও, রাত হয়েছে বাবা—ক্ষিদে পেয়েছে যে তোমার।

—না রে, রাত তো বেশী হয়নি।

—আমি বিকেল থেকে কিছুটি খাইনি বাবা! তোমায় নিয়ে একসঙ্গে খাব বলে বসে আছি। চলো, ওঠো। কানাই! আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা!

রামেশ্বর চলিয়া গেলেন।

কানাই খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। রামেশ্বর ও মীনু খাইতে বসিয়াছে।

রামেশ্বর বলিলেন,—তুই এতক্ষণ খেয়ে নিলেই ত পারতিস মা!

মীনু বলিল,—তোমার মা থাকলে কি আগে খেতে পারতো বাবা! আমি যে তোমার মা! বাবা, কিছু খাচ্ছো না, রাগ করবো আমি।

—আর পারছি নে মা। পথ হেঁটে ক্ষিদেটা কমে গেছে। আজ আর থাক, লক্ষ্মী মা আমার, কাল আবার খাবো।

প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একপার্শ্বে একজন অদ্ভুতদর্শন লোক। অন্ধকারে দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সে পিতাপুত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সে নিকটে আসিল, তাহার অবয়ব আধো অন্ধকারে দেখা যায় যেন ছায়া, কিন্তু চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে। বারান্দার এক কোণে আত্মগোপন করিয়া সে রামেশ্বর ও মীনার খাওয়া দেখিতে লাগিল। মীনা বলিতেছে,

—না—না—না, আমি কত কষ্ট করে সন্দেশ তৈরি করলুম আর তুমি খাবে না বাবা?

খাও—খেতেই হবে।

রামেশ্বর বলিল, তোর কাছে আমি হেরে গেলুম মা মীনু! মা-দের কাছে খাওয়া সম্বন্ধে ছেলেদের হার চিরকাল। ভীমের খাওয়া দেখে কুন্তীদেবী খুশী হতেন না, কুম্ভকর্ণের খাওয়া দেখে তার মা বলতেন—বাছা আমার কিছু খেতে পারে না। তুই এবার—

মীনু যেন কতকটা নীরস কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, ওভালটিন খেয়ে ঘুমুবে চল, এসো হাত ধুইয়ে দিই।

মীনু রামেশ্বরের হাত ধোয়াইয়া দিল। রামেশ্বর ব্যাকুল স্নেহাতুর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মীনু বলিল—নাও,—এসো, ওভালটিন খাও।

মীনু মুখের কাছে রূপার পেয়ালটা ধরিল। রামেশ্বর সস্নেহে মীনুকে কাছে টানিয়া বলিলেন—তোর মা যদি আজ থাকতো মীনু—সে যদি আজ থাকতো।

রামেশ্বর উন্মনা হইয়া উঠিলেন। উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কী যে ভাবিতে লাগিলেন—মীনু জানে না। সে অনেকক্ষণ বাবার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল। চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ রামেশ্বরের। মীনু কিন্তু আর কিছু বলিল না।

শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। একজন চাকর গড়গড়া রাখিয়া বিছানাটা আর একবার ঝাড়িয়া পাতিল। চতুর্দিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল কোথাও কোন খুঁৎ আছে কিনা। তৎপরে আলোটি কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শয়নের বেশ পরিধান করিয়া রামেশ্বর আসিয়া শয্যায় শুইলেন ও গড়গড়ার নলটা লইয়া টানিতে লাগিলেন। মীনা আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—

সেতারটা বাজাই বাবা, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাও। ভারী লক্ষ্মী ছেলে—কেমন?

মীনা সেতার বাজাইতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিলেন—তুই শুগে মা, রাত হয়েছে।

মীনা বলিল—তুমি ঘুমাও, তোমাকে একা ফেলে—

—তোর বুড়ো খোকা ঠিক ঘুমুবে, যা শুয়ে পড় মা, রাত বারোটার উপর।

মীনা নিরুপায়ের মতো সেতার লইয়া আসিতে আসিতে বলিল,

আধঘণ্টার মধ্যে যেন নাক ডাকার শব্দ পাই বাবা।—

মীনা চলিয়া গেল।

মীনার শয়নকক্ষটি আধুনিক রুচিসম্মতভাবে সাজানো। তবে নানারকম সৌখিন দ্রব্যের একটু বেশি ভীড়। ড্রেসিং টেবিলের নিকট আসিয়া বেশবাস শ্লথ করিয়া দিল সে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে সুন্দর শয্যা অপেক্ষা করিতেছে। মীনা দেওয়ালে লম্বিত পিতার মূর্তির পানে চাহিল। ভাবিতে লাগিল।

—মার একটা ফটো পর্যন্ত নাই—আশ্চর্য। মার কথা বাবা কোনদিন কিছু বলেন না. আজ বললেন!

মীনা শুইয়া পড়িল এবং একটা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া গেল। ঘরে স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিতেছে! দেখা গেল এক অদ্ভুত দর্শন মূর্তি বারান্দা দিয়া নিঃশব্দে মীনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে।

মীনা ঘুমাইতেছে। অতি নিঃশব্দে সেই অদ্ভুতদর্শনে লোকটি মীনার শয়নকক্ষে আসিয়া ঔষধসিক্ত একটি রুমাল মীনার মুখে চাপিয়া ধরিল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মীনা চলিয়া যাওয়ার পর রামেশ্বর কিছুক্ষণ শুইয়াই ছিলেন। পরে উঠিয়া একটা চাবি লইয়া লৌহ-সিন্দুক খুলিলেন। বহু দিনের বহু বস্তু আছে এই সিন্দুকে। অন্য সব ফেলিয়া দিয়া রামেশ্বর লৌহ-সিন্দুক হইতে একটি ছোট্ট বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের মধ্যে একখানি ফোটো ও এক টুকরো চিঠি। রামেশ্বর ফোটো ও চিঠিখানি কয়েকবার দেখিলেন। শান্ত স্নেহময় রামেশ্বর ধীরে ধীরে যেন পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। মুখের রেখাগুলি কঠিন হইয়া উঠিল। ওষ্ঠে একটা দারুণ সংকল্প পরিস্ফুট হইল। আপন মনেই বলিলেন—.

--রামেশ্বর—ওই মায়াবিনীর শরীরে তোমার এক ফোঁটা রক্ত নেই। তবু ও তোমার কন্যা—তোমার যথাসর্বস্বের অধিকারিণী। কিন্তু রাজীব এতকাল পরে কেন খোঁজ করতে চায়? কেন?—কেন?

কিছুক্ষণ পায়চারি করিলেন, অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন রামেশ্বর। আপনমনে বলিতে লাগিলেন,

না। রায়বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাক। ওকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিই—ওর মার কাছে গিয়ে জুড়োক।

রামেশ্বর একটা ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিলেন। গুলী ভরা আছে কিনা দেখিলেন। আবার সেফের ভিতরকার ফটো ও চিঠিখানি দেখিলেন। ভাবিতেছেন,

--কেন মিছে মমতা বাড়ানো! রাজীব যদি প্রকাশই করে দেয়,—কিন্তু কি স্বার্থে করবে? এতকাল তো কোন খোঁজ করেনি! আজ তার কি দরকার পড়লো!

আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন :

---মেয়ে তার ; আমি তার পিতৃত্বকে অন্যায়ভাবে ভোগ করছি! অন্যায়? অন্যায় কি আবার!

যেন চমকিয়া উঠিলেন। কি যেন দেখিতেছেন। দ্বারপ্রান্তে এক অশ্রুমতি নারীর ছায়ামূর্তি,—না না ও কিছু নয়।

—কে? ও—কে? ওঃ! আবার এসেছ। ভূত আমি মানি না, শুনলে? তোমাদের প্রেম ছিল,—হ্যাঁ, ছিলো প্রেম তোমাদের—স্বর্গীয় সুকুমার প্রেম! তুমি আসতে চাওনি, কিন্তু তোমার বাবা আমাকেই নির্বাচন করেছিলেন। রাজীবকে বার করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে—মনে পড়ে না? রাজীবের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা তোমার বিয়ের পূর্বেই ঘটেছে জানলে—রায়বংশের বধূ করতাম না তোমায়। যা হবার হয়েছে—এখন ওই মেয়েটাকে শেষ না করলে বংশের মর্যাদা নষ্ট হবে। যতবার সঙ্কল্প করি, তুমি এসে বাধা দাও। আচ্ছা, আজ আর কোন বাধা মানব না। আজ নিশ্চয়ই—

রামেশ্বর মূর্তির পানে রিভলবার উদ্যত করিয়া বলিলেন,

—আগে যাও তুমি—যাও—

রামেশ্বর গুলী করিলেন। মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর নিজের

নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর বিরক্ত হইয়া একটা বড় আলমারী হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিলেন—পানীয় ঢালিলেন এবং সামনে বড় ড্রেসিং টেবিলটার নিকট দাঁড়াইয়া পান করিতে লাগিলেন। আয়নায় তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরু পুরু ঠোঁটের উপর ঘন কাঁচা পাকা গোঁফ মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। বাঁ হাতে গোঁফজোড়া একবার মুচড়াইয়া লইয়া রামেশ্বর হাসিলেন—

—কত খুন জখমই তো হয়েছে রামেশ্বর তোমার হাত দিয়ে। এই এক ফোঁটা মেয়েটাকে আজও সরাতে পারলে না! কিসের মায়া-মমতা! কে সে তোমার? রাজীব আজ যদি প্রকাশ করে, ওর মা বিবাহের পূর্বেই আত্মদান করেছিল, যদি বলে ওর বাপ ওই রাজীব—তা হলে রায়বংশের সম্মান—রামেশ্বর রায়ের অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। রাজীব কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে? কি ওর মতলব?

আরও কয়েকবার মদ্যপান করিলেন এবং ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো নিজের ছবির পানে চাহিয়া রইলেন। অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছেন,

—রায়বংশের কেউ থাকবে না—কিন্তু ও তো রায়বংশের কেউ নয়—ওর গায়ে রায়বংশের একটা ফোঁটা রক্ত নেই ; অনর্থক বিপদ বাড়ানো—নাঃ—আজই, এই অমাবস্যার রাত—এই অন্ধকার—সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে, এই-ই ঠিক সময়!

রামেশ্বর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রিভলবার তুলিয়া লইলেন। অকস্মাৎ বাহিরে কি যেন একটা শব্দ। রামেশ্বর রিভলবার গোপন করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন।

কেহ কোথাও নাই।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে বড় রাস্তা। বাড়ির ঠিক পাশ দিয়া একটা গলিরাস্তা, সম্মুখে উদ্যান—বাহিরে কলাপসিব্‌স গেটের পাশে উর্দিপরা-তকমাআঁটা দারোয়ান দাঁড়াইয়া আছে। বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ, শুধু বাগানের একদিকে একটা কাচের ঘরের সামনে একটি ক্ষুদ্র জানালা। কাচের ঘরটির মধ্যে কাচের ছোট ছোট জারে নানা জাতীয় সাপ. কয়েকটা হুড়পিতেও সাপ। খাদ্য দানের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর।

একটি যুবক—পরণে খদ্দরের পাঞ্জাবী, ধুতিখানা কতকটা কাবুলিওয়ালাদের মতো করিয়া পরা, হাতে কয়েকখানা চক্‌চকে বাঁধানো বই লইয়া গেটের সামনে আসিল।

দারোয়ান সেলাম করিয়া বলিল,

—আভি তক সাহেব নেহি আয়া হুজুর!

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। প্রশ্ন করিল,

—কব্ আয়েঙ্গে কুচ বোলা হ্যায় তোমকো?

—নেহি হুজুর!

যুবক চলিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেভাবিতে কাচের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নানা রকমের সাপ কিলবিল করিতেছে। যুবকটি শিহরিয়া উঠিল।

যুবক আপন মনে বলিল, লোকে কুকর-বিড়াল পোষে, না হয়, বাঘ-ভাল্লুক পোষে—উনি পোষেন সাপ! আশ্চর্য খেয়াল কিন্তু!

যুবক চলিয়া যাইতেছে : ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া যুবকটি দাঁড়াইল।

(গান)

আকাশ জাগে আলোর লাগি
বাতাস জাগে ফুলের তরে।
আঁধার রাতের তারা জাগে
আঁধার শেষে ফিরতে ঘরে।
কুঁড়ির ভেতর গন্ধ জাগে,
ব্যাকুল প্রাণে মুক্তি মাগে,
জানি না কে আছে জেগে
আমার বুকে এ পিঞ্জরে।

যুবক দারোয়ানকে শুধাইল,

—কোন হ্যায় দারোয়ানজী! গানা করতো হ্যায় কোন্?

দুসরা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর! উধার দরয়াজা হ্যায়।

যুবক আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘুরিয়া সটান বারান্দায় আসিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ। দিক হইতে গানের শব্দ আসিতেছে—সেই দিকে—সাপের ঘর যেখানে আছে, ইখানে গিয়া দেখিল—জানালা দিয়া আলো আসিতেছে! সে জানে, এ বাড়িতে প্রফেসার ধিকারী ব্যতীত আর কেহ থাকে না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নিকটবর্তী একটি থামের ডালে দাঁড়াইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ভিতরে প্রশস্ত একটা কক্ষ। একধারে শুভ্র একটি শয্যা বিছানো রহিয়াছে। কেহ যে হাতে শুইয়াছিল—তাহা বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে কয়েকটা কাঠের টিপয়ের উপর য়কটা কাচের জারে একটা একটা করিয়া জীবন্ত সাপ ফণা তুলিয়া দুলিতেছে। ঘরের ৃটি কোণায় অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে একটি মেয়ে ; ভয়ে পিতেছে! মধ্যস্থলে একজন বেদে তুমড়ি বাজাইতেছে আর বলিতেছে,

—গাও—আর একবার গাও—

বেদে একটা সাপকে একটু নাড়িয়া দিল।

মীনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,

—বাবা গো—।

—আর একবার বলো—'বাবা গো—বাবা' বলো...

—তা হলে ছেড়ে দেবে?

—না, তা হলে আচ্ছা বলো—বাবা!

—বলছি। আমি সর্পনৃত্য জানি, নাচবো?

—সত্যি জান? সত্যি? নাচ তো মা, নাচ তো ; আমি বাজাচ্ছি। নাচো—কি! ওরা মার পোষা সাপ।

—কিন্তু আমায় ছেড়ে দিতে হবে, বলো—দেবে?

না। তুমি আমায় বাবা বলবে, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো—তুমি শুধু বে,—বাবা—বাবাগো—বাবা। যেমন ক'রে সেদিন রামেশ্বর রায়কে বলেছিলে—বলো। তোমাকে তেমনি করে বাবা বলতে হবে! কী আস্পর্ধা তোমার। মীনা রুখিয়া সরিয়া ল।

—বলবে না? আচ্ছা!

বেদে একটা সাপকে নাড়িয়া দিল। ভয়ে মীনা করুণ কণ্ঠে বলিল,—বলছি—বাবা।

—নৃত্য কর তো মা, সর্পনৃত্য করো। সাপের নৃত্যে বিষ ঝরে, তোমার নৃত্যে অমৃত ঝরুক।

মীনা বাক্যব্যয় না করিয়া ভয়ে ভয়ে সর্পনৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের সাথে সাথে তালে তালে বাঁশী বাজিতেছে এবং সাপগুলি হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। মীনা বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নৃত্য শেষ হইলে বেদে বলিল,

—রামেশ্বর রায়কে বাবা বলে এতকাল যে বোকামী করেছ মা, আমায় বাবা বলে তার শোধ করো। ও তোমার কেউ নয়। কিন্তু তোমাকে আজ আর কিছু বলবো না। এসো ঘুমুবে

অত্যন্ত স্নেহের সহিত বেদে মীনুকে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল এবং সাপগুলি যথাস্থানে রাখিয়া সন্তর্পণে একটি বন্ধদ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল।

থামের আড়ালে যে যুবকটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল, সেও অতঃপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল এবং বহিঃদরজায় আসিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল,

—উধার কোন হ্যায় দারোয়ানজী?

—দুস্‌রা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর। পিছন তরফ উন্‌লোককো ভাড়া দিয়া গিয়া! ও বেদিয়াকো কোই আপনা আদমী হো গা।

যুবকটি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নামিল, আবার থামিল, আবার চলিতে লাগিল পুনরায় বাগানের গেটে আসিয়া একটি লতা হইতে ফুল তুলিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

ও দিককার গলির মোড় হইতে এক ভদ্রলোক—শুভ্র-সুন্দর ধুতি চাদর পরিহিত চোখে চশমা, দ্রুত আসিতেছেন, তিনিই প্রফেসার রাজীব অধিকারী। যুবকের কাছে আসিয়াই থামিয়া বলিলেন,

—চলে যাচ্ছো যে শ্যামল? আমার একটু দেরী হলো। এসো শ্যামল তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া বলল,

—আজ আর থাকগে স্যার, রাত হয়ে গেল। তাছাড়া আপনি যেন বড় ক্লান্ত। আমি কাল সকালে আসব।

—যে নোটগুলো দিয়েছিলুম—বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শুধু এক জায়গায়—

—কাল একবার 'এক্সপেরিমেন্ট' করে নিও, সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—যে আজ্ঞে, আজ তা হলে আসি স্যার!—শ্যামল রাজীবকে প্রণাম করিল।

—এসো বাবা—এসো।

শ্যামলের মূর্তি আধো অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী লেবরেটারীকক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড ঘর ; এক-পাশ দিয়া দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি দেখা যাইতেছে। ঘরটার চারিদিকেই আলমারি—মেঝেতে কয়েকটা বড় টেবিল পাতা, তাহার উপর মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আলমারিতে কাচের জারে নানা প্রকার মৃত সর্প কোনটায় বা সাপের কঙ্কাল সংরক্ষিত। একাধারে একটু পর্দা দিয়া পোষাক

বদলের স্থান করা আছে। প্রফেসার অধিকারী সেই স্থানে ঢুকিয়া লেবরেটারীর বেশ পরিধান করিলেন। পরে পাইপটা ধরাইয়া লইয়া ঘরের মাঝে রাখা টেবিলের সামনে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁহার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,

—খাবার দিয়েছি হুজুর।

—উঁ—কিঃ—?

—খাবার—খাবার দিয়েছি হুজুর!

—আঃ—কি জ্বালাতন করিস। যাঃ

—খাবার দিয়েছি হুজুর!

রাজীব এতক্ষণে চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন এবং দেখিয়াই কহিলেন,

—শুগে যা খাবো না কিছু।

প্রফেসার অধিকারী পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন। ভৃত্য প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ক্লান্ত প্রফেসার বেশীক্ষণ কার্য করিতে পারিলেন না। কাজ ফেলিয়া উঠিলেন এবং ডাকিলেন—

—ওরে—ও—

ভৃত্য আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। প্রফেসার খাদ্য চাহিলেন। ঐ ঘরেই তাঁহাকে খাবার দেওয়া হইল—অতি সামান্য খাদ্য। দুই টুকরা রুটি, মাখন, একটু ঝোল এবং কয়েক টুকরো ফল। ভৃত্যকে যাইতে আদেশ করিয়া প্রফেসার খাইতে বসিলেন। কিন্তু আহারে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। আলমারি হইতে দুই একটা বই টানিয়া লইয়া যন্ত্রপাতি সহযোগে একাগ্রচিত্তে পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর প্রফেসার অধিকারী অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন; কাজে যেন আর মন বসিতেছে না। লেবরেটরীর এক কোণে রক্ষিত ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে ছোট্ট একটা পাখী আপন মনে শব্দ করিয়া উঠিল। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে উঠিয়া খাঁচাটি সামনে আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিলেন—

—তোর বড় কষ্ট হচ্ছে, না? একলা থাকা অভ্যাস নেই বুঝি? কিন্তু তোকে দিয়ে আমি যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলাম।

পাখিটা কিচমিচ শব্দে আর একবার ডাকিয়া উঠিল।

—ও—এখানে আর থাকবি না—? সঙ্গীর কথা মনে পড়েছে। বেশ—তবে যা—তারি কাছে উড়ে যা, জোর করে আমি তোকে ধরে রাখবো না।

প্রফেসার অধিকারী খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পাখিটা উড়াইয়া দিলেন। বনের পাখি মিলনানন্দের পাখা মেলিয়া নীলিমার বুকে মিলাইয়া গেল।

প্রফেসার অধিকারী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উন্মনা দেখাইতেছে; মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়া তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ঘরের এক কোণায় একটি পর্দাঢাকা স্থান। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে গিয়া পর্দাটি তুলিলেন। অপরূপ সুন্দরী একটি নারীমূর্তি দেখা গেল—মূর্তি যেন সজীব, এখনি কথা কহিয়া উঠিবে। প্রফেসার অধিকারী বলিতে লাগিলেন—

-আজো ত তেমনি চেয়ে আছ। তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টি, তেমনি ম্লান। কেন? জানো

না—তোমার মীনাকে আজ আমার কোলে ফিরিয়ে এনেছি। চল, দেখবে চল—ভদ্রা! আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিলেন, ঐ নরপিশাচ তোমার মীনাকে ভালবাসার ভণ্ডামি দেখাতো, যেমন করে তোমার বাবার মন জয় করে আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলো ;—ভদ্রা।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে আবেগের সহিত বলিলেন—

"তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া
অয়ি অসীম জীবন বিহারী—
মম হৃদয়রক্ত রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া..."

প্রঃ অধিকারীর দুই চোখে জল টলমল করিতেছে ; কোথায় কে যে গুমরিয়া কাঁদিতেছে,—বাবা—বাবাগো—। প্রঃ অধিকারী মূর্তিটির উপর পর্দা টানিয়া দিলেন এবং পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

কলিকাতা সহরের উত্তরদিকে একটা বসতি। কয়েকখানা খোলার ঘর। বাসিন্দারা প্রায় সব শুইয়া পড়িয়াছে। একস্থানে একটা খোলা জায়গায় একজন নর্তকী গাহিতেছে। কয়েকজন শুনিতেছে, মদ ও হল্লা চলিতেছে। শ্যামল পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। আরও কিছু দূরে ছোট্ট একটি ঘর। মা আর ছেলে বাস করে। রাত হইয়া গিয়াছে, ছেলে এখনো বাড়ি ফিরিল না—মা অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আহার্য ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে—কেরোসিনের আলোটা জোর করিয়া দিয়া রামায়ণ লইয়া বসিল। সুর করিয়া পড়িতেছে।

—মা—ওমা।

—যাই বাবা। এত রাত করলি কেন রে!—মা দরজা খুলিয়া দিল।

—খুব একটা জরুরী কাজ ছিল মা। জান তো—তোমায় বললাম সেদিন, বন্যায় আর কলেরায় বাংলা দেশ উজাড় হতে চলেছে। পেটে খাবার নাই, পরনের কাপড় নাই, কী যে তাদের কষ্ট মা।

—তুই তার কী করতে পারিস বাবা! তোরও তো কিছুই নাই।

—আমার আছে মা, শরীরে শক্তি আছে—তোমার মতো মা আছে, আরো কত কী আছে। দেখবো যদি কিছু করতে পারি।

শ্যামল হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসিল।

—স্বদেশী নয়তো বাবা? সরকার কিছু বলবে না ত।

—না মা, সরকার খুশী হবে, তোমার ভয় নাই।

মা পুত্রের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্যামল যেন খানিকটা অন্যমনা হইয়া আছে—ভাল করিয়া খাইতেছে না।

—কিছু যে খাচ্ছিস না—কী ভাবছিস খোকা?

মৃদু হাসে। শ্যামল বলিল, আজ একটা মজার ব্যাপার দেখে এলুম মা, প্রফেসার অধিকারীর বাড়িতে, তাই ভাবছি।

—কি এমন মজার ব্যাপার যে খাওয়া ভুলে যেতে হবে।

—প্রফেসার অধিকারী সাপ নিয়ে গবেষণা করেন—জান তো। যে বেদেটা ওঁকে সাপ যোগায়—সে থাকে ওরই বাড়ির পিছন দিকটায়। আজ দেখলুম ওই বেদেটা কোথা থেকে একটা মেয়ে এনে রেখেছে সেই বাড়িতে।

—হবে কেউ হয় ত তার—কত বড় মেয়ে?

—তা পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি হবে।

—সে কিরে, পনের থেকে কুড়ি পর্যন্ত কোন্‌টা বয়স?

—ওর যে কোন একটা। মেয়েদের বয়স চেনা মুস্কিল মা।

—মজার কি হলো তাতে?

—শোন। বেদেটা মেয়েটাকে বলছে,—বাবা বলো—বলো আর একবার বলো—বাবা!' ওকে বাবা বলাবার জন্যে বেদের সে কি আগ্রহ মা,—কল্পনাও করতে পারবে না।

—আহা, ওর হয়ত কেউ নাই।

—"বাবা" ডাক শুনবার জন্যে মানুষ অমনি করে মা? আশ্চর্য নয়? আমি মা বলে না ডাকলে তুমি অমনি করতে?

—তা করতাম হয় ত!

শ্যামল অন্যমনে খাইতে লাগিল।

—আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো?

—আগে খেয়ে নে—তারপর কথা।

—খাচ্ছি মা—খাচ্ছি। আচ্ছা মা, ওর না হয় কেউ নেই। তাই একটা মেয়ে ধরে এনে "বাবা" বলাতে চাচ্ছে। আমার বাবার কথা তুমি ত কোনদিনই কিছু বলতে চাও না মা। তিনি কি নেই?

—না। নেই, বেঁচে থেকেও নেই তার নাম কখনো করিসনে খোকা—ভুলে যা—ভুলে যা তার কথা—

মা অত্যন্ত অসম্বৃতা হইয়া উঠিল।

—ভুলে যাওয়া অত সোজা নয় মা। আমি বেটাছেলে—আমার একটা পিতৃ পরিচয় দরকার। কিন্তু কেন তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছো? আমাকে বলার কী বাধা আছে মা তোমার?

—হ্যাঁ—খোকন! মাণিক আমার! সে কথা তুই শুনতে চাস কেন বাবা! তোর শয়তান, ব্যভিচারী, লম্পট, নারী-মাংসলোভী কুক্কুর বাবাকে ভুলে যা খোকন—ভুলে যা, মনে কর এই বিশ্বে মা ছাড়া তোর কেউ নাই।

—সত্যি মা—সত্যি? সত্যি তিনি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান? বলো মা, তিনি যা-ই হোক, আমার তো বাবা!

—নাঁ-না-না—রাক্ষস। তোর মা'র সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখিরী করে তাড়িয়ে দিয়েছে—নারে না, তুই যখন পৃথিবীর আলোকে আসিসনি, গর্ভে যখন তোর স্পন্দনটুকু মাত্র অনুভব করছি, তখনই একদিন সেই শয়তান একটা মোড়ক দিয়ে বললে—এটা দিয়ে ওকে হত্যা করো—সেইদিনই বুঝেছিলাম—সে কতবড় শয়তান!

—তারপর মা তারপর?

—তারপর। বুদ্ধি হয়ত ভগবানই যুগিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসময় বলেছিলাম, তাই করবো—কিন্তু এ দেশে নয়; কিছু মোটা রকম টাকা দাও—চলে যাই দূর দেশে। টাকা

তার আছে ; তাই হাজার কতক দিয়েছিলো। সেই রাত্রেই বুড়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাই. তারপর তুই কোলে এসেছিস।

—আমি এমন একজন ভয়ঙ্কর লোকের ছেলে মা!

—কিন্তু তুই দেবতা হয়ে ওঠ খোকা! আমার বুকের রক্ত দিয়ে, আমার অন্তরের সব স্নেহামৃত দিয়ে. আমার ঈশ্বরের সব আশীর্বাদ দিয়ে আমি তোকে দেবতা করে গড়বো—খোকন—বাবা আমার।

—আচ্ছা মা তাই হবে—কিন্তু কোথায় তিনি থাকেন? আমি একবার তাঁকে দেখতে চাই।

—না-না-না—তোর মার বিয়েই হয়নি, তুই তার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান ; সে তোকে স্বীকার করবে না। লক্ষ্মী বাবা আমার—চল্, ঘুমোবি চল।

—আজই দেখে এলাম একজন 'বাবা' ডাক শুনবার জন্যে কী আকুল হয়ে প্রার্থনা করছে, আর আমার বাবা—হলুমই বা আমি তোমার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান! তাঁর ঠিকানা?

—না. বলবো না। শুনে তোর কিছু দরকার নেই। চল্—শুবি চল।

মা জোর করিয়া শ্যামলকে টানিয়া লইয়া গেল।

শ্যামল শুইল, কিন্তু চিন্তা তাহার অগাধ হইয়া উঠিতেছে। নিজের পিতৃপরিচয় তাহার জানা নাই। এ পর্যন্ত সে প্রফেসার অধিকারীকেই পিতার মতো দেখিয়া আসিয়াছে। যদিও জানে প্রফেসার অধিকারী তাহার পিতা নহেন—পালক-পিতা মাত্র। কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ শ্যামলকে পিতার অভাব জানিতে দেয় নাই।

আজ কিন্তু শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর মধ্যে কিঞ্চিত ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে। না—স্নেহের অভাব নয়—অন্য কিছু। প্রফেসার অধিকারী যেন কিঞ্চিৎ উন্মনা—কিঞ্চিৎ উদাস। আজ প্রফেসার অধিকারী তাহাকে না পড়াইয়াই ছাড়িয়া দিলেন—কিন্তু আর কখনো তিনি এমন করেন না। যত রাত্রিই হোক—শ্যামলকে লইয়া তিনি কিছুক্ষণ গবেষণা কার্য চালান। বহুদিনই তাহাকে খাওয়াইয়া ছাড়েন।

শ্যামলের অন্য চিন্তা—কে ওই মেয়েটি! কোথা হইতে আসিল? বেদের মেয়ে সে নয়—নিশ্চয়ই নয়! প্রফেসার অধিকারীর বাড়িতে অন্য ভাড়াটিয়াও নাই। বাড়ি ভাড়া দিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই—তবে কে ও।

অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে—এবং যতটুকু কথা তার শ্যামল শুনিয়াছে তাহাতেই বোঝা যায়—মেয়েটি যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সঙ্গীতজ্ঞা। গান সে ভালোই গাহিতে পারে। কে ও।

কিন্তু আজ রাত্রে আর কিছু জানা সম্ভব নহে। মা ওঘরে ঘুমাইতেছেন। শ্যামল মার নিকট তাহার পিতৃপরিচয় কোনদিন জানিতে পারে নাই—আজও পারিল না।

হয়তো প্রফেসার অধিকারী সবই জানেন। কিন্তু তিনিও কোন দিন বলেন নাই। কে জানে কবে শ্যামল তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে পারিবে। আজ শুধু জানিল; তাহার পিতা লম্পট ব্যভিচারী মাতাল। হোক—শ্যামলের মনে অজানা পিতার প্রতি কোনরকম ক্রোধ বা দ্বেষ জাগ্রত হইল না। সে ভাবিল—হয়তো কোন বিশেষ? কারণে পিতা তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! হয়তো কোন পারিবারিক কারণে বিবাহ করিতে পারেন

নাই—কিংবা হয়তো—কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? যে কারণেই হোক—শ্যামল তো তাঁহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। শ্যামলের না-দেখা না-জানা পিতা যেমন হউন—শ্যামল তাহাকে একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইলে যেন ধন্য হইয়া যায়।

আজ সে যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছে—বেদেটা ঐ মেয়েটিকে 'বাবা' বলাইবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে—শ্যামলের পিতা কি ঐ রকম 'বাবা' ডাক শুনিবার জন্য কোন আগ্রহই রাখেন না।

হয়তো তাঁহার আরো সন্তান আছে—যাহাদের 'বাবা' ডাক তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করে। অভাগা শ্যামল জীবনে ঐ মধুর ডাকটি ডাকিতে পাইল না ইহা শুধু দুর্ভাগ্য নহে—প্রকৃতির ইহা নিষ্ঠুর বঞ্চনা।

শ্যামলের অনিদ্রাক্লান্ত চোখে জল গড়াইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রি। মীনু শয্যার উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার তন্বী দেহলতা ক্রন্দনাবেগে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। অশ্রান্ত ক্রন্দন বাধা মানিতেছে না, বেশবাস অত্যন্ত অবিন্যস্ত! কক্ষের স্বল্পলোকে দেহের অবয়ব ভাল দেখা যাইতেছে না। ধীরে ধীরে প্রফেসার অধিকারী আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীনুর শয্যালুণ্ঠিত দেহের পানে একবার চাহিলেন—পরে কণ্ঠে অপরূপ স্নেহ মিশাইয়া বলিলেন,

—কাঁদছো কেন মা, মীনু? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রফেসার অধিকারী আলোটা জোর করিয়া দিলেন। মীনু ত্রস্তে বস্ত্র সংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল পরম বিস্ময়ে ; প্রফেসারের দিকে আধ মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—

—আপনি কে? আপনি—আপনি কত ভালো—কত সুন্দর! কে আপনি?

—আমি—আমি তোমার—যা খুশি তুমি বলো আমায়। বাবা, কাকা, জ্যেঠা, মেসো, বা—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—শোবে না মা! রাত হয়েছে যে! ভয় কি তোমার। এ আমার বাড়ি, আমি তোমাকে দেখবো—আমার কাছে থাকবে—মীনু মা!

—আমাকে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দিন—আপনার পায়ে পড়ি। আপনি এতো ভালো—আমায় পৌঁছে দিন।—মীনু প্রফেসার অধিকারীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা মা, তাই হবে। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব—ভয় কি—ঘুমাও।

—না—ওই সাপুড়েটা আবার যদি আসে! যদি আবার ওকে বাবা বলতে বলে! ঘুম পাচ্ছে না—ভয় করছে।

না! ও আজ আর আসবে না। আর যদিই বা কাল এসে 'বাবা' বলতে বলে তো একবার না হয় বুলবে। "লেট দ্যাট পুওর শোল বি ইওর ফাদার, চাইল্ড।"

—না—না—না। আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—কিসের জন্য আমি ওকে বাবা বলতে যাবো। কেন আপনি এ রকম বলছেন?

মীনু মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার চোখে আগুন জ্বলিতেছে। প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আচ্ছা, থাক, বলো না। তোমার সত্যিকার বাবাকেই বাবা বলো। এখন ঘুমাও—ঘুমাও মা—চলো—ঘুমোবে।

প্রফেসার অধিকারী তাহাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন, আলো কমাইয়া দিলেন এবং কচি ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার মতো বলিতে লাগিলেন,

"—ঘুমাও মীনু চারিদিকে থাক আঁধার বুড়ী জেগে,
কাল সকালে উঠবে সোনার সূর্যকিরণ লেগে।
সেই সকালে আমি যাব আনতে তোমার বর,
তার সঙ্গে মীনু-মানিক—করবে তুমি ঘর।"

মীনু কাঁদিতেছে না—হাসিয়া উঠিল। বলিল—

আপনার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?

আছে।

—কোথায়?

—এই যে! এই এতবড় বাড়িতে একটি মাত্র মেয়ে আছে, সে তুমি—ছেলে—মেয়ে—সবাই,—কিন্তু ঘুমাও মা আমার! তুমি যা চাইবে, তাই দেবো। তোমার বাবার কাছে যেতে চাও—আমি নিয়ে যাবো। ঘুমাও আজ—রাত হয়েছে।

—ঘুমোচ্ছি। ঐ সাপুড়েটা কে? কেন ওকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেন। ওই কি আমাকে এখানে এনেছে!

—হাঁ তুমি জান না মা, আমি সাপ আর তার বিষ নিয়ে গবেষণা করি। ও আমাকে সাপ এনে দেয়। ওকে না হলে আমার চলে না! আর হতভাগারও কেউ কোথাও নাই—তাই তোমাকে মেয়ে করতে সাধ জেগেছে! আচ্ছা—আমি বারণ করে দেবো।

—আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে ও!

—না মা। আজ ঘুমাও, কাল আমি তোমাকে নিয়ে সারা সহর বেড়িয়ে আসবো। আমার সঙ্গে সব জায়গায় যাবে তুমি।

প্রফেসার অধিকারী মীনুকে শোয়াইয়া দিলেন।

একটু একটু করিয়া মীনুর চোখের পাতা বুজিয়া গেল। তাহার মাথাটা কোলে লইয়াই প্রফেসার অধিকারী চোখ বুজিলেন। স্নেহের অপার্থিব সুষমায় তাঁর মুখখানা জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিতেছে।

এতো আনন্দ কি জীবনে তিনি কোন দিন পাইয়াছেন? না—আপন আত্মজ দুহিতাকে কোলের কাছে লইয়া ঘুম পাড়াইবার মতো সৌভাগ্য তাঁহার তো কোন দিন হয় নাই। অথচ না হইবার মতো কিছু ছিল না! সবই ঠিক ছিল—কিন্তু বিধি বিড়ম্বনা।

উদ্দাম যৌবনের জোয়ার প্রফেসার অধিকারী হয়তো স্খলিত হইয়াছিলেন মুহূর্তের জন্য; কিন্তু মনে তাঁহার কোন পাপবোধ ছিল না। ইংরাজের হাত হইতে দেশ-মাতাকে উদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন প্রফেসার অধিকারী—তাঁহার ছাত্রজীবনে। ভদ্রা ছিল সেই যজ্ঞের হোত্রী। সহকর্মিণী শুধু নয়—সহধর্মিণীর আসনেই তাহাকে বসাইবার সব কথাই পাকা ছিল—কিন্তু অকস্মাৎ রাজরোষে পতিত হইলেন রাজীব অধিকারী। ইংরাজের কারাগারে যাইতে হইল তাঁহাকে। এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। রাজীব সকলই বুঝিয়াছিলেন, ভদ্রার সহিত বিবাহ হইবার মাত্র সাতদিন পূর্বে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইল রামেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। রামেশ্বরই তাহাদের গুপ্ত চক্রান্তের কথা ইংরাজ দরবারে জানাইয়া দেয়—কিন্তু আরও কি করিবে জানা ছিল না রাজীবের।

কারাগারেই সংবাদ পান—রামেশ্বর ভদ্রার দরিদ্র পিতাকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়া এবং রাজীব ইংরাজের চক্ষুশূল প্রমাণিত করিয়া ভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছে। মীনু তখন মাত্র মাসখানেক ভদ্রার গর্ভে।

এই সেই মীনু! আঠার বছরের হইয়াছে—কিন্তু প্রফেসার অধিকারীর মনে হইতেছে—আঠার দিনের শিশু কন্যা। ঘুমন্ত মীনুর মুখখানা দেখিলেন তিনি—ঠিক ভদ্রার মতই হইয়াছে—হ্যাঁ—প্রায় ওর মার মতই।

কিন্তু প্রফেসার অধিকারী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহর শান্ত স্নেহশীল মুখ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল একটা কথা মনে পড়ায়। এই কথাটাই তিনি জেলের বাহিরে আসিয়া শুনিয়াছিলেন।

ভদ্রার গর্ভে রামেশ্বরের কন্যা জন্মিয়াছে এবং পল্লীগ্রামে আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সর্পের দংশনে ভদ্রার মৃত্যু হইয়াছে। সাপের বিষের ওষুধ পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক অধিকারী তদবধি সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

কিন্তু সেদিন তিনি জানিয়া আসিলেন—সাপের বিষে ভদ্রার মৃত্যু হয় নাই। রামেশ্বর পত্নীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল এবং পুলিসের নিকট জানাইয়াছিল—সর্পদংশনে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

এই সাংঘাতিক শয়তান রামেশ্বর কন্যা মীনুকেও হত্যা করিত —করিবার চেষ্টা বহুবারই করিয়াছে—কেন করে নাই বা পারে নাই তাহা অজ্ঞাত। হয়তো মীনুর অতি সুন্দর মুখশ্রী—হয়তো বা রামেশ্বরের অন্তরের অন্য কোনরকম অনুভূতি অথবা তাহাকে স্বকন্যা রূপে প্রতিপালিত করিয়া নিজেকে অপত্যবান বলিয়া পরিচিত করার চেষ্টা। কে জানে কি কারণ! তাহা যাই হোক—প্রফেসার অধিকারী দীর্ঘদিন সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ভদ্রার মৃত্যুর জন্য সাপকেই নিমিত্ত মনে করিয়া তাহা সত্য নহে। সাপ অপেক্ষাও ক্রূর রামেশ্বর রায়ই নিমিত্ত এবং উপাদান, কারণ! ওঃ কি শয়তান।

কিন্তু রামেশ্বর চিরদিনই ভাগ্যবান। আজিও সে ভাগ্যবান আছে। আশ্চর্য বিধাতার নিয়ম! রামেশ্বর এত পাপ করিয়াও ভাগ্যবান—অপত্যবান—আর দুর্ভাগা রাজীব অধিকারী...

না—রাজীব অধিকারী আজ আর দুর্ভাগা নয়। রাজীব চাহিলেন মীনুর ঘুমন্ত মুখ পানে। আহা—কী সুন্দর! ফুলের কুঁড়ির মতো দেখাইতেছে মীনুকে। রাজীব আজ আর হতভাগ্য নয়—রাজীব আজ কন্যার পিতা—অপত্যবান রাজীবও আজ। তাঁহার বিপুল খ্যাতি—বিশাল সম্পদ সবই এই মীনুর জন্য থাকিবে—এখন একটা ভাল বর দেখিয়া উহাকে পাত্রস্থ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু—

লোক সমাজে মীনু রামেশ্বর রায়ের কন্যা। আইনে মীনু রাজীবের কেহই নহে। রামেশ্বর ইচ্ছা করিলে মামলা করিয়া মীনুকে কাড়িয়া লইতে পারে এবং মেয়ে চুরির অপরাধে রাজীবকে জেলেও ভরিতে পারে। হয়তো রামেশ্বর তাহাই করিবে।

জেলে যাইতে ভয় করেন না রাজীব অধিকারী। কিন্তু মীনুকে যদি কাড়িয়া লয় রামেশ্বর। না না—তাহা কিছুতেই রাজীব সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহা অপেক্ষা মীনুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন—বলিবেন, মীনু তাঁহারই কন্যা—কিন্তু মীনু খুব ছোট। সে কি সব কথা বুঝিবে?

প্রফেসার অধিকারী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সকাল হইয়া গিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারীর লেবরেটরী রুমে ভৃত্য আসিয়া দেখিল—গতরাত্রের খাদ্য সামান্য স্পর্শ করা হইয়াছে মাত্র। সেগুলি তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। একজন চাকর আসিয়া ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। দুইজন তরুণী আসিয়া ঢুকিলেন।

প্রফেসার অধিকারী এখনো ওঠেননি?

—না, কাল অনেক রাতে শুয়েছিলেন। বসুন—উঠবেন এখনি। ভৃত্য চলিয়া গেল। তরুণী দুটি এদিকে ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কাচের জারে মৃত সাপ ও সাপের কঙ্কাল। প্রত্যেকটির নীচে লেবেল মারা আছে—কোন্ দেশের সাপ —বিষাক্ত কিনা—সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ—ইত্যাদি—

তরুণীদের একজন বলিল—

—যদি রাজি না হন ভাই, যা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

—না হন চলে যাবো।

শ্যামল আসিয়া ঢুকিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—ভালো আছেন? নমস্কার।

শ্যামল বলিল—আজ্ঞে হাঁ, এত সকালে?

—আজ আমাদের 'সরিৎপদ্মে' একটা জলসা আছে, আপনাকেও নিমন্ত্রণ করছি। একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র দিল শ্যামলের হাতে।

—ধন্যবাদ। কিন্তু প্রফেসার অধিকারীকে কেন?

—উনি যদি অনুগ্রহ করে প্রিসাইড করেন।

আপনাদের সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু উনি কি রাজি হবেন মনে করেন?

—জানি না, আপনার কি মনে হয়?

—জানি না। সাপ নিয়েই যিনি সারাজীবন কাটালেন—বিয়ে পর্যন্ত করলেন না, তাঁর মতো লোক এ-ব্যাপারে যাবেন কি না...

নেপথ্যে প্রফেসার অধিকারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ওর স্নানকরা কাপড় ছাড়া ইত্যাদি হ'লে আমাকে খবর দিস। বুঝলি? বলিতে বলিতে প্রফেসার নামিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ; পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সৌম্যশ্রীতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের জ্যোতি জাগিয়া আছে। তথাপি মুখে ক্লান্তির চিহ্ন—ওষ্ঠযুগল দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্পের পরিচয় দিতেছে। তরুণীদ্বয় নত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বলিল—

—একটা দরকারে এসেছিলাম, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে স্যার।

—বলো মা, সঙ্কোচের কি আছে।

—না স্যার—অন্য কথা—

—কারো কাছে ইন্ট্রোডাকশন লেটার—

—না স্যার—আমাদের 'সরিৎপদ্মে' আজ একটা জলসা আছে।

—জলসা। সে কি, কি জিনিস? খাওয়ার নিমন্ত্রণ?

—হ্যাঁ—নাচ, গান, আবৃত্তি সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ।

—ও—আচ্ছা, তা আমায় কি করতে হবে?

—আমাদের সব প্রফেসারই একদিন করে প্রিসাইড করেছেন। আজ যদি আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন।

—আমার একটি আত্মীয়া এসেছে—খুব নিকট আত্মীয়া। তাকে নিয়ে যেতে পারবো?

—নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। কোথায় তিনি? আমরা নিজে বলে যাব।

সে নেহাৎ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মা, এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—বেশ স্যার, তাই করবেন।

আশাতীত সাফল্যে উভয়েই খুব আনন্দিত হইয়া উঠিল। শ্যামল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রফেসার অধিকারী তাহার দিকে চাহিলেন। শ্যামল সকালে উঠিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। হাতমুখ ধোয়া এবং কিছু খাওয়া হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছে।

—তোমার এ-রকম অবস্থা কেন শ্যামল? খুব যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। শরীর ভালো আছে? তোমার মা—?

—ভালই আছি স্যার, একটা দরকারে সকালেই এসেছি।

তরুণীদ্বয় সাহস পাইয়া বলিল—শ্যামলবাবু পড়াশুনো যত ভাল করেন বেশবাসে ততোধিক অন্যমনস্ক। ওঁকেও নিয়ে যাবেন স্যার—আমরা নিমন্ত্রণ করে গেলাম। নমস্কারান্তে তরুণীদ্বয় প্রস্থান করিল।

—বসো শ্যামল। দরকার হয়ত মুখ হাত ধোও বাবা। কিছু খাবে? বোধ হয় না খেয়েই এসেছ!

শ্যামলকে পাশের বাথরুমে যাইতে বলিল,

—হ্যাঁ—খাবো কিছু।

শ্যামল চলিয়া গেলে প্রফেসার অধিকারী বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। একটা ফুলের টবে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই একটা তুলিয়া লইলেন। উপর হইতে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, দিদিমণির স্নান হইয়া গিয়াছে। শ্যামল বাহিরে আসিতেই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। মীনু বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

এসো মা, চা খাবে, এসো! এই আমার ছাত্র শ্যামল, এসো, আলাপ করিয়ে দিই।

শ্যামল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছে। গতকল্য সে ইহাকেই তো দেখিয়াছে? হ্যাঁ—ঠিক ইহাকেই। মনে তাহার নানা প্রশ্ন উদয় হইতে লাগিল।

—আপনার সাপ এনে দেয় সেই কে উনি স্যার?

অকস্মাৎ অতর্কিত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া প্রফেসার অধিকারীর মুখে বিচলিত ভাব দেখা গেল। মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—

—ওর কেউ নয়, আমারই আত্মীয়া—মেয়ের মতো,—বসো।

শ্যামল আর কোন কথা কহিতে সাহস পাইল না। বিশেষ কোন কথাও কহিল না। খাওয়া শেষে প্রফেসার অধিকারী শ্যামলকে লইয়া নীচে নামিলেন। মীনু উপরে রহিল।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন রামেশ্বর। হাতে দোনালা বন্দুক। কোথায় যেন বাহির হইবেন। ভৃত্য কানাই আসিয়া করজোড়ে জানাইল প্রাতরাশ দেওয়া হইয়াছে! বন্দুকটা সযত্নে একপাশে রাখিয়া খাবার-ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্তির সুরে বলিলেন—

—কি দিয়েছো ওগুলো! মোটা মোটা রুটি। রুটিও কাটতে জানো না। মাখন লাগিয়েছো তো ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। নিয়ে যাও।

—ডিম দুটো এতো বেশী সেদ্ধ করেছ কেন? ইডিয়ট সব! হারামজাদার দল—এতকাল কি শিখলি!

খাদ্যপাত্রগুলি ঠেলিয়া দিলেন এবং চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

—চা না ছাই হয়েছে—গরম জলে চিনি গুলে দিয়েছ। যত সব! নীরবে কয়েকটা চুমুক দিয়া বলিলেন—

—ও চেয়ারটা এখানে কেন? সরিয়ে দাও—জান না, ওটাতে মীনু বসতো?—ওটা সরাও! আরও এক চুমুক দিয়া,

—নাঃ—খাওয়া গেল না। উঠিয়া আসিবার পথে ঢাকা দেওয়া সেতারটা দেখিয়া—কি এটা—কি ঢেকে রেখেছ?

দিদিমণির সেতার হুজুর।

রামেশ্বর রায় সেতারে প্রচণ্ড একটা লাথি মারিয়া বলিলেন, দূর করো—আমার চোখের সামনে কেন?

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো রামেশ্বর বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

'লোকে বলবে—রায় বংশের মেয়ে বেরিয়ে গেল! না বেরিয়ে সে যায়নি। রাজীব তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।' কে আছিস? দয়াল সর্দারকে ডাক—এক্ষুণি।

—ডাকতে গেছে হুজুর।

—গেছে তো আসছে না কেন? লাটসাহেব হয়েছে নাকি?

রামেশ্বর দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এতবড় স্পর্ধা! আচ্ছা দেখে নেব। দয়াল আসিয়া অভিবাদন করিল!

—এসো দয়াল, এত দেরি করে ফেললে! শুনেছ তো, তোমাদের দিদিরাণীকে, রায় বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। যে তাকে চুরি করেছে আমি চিনিয়ে দেবো—তুমি শেষ করে আসবে, পুরস্কার দক্ষিণের মাঠের বারো বিঘে জোল জমি। তোমার ছেলে—নাতি—ভোগ করবে! রাজি?

—হুজুরের কথা চিরদিন মেনে এসেছি, কিন্তু চুরি সে করেছে কিনা—

রামেশ্বর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—চুপ কর বেটা, তোকে তার হিসাব রাখতে হবে না।

দয়াল চুপ করিয়া গেল। রা[illegible] হাঁকিলেন,

—কানাই!

—হুজুর।

—কিছু খেতে দে। ঐ বোতল রয়েছে—একটু কড়া পাক—ঐটে, হ্যাঁ, যা তোরা এবার, আচ্ছা থাম,—না—যা সব।

রামেশ্বর ও দয়াল ব্যতীত অন্য সকলেই চলিয়া গেল।

—মীনুর মা'র কথা মনে আছে তোমার দয়াল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—মনে থাকবে না কি!

—তাঁরই এক আত্মীয়—হ্যাঁ, আত্মীয়ই বলা যেতে পারে, সেই করেছে এ কাজ। কেন করেছে জান—ভয়ে।

—তা হতে পারে হুজুর, আপনাকে কে না ভয় করে?

—না দয়াল—এই পৃথিবীতে সেই একমাত্র লোক—যে রামেশ্বর রায়কে কোনদিন ভয় করলো না! ভয়ে নয় লোভে—কিন্তু কিসের লোভ জান?

টাকা কড়ি কিছু চায় হয়ত।

—না—না টাকার তার অভাব নাই। যাক—যে জন্যই হোক রায় বংশের সম্মান সে ক্ষুণ্ণ করেছে, অতএব—বুঝেছো?

—যে আজ্ঞে, ওর আর বোঝাবুঝি কি! কালই তা হলে।

সম্মুখের পথ দিয়া একজন বৈষ্ণবী গাহিতে গাহিতে আসিতেছে :

(গান)

সম্মুখের কুঞ্জ-কাননে বসি মনে মনে গাঁথিব যতনে মালা।
আমি প্রভাত-পবনে ভ্রমি বনে বনে জুড়াবো হৃদয়-জ্বালা।
আমার হারানো নিধিরে পাই যদি ফিরে আসিব আবার দেশে,
আর যদি নাই পাই—শোন বলে যাই কি কাজ ফিরিয়া এসে।
আমি সেই দেশে যাব যেথা গেলে পাব আমার সে হৃদিহারা।
মাটিতে না পাই জলেতে খুঁজিব, হব আকাশের তারা।
আমি বাতাসে বাতাসে মিশিয়া থাকিব সে লবে নিঃশ্বাসে টানি,
আমি জীবনে না পাই মরণে খুঁজিব বিশ্বভুবন খানি।

রামেশ্বরে কিছুক্ষণ গান শুনিলেন। এই বিরহসঙ্গীত সহ্য হইতেছে না—বলিলেন—
ওকে তাড়িয়ে দে তো—তাড়িয়ে দে।

কানাই ও দয়াল যাইবার ইঙ্গিত করিতেই বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কানাইকে বলিলেন—

—ও বেলা কলকাতা যেতে হবে, সুটকেশ, বেডিং, সব গুছিয়ে রাখ! আর ম্যানেজারকে বল কলকাতায় একটা 'তার' করে দিতে।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর বলিলেন—

—আচ্ছা দয়াল, কাল রাত্রেই তোমার দয়াল নাম সার্থক হবে।

রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিলেন।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দয়াল বলিল—

—হুজুরের দয়া।

দয়াল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

—রায় বংশের কেউ থাকবে না—না থাক্, যাক—সব যাক।

অত্যন্ত অস্থির হইয়া একটা আয়রন-সেফ খুলিলেন। টানিয়া বাহির করিলেন একটা ফটো ও এক টুকরা কাগজ। জোরে পড়িতে লাগিলেন—

—"প্রিয়, তুমি যে না-দেখা স্বর্গ-কুসুমটি আমাকে উপহার দিয়েছিলে—সে আজ সাতদিন হলো—মাটির ধরণীতে নেমেছে। তোমার অগাধ প্রেমের এই একরত্তি নিদের্শনটুকুই আমার বিশ্ব ভরে রাখবে"...রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ! প্রেম! প্রেম বলে কোন পদার্থ আছে নাকি! ও-সব ওই কাব্যময়ী মেয়ে ভদ্রার ছিলো। যাক, সে গেছে—জাহান্নামে গেছে, যদি জানতাম সে বিয়ের পরেও রাজীবের কথাই ভাববে—কিন্তু থাক! সে গেছে। তার মেয়ে যাবে, তার কাছে যাবে রাজীব, যাবেই। বংশের কেউ থাকবে না! দূর হোক—আমি আছি, আমি—স্বয়ং রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

গ্লাসে খাঁটি মদ ঢালিলেন ও মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

চিন্তা তাঁর অগাধ হইয়া উঠিল। বহুদিন যে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তাহাও মনে পড়িতেছে—ভদ্রাকে লাভ করিবার জন্য কী ভীষণ চক্রান্ত-জাল তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কি হইল? ভদ্রা তাহাকে কিছুই দিল না। না—দিয়াছে অশান্তি। মনে পড়িল, মৃত্যু-মুহূর্তে ভদ্রার কথা—"আমার দেহের দেউলে তিনিই রইলেন—তোমাকে ছুঁতে দিইনি। এই আমার সান্ত্বনা।" আশ্চর্য! মৃত্যু বরণ করিল, তবু সে রামেশ্বরের হইল না। প্রেম কি সত্যই আছে নাকি?

কিন্তু এসব কথা এখন কেন?

চিন্তার মোড় ঘুরাইলেন রায় রামেশ্বর। ভাবিতে লাগিলেন, আগে ভদ্রভাবে বলা যাক—মীনুকে ফিরাইয়া দিতে। অনর্থক ঝামেলা করিতে রামেশ্বর ইচ্ছুক নহেন। মীনুকে তিনি কিছুতেই রাজীবের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। না—না—না!

রায় বংশের ঐ জ্বলন্ত কলঙ্ক কোন রকমেই পৃথিবীতে থাকিবে না। নিজের হাতে তাহাকে—না—না—না—মীনুকে নিজের হাতে হত্যা করা রামেশ্বরের পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব নহে। মীনু—মীনাক্ষী—তাঁহার কত আদরের মীনাক্ষী—যাহার জন্য রায় রামেশ্বর সর্বস্ব দিতে পারেন—তাহাকে একেবারে হত্যা করিতে হইবে!

কিন্তু উপায় কি। বংশের কলঙ্ক সে। বাঁচিয়া থাকিলে কোনদিন না কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিবে—তাহার জীবনরহস্য। ঐ রাজীবই হয় তো বলিয়া দিবে অথবা ইতিমধ্যেই বলিয়াছে।

কিন্তু হত্যা মীনুকে নিজের হাতে কিছুতেই করিতে পারিবে না রামেশ্বর।—সে কি! কেন? কেন পারিবেন না? কে সে তাঁর। তাঁর নিজের আত্মজ তো...

শিহরিয়া উঠিলেন রায় রামেশ্বর। কোথায় যেন একটা অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে তাঁহার জীবনে! হ্যাঁ—অঘটনই তো!

বহু ; বহু দিন চলিয়া গিয়াছে—[illegible] বৎসর—হয়তো পঁচিশ বৎসর—কে জানে কত দিন—রায় রামেশ্বর একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—বেশ টাকা...নাঃ—রায় রামেশ্বরের হইল কি!

চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন—

—এই, কে আছিস!

ভৃত্য কানাই তৎক্ষণাৎ আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন,—কিছু না—যা—

কানাই চলিয়া যাইতেছে। রামেশ্বর বলিলেন—

—আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়। না না—থাক—ম্যানেজারকে ডাক ; বল, ত্রিশ বছরের হিসাবের খাতা দেখতে চাই আমি।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর মদ ঢালিলেন এবং পান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে একটা চাকরের মাথায় কয়েকখানা মোটা খাতা চাপাইয়া ম্যানেজার বলরামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন—

—আমি কোন কোন সালে কলকাতার কলেজে পড়তাম বলরামবাবু?

—হুজুর—বলরামবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—বছর পঁচিশ আগের কথা!

—দেখুন তো ঐ সময় একটা মোটা টাকা আমি খরচ করেছিলাম একসঙ্গে। হাজার আট দশ হবে—কত সালে দেখুন।

বলরামবাবু মনে মনে যতটা সম্ভব সালের হিসাব করিয়া একখানা মোটা খাতা খুলিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—

—ইংরাজী উনিশ শো' আটত্রিশ সাল হুজুর—ঠিক পঁচিশ বছর হলো। কত টাকা দেওয়া হয়েছিল...

—থাক—আর কিছু দরকার নাই। যান আপনি।

বলরামবাবু চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন,

তহবিল হইতে মোটা টাকাই লওয়া হইয়াছে—কিন্তু সব টাকা তো ঐ বাবদে খরচ হয় নাই। মীনুর মায়ের বাবাকে কিছু মোটা টাকা দেওয়া হইয়াছিল। বেশী অংশই তিনি লইয়াছিলেন। মীনুর মা যে তার পূর্বেই রাজীবকে...না না—এসব কথা রামেশ্বর আর ভাবিবেন না—যত ভাবিতেছেন, ততই তিনি উত্তেজিত হইতেছেন। এখন উত্তেজনার সময় নহে। ধীর মস্তিষ্কে তাঁহাকে সকল দিক সামলাইতে হইবে। আগে রাজীবকে পৃথিবী হইতে সরানো দরকার। তারপর—মীনাক্ষীকে। কিন্তু কেন? অকারণ দুটো খুনের কি দরকার। মীনাক্ষীকে সরাইয়া দিলেই তো চলিবে। রাজীব কাঁদিতে থাকিবে—আঁটকুড়ো রাজীব বুকফাটা চীৎকারে কলকাতা শহর কাঁদাইয়া তুলিবে—সেই তো ভাল প্রতিশোধ। রাজীবের আর কেহই থাকিবে না।

কিন্তু রামেশ্বরেরই বা কে থাকিবে! কেহ না—কেহই না। তার পরও কিছুকাল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যাইবে—মন্দ কি? হ্যাঁ—মীনুকেই সাবাড় করিয়া দেওয়া হউক—

—দয়াল!—সজোরে হাঁক দিলেন রামেশ্বর।

—দয়াল তো চলে গেছে হুজুর—কানাই আসিয়া জবাব দিল।

—আচ্ছা থাক্—এখন আর দরকার নেই। তুই যা।

কানাই চলিয়া গেল।

রামেশ্বর ভাবিতেছেন, এত তাড়াতাড়ি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তা করিয়া তারপর যা হয় করা যাইবে।

চতুর্দিক শূন্য হইয়া আসিতেছে। বাগানের দিকে একটা মালী ফুলগাছে নিড়ানী চালাইতেছিল—সেও চলিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর একা। প্রকাণ্ড ঘরটার মধ্যে একা রামেশ্বর।

চারিদিকে কেহ কোথাও নাই...শুধু আছে রামেশ্বরের চিন্তা—রামেশ্বরের হত্যাপটু হাত এবং সেই হাতে মদের গেলাস।

কিন্তু বিস্তর খাইয়াছেন রামেশ্বর আজ। আর না। রামেশ্বর গ্লাসটা সরাইয়া দিলেন উঠিয়া একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন দেরাজের কোণা হইতে। বাক্সটির মধ্যে কি যেন আছে। মণিমানিক্য নয়—একটা ফোটো। ছোট একটা বাচ্চার ফোটো অনাদৃত—অবহেলিত অবস্থার ফোটো। নিতান্ত শিশুর একখানা ফোটো—হয়ত ছয় মাসের। কে জানে কে সে।

কেউ কি জানে? না। কিন্তু রামেশ্বর জানেন? আর কেহ যদি জানে তো সে রাজীব অধিকারী। হ্যাঁ রাজীবরে আর বাঁচা চলে না। রামেশ্বর-সম্বন্ধে রাজীব অনেক বেশী জানে—অতএব তাহাকে মরিতেই হইবে।

গাড়ীতে চলিতেছিলেন রামেশ্বর রায়—প্রথম শ্রেণীর কামরায়। তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ইংরাজ রাজপুরুষ ও বিশেষ ধনী ব্যতীত কেহই চড়িত না।

রায় রামেশ্বর বিশেষ শ্রেণীর ধনী। তাঁহার জমি-জমিদারীতে ও কয়লাকুঠির আয় কয়েক লক্ষ টাকা।

রামেশ্বর রায় গদীমোড়া আসনে শুইলেন। ভৃত্য কানাই চাকরের কামরায় নিজের বিছানা রাখিয়া এখানে আসিল ও মনিবের সবকিছু প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্ন দেখিতেছেন—

জমিদারীর একটা মহলে গিয়াছেন তিনি। প্রকাণ্ড কাছারীর সামনে একটা পুকুর। জল কাক চক্ষুর মতো। সেই পুকুরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন তিনি। ওপাশে গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসে। জমিদার এদিকের ঘাটে আছেন জানিয়া তাহারা কেহই আসিতেছে না। অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে গ্রামের সকলের। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার সাহস নাই।

অবশেষে এক বিধবা আসিয়া করজোড়ে বলিলেন,

—সারা গাঁয়ে এই একটি মাত্র খাবার জলের পুকুর হুজুর...

—হ্যাঁ—তাতে কি? জল খাবে তোমরা!

—হুজুর ঘাটে থাকতে মেয়েরা জল নিতে আসতে পারে না!

—ও তাই নাকি! তা আমাকে তো কেউ জানায়নি। আচ্ছা...

রামেশ্বর ছিপ গুটাইয়া চলিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ ঐ বিধাবাকে বলিলেন—

—তুমি কে? কার ঘরের মেয়ে! কে আছে তোমার?

—আমি হুজুর দেবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী। থাকার মধ্যে আছে একটা সোমত্ত মেয়ে।

—চলে কি করে? আয় কি?

—অচল হয়েই আছে হুজুর—[illegible] তিন বিঘে জমির ধান—আর হাতে পৈতে কাটি।

—তোমার মেয়ে? সে কি করে?

—কী আর করবে হুজুর—রাঁধে-বাড়ে—

—লেখাপড়া শিখেছে?

—সামান্য—গাঁয়ের স্কুলে যা হয়।

—আচ্ছা—তাকে নিয়ে এসো—আমি দেখি যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।

—যে-আজ্ঞে।

বিধবা চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কাছারীর ভিতর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইতেছে। তবে কি আজ উহারা আসিবে না নাকি! না আজ আর আসিবে না। রামেশ্বর একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—

—দেবানন্দ মজুমদারের বাড়ী কতদূর?

—ঐ তো পুকুরটার ওপাশে।

—চল—দেখে আসি। ওদের নাকি খুব অভাব।

হ্যাঁ—হুজুর, চলুন।

জমিদার রামেশ্বর পৌঁছিলেন দেবানন্দ মজুমদারের ভাঙা বাড়ীতে। দরিদ্র বিধবা কি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে। নাই—কিছুই নাই। কিন্তু কিছুই দরকার হইল না। রামেশ্বর নিজেই একটা কাঠের জলচৌকি টানিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,

—কৈ—দেখি কত বড় মেয়ে?

ধীরে ধীরে অষ্টাদশী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর দেখিলেন তাহাকে—দেখিলেন মৃৎ প্রদীপের আলোক—দেখিয়া আর পলক ফেলিলেন না।

—আমি ওকে বিয়ে করবো। কি নাম তোমার? ভয় কি বলো!

মেয়েটি ভয়ে এবং আশঙ্কায় জড়সড় হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তাহার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন—

—ভয় কি! রায় বংশের বৌ হবে তুমি।

—অত সৌভাগ্য কি ওর হবে হুজুর!—বিধবা বলিবেন।

—হবে কি—হয়েছে। এ মেয়ে আমি হাতছাড়া করবো না। চল, তোমরা আজ থেকেই আমার কাছারীতে থাকবে। চলে এসো।

—আজ থেকেই? সেটা কি ঠিক হবে হুজুর?

—ও—আচ্ছা—বেশ। আজ অধিবাস হয়ে গেল। কাল বিয়ে। যোগাড় কর। এই নাও টাকা—

রামেশ্বর এক গোছা নোট দিলেন। তাঁহার যেন আর সবুর সহিতেছে না।

—এটা পৌষ মাস চলেছে হুজুর—বিয়ে হয় না।

—ও হ্যাঁ—আচ্ছা, আমি গন্ধর্ব্ব বিবাহ করবো। শাস্ত্রে-বিধান আছে মালা-বদল হবে। কালই বিয়ে হবে—বুঝলে।

বিধবা চুপ করিয়া রহিলেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে রামেশ্বরের বিরুদ্ধে যাইবে। তিনি মেয়েটিকে আবার দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা—আজ আসি—

কিন্তু তারপর। ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল নাকি। না—একটা ছোট ছেলের ফোটো চোখে ভাসিতেছে।

রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলেন।—হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

বড় রাস্তার উপর 'সরিৎ-পদ্মের' প্রকাণ্ড গেট দেখা যায় পত্রপুষ্প দ্বারা সুন্দররূপে সাজানো ছোট ছোট লাল নীল আলোর ফুলঝুরির মধ্যে সুন্দর হরফে লেখা—"সরিৎ-পদ্ম"। দুই একজন নারী ও পুরুষ ঢুকিতেছেন, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নীলা ও শীলা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের একজনের হাতে একটি পুষ্পপাত্রে গোড়ে মালা অপরের হাতে একটি বোকে। ওদিক হইতে ইলা একগোছা বেলফুলের মালা লইয়া আসিয়া যোগ দিল। অতিথিদের প্রত্যেককে ইলা একটি করিয়া মালা দিতেছে, পরস্পর অভিবাদন করিয়া অতিথিগণ ভিতরে গিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন। সভাপতি এখনো আসেন নাই। শ্যামল আসিয়া প্রবেশ করিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—প্রফেসার অধিকারী কৈ?

—মোটরে আসছেন, আমি বাড়ী থেকে এলাম।

—ভুলে যাননি তো তিনি? আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই ভাল হ'তো।

—না—না—কথা দিয়েছেন—আসবেন নিশ্চয়।

একখানি গাড়ী হইতে প্রফেসার অধিকারী নামিলেন। মীনাকে তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছেন। মীনা সাজানো গেট ও লেখাটার দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ মীনা বলিল,

—সরিৎ মানে তো 'নদী আর 'পদ্ম' মানে বাড়ী, নদীর বাড়ী কি রকম কাকা বাবু?

প্রফেসার অধিকীর বলিলেন,

--মানে খুঁজো না মা, এটা কলকাতা শহর! এখানে কোন কিছুর মানে নেই। এখানে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েরা গার্ল, তাদের কাছে তুমি বেবি! 'কাম ডাউন মাই বেবি'। দেখো, হোঁচট লাগে না যেন।

সযত্নে মীনুকে নামাইলেন।

প্রফেসার অধিকারীর গলায় নীলা গোড়ে পরাইয়া দিল। শীলা মীনার হাতে দিল বোকেটি। ইলা একটি মালা মীনার গলায় পরাইয়া দিল। সকলে হলের মধ্যে প্রবেশ করিলে মীনার হাত ধরিয়া প্রফেসার অধিকারী তাহাকে নিজের ডানদিকের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

প্রেসিডেন্টের বসার সারিতে কয়েকজন নামকরা ভদ্রলোক—তৎপরে নৃত্যগীতের জন্য স্থান এবং তাহার পর শ্রোতা ও দর্শকের সারি। প্রথমেই এক লাইনে জন পাঁচেক তরুণী ও অন্য লাইনে জল সাতেক তরুণ সমস্বরে গান ধরিল—

(গান)

"জনগণ মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা"—

গান শেষে একটি মেয়ে আবৃত্তি করিল—

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।"

তৎপরে অন্য একটি তরুণ গাহিল—

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস নে আজি দোল।"

অতঃপর দুইটি তরুণ কমিক করিল—

প্রথম জন বলিল—

-—বড্ড পয়সার অভাবে পড়েছি রে, গোল্ডফ্লেকের দাম যা চড়া! পাসিংশোই খাচ্ছি

আজকাল—কি আর করি! একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুললে হয় না?

দ্বিতীয় জন বলিল—

—ওপথ একদম বন্ধ। বড় সব জাঁদরেলরা নেমেছেন। তবে ভলেন্টিয়ার হতে পারিস।

—দূর—ছোঃ! আচ্ছা এক কাজ করা যাক। ভদ্রভাবে দুটো পয়সা রোজগার করবো—অন্যায় তো করছি না, কি বল।

২য়—আগে মতলবটাই বল, ভদ্র, অভদ্র পরে বোঝা যাবে।

১ম—তুই আর আমি—বুঝলি, আমি আর তুই, হেঁদোকেও নিতে হবে, বেশ লিখতে পারে ছেলেটা—হ্যাঁ—একটা যাত্রার দল—

২য়—তিনজনে যাত্রার দল হয় নাকি রে ইডিয়ট্।

১ম—হ্যাঁ সেদিকেও মেরে রেখেছে। হিন্দু-সৎকার-সমিতি, অহিন্দু-সৎকার সমিতি কতো কি!

১ম—ধরা, একটা সিগারেট ধরা (সিগারেট ধরাইল) একটা মাসিক পত্র বার করতে হবে মানে বার করবার কসরৎ দেখতে হবে। সব অশ্লীল—আপাদমস্তক অশ্লীল, ন্যাংটা!

২য়—মন্দ মতলব নয়, কিন্তু চালাবি কি দিয়ে? প্রেস, পেপার?

১ম—যারা লিখলে আর যারা পড়বে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে। তোদের বাড়ীর সিঁড়ির পাশে যে জায়গাটা আছে, ওইখানেই অফিস হবে—বুঝেছিস। আমার বাড়ীতে বাবা আছে, তোর ত' আর ঈশ্বরের কৃপায় সে ভয় নেই। দে-না তোর একটা সিগারেট, অনেক দিন উইল্‌স্ খাইনি।

২য়—অফিস করতে বাধা নাই (সিগারেট দিল) কিন্তু টাকা আসবে কি না কে জানে।

১ম—আমি জানি বন্ধু, বাংলার তরুণ-তরুণী এক কলম লিখিবার মতো মাসিকপত্র পেলে আত্মহত্যা করতে পারে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক—চাঁদা এবং ছাঁদা সংগ্রহার্থে!

একজন পরিচিত ভদ্রলোক আসিতেছেন। কমিককারীরা বলিল—

১ম—নীরেন দা, যে। শুনুন শুনুন! আমরা একটা মাসিক বার করছি। সব তরুণের লেখা, আর বেবাক অশ্লীল। আপনার সহানুভূতি নিশ্চয় পাব ভেবেই যাচ্ছিলুম।

—তা বেশ, সবই যখন অশ্লীল—তখন আর কথা কি? বার করো!

—চাঁদা বার্ষিক মাত্র দুটো টাকা। আপনারটা—

—সবই যে অশ্লীল হে, টাকা চাইছো কেন? টাকা তো ভয়ানক রকম শ্লীল। ও সব সময় হয় পাস, নয় পকেটে, নয় প্যাঁটরায় লুকিয়ে থাকে, ও দিয়ে কি করবে তোমরা?

দুইজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল—মানে ও দিয়ে অশ্লীল বস্তু সংগ্রহ করতে হয় কিনা। তাই চাইছি।

—ও হো! তাহ'লে টাকাওয়ালাদের কাছে যাও, বলো—ভয়ঙ্কর শ্লীল একটা কিছু বার করছো তোমরা। ভাগবততত্ব, গীতামৃত চণ্ডীসার—এমনি একটা কিছু।

প্রথমজন বলল,—কী চমৎকার বুদ্ধি আপনার নীরেনদা, আসুন না আমাদের দলে।

—আগে কিছু যোগাড় হোক্, তারপর খবর দিও। নীরেন চলিয়া গেল।

ও দেবে চাঁদা, তুইও যেমন। তার চেয়ে গঙ্গার ঘাটে চল—রামায়ণ পড়বো। দু'একটা বুড়ি এক আধ পয়সা দিতে পারে।

—যাঃ! করিসনে—ইতর কোথাকার।

একটি তরুণী তেছে। হাতে হ্যান্ড ব্যাগ, চোখে চশমা। তাহাকে নমস্কার করিয় বলিল,—একটু দাঁড়াবেন? একটা কথা ছিলো।

—বলুন।

—আমরা একটা মাসিক বার করছি—সব তরুণের লেখা—গীতা, ভাগবত, চণ্ডীরসার সংগ্রহ এবং বেবাক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল,—তা বেশ তো, খুব ভাল কথা—দেবেন এককপি পাঠিয়ে। হ্যান্ড ব্যাগ হইতে কার্ড বাহির করিয়া দিল—ঠিকানাটা রইল—আচ্ছা, নমস্কার।

দুজনে পথ আগলাইয়া বলিল,—চাঁদাটা যদি আগাম দিতেন তো বড় উপকার হতো—মাত্র দুটো টাকা।

—তা বেশ তো, বিকেলে যাবেন। আমি জুতো কিনতে বেরিয়েছি, নতুন এক জোড়া জুতোর বড্ড দরকার হয়েছে—

—জুতো?

—হ্যাঁ, মানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত। আচ্ছা নমস্কার! তরুণী চলিয়া যাইতেছে।

প্রথমজন বলিল,—মনে রাখবেন, আমাদের শিল্পীসঙ্ঘ সব তরুণ-তরুণী—সব অশ্লীল—বে-আবরু।

অন্যজন তাতে যোগ দিল—

—মানে—নগ্ন, উলঙ্গ, অবাধ—ঠিক আপনার হাতকাটা ব্লাউজের মতো।

—না—না, তার চেয়ে আমার জুতো অনেক বে-আব্রু—ঠিক আপনাদের মুখের মতো।

বলিয়া তরুণী চলিয়া গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

—দে না একটা সিগারেট—দেখছিস না, মনটা কি খিঁচিয়ে দিয়ে গেল্!

সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া গেল।

কমিকের অভিনয় শেষ হইতেই একটি মেয়ে সুকুমার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিল। পরে "বন্দেমাতরম্" গান হইল। সকলে দাঁড়াইলেন।

প্রফেসার অধিকারী নীরবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখে দু একবার বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াই মিলাইয়া যাইতেছে! মীনা প্রথমটা চুপ করিয়া শুষ্ক মুখেই বসিয়া ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নৃত্য ও গীত উপভোগ করিয়া খুশী হইয়া উঠিল। জলসার শেষে প্রফেসার অধিকারী একজন ভদ্রলোককে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রথম ভদ্রলোক বলিলেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ। এই তরুণ শিল্পীসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আজকের এই উৎসব আমার মনকে আনন্দের মন্দাকিনী-তীরে নিয়ে গিয়েছে! এঁদের আরো সাফল্য কামনা করার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—এঁরা সকলেই জয়যুক্ত হোন।

অন্য একজন বলিলেন—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত ভদ্রবৃন্দ। এই অপরূপ অনুষ্ঠান-এর উদ্যোক্তারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। দেশের তরুণ মন যে ললতি কলা-রস কলা সম্বন্ধে এতখানি সজাগ

হয়ে উঠবে, এ আশার এবং আনন্দের কথা। আমি উত্তরোত্তর এদের উন্নতি কামনা করি।

পরবর্তী বক্তা একজন মহিলা। তিনি বলিলেন,

সভাধিষ্ঠাতা ও সভাবৃন্দ, আজ কি বিপুল আনন্দ যে পেয়েছি তা মুখে বলাবার ভাষা আমার যোগাচ্ছে না। এই কিছুদিন পূর্বে আমরা অতি সামান্য একটা নাচগানে যোগ দিতে পারতাম না। বিয়ের সময় বাসর ঘরের কুৎসিত কদর্য রসিকতা আর খিড়কী পুকুরের জঘন্য আলাপ ছাড়া আমাদের—মেয়েদের আর কোন আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার অধিকার ছিলো না। আজ এখানে যে সব নারী তরুণী নৃত্য গীত আনন্দ নিয়ে আমাদের চিত্তলোকে রস সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা আমাদেরই জাতি—নারীজাতি—তাই নারীজাতির পক্ষ থেকে আমি এর উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

এর পর প্রফেসার অধিকারী উঠিলেন।

—উপস্থিত ভদ্রকন্যা ও ভদ্রলোকগণ! আপনাদের এই অভিনব আনন্দোৎসবের মধ্যে আমাকে যে কেন নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—বুঝতে পারছি না। তথাপি ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এমন একটা ব্যাপার সভ্যরুচিসম্মতভাবে চলচে পারে—এটা দেখবার সুযোগ আমারা আপনারা দিয়েছেন—এই জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এই আনন্দোৎসব আমাকে নিরানন্দের অন্ধগহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। মানুষের রসগ্রাহী চিত্ত এতে কিভাবে সংক্ষুব্ধ না হয়ে পারে, তাই ভাবছি।

প্রথম যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল তখন শ্রোতার মন দেশাত্মবোধের উচ্চতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলল ; ঠিক তার পরেই একটি আদর্শ প্রেম ও চরিত্রনিষ্ঠার নিদর্শন—এতটা ভালই চললো। তার পরই অতি ললিত গান এবং পরমুহূর্তে বিষাদের এক আবৃত্তি, তৎপরেই আবার বীররস এবং তারপরে লাস্যনৃত্য ;—অথচ প্রত্যেকটা আলাদা, কারো, সঙ্গে কারো কোন সামঞ্জস্য নেই। মানুষের সূক্ষ্ম কলারস-জ্ঞানকে এমন অদ্ভুত নাগরদোলায় দুলিয়ে হত্যা করিবার যাঁরা পক্ষপাতী, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে পারছি না।

আনন্দ উপভোগের নানা পন্থা আছে। মদ বা গাঁজা খেয়েও আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু সে আনন্দ স্বাস্থ্যকর নয়, সুস্থ মন তো কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেও, সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানসম্পন্ন মন এতে আহত হয়। তা ছাড়া, এইরকম নানা রসের সমবায়ে যে কলার সৃষ্টি এঁরা করতে চাইছেন, তাতে উচ্চতর কলানুভূতির কোন আবেদন নেই। একটি মহাকাব্যে সব রসই থাকে কিন্তু সবকে আচ্ছন্ন করে থাকে তার পারস্পর্য্য। আর এ যেন টুকরো ছেঁড়া কয়েকটা মৌসুমী ফুলের পাপড়ি, মালা তো হয়ই না—গন্ধও নাই, গোটাফুল দেখারও আনন্দ মেলে না। জাতীয় সঙ্গীতে মন যখন উচ্চগ্রামে বাঁধা ঠিক তার পরেই পারস্পর্য-রহিত প্রেমসঙ্গীত এবং তারপরই ভাঁড়ামী—কলাজ্ঞানের ব্যভিচার—ইতরামির নামান্তর।

আমাকে এখানে না ডাকলেই সুখী হতাম। যাই হোক, আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি,—এঁরা বারান্তরে সূক্ষ্ম কলা, রসকলার উপযুক্ত ভাবেই আসর গড়বেন।

সভায় উদ্যোক্তা শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন—

আমাদের ত্রুটি এমন স্পষ্ট করে কেউ কোন দিন ধরিয়ে দেয়নি। পূর্বে যাঁরা, এসেছেন—সবাই নিছক প্রশংসাই করে গেছেন। প্রফেসার অধিকারী আমাদের যে পরম উপকারি করলেন এই স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

সভা ভঙ্গ হইল।

মীনাকে লইয়া প্রফেসার অধিকারী বাহির হইলেন।

রামেশ্বরের কলিকাতার বাটি, প্রকাণ্ড প্রাসাদ, বহির্বাটীও উত্তমরূপে সাজানো। একধারে ফরাস পাতা, অন্যধারে সুদৃশ্য টেবিল এবং তাহার নিকট গদিমোড়া কয়েকখানি চেয়ার। দেওয়ালে একটা সুদৃশ্য সুইজারল্যান্ডের ক্লক টাঙানো। টেবিলের উপর টেলিফোন এবং রাইটিং প্যাড—কলমদানী, একটা ভালো ক্যালেন্ডারের তারিখটা ঠিক করিয়া একজন চেয়ার ও টেবিলগুলি পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ঝাড়িয়া দিল। অন্য একজন একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া চেয়ার ও টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অপর একজন ভৃত্য একখানা বাংলা ও একখানা ইংরাজী দৈনিক পত্র আনিয়া বাংলাটি ফরাসে ও ইংরাজীটি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। চারজন তরুণ-তরুণী চাঁদার খাতা হাতে প্রবেশ করিল! একজন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কাকে চান?

—বাড়ীর মালিককে।

—কি দরকার?

—সে কথা তাঁকেই বলবো।

—তিনি সবে এসেছেন—নামতে দেরি হবে।

—আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করছি।

দুইজন তরুণ ফরাসে ও দুইজন তরুণী চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইল।

রামেশ্বর রায় আসিতেছেন। ভৃত্যের দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দুই একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়া গেল। রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন। পরণে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে চীনা-ঢঙয়ের হাতঢাকা ফতুয়া এবং চাদর, ডান হাতের কনুইয়ের উপর মোটা একটা সোনার তাবিজ এবং পায়ে শুঁড় উঠানো চটিজুতা। তিনি যেন কোথায় বাহির হইবেন। তরুণ-তরুণীগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। রামেশ্বর কিছুটা বিরক্ত কিছুটা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কি চাই তোমাদের?

—শুনেছেন নিশ্চয় মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ঘূর্ণিবাত্যায় উৎসন্ন যেতে বসেছে,—মুর্শিদাবাদে মহামারী আকারে কলেরা...

—হ্যাঁ—তার কলকাতায় কি?

—আমরা আমাদের কলেজ থেকে একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছি।

—বেশ ; কিন্তু আমি তোমাদের কলেজের মাষ্টারও নই, পড়ুয়াও নই।

—আপনি দেশের একজন মানুষ, আজ আপনার দেশবাসী বিপন্ন—

—তাদের সম্পন্ন হতে বল বাপধনরা, আমি বড় ব্যস্ত আছি। কানাই!...

রামেশ্বর অন্যদিকে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কানাই আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

—সম্পন্ন হবার পূর্বে তারা বাঁচুক, তাদের বাঁচাতে হবে আমাদেরই।

রামেশ্বর মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

—কত টাকা উঠেছে?

—বেশী না—শ' দুই, অবশ্য আমরা এই চার পাঁচ দিন কাজ আরম্ভ করেছি।

—কত টাকা সিনেমায় খরচ করলে?

—সে কি স্যার! সিনেমার খরচ করলুম মানে।

—মানে কত টাকার সিগারেট খেয়েছে ঐ দুশো টাকার মধ্যে?

—আপনি আমাদের হিসাব পরীক্ষা করতে পারেন।

—আমি অডিটর নই, পরীক্ষার দরকার নেই—কিছু দেবো না। তরুণ-তরুণীগণ পরস্পরের মুখে তাকাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। শ্যামল সব পশ্চাতে ছিল—আগাইয়া আসিয়া বলিল—

—কিছু দেবেন না মানে! প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কত টাকার বাড়ী বানিয়েছেন, কতো টাকার আসবাব কিনেছেন, ট্রেনের কোন ক্লাসে চড়ে কলকাতা এসেছেন, কত টাকার মোটর রাখেন, দৈনিক কত টাকার বাজার হয়, কতগুলো চাকর পোষেন সুখ-সুবিধার জন্যে?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিয়াছিলেন। বলিলেন,

—কে হে তুমি চমৎকার বলতে পার ত!

—না, এখনো চমৎকার কিছু বলিনি—বলছি কত টাকার মদ কেনা হয়, কত টাকার মেয়ে-মানুষ আছে, ক'জন মোসাহেব আপনাকে চরিয়ে খায়—বলবেন?

—কি বলছো হে তুমি!

—বিশেষ কিছু বলছি না। বাইরে তো দেখে এলুম, ফটকে লেখা রয়েছে "রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।" হে ইংরাজ সরকারের পোষ্যপুত্র আপনি অবিলম্বে স্যার হোন ; কিন্তু যে দেশের মাটিতে জন্মেছেন, যে দেশের বাতাস নিশ্বাসে টেনে বেঁচে আছেন, সেই দেশের বৃহৎ একটা অংশ আজ বিপন্ন! নিরন্ন দুর্গতদের এই দারুণ দুঃখের দিনে একবার অন্তত বলুন, আপনার সহানুভূতি আছে। টাকা যদি না-ই দিতে পারেন, ওদের কাছ থেকে অপহরণ করা টাকার সবটাই যদি আপনার খোস খেয়ালেই ব্যয় হয়—কলকাতার এই বিলাসের কেলি-নিকুঞ্জে আপনি যত ইচ্ছা সে টাকা খরচ করুন—অন্যের উপর সন্দেহ করবেন না। সবাই রায় বাহাদুর হতে চায় না, কেউ কেউ আছে—যারা শুধু মানুষই হতে চায় ; তাদের যদি চিনতে নাও চান—কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তারা আছে—তারা থাকবে, চললুম। নমস্কার!

নির্বাক্ বিস্ময়ে রামেশ্বর চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহারা চলিয়া যাইতেছে।

—খুব বড় বড় কথা বললে যে হে? কার ছেলে তুমি? বাড়ী কোথায়?

শ্যামল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, সে খোঁজে আপনার দরকার? আপনার মতো স্বার্থান্ধ ধনীর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম—এটা আমার পিতৃপুরুষগণের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

শ্যামল ও তাহার দল চলিয়া যাইতেছে।

ব্যাকুলভাবে রামেশ্বর বলিলেন,

—ওহে ছোকরা—শোন শোন, টাকা নিয়ে যাও।

যাইতে যাইতে শ্যামলের দল বলিল,

—দরকার হবে না, ও-টাকায় আপনার মোসাহেবদের মদ খাওয়াবেন!

সকলে প্রস্থান করিল।

—ছেলেটা কি আশ্চর্য তুখোড়! আমার মুখের উপর কত কথাই না বলে গেল! পুঁচকে একটা কলেজের ছেলে, কিন্তু কি অদ্ভুত সাহস ওর!

হ্যাঁ, ছেলের মতো একটা ছেলে। কী অবাধে—কতটা অনায়াসে কথাগুলো বললো ও! কে জানে কার ছেলে! ওর বাবা নিশ্চয় ভাগ্যবান। এমনি যদি একটি ছেলে পাই মীনুর জন্য! আহা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী সব ভাবছি! মীনুর ভাবনায় আমার আর কি দরকার! মীনুকে কি আর পৃথিবীতে রাখবো আমি? নিশ্চয় না। রায় বংশের কলঙ্কের ঐ জলন্ত প্রমাণকে পাওয়া মাত্র পৃথিবী থেকে সরাতে হবে।

—এই কে আছিস!

ভৃত্য কানাই আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। রামেশ্বর দেখিয়া বলিলেন,

—দয়ালকে ডাক—আমার সঙ্গে যেতে হবে, গাড়ী বার করতে বল।

—যে আজ্ঞে!

গাড়ী আসিতেই রামেশ্বর দয়ালকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন।

পথে যাইতেছেন রায় রামেশ্বর। সামনের সীটে দয়াল সর্দার ড্রাইভারের পাশে বসিয়া আছে। গাড়ী চলিতেছে রাজীবের বাড়ীর দিকে। রায় রামেশ্বর ভাবিতেছেন কে ঐ ছেলেটি? কী আশ্চর্য তাহার ভাবভঙ্গি। আর চেহারাখানা—সত্যই সুন্দর। সমাজসেবা করিয়া বেড়াইতেছে, কে জানে কে উহাদের সর্দার। কিছু টাকা দিতে পারিলে হয়তো খুশী হইত রায় রামেশ্বর—কিন্তু উহারা তো চটিয়া চলিয়া গেল।

আশ্চর্য। রায় রামেশ্বর কোনদিন তো এসব কথা ভাবেন নাই। কোনদিন কাহাকেও কিছু দান করিয়াছেন কি তিনি? না, মনে পড়িতেছে না। দান তিনি হয়তো করিয়াছেন। কিন্তু সে সবই আজ্ঞাবাহী স্তাবকবৃন্দকে। বন্যার্ত বা মহামারীতে আক্রান্ত কাহাকেও কিছু দিয়াছেন কি? না—দান তিনি কখনো করেন নাই—গ্রহণ করিয়াছেন চিরদিন। যদি দান কিছু করিয়া থাকেন, সাধারণ ভাষায় তাহার নাম ঘুষ।

কিন্তু কেন আজ দানের কথা মনে হইতেছে রামেশ্বরের? কেন—কেন? ঐ বাচ্চা ছেলেটা কয়েকটা শক্ত কথা বলিয়া গেল—তাহারই জন্য কি! হ্যাঁ—অমন জোরালো কথা কেউ কখনো বলে নাই রায় রামেশ্বরকে।

কিন্তু এসব চিন্তার ইহা সময় নহে। গাড়ী রাজীবের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রায় রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজীবের হাত হইতে মীনুকে উদ্ধার করিতে হইবে। নালিশ করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আদালতে নানা কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। তাছাড়া রায় বংশের কেহ কোনদিন আদালতে যায় নাই। লাঠির জোরেই চিরদিন এ বংশের সমস্ত মামলা ফয়শালা করিয়াছে। হ্যাঁ—লাঠির জোর—রায় রামেশ্বরের হাতে অন্তত তিন হাজার লাঠিয়ালে মজুত। চিন্তা কি?

রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া লইলেন। রাজীবের বার বাড়ীটা দেখা যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ—বড় গেট—বাগানে নানা রকম ফুলের গাছ—দরজায় দারোয়ান। রামেশ্বর নিজের বেশবাস সংযত করিয়া লইলেন। গাড়ী আসিয়া গেটে থামিল।

রাজীবের প্রাসাদস্থ লেবরেটারী। রাজীব কোথায় বাহির হইয়াছে। মীনা একাকিনী আসিয়া ঘরে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাপ ও সাপের কঙ্কালগুলি দেখিতে সে যেন কতকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মনে হঠাৎ কখন গান ধরিয়াছে।

(মীনার গান)

আমায় ডাক দিযেছে বনের কোকিল কুহুব বাঁশীতে।
আমায় লিখলো লিপি ফাগুন-মাহ্য ফুলের হাসিতে।
আমার মনে যত ছিলো চাওয়া—
সব মিটালো দখিন হাওয়া
সঙ্গোপনে এলো প্রিয় প্রেমের ফাঁসিতে
আমায় বাঁধিয়া নিতে।
অশোক পলাশ ফুলের ডোরে বাঁধিয়া নিতে।

শ্যামল নিঃশব্দে আসিয়া দরজার এক কোণে দাঁড়াইল। মীনা গাহিতেছে। শ্যামল বলিল।

—চমৎকার! বেশ তো গাইতে পারেন।

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া মীনু বলিল,

—যান্—আপনি কখন এসেছেন?

—এই একটুক্ষণ। কিন্তু প্রশংসা করা উচিত হলো না। গানটা থামালেন কেন? গেয়ে চলুন—ভারী সুন্দর লাগছে!

—থাক ঠাট্টা করতে হবে না।

মীনা পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়।

—যাবেন না, গান না গাইতে চান. থাক— কথা আছে।

—বলুন। আমার সঙ্গে কি কথা আপনার?

—কিছু মনে করবেন না। প্রফেসার অধিকারীর তো আপনি আত্মীয়া, কিন্তু ঐ বেদেটা কে আপনার?

—জানি না, ও কেউ নয় আমার। কেন বলুন ত'?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি। আজ রাত্রে আমরা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য মেদিনীপুর চলে যাব। প্রফেসার অধিকারীও যাবেন, আপনিও যাবেন আশা করি।

—জানি না, আমায় কিছু বলেননি।

—হয়তো পরে বললেন। প্রফেসার অধিকারী এলে বলবেন—আমি এসেছিলাম। আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবো। যাবার আয়োজনে ব্যস্ত আছি।

শ্যামল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মীনু তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

—ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে!

প্রবেশ করিল বেদে। হাতে একটা সাপ।

—কেমন আছিস মা? কোন কষ্ট হয়নি তো?

বেদেকে দেখিয়া মীনুর বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। ভয়ে জড়সড় হইয়া সে বলিল—না—ভালো আছি।

—ভয় কী মা—ভয় কী। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। আমাকে যদি বাবা বলতে না পার—বলো না। প্রফেসার অধিকারীর তো আর কেউ নাই, তাকেই বাবা বলো!

—কেন—কিসের জন্য বলবো! আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর। খবরদার সাবধানে কথা বলবে।

—ভুল মা—ভুল শুনেছিস তুই। রামেশ্বর রায় তোর শত্রু। তোর মাকে তোর বাবার বুক থেকে ছিঁড়ে কিন্তু থাক মা, তুই বড্ড ছোট। এখন এসব বুঝবি নে!

বেদের কথা শুনিয়া মীনু বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল আধ মিনিট। তারপর ব্যাকুলভাবে বলিল,

—তুমি কি করে এসব জানলে? কোথায় আমার মা? তুমি দেখাতে পারো?

—পারি! তবে কথা বলাতে পারি না। রামেশ্বর তাকে খুন করেছে, তোকেও খুন করতো—পারেনি।

—মিথ্যে কথা, রামেশ্বর আমার বাবা—আমার বাবা আমায় কতো ভালোবাসেন তুমি মিথ্যেবাদী—চোর শয়তান!

—থামো মা, থামো। রামেশ্বরের কাছেই যদি ফিরে যেতে চাও—আমি তোমায় তাঁরই কাছে পৌঁছে দেবো, কিন্তু মীনু তোমার হতভাগ্য পিতা, তোমার সত্যিকার বাবাকে একবার দেখতে চাও না মা? সে যে বড় দুর্ভাগা।

—তোমার কথা সত্যি কি না কি করে জানব! এই সতেরো বছর আমি রায় রামেশ্বরের পিতৃস্নেহে বড় হয়েছি, এক দিনের জন্যও এতটুকু দুঃখ পাইনি—আজ তুমি বলছো তিনি আমার কেউ নন—বরং পরম শত্রু। মিথ্যে কথা।

বেদে অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল,

—শোন মা—ঐ ভণ্ড কাপুরুষ তোর মাকে এক ফোঁটা ভালবাসতে পারেনি। তুই ছোট হলেও বুঝতে পারবি, তোর মা এক হতভাগাকে ভালবাসতো। টাকা কড়ির তার অভাব ছিল না, কিন্তু সে ছিল স্বাধীনতার উপাসক। তাই বারবার বিদেশী রাজদ্বারে হতে হয়েছিল তাকে লাঞ্ছিত। আর সেই সুযোগ নিয়ে রামেশ্বর তার কাঞ্চনকৌলিন্যে তোর মায়ের বাবাকে—তোর দাদুকে বশীভূত ক'রে বিয়ে করেছিলো, তখন তুই গর্ভে মা—তোর চিরদুঃখিনী মা নিরুপায়ের মতো আত্মবলি দিতে পারেনি, নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও নিজেকে তার বাঞ্ছিত বন্দী প্রিয়তমের জন্য পবিত্র রেখেছিলো। কিন্তু তোর জন্মাবার পর রামেশ্বর আর সহ্য করতে পারেনি—তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলো তুই তখন সাত দিনের মাত্র। তোকেও সে সেই সময় সরাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পেরে ওঠেনি, রামেশ্বরের বাবা বাধা হয়েছিলেন। তারপর কতবার যে রামেশ্বর তোকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষদিন—যেদিন তোকে চুরি করে এনেছি, সেইদিন তোর বাবা রামেশ্বরের কাছে তোকে চাইতে গিয়েছিলো। তাই সেই রাত্রেই তোকে—অকস্মাৎ বেদে থামিয়া গেল।

—বলো—বলো—এ যদি সত্যি হয়—কোথায় আমার সেই বাবা?—কোথায় তিনি? তুমি কি সেই...?

উত্তেজনায় মীনু কাঁপিতেছে। বেদে শান্ত কণ্ঠে বলিল,

—থাম না, তুই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস্!

মীনা পড়িয়া যাইতেছিল—বেদে ধরিয়া ফেলিল।

—না-না-না আপনি বলুন—বলুন আপনি—আপনি কি—

—না মা না! তোর মাকে দেখতে চাস্?

—হ্যাঁ দেখবো আমি—দেখবো—দেখান আপনি!

অকস্মাৎ বাহির হইতে মোটরের শব্দ হইল। বেদে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া দেখিল রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় ও দয়াল সর্দার নামিতেছে। ত্বরিতে মীনুকে টানিয়া লইয়া সে পাশের অন্য দরজা দিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই লেবরেটরীতে রামেশ্বর ও দয়াল প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

—প্রফেসার অধিকারী কোথায়?

—তিনি বাইরে গেছেন হুজুর।

—কখন ফিরবেন?

—আধঘণ্টার মধ্যে। ভৃত্য পাখাটা চালাইয়া দিল।

লেবরেটারী-ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রামেশ্বর আপন মনে বলিল,—আচ্ছা—আসুক।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

—দয়াল! খুব ভালো করে দেখে রাখো। ঘব, দরজা, ভেতর বার—সব।

—যে আজ্ঞে হুজুর!

উভয়ে কিছুক্ষণ লেবরেটারীতে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঢাকা মূর্তিটার কাছে আসিয়া পর্দা সরাইয়া রামেশ্বর যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

—এ কি?

পরম বিস্ময়ে দয়াল বলিলে,

—রাণীমার মুরত হুজুর!

—হ্যাঁ!—পর্দাটা টানিয়া দিলেন।

—ইনি বুঝি রাণীমার কেউ হোন—হুজুর?

—হ্যাঁ—তাঁর আত্মীয়! নইলে মীনুকে চুরি করবে কেন!

রামেশ্বর এদিক-ওদিক ঘুরিতেছেন। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিতেছেন। হঠাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন—স্বদেশী পোষাক পরিহিত জ্যোতির্ময় এক দেশপ্রেমিক।

—ভারত মাতরম বন্দে!

রামেশ্বর পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বললেন—বেশ বেশ। স্বদেশী চালাচ্ছো তা হলে এখনো।

নিশ্চয়। স্বদেশী করতে গিয়েই তো ভদ্রাকে হারিয়েছি—তাতে ছাড়িনি। কিন্তু অকস্মাৎ রায় বাহাদুরের দীন-ভবনে শুভাগমন কেন?

—মীনুকে রেখেছো কোথায়? চুরি যে তুমি করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাস্তি। তাকে বার করে দাও, নইলে—

—নালিশ করবে?

—রায় বংশের কেউ কখনো আইন আদালত করে না, জানো ত?

—নিজের মেয়েকে আনবার জন্য আইন-আদালত দরকার হয় না।

—একটা মরা সাপ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। বললেন,

—ওরে, রায়বাহাদুর আর তাঁর দেহরক্ষীর জন্যে কিছু চা, জলখাবার আন। কেমন হে—খাবে ত? রামেশ্বর।

—তোমার বাড়ী খেতে আসিনি রাজীব। যদি ভালোয় ভালোয় মীনুকে না দাও—অন্য

পন্থা দেখতে হবে। ভেবে বলো।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—দেবো না, যে-কোন পন্থা দেখাতে পার।

—না দেবার কারণ? কি অধিকার আছে তোমার তাকে আটক রাখবার?

রাজীব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—অধিকার তোমারই আছে নাকি হে!

—আচ্ছা—তা হলে দেখা যাক।

দয়াল সর্দার ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল—রামেশ্বর ডাকিলেন,—এসো দয়াল।

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

—শোন রামেশ্বর। তুমি বোধ হয় জানো না যে দীর্ঘ সতের বছর আমি সর্বদা মীনুর খোঁজ নিয়েছি। জানতাম তুমি তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখ—সুখে আছে—থাক। কিন্তু সেদিন জানলাম—তুমি তার পিতৃস্নেহবুভুক্ষ হৃদয়কে প্রতারিত করেছো। তুমি তাকে পৃথিবী থেকে—কিন্তু বহুদিন তার লালন-পালন করেছো—ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি তার জন্য। এবার আমাব ধন আমি ফিরে চাই—তাই নিয়ে এসেছি। ভদ্রার দান—আমার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন কুসুমকলিটি তোমার মতো শয়তানের হাতে আর ফেরাবো না।

—ভালোয় ভালোয় দেবে বলেই এসেছিলাম, আচ্ছা থাক—তা হলে।

—কিছু একটু খেয়ে যাও হে রামেশ্বর...বিষ দেবো না, ভয় নেই, বসো। পদ্মার খবর বাখ কিছু?

—কে পদ্মা? কোথাকার পদ্মা?

রাজীব উচ্চহাস্য করিলেন—তা বটে। কোথাকার পদ্মা। নদী হে—কীর্তিনাশা পদ্মা। রায়বংশের সব কীর্তি নাশ করে তবে ছাড়বে। মনে নেই?

—অনর্থক ভয় দেখিও না রাজীব, পদ্মা মেঘনাকে ভয় করে না রামেশ্বর। কে সে—কোথায় থাকে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার?

—থাক্ থাক্। যখন ভুলেই গেছ—তখন আর কেন. বসো, চা খাও একপাত্র। ওবে—চা-খাবার নিয়ে আয়।

—থাক রাজীব—এই নীরস আতিথ্যের প্রয়োজন নাই। দয়াল!

দয়াল দরজার ওপাশ হইতে বলিল,

—হুজুর!

উভয়ে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন। শ্যামল ঢুকিল।

একমিনিট তাহার দিকে তাকাইয়া রামেশ্বর বলিলেন,

—এসো দয়াল!

ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে শ্যামল বলিল,

—অধমাধমের আসায় কিছু ক্ষতি হলো নাকি রায়বাহাদুর?

রায় রামেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। প্রায় আধমিনিট চাহিয়াই রহিলেন তিনি। শ্যামল আবার ব্যঙ্গস্বরে বলিল,

—ভয় দেখাচ্ছেন নাকি স্যার! কিন্তু ও চাহনি বুর্জোয়ার চাহনি। ওতে আমাদের আর

ক্ষতি হয় না।

—সাবধানে কথা বলবে ছোকরা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সাবধানেই আছি। আপনিও এবার থেকে একটু সতর্ক হবেন—কারণ দেশ শীগ্রি স্বাধীন হচ্ছে—জমিদারী যাবার মুখে ; স্যার বা রায় বাহাদুরদের আর খাতির নেই—ওটা ত্যাগ করে বরং খবরের কাগজে নাম ছাপাবেন। বলেন তো আমিই আপনার স উপকারটা করে দিতে পারি।

—ডেঁপো কাঁহাকা! এসো দয়াল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া রায় রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। রাজীব বলিলেন,

—ব্যাপার কি শ্যামল? ওঁর সঙ্গে কিসের ঝগড়া তোমার? ওঁর অসম্মান করো না। উনি আমার বন্ধু!

—বলবেন না স্যার। উনি আপনার বন্ধু হবার একান্ত অযোগ্য। উনি শুধু শোষক জমিদার নন—উনি শয়তান!

রায় রামেশ্বর গেটের বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিতেছেন। শ্যামল দেখিল রামেশ্বর চলিয়া গেলেন। রাজীব শ্যামলকে প্রশ্ন করিলেন,

—ওকে তুমি চিন্‌লে কি ক'রে?

—ওঁর বাড়ী চাঁদার জন্য গিয়েছিলাম স্যার। বলেন চাঁদা তুলে কত টাকার সিনেমা দেখলে, কত টাকার সিগারেট খেয়েছ। ও কি জন্যে এসেছে স্যার? এই দেবভূমি অপবিত্র করে যে!

রাজীব মৃদুহাস্যে বলিলেন—আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। ও আমার বন্ধু!

—এ পরিচয় দেবেন না স্যার! ও আপনার বন্ধু হবার যোগ্য নয়।

—বন্ধু নয় শ্যামল—শত্রুতা করতেই এসেছিলো। কিন্তু থাক্ সে কথা। মেদিনীপুর যাবার আয়োজন সব হয়েছে ত?

—হ্যাঁ স্যার—সব ঠিক। আজই আমরা রওনা হতে পারি!

—আর দেরী করা উচিত হচ্ছে না, চলো—আজই যাওয়া যাক।

—আপনার সেই আত্মীয়াটিকে কোথায় রেখে যাবেন স্যার?

—ওকে সঙ্গেই নিয়ে যাব, সেও এ সব কাজে যোগ দেবে।

শ্যামল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল—খুব ভাল হবে স্যার। আচ্ছা, আমি তৈরি হয়ে নিইগে।

রাজীব চুপচাপ বসিয়া আছেন। গভীর চিন্তা করিতেছেন তিনি। শ্যামলের সহিত রায় রামেশ্বরের কথা ও তার প্রতি শ্যামলের মনোভাব জানিলেন প্রফেসার অধিকারী। তিনি নিজেও রামেশ্বরকে শত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেন, কিন্তু কেন করিলেন। রামেশ্বর শত্রুতা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শ্যামলের কি। শ্যামলকে কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

কিন্তু শ্যামল তাঁহার ভক্ত শিষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন—হয়তো সে কোনদিন বাংলার গৌরব, এমন কি ভারতের গৌরব বর্ধন করিতে পারিবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে শ্যামলের মতো উদার বুদ্ধিমান ও বিদ্বান যুবকের অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্যামলকে তিনি নিজ হাতে গাড়িয়াছেন—হ্যাঁ গড়িয়াছেন। বহু ব্যক্তির ধারণা—শ্যামল তাঁহারই পুত্র। অন্তত পালিতপুত্র—ইহা সকলেই জানে।

শ্যামল তাহার মাকে লইয়া অন্য বাড়ীতে থাকে। কিন্তু সে বাড়ীর এবং শ্যামল ও তাহার

মা'র দেখাশুনার সব ভারই প্রফেসার অধিকারীর হাতে। কিন্তু প্রফেসার অধিকারী জানে
শ্যামল তাঁহার কেহ নহে—হয়তো কোনদিনই কেহ হইবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন তিনি একটা?

সেই খোলার বস্তিতে শ্যামলের ঘরে টবের উপর একটি তুলসী গাছ। শ্যামলের মা
তুলসীমঞ্চতলে প্রণাম করিতেছেন। শ্যামল বাড়ী ঢুকল।

—ভালো ক'রে আশীর্বাদ চেয়ে নাও মা, তোমার খোকা যেন জেলে যায়।

মা চমকিয়া বলিলেন—শয়তান ছেলে! কি অলক্ষুণে কথা—মাগো! খোকা।

হাসিতে হাসিতে শ্যামল বলিল—বন্যায় যারা ডুবেছে, যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, যারা
পেটে খাবার আর পরণে কাপড় জোটাতে পারছে না—তাদের জন্য যাচ্ছি মা! তোমার
খোকাকে যে দেবতা করতে চাও—ভয় কি তোমার?

—ভয় করে বাবা—মাণিক! আমার যে আর কেউ নেই খোকন!

—আমিই তো আছি মা। প্রফেসার অধিকারী সঙ্গে যাচ্ছেন—তাঁর মেয়েও।

—প্রফেসার অধিকারীর মেয়ে! মেয়ে কোথায় তাঁর?

—ওহো—সেই মেয়েটি—সেই বেদেটা যাকে এনেছে। প্রফেসার অধিকারীর
আত্মীয়া—মেয়ে ঠিক নয়—ভুল হয়েছে মা! তবে মেয়ে বললে বিশেষ দোষ হয় না। যাই
হোক আজ আমাদের যেতে হবে মা।

—যেতে হয়—আসবি গিয়ে বাবা! তবু মনকে বোঝাতে পারি না।

—বোঝাও মা! মাত্র আট-দশটা দিন মনকে বোঝাও একটু। চলো, খেতে দেবে। মা
শ্যামলকে খাইতে দিল। খাইতে খাইতে শ্যামল বলিল, আর একটা কথা আছে মা!

—বল মাণিক।

—"শ্যামল।" বাহির হইতে ডাকিয়া প্রফেসার অধিকারী প্রবেশ করিলেন।

শশব্যস্তে শ্যামল বলিল—আসুন স্যার—আসুন।

—খেয়ে নাও—আমি বসছি। মীনু মা।

পিছনে মীনা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া শ্যামলের মা বলিল,

—বাঃ, কি সুন্দর মেয়েটি। কে আপনার?

প্রফেসার অধিকারী সহাস্যে বলিলেন?

—আমার গত জন্মের মেয়ে।

শ্যামলের মা মীনাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। প্রফেসার
অধিকারী একটা মোড়া টানিয়া বসিলেন। শ্যামল বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—আজ রওনা না হলে বিশেষ অসুবিধা ঘটতে পারে যাওয়ার
পক্ষে তাই ভেবে আজই যেতে হচ্ছে শ্যামল। আশা করি তোমার অসুবিধা হবে না।

—কিছু না স্যার। আমি সব সময়েই তৈরি।

এই তো বীরের লক্ষণ শ্যামল। সব সময়েই সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো। জীবনে
এমন অনেক কিছু ঘটে, যার জন্য মানুষ মোটে প্রস্তুত থাকে না। বীর যে তার প্রস্তুতি
চিরদিন।

—আপনার শিক্ষা যেন সার্থক করতে পারি স্যার।

—মীনা ও শ্যামলের মা ফিরিয়া আসিল।

ওকে কিছু খাওয়াতে পারছি না যে?

—ও খেয়ে এসেছে, তা ছাড়া আরো খাবার সঙ্গে আছে। থাক, ফিরে এসে খাবে আপনার কাছে।

—প্রথম দিন এলো—আজ কিছু খাবে না?

প্রফেসার অধিকারী মীনাকে বলিলেন,

—যা মা—উনি মায়ের মতো, খা কিছু।

—আচ্ছা, দিন। এই শ্যামলবাবুর পাতের সন্দেশটা খেয়েই জল খাই একটু। মীনা শ্যামলের ভুক্তাবশিষ্ট সন্দেশ লইয়া মুখে দিল।

—আমার এঁটো খেলেন?

—হ্যাঁ—কেন? কি হয়েছে তাতে?

—আমার জাতকুল কিছু ঠিক নেই ; জানেন না তো।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আছে শ্যামল, সব ঠিক আছে। তুমি মানুষ জাত, তোমার কুল সভ্যভদ্র শিক্ষিত কুল, এঁটো খেলে ওর জাত যাবে না।

মা সস্নেহে মীনার দিকে চাহিয়া বলিল,

—ফিরে আসুন আপনারা, ওকে আমি দু'দিন কাছে রাখবো।

—বেশ, সেই দু'দিন শ্যামল আমার কাছে থাকবে।

শ্যামল ও মীনা বাক্স বিছানা বাহিরে গাড়ীতে উঠাইল।

—আসি মা, উনি সঙ্গে রইলেন—ভয় কি তোমার।

না বাবা—ভয় করছি না, তবু বলি সাবধানে থাকিস।

শ্যামল, মীনা ও প্রফেসার অধিকারী চলিয়া গেলেন।

—এতটুকু ছেলে—কত বড় হয়েছে। কত ওর সাহস। দুর্জয় ওর সঙ্কল্প। সেই বাপেরই তো ছেলে! গোঁ যা ধরবে, ছাড়বে না।

মা আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—এই মেয়েটি কে? প্রফেসার অধিকারী সম্পর্কটা চেপে গেলেন। হবে হয়তো কেউ মা-বাপ মরা। অনাথের বন্ধু প্রফেসার অধিকারী, নইলে আমিই তো ভেসে যেতাম কোথায়!

তুলসীতলায় আর একবার প্রণাম করিয়া বাহিরে দেখিতে লাগিল। অন্ধকার নামিতেছে।

বস্তির স্বল্পালোকিত পথে দেখা গেল রামেশ্বর ও দয়ালকে।

—দেখেছিস? চিনতে পারবি তো?

—হ্যাঁ হুজুর, কিন্তু ওঁরা যে ঢাকা মোটরে যাচ্ছেন।

—তাতে তোর কি উল্লুক। চল্, এই, ট্যাক্সি—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটা থামিল না। রামেশ্বর ও দয়াল দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে দয়াল বলিল,

—কলকাতায় বেশি সুবিধে ছিলো হুজুর!

—ছিলো, কিন্তু তা যখন হলোই না তখন অন্য পন্থা দেখতে হবে। চল্ এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।

—চলুন হুজুর!

একখানা ট্যাক্সি চাই-ই, কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না। দরকারের সময়ই ওদের পাওয়া যায় না। কিন্তু রামেশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি হাঁটিয়াই চলিতেছেন। সঙ্গে স্যুটকেশ ও বিছানার বান্ডিল মাথায় দয়াল। অবশেষে ট্যাক্সি একখানা মিলিল। গলদঘর্ম কলেবরে ষ্টেশনে আসিয়া রায় রামেশ্বর দুইখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। রাজীব থার্ড ক্লাসে যাইবে। কারণ তাহাদের জন্য একখানা থার্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ আছে। দয়াল যদি থার্ড ক্লাসের দিকে যায় তো রাজীব বা মীনু তাহাকে চিনিয়া ফেলিতে পারে। তাই দয়ালকেও তিনি প্রথম শ্রেণীতেই রাখিলেন। দয়াল এমন গদীমোড়া গাড়ীতে কখনো বসে নাই। রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন,

—ওকে পৃথিবী থেকে সরাতেই হবে দয়াল—ভগবানও ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—নিশ্চয় হুজুর—নিশ্চয়! কোথায় আর যাবে। মেদিনীপুরও আমার দেখা আছে হুজুর—কাঁথির ওদিকটায় ছিলাম কিছুদিন।

—তাই নাকি! তবে তো মহাসুবিধে। কাঁথিই যাচ্ছে ওরা, কিন্তু কি ভাবে কাজ হাসিল করবে?

—সে ভাবনা এখন নয় হুজুর। ওখানে যেমন সুবিধে পাব, তেমনি করা যাবে। কি বলেন?

—ঠিক ঠিক—তোমার হাতিয়ার সব কোথায়?

—ছোরা? ও ঠিক আছে হুজুর—ও ছাড়া আমি চলি না।

—বাঃ! এই তো চাই।

—কিন্তু দিদিমণিকে একেবারে খুন কি করে করবো হুজুর!

—কেন? মায়া জাগছে নাকি তোমার?

—তা হুজুর—মায়া-দয়া আমাদের নাই হুজুর, তবে দিদিমণি মা-মরা—মুখখানি দেখলেই রাণীমাকে মনে পড়ে যায়।

রামেশ্বর দুই মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,

—ও সব ছাড় দয়াল—বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার বেশী আমার কাছে কেউ নয়, কিছু নয়। ও-কথা থাক্—

দয়াল আর কথা কহিল না। রামেশ্বর মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। গাড়ী গভীর অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে।

চাহিয়া দেখিলেন গাড়ীর গদীমোড়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দয়াল ঘুমাইয়া গিয়াছে। নিদ্রাহীন চোখে রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন বাহিরের অন্ধকার পানে। অন্ধকার পৃথিবীর সর্বত্র—রামেশ্বরের বুকের ভিতরটাতে কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। জিঘাংসার তীব্র বিষাক্ত আগুন...

কিন্তু কেন এই জিঘাংসাবৃত্তি! রামেশ্বরের মনস্তত্ত্ব পড়া মন যেন ব্যাপারটার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চাহিতেছে। মীনু তাহার কেহ নহে—কিন্তু সারা জীবন প্রতিপালনের কি কোন মূল্য নাই? রক্তের সম্পর্কই কি সব? না—তা যদি হইত তবে...কিন্তু রামেশ্বর চিন্তাটা অন্যদিকে সরাইয়া লইলেন। রাজীব মীনুকে কাড়িয়া লইয়াছেন পিতৃত্বের অধিকারে। রাজীব তাহার পিতা। আর রামেশ্বর কেহ নহেন। চমৎকার! ভাল—দেখা যাক কে জিতে।

জিজ্ঞাংসার অগ্নি তিনি জ্বালিয়াই রাখিলেন।

আর্তনাদ আর হাহাকার চলিতেছে সারা দেশটা জুড়িয়া। বন্যা ও মহামারী-রূপে কলেরা দেখা দিয়াছে এমন ভীষণভাবে যে মানুষ পালাইবার পথ পাইতেছে না। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও আগাইয়া আসা দরকার। সেবা-প্রতিষ্ঠান দেশে বড় কম নাই। স্বেচ্ছাসেবক বিস্তর মেলে, কিন্তু আর্ততা ক্রমেই বাড়িতেছে।

প্রফেসার রাজীব অধিকারী দলবল লইয়া পৌঁছিয়াছেন গত সন্ধ্যায়। সর্বাগ্রে তিনি জনগণের নিকট হইতে জানিলেন কোথায় কিরকম সংক্রামক ব্যাধি চলিতেছে এবং ত্রাণকার্য কেমনভাবে করা হইতেছে। স্থানীয় লোকজন তাহাকে এ বিষয়ে যথাযোগ্য খবর দিল। প্রফেসার রাজীব অধিকারী অতঃপর প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া লইলেন—কোন দিক দিয়া কেমনভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন। শ্যামল ও মীনু সর্বক্ষণ তাহার কাছে আছে এবং আরো আছে প্রায় জন পঞ্চাশ ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহার—যাহারা রাজীবের কথায় মৃত্যুর মুখেও যাইতে পারে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করার পর সব ঠিক হইয়া গেল। আগামী সকাল হইতেই কাজ আরম্ভ করা হইবে একটি ছোট গ্রাম হইতে। নদীর কিনারায় এই গ্রামটির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ধান-ধান তো গিয়াছেই—গোরু-বাছুর এবং ঘর-বাড়ীও গিয়াছে। ইহার পর চলিতেছে সংক্রামক ব্যাধি যাহার প্রকোপ থামিতেছে না।

ঝোপঝাড়, জঙ্গল ও নদী লইয়া এই গ্রাম ও পাশাপাশি আরো কয়েকটি গ্রাম। প্রফেসার রাজীব এইখানে একটা ডাকবাংলোতে আশ্রয় লইলেন এবং কাছাকাছি গ্রামেও তাঁবু ফেলিয়া ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাজ ভালই চলিতেছে।

তৃতীয় দিন পার হইয়া গেল। চতুর্থ দিন সকালেই একটু দূরের একটা গ্রামে গিয়াছে মীনু ও শ্যামল এবং আরো কয়েকজন। সন্ধ্যা হইতেছে, এবার তাহারা ফিরিবে। প্রফেসার রাজীবও এখানকার কাজ সারিয়া বাংলোতে ফিরিতেছেন—দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের আশ্রয়-বাংলোর নিকটেই একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। কে ও? কি চায়? রাজীব বলিলেন,

—কে তুমি? ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছে? কি চাও?

—মাছ লিবেন হুজুর! মাছ! বড় মাছ—লোকটা একটা মাছ দেখাইল।

—না—এখানে এখানে মাছ খাওয়া নিরাপদ হবে না।

—একদম জ্যান্ত আছে হুজুর—

—থাক—আমি নেব না।

লোকটা তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। বিরক্ত হইয়া রাজীব বলিলেন,

—উঁকী দিয়ে কী দেখছো? যাও এখান থেকে—যাও...

লোকটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজীবের মনে হইল মাছ বিক্রী তাহার উদ্দেশ্য নহে—বাংলোর ভিতরটাই ও দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কেন?—চিন্তাটা রাজীবকে বিশেষ ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু ভাবিবার কি আছে? এখানে তিনি একা নাই। তথাপি তাঁহাকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে।

মীনু ও শ্যামল এখনো আসিল না কেন? উহারা পাঁচজন গিয়াছে। হয়তো দূরে—আরো দূরে গিয়াছে। অপরিচিত স্থান এবং রাত্রির সামনের দিকটা অন্ধকার—কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে।

প্রফেসর রাজীব ক্রমশ বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। বাংলো বাড়ীটা সর্বত্র তিনি স্বয়ং একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন লইয়া ঘুরিয়া আসিলেন! সকলেই আসিয়াছে শুধু শ্যামলের দল আসে নাই। কী হইল! কেন তাহারা আসিতেছে না!

রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে। না—শ্যামল বা মীনু ঐ দলের কেহই আসিল না। যেখানে গিয়াছে সে জায়গাটা এখান হইতে চার-পাঁচ মাইল দূর। তবে কি রাজীব সেখানেই দেখিতে যাইবেন? কর্তব্য ঠিক করিতে পারিতেছেন না তিনি। ওখানকার ঠাকুর যে রান্না করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া শুধাইলেন,

—বাউড়ি গ্রামটা ঠিক কতদূরে?

—এজ্ঞে—তা, ক্রোশ দু' আড়াই হবে—রাস্তা খারাপ—কাদা, পিছল—

—নদী আছে?

—হ্যাঁ এজ্ঞে—নদী খাল—ঝোপজঙ্গল তো থাকবেই এদেশে, বুনো গাছ—সাপ শেয়াল—আরও কত কি!

—তুমি পথ—চেনো?

—এজ্ঞে তা আর চিনিনে! আমার শ্বশুর বাড়ী যাবার পথ—ঐদিক পানেই রাসপুর, কাঁটাপালং, ধমেত্তি হয়ে...

—থাক থাক—বাউড়ী যাব আমি। চল দেখি আমার সঙ্গে।

—এজ্ঞে এই রাত্তিরে?

—হ্যাঁ—চল—বকশিস পাবে।

—এজ্ঞে তাতো পাবই। তবে কি আপনি আর আমি একলা...।

—না-না—তুমি আর আমি একলা নয়। আরো দুজনকে নিচ্ছি, চল!

—এজ্ঞে রান্না হয়েছে, খেয়েই রওনা হব।

—হ্যাঁ—তা মন্দ কথা নয়।

প্রফেসার অধিকারী সবাইকে খাইয়া লইতে বলিলেন কিন্তু নিজে কিছুই খাইলেন না। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ চারজন লোক লইয়া রাজীব রওনা হইলেন বাউড়ী নামক গ্রামের উদ্দেশে মীনু ও শ্যামলের খোঁজে! চিন্তায় কপালটা ঘামিয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

শ্যামল আর মীনু একটু দূরেই আসিয়াছে আজ। এদিকটায় নাকি মড়ক কিছু বেশী। বেলা ন'টা নাগাদ নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছাইল। সত্যিই এখানে কে কার মুখে জল দেয়—এমন অবস্থা। ম্যালেরিয়ায় ওরা আগেই জখম হইয়াছিল, তাহার উপর এই জলপ্লাবন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও আরো হাজার রকম রোগ উহাদের প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে।

একটা স্কুল বাড়ীতে আড্ডা লইয়া তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া এবং সাবধান হওয়ার জন্য কিছু উপদেশ দেওয়া চলিতে লাগিল। আশ-পাশের গ্রামেও যাইবে। বেলা অনেকটা হইয়াছে। ডাল-ভাত আলু সেদ্ধ রান্না হইয়াছে। সকলে খাইতে বসিল। কয়দিনই তাহাদের এই রকম খাওয়া চলিতেছে! কিন্তু খাওয়া শোওয়ার কথা ভাবিলে এসব কাজ করা যায় না।

বেলা প্রায় দেড়টা। একজন লোক আসিয়া বলিল,

—এই পাশের গাঁয়ে একবার যাবেন বাবারা? ওখানে বড়ই মড়ক চলেছে।

—কোন্ গ্রাম? কতদূর?—শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল।

—বাগাটুলি! এই আধক্রোশটাক হবেন! তুমি চলুন বাবা—আপনিই চল।

—বেশ থামো একটু। খেয়েই যাব আমরা!

লোকটি সদরে বসিয়া বিড়ি ধরাইল এবং দুইটা টান দিয়া বলিল,

বেঁচে থাকো বাবারা। তোমরা যে কি উপকার করেছো দেশের, আহা! বলিহারি যাই—

শ্যামল বা অন্য কেহই কিছু বলিল না। খাওয়া শেষ হইলে শ্যামল মীনুকে বলিল,

—যাবে তুমি!

—হ্যাঁ—নিশ্চয়।—চলুন।

উহারা দুইজনে ফার্স্ট এইড্ বাক্স ও পথ্যাদি লইয়া লোকটির সহিত বাহির হইয়া গেল।

নিকটেই বাগাটুলি গ্রাম। বড় জোর পনর-বিশ মিনিটের পথ—তবে রাস্তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছল। কিন্তু এই কয়দিন ঘোরাঘুরি করিয়া মীনু ও শ্যামল এরকম পথে চলার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। লোকটির পিছনে পিছনে তাহারা অনায়াসেই চলিয়া আসিল।

বাগানটুলি একদিন বড় গ্রাম ছিল—তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গ্রামের প্রান্তেই পাথরের মন্দির, ছোট ইটের বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও শিলালিপিতে। অদূরে প্রকাণ্ড এক জীর্ণ প্রাসাদ। লোকটি সেখানেই আনিল। শ্যামল ও মীনুকে ব্যস্ত স্বরে বলিল,

—আসেন দাদাবাবু, দিদিমনি—এই বাড়ীতে আসুন।

—চল—শ্যামল ও মীনু সেই দীর্ঘ প্রাসাদের ভাঙা দরজায় প্রবেশ করিল।

কী বিপুল বাড়ী! সেকালের রাজাদের গড় হয়তো। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শ্যামল বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে এই ভাঙাবাড়ীতে লোক কিভাবে থাকিতে পারে! জিজ্ঞাসা করিল,

—এ বাড়ীতে লোক কেমন করে থাকে হে?

—এজ্ঞে দাদাবাবু—বানের ভয়ে ক'জন এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

—ও—তা হতে পারে। কোথায় আছে দেখি চল।

ঘরের পর ঘর—উঠানের পর উঠান পার হইয়া আসিল তাহারা—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। মীনু বলিল—

—না—সুবিধে লাগছে না। চলুন ফিরে যাই—আর যাবো না।

—ডর লাগছে নাকি দিদিমণি। এই তো আমি সঙ্গে রয়েছি। আসেন।

এখনো অনেকটা বেলা আছে, কিন্তু বাড়ীর এই জায়গাটা অন্ধকার—মনে হয় সন্ধ্যা হইতেছে। মীনু কিছু বলিবার পূর্বেই শ্যামল বলিল—

—চল—চল—আমরা কারো কিছু ক্ষতি করিনি যে ভয় করতে হবে।

—আসেন—

আরো একটা উঠান পার হইল উহারা। ওদিকে একটা ঘরে কে যেন কাতরাইতেছে। শ্যামল ও মীনু গিয়া দেখিল, একটা লোক ছেঁড়া বিছানায় পিড়য়া ছট্‌ফট্ করিতেছে মৃত্যুযন্ত্রণায়, শ্যামল আগাইয়া গেল—সঙ্গের লোকটি বলিল—

—আপনি এই ঘরে আসেন দিদিমণি—ওখেনে উনার ইস্তিরিরও অসুখ—খুব জরুরী।

মীনু যাইবে কিনা ভাবিতেছে! শ্যামল বলিল—

—যাও না—যাও ওখানে। আমি একে দেখছি।

মীনু আর কিছু না বলিয়া লোকটির সঙ্গে অন্য ঘরে গেল। শ্যামল নিচের লোকটির ডান হাতখানা ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—লোকটির নাড়ির গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কী ব্যাপার দরজাটা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল কেন? বাতাসে! শ্যামল উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতে যাইতেছে—বিছানায় শোয়া লোকটি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এবং লাফ দিয়া উঠিয়া লম্বা ঘরটার অন্য দিকের বন্ধ দরজাটা খুলিয়া চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিল তাহার ছেঁড়া বিছানাটা। অপর দরজাটাও বন্ধ করিয়া দিল সে। আশ্চর্য! শ্যামল কি বন্দী হইল নাকি!

শ্যামলের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহারা এক কঠিন চক্রান্তে বন্দী। কিন্তু কেন? কারণটা ঠিক মত বুঝিতে পারিতেছে না শ্যামল। নিজের জন্য তাহার চিন্তা নাই—মৃত্যুকে ভয় সে করে না। কিন্তু মীনুও নিশ্চয় অন্যত্র বন্দিনী হইয়াছে। তাহার জন্যই শ্যামলের মন নিদারুণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মীনু ঢুকিবার পথে একবার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আর না ঢুকিলেই ভাল হইত। কিন্তু কিরূপে জানিবে—তাহাদের সেবা-ধর্মের কাজেও বাধা দিবার জন্য চক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু এ চক্রান্ত নিশ্চয় অন্য কিছুর জন্য। শ্যামলের মনে হইল, এই চক্রান্তের সহিত প্রফেসর অধিকারীর জীবনের কোন রহস্য নিশ্চয় লুকাইয়া আছে। অথবা শ্যামলের জীবনের, কে জানে, মীনুর জীবনেও অনুরূপ কোন রহস্য আছে কি না। হ্যাঁ—মনে পড়িতেছে রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় মীনুর যেন কে হন।—তিনি প্রফেসব অধিকারীর নিকট কি জন্য আসিয়াছিলেন? মীনুকে তিনি চাহিতেছেন। এইখানেই কোন গুপ্ত-রহস্যের সূত্র আছে। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? মীনুকে উদ্ধারের উপায় বাহির করা সর্বাগ্রে দরকার।

শ্যামল ঘরটা ভাল করিয়া দেখিল। দুই প্রান্তে দুইটি দরজা—সেকালের শক্ত শাল কাঠের। একটি মাত্র জানালা আছে। রডগুলি মোটা কাঠের। কোন রকমে এই রডের অন্তত দুটি ভাঙ্গিয়া যদি বাহির হওয়া যায়—অন্য আর কোন উপায় নাই। শ্যামল দেখিল—রডগুলি খুবই শক্ত—তবে কাঠের। উহা কাটা যাইতে পায়ে। কি দিয়া কাটিবে।

শ্যামলের হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার ফার্স্ট-এইড্ বাক্সে ছুরি আছে। তৎক্ষণাৎ ছুরিখানা বাহির করিয়া রড কাটিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে বুঝিল—ঐটুকু ছুরি দিয়া ঐ শক্ত রড দুটিকে কাটিতে বহু সময় ব্যয় হইবে। এখন করা যায় কি? কয়েকটা লাথি মারিয়া দেখিল, সেকালের শক্ত কাঠের জানালায় কোন ক্ষতিই হইল না। অতঃপর ক্লান্ত শ্যামল সেই ছেঁড়া বিছানাটায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কী সে করিবে।

না—কোন উপায় সে দেখিতেছে না। হাতঘড়িটায় দেখিল প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার হইয়া গিয়াছে। বেলা হয়তো আর নাই—কারণ ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—শ্যামল কিছুই দেখিতেছে না আর।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিল একজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান। আসিয়াই শ্যামলকে ধরিয়া ফেলিল এবং মোটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। উহার সহিত লড়াই করিয়া কোন ফল হইবে না বুঝিয়া শ্যামল প্রতিবাদ করিল না। তবু প্রশ্ন করিল,

—আমাদের বন্দী করে লাভ কি?

—চোপ রহ—

এছাড়া কোন উত্তর মিলিল না।

ওদিকে মীনুকে লইয়া কোণের একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সঙ্গী লোকটি বলিল—

—যাও দিদিমণি—উখেনে রুগী আছে—হৈ ঘরটায়। আমি জল আনি।

আচ্ছা!

মীনু নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়—কিছুটা ভয়েই প্রবেশ করিল এবং খানিকটা অগ্রসর হইল। হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হইলা গেল। মীনু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখিল,—লোকটি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মীনু সভয়ে বলিল,

—ও কি—দরজা খোলো—ও মশাই ;

উত্তর নাই। মীনু আবার ডাকিল—আবার। না—উত্তর পাওয়া যাইবে না। মীনুর দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। কী হইবে। কী ইহারা করিবে তাহাকে লইয়া! চিন্তায়-ভয়ে মীনু যেন দিশাহারা হইয়া সেইখানেই মেঝেতে বসিয়া পড়িল।

দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় চলিয়া গেল—কেহই আসিল না, না শ্যামল, না বা সেই চাষী লোকটি—কিম্বা আর কেউ। ক্লান্ত-শ্রান্ত-ভীত মীনু শুকাইয়া গিয়াছে। মনে পড়িতেছে রায় রামেশ্বরের কথা—রাজীবের স্নেহের পরশ—কত কি মনে পড়িতেছে—হায়—সব শেষ হইয়া গেল। এই ঘরেই মীনুকে আমৃত্যু বন্দী থাকিতে হইবে, কিম্বা কি হইবে, কে জানে। কেন ইহারা তাহাকে বন্দী করিল—কেন—কেন?

কতটা সময় গিয়াছে। দিন না রাত্রি—কে জানে। কাঁদিতে কাঁদিতে মীনু আপনিই কখন চুপ করিয়া গিয়াছে! নিজের ভাগ্যের উপর তাহার আর বিশ্বাস নাই। যা হইবার হইবে। চিরদিনের ঈশ্বর বিশ্বাসিনী মীনু ভগবানের উপর নিজের সব ভার ছাড়িয়া দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল সে।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল ভেতর দিককার। একজন ঝি আসিয়া বলিল—

—এদিকে আসুন দিদিমণি—মুখ-হাত ধোন—জলখাবার খাবেন।

—না—আমাকে ছেড়ে দিতে বলো—নইলে ভাল হবে না।

—কি করবে?—ঝি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল—-যুদ্ধ করবে নাকি!

—আমি না করি—আমার বাবার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি ছেড়ে দেবেন না।

—তাই নাকি—কে তোমার বাবা দিদিমণি?

—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—তাঁর হাতে তিন হাজার ডাকাত আছে।

—ডাকাত!

—হ্যাঁ—তোমার মনিবকে বলবে, যদি ভাল চায় তো আমায় ছেড়ে দিক—শ্যামলবাবু কোথায়?

—আমি জানি না দিদিমণি। আমাকে তোমার জন্যই রাখা হয়েছে। এসো, মুখ-হাত ধুয়ে নাও—ছেড়েই দেবে তোমাকে—এসো।

—না—ছেড়ে না দিলে কিছুই খাবো না আমি। যাও...

ঝি বারম্বার বলা সত্ত্বেও মীনু উঠিল না।

নির্জন পথ—আগে পাছে দুইটি লুণ্ঠন লইয়া চলিতেছেন প্রফেসর রাজীব অধিকারী। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার সহিত চলিতে পারিতেছে না—কারণ, মনের ব্যাকুলতায় রাজীব

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁটিতেছেন। তাঁহার শুধু বারম্বার রামেশ্বরের কথাই মনে পড়িতেছে। কী না করিতে পারে ঐ রায় রামেশ্বর। মীনুকে হত্যা করা তাহার পক্ষে একটা মশা মারার সামিল! কলিকাতায় তাহা না করিতে পারিয়া ক্রোধবশে রামেশ্বর যে এখানে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে—ইহা রাজীবরে পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল। বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকটা কেন বাংলোর কাছে দাঁড়াইয়াছিল? কেন! কি তাহার মতলব? বাংলোতে তো মীনু তখন ছিল না। রামেশ্বর কি রাজীবকেও হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে নাকি। অসম্ভব কিছু নয় তাহার পক্ষে। কিম্বা অপর কোন মতলবও থাকিতে পারে—প্রফেসর অধিকারী এইসব কথাই ভাবিতেছেন।

পাকা পাঁচ মাইল পথ। পথ তো নয়—পথিকের প্রাণনাশের ফাঁদ। তবু প্রফেসর অধিকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ গ্রাম—যেন কেহ কোথাও নাই। অনেক দূরে একটা দোকানঘর—মালিক ঘুমাইতেছে। তাহাকেই ডাকিয়া তুলিলেন।

—অ্যাঁ—কি বলছো? পুলিশ নাকি?—লোকটি সভয়ে বলিল।

—না—এখানে আজ রিলিফ-ওয়ার্ক করতে লোক এসেছিল কিনা জান?

—হ্যাঁ—তাঁহা তো চলে গেছেন বেলা দুটোর সময়।

—কোন গ্রামে গেছেন জান?

—না বাবু—অত খবর জানি না। আমার দোকানে চা খেয়েছেন সব! তবে শুনলাম, বাগাটুলি যাবেন।

—বাগাটুলি কত দূর? কতবড় গ্রাম?

—ঐ তো মাইলট্যাক—যান, দেখুন। গাঁ তো বড়ই ছিল এককালে—এখন ভাঙতা অবস্থা। শুধু লোকজন আছে জনকতক—রাজাও নাকি ছিল। তাঁর গড় রাজবাড়ী ওখেনে আছে। পুরোনো রাজবাড়ী—লোকজন কেউ নাই—পোড়ো বাড়ীটাই আছে শুধু!

রাজীব আর সময় নষ্ট করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বাগাটুলির দিকে রওনা হইলেন। বেশী দূর আসিতে হইল না। কতকগুলো আলো দেখিতে পাইলেন—কাহারা যেন আসিতেছে। প্রফেসর থামিলেন। যাহারা আসিতেছিল, তাহারা কাছে আসিল, রাজীব দেখিলেন উহারা তিনজন—তাঁহারই দলের লোক। কিন্তু মীনু বা শ্যামল নাই। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন—

—মীনু কৈ! শ্যামল কোথায়?

—জানি না স্যার—ওরা যে কোথায় কে জানে। ফেরেন নি—তাই আমরা আপনার কাছে খবর দিতে যাচ্ছিলাম।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব একটা গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন। মাথাটা তাঁহার ঘুরিয়া গিয়াছিল হয়তো। অবশেষে বসিয়া পড়িলেন তিনি ঐ কাদার উপর! একজন বলিল—

—অত ঘাবড়াবেন না স্যার—হয় তো ওরা আরো দূরে কোথাও গেছে।

—না—রাজীব বলিলেন—ওখানে তোমরা আড্ডা কোথায় করেছিলে?

—একটা স্কুল বাড়ীতে। স্কুল ছুটি—কেউ ছিল না সেখানে। একজন বাসায় ছিলাম—আর দু'জন করে দু'দল বেরিয়েছিলাম গ্রামে। শ্যামল আর মীনুদি একসঙ্গে বেরিয়েছিল—ওরা আর ফেরেনি স্যার।

—ঐটুকু তো গ্রাম। তোমরা খোঁজ করেছিল?

—বিস্তর স্যার! বিস্তর খোঁজ করেছিলাম। ওখানে একটা গড় আছে খুব পুরোনো রাজবাড়ী—মন্দির—ঠাকুর সব পোড়ো। শুধু সাপ থাকে। সেখানেও খোঁজ করেছি আমরা। না স্যার, ওরা ওখানেও নেই।

—তাহলে গেল কোথায়?

—কি জানি স্যার। আমরা ভেবেছিলাম আপনার কাছেই ফিরে গেছে।

—না—যায়নি।

রাজীব এখন কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি নিশ্চয় ধারণা করিলেন—ইহা রামেশ্বরের কাজ। চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে রামেশ্বর। মীনুকে তো লইয়াছেই—শ্যামলকেও চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কোথায় লইয়া গিয়াছে কে জানে!

এদিকে আর খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। রামেশ্বর এতো কাঁচা ছেলে নয় যে, উহাদিগকে এখানেই রাখিবে। নিশ্চয় সে মীনু ও শ্যামলকে অন্য কোথায়ও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। এখন কি করা যায়? পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে নাকি। হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় কি! কিন্তু এতদূর আসিয়া তিনি ঐ পোড়ো বাড়ীটা না দেখিয়াই ফিরিয়া যাইবেন! না, তাহা উচিত হইবে না! প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—

—চল—ঐ পোড়ো বাড়ীটা আমি একবার দেখতে চাই।

কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। সকলেই ফিরিল এবং আরো প্রায় পনের মিনিট হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের মত বিশাল প্রাসাদে পৌঁছিল। অন্ধকার বাড়ীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। প্রফেসর অধিকারী সাপ-খোপের ভয় মন হইতে দূর করিয়া দিয়া অন্দরের দিকে একা চলিলেন। চারদিকের অন্ধকার যেন ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভিতর দিকের উঠানের আগাছাগুলি যেন পা দিয়া মাড়ানো হইয়াছে। টর্চটা ঠিক আছে—কিন্তু আব জ্বালিলেন না।

কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে! না। কেহ নয়! বাতাসের শব্দ—না—কান্নাই। কী আশ্চর্য! কোন দিক হইতে কান্নার শব্দটা আসিতেছে? প্রফেসর অধিকারী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। হ্যাঁ কান্নাই!

—উঠে এসো—

কঠোর কর্কশ স্বর কানে আসিল মীনাক্ষীর—যেন গর্জন। কিন্তু মনকে সে ঠিক করিয়া লইয়াছে। মৃত্যু-পণের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল—উঠিল না। অন্ধকার ঘরের কোনার দিক হইতে আবার কে যেন বলিল—

—ওঠো—হাতমুখ ধুয়ে খাও—না খেলে কারো কিছু যায় আসে না এখানে।

—আমারও কিছু যায় আসে না। তবে তুমি জেনে রেখো আমার বাবা রামেশ্বর রায় তোমাদের উচিত শাস্তি দেবেন।

—তাই নাকি—হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার বাবা দশ মুণ্ড রাবণ নাকি!

—না—আমার বাবা শ্রীরামচন্দ্র—দশ-মুণ্ড তুমিই—তুমিই রাবণ—রাক্ষস!

—তোমার বাবাকে আমরা ডরাই না মীনু—উঠে এসো—খেয়ে নাও—তোমাকে তারপর চালান করতে হবে—বহুদূর কতদূর তুমি জান না—বহু দূর-দেশে—

বুঝেছি, আমার বাবার ভয়ে আমাকে দূর-দেশে নিয়ে যাবে—কিন্তু জেনে

রাখো—আমার বাবা তোমাদের কিছুতেই রেহাই দেবেন না—চোর—ডাকাত সব।

—খাবে কি না?

—না—খাব না। যা খুসী করতে পার তোমরা।

—আচ্ছা—থাক—এখানে কারো বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়।

মীনু আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। লোকটি হয়তো চলিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত অবসন্ন মীনু দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে—কে জানে কখন ঘুমাইয়া গিয়াছে।

পাশের ঘরে একটা হ্যাজ্যাগ লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঘরটার দরজা জানালা সবই বন্ধ। আলো বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। ঐ ঘরে একটা পুরানো ভাঙা চেয়ারে বসিয়া আছেন রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর। পদতলে দয়াল সর্দার। একদিকে মদের বোতল ও অন্য দিকে একটা ছোরা। রামেশ্বর বলিলেন—

—ঐ ছেলেটা কি করছে?

—কি আর করবে? জানালার রড্ কাটবার চেষ্টা করছিল চাকু ছুরি দিয়ে। তাই ওকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এলাম। ওকেও তো সরাতে হবে হুজুর।

—হ্যাঁ—নিশ্চয়! এদের কাউকেই রাখা চলে না। ছেলেটা খুবই ভাল। বেঁচে থাকলে দেশের গৌরব বাড়াতে পারতো। কিন্তু উপায় নেই দয়াল—উপায় নেই। ওকেও মরতে হবে।

—ওর সঙ্গে হুজুরের যুবা বয়সের চেহারার খুব মিল আছে হুজুর!

—চুপ কর দয়াল। ওসব কি কথা বলছিস। ও আমার কে?

—ঠিক কথা হুজুর—বেঁচে থাকলে পুলিশে খবর দেবে ও।

—পুলিশে খবর দেবার আরো লোক আছে দয়াল—রাজীব স্বয়ং দেবে খবর। কিন্তু তার আগেই আমরা কাজ সেরে চলে যেতে চাই। দে—ঢাল আর এক পাত্র। ওদিকে কলকাতার কাজটা ঠিক হবে তো?

হ্যাঁ হুজুর—ওখানে কানাই আছে। সে ঠিক কাজ সারবে।

দয়াল মদ ঢালিয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে মদ্যপান করিতেছেন। দয়াল চুপচাপ বসিয়া রহিল। জোরালো আলোটার চারিদিকে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ উপদ্রব করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—

—আলোটা সরা এখান থেকে।

দয়াল আলোটা সরাইয়া লইল। রামেশ্বরকে আর ভাল দেখা যাইতেছে না। তীব্র সুরার গুণে তাঁহার মূর্তি এবং মুখশ্রী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের তলায় ছোরাটা দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার কোমরে ছয়-ঘরা রিভলভারটাও ঠিক আছে। আর দেরী কেন! রাত্রি তো দ্বি-প্রহর অতীত! অতএব এই সময়ই শেষ করিয়া দেওয়া যাক। উঠিলেন রায় রামেশ্বর। হাতে ছোরাখানা তুলিয়া লইলেন। দয়াল খানিকটা দূরে বসিয়াছিল। বলিল—

—কাজটা নিজের হাতেই করবেন হুজুর?

—হ্যাঁ—দয়াল—নিজের হাতে যে লতায় জল সেচন করেছি, নিজের হাতেই তাকে ছিঁড়বো—নিজের হাতে আগে কখনো একাজ করিনি।

—ও বড় নেশার কাজ হুজুর—মদের চেয়েও নেশা। একবার করলে আবার করতে

ইচ্ছে যায়। জল্লাদের হাত হয়ে ওঠে—মানুষ তখন বাঘ হয়ে যায়।

—তোমার ইচ্ছে করছে নাকি দয়াল?

—তা হুজুর—একটা মস্ত শিকার—অনুমতি করনে তো—

—না দয়াল—একাজ আমি স্বয়ং করবো—মীনুর মৃত্যু আর কারো হাতে হতে দেব না আমি—যাও—তুমি দেখে এসো।

দয়াল দেখিতে গেল। রামেশ্বর ছোরাখানা পরীক্ষা করিলেন। সুতীক্ষ্ণ ছোরা—বহু নর-রক্তে অভিষিক্ত—দয়ালের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ছোরা কেন। গুলি করিয়াই তো মীনুর কোমল বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ হইবে। দূর হইতে জানালা পথে রামেশ্বর অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু গুলি যদি ঠিক জায়গায় না লাগে—যদি মাথায় না লাগিয়া পাশে লাগে—যদি মীনুর মরিতে দেরী হয় তো কষ্ট পাইবে—মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিবে মীনু। ছোরা একেবারে বুকের ভিতর বসাইয়া দেওয়া যায়—মীনু তৎক্ষণাৎ ইহলোক ছাড়িবে। মৃত্যু-যন্ত্রণা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু কে জানে ছোরায় না গুলিতে মৃত্যু সহজ হয়। রামেশ্বর নিজহাতে একাজ তো করেন নাই। না—কখনো না। হ্যাঁ—একবার যেন—অনেক দিন হইল—একজনকে নিজহাতে—না-না-না—নিজহাতে তো মারেন নাই। দয়ালই গলা টিপিয়া তাহাকে ভবধাম হইতে সরাইয়াছিল। উঁহু না—মনে পড়িতেছে—আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সাপ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বাহির হইবার কোন পথ রাখা হয় নাই—সাপের তীব্র বিষে নীল হইয়া গিয়াছিল সে—মৃত্যু-মুহূর্তে রামেশ্বর গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন! নিঃশব্দে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে বলিয়াছিল,—"তোমাকে ধন্যবাদ—তোমার অন্ন গ্রহণের পাপ এই মহাবিষে নষ্ট হয়ে গেল—আমার দেহ পবিত্র রইল। ওপাশে গিয়ে আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবো—"

আরো বলিয়াছিল—"তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, জীবনের শেষদিনেও যেন তুমি বুঝতে পার—প্রেম আছে, আছে স্নেহ-ভালবাসা নিশ্চিন্ত নির্মম হয়ে আছে। ঈশ্বর তোমার অন্তরে সেই অনুভূতি দিন।"—আশ্চর্য!

কিন্তু আরো আশ্চর্য আছে। সেই মৃত্যুরূপী গোক্ষুর বিষধর বাচ্চাটিকে স্পর্শ করে নাই। স্নেহভবে পরিত্যাগ করিয়া রায় রামেশ্বরকে যেন দেখাইয়া দিয়াছিল—স্নেহ আছে—বাঘের আছে—সাপেরও আছে। আজ রামেশ্বর সেই বাচ্চাটির কুসুমিত দেহটিকে ধ্বংস করিবে। সাপ যাহা পারে নাই—রামেশ্বর তাহাই করিবে...

কিন্তু এসব কি ভাবিতেছে রামেশ্বর! কর্তব্য যাহা, তাহা করিতেই হইবে। অকারণ দেরী কেন? মনকে দুর্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য—রামেশ্বর ছোরাখানা রাখিয়া এক পাত্র মদ নিজে ঢালিয়া লইলেন—হ্যাঁ—বংশের সম্মান রক্ষার জন্য একাজ অবশ্য করণীয়! এতএব চলিলেন রায় রামেশ্বর—হাতে ছোরা—মনে অদম্য হত্যাপিপাসা—

পাশের ঘরে মীনা ঘুমাইয়া গিয়াছে হয়তো। বাহিরের হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটার ছায়াময় আলো আলোকিত করিয়াছে ঘরখানা অতি সামান্যভাবে। সেই আধো অন্ধকারে দেখা যাইতেছে মীনুর মুখ—স্বর্গের পারিজাত—না না—অতুলনীয়—সাগরলক্ষ্মীর মত সুন্দর। কিন্তু রামেশ্বর এ কি ভাবিতেছে! মীনু সুন্দর তো রামেশ্বরের কি! মীনুর বুকে ছোরাটা বসাইয়া রামেশ্বর দেখিবেন—রাজীব ও ভদ্রার রক্তের বন্যা বহিয়া যাইবে—চমৎকার

প্রতিশোধ! হ্যাঁ—আর দেরী নয়—রামেশ্বর সজোরে দরজাটা ঠেলিলেন।

—উঁ—কে?

মীনু জাগিয়া উঠিল। রামেশ্বর ত্বরিতে বাহিরে আসিলেন। মীনু আবার বলিল—

—কে? কে?...

রামেশ্বর একটা কম্বলে নিজেকে আপাদমস্তক মুড়িয়া ঢুকিলেন।

—কে—?

উত্তর না দিয়া রামেশ্বর ছোরা তুলিতেছেন। ভীতা মীনু বলিল,

—মেরো না—মেরো না—আমাকে মেরে কোন লাভ হবে না—আমার বাবার কাছে—রায়বাহাদুর রামেশ্বরের কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি তোমাকে লাখ টাকা দেবেন। মেরো না—

জিভ উল্‌টাইয়া রামেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন—

—রামেশ্বর তোর কেউ নয়—

—তিনি আমার বাবা—আমার জন্য তিনি সর্বস্ব দিতে পারেন।

না-না—রামেশ্বর কণ্ঠ আরো জোরে আরো বিকৃত করিয়া বলিলেন—

—রামেশ্বর তোকে মারতে হুকুম করেছে—

—মিথ্যাবাদী—শয়তান—আমার বাবা আমাকে মারতে হুকুম করেছেন।

—রামেশ্বর তোর মাকে মেরেছে—তোকেও মারবে। জানিস!

—না—জানি না! জানতে চাই না। তুমি নিশ্চয় সেই বেদে—যে আমাকে আমার বাবার কোল থেকে চুরি করেছে—রামেশ্বর আমার বাবা—বাবা—আমার আরাধ্য পিতা—

—না। শোন আহাম্মক মেয়ে—তোর বাবা ঐ উদার মহান রাজীব—ঐ দেশসেবক—ঐ আর্ত-আতুরের বান্ধব রাজীব—শুনছিস্—?

—না। শুনবো না। ভগবান বললেও বিশ্বাস করবো না আমি। আমি জানি আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর—

না-না-না—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে চেয়েছে। কারণ, তুই তার কেউ নোস্—তুই আর্তত্রাতা রাজীবের—

—না—আমি শুনবো না—মীনু কানে আঙুল দিয়া বলিল,

—রাজীব মহান হতে পারেন, উদার হতে পারেন, তাতে আমার কি। পৃথিবীতে বিস্তর মহান পুরুষ আছেন—তাই বলে—তাদের 'বাবা' বলতে হবে নাকি?

—কিন্তু জানিস—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে পাঠিয়েছেন আমায়।

—অসম্ভব—হোতে পারে না! আমার হাত ছাড়া তাঁর খাওয়া হয় না—আমাকে ঘুমুতে দেখেও তিনি পাহারা দেন—আমার জন্য নিজের শরীরের রক্ত দিতেও পিছপা নন—দিয়েছেন আমার বড় একটা অসুখের সময়। আমার বাবা তোমাকে পাঠিয়েছেন আমাকে খুন করতে। মিথ্যুক শয়তান—কে তুমি? তোমার গলার আওয়াজ চেনা লাগছে। নিশ্চয় তুমি সেই বেদে—কে তুমি—?

—আমি তোকে খুন করতে এসেছি!

—বেশ—করো—তবু তোমাকে আমি 'বাবা' বলবো না! আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

মীনু কাঁদিয়া উঠিল—আমার বাবা—আমার বাবা!...

—ভুল—ভুল। মিথ্যে...

—না—মিথ্যে নয়। আমি আমার বাবা ছাড়া কাউকে চিনি না। মাকে আমি দেখিনি। আমি রায় রামেশ্বরের বুকে চড়ে বড় হয়েছি। রায় রামেশ্বর আমার বাবা। বেশ—আমাকে খুন করো—তবু আমি বলবো আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর...

রামেশ্বর কম্বলের ভিতর ঘামিতেছেন। না, কাঁপিতেছেন তিনি। সমস্ত দৃঢ়তা—বজ্রকঠিন সংকল্প যেন বর্ষা-ধারার মত গলিতেছে! একি হইল!

ছোরাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন রায়বাহাদুর রামেশ্বর। এরপর কি করিবেন? কে যেন আসিতেছে? নিশ্চয় রাজীব অধিকারী। এখনি দেখিয়া ফেলিবে...ত্বরিতে ওঘরে চলিয়া গেলেন তিনি—চোখে তাঁহার জল।

অন্ধকার উঠোনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজীব উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন—কে যেন কাঁদিতেছে—হয় তো কথা কহিতেছে কাহারা। কিন্তু কোথায়—কোন ঘরে? কোন দিকে! এই বিশাল বাড়ীর কোন মহলে কথা হইতেছে--কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না রাজীব। হাতের টর্চটা জ্বালিবেন কিনা, ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারেই অগ্রসর হইলেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্যে চক্ষের জ্যোতি কিছু বাড়িয়াছে! দেখিতে পাইতেছেন তিনি। চলিলেন।

একটা উঁচু বারন্দা। ঠোক্কর খাইলেন অধ্যাপক। হাঁটুতে বেশ লাগিয়াছে সামলাইয়া বারান্দাতে উঠিলেন। কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হইল। হ্যাঁ—কোণার দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। অতি সাবধানে রাজীব অগ্রসর হইলেন। একেবারে কোণের ঘর—ভিতর হতে বন্ধ। একটা জানালাও এদিকে নাই যে ভিতরে কি ঘটিতেছে দেখিতে পাইবেন। বন্ধ দরজাটায় কান পাতিলেন প্রফেসর অধিকারী। অল্প অস্পষ্ট কথা শোনা যাইতেছে। মীনুর গলা! হ্যাঁ—মীনুরই তো!

—'আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর'—কান্না-ভরা কণ্ঠস্বর তাহার।

একটা কি যেন মাটিতে পড়িল—হয়তো ধাতব কিছু—ছোরা-ছুরি নাকি! আর কোন কথা শোনা গেল না। শুধু মীনুর ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নার শব্দটা আসিতেছে। কী এখন করিবেন রাজীব অধিকারী? এই শাল কাঠের শক্ত দরজা ভাঙিয়া প্রবেশ করা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব নয়—বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবেন নাকি! কিন্তু ততক্ষণে এখানে কি ঘটিবে কে জানে! না—রাজীব ব্যাপারটা ভাল করিয়া না দেখিয়া যাইতে পারেন না। রাজীব ওপাশ ঘুরিলেন। বারান্দায় হয়তো ওদিকে যাইবার পথ আছে।

হ্যাঁ—আছে। বারন্দার ঠিক মাঝামাঝি ওদিকে যাইবার দরজা—রাজীব অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিকদূর যাইতে হইল না শুনিতে পাইলেন। কে যেন বলিতেছে—

এদিকে বারান্দায় একজন লোক ঢুকেছে—হয়তো পুলিশ! কি করা যায়?

—দেখি!

উত্তরদাতার কথা এতো মৃদু যে রাজীব ভালরকম শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি সতর্ক হইবার জন্য একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ হ্যাজাক লুণ্ঠনের তীব্র

আলো পড়িল বারান্দায়। সর্বাঙ্গে কম্বল চাপা কে একটা লোক লণ্ঠনটা বারান্দায় নামাইয়া এক তাড়া চাবি ছুঁড়িয়া দিল রাজীবের দিকে। লোকটা সবেগে আবার ঘরে ঢুকিল।

ব্যাপার কি রাজীব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। মিনিট দুই তিন অপেক্ষা করিলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন—যে-ঘর হইতে লোকটি আসিয়াছিল সেই ঘরের দিকে। গিয়া দেখিলেন, স্বয়ং রামেশ্বর রায় সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন—পদপ্রান্তে শূন্য বোতল একটা। ঘরে আর কেহ নাই। রামেশ্বরের চোখে জল। রাজীব বিস্মিত স্বরে বলিলেন—

—রামেশ্বর তুমি এখানে?

—হ্যাঁ রাজীব—এসো! ঘরে আর চেয়ার নেই। আমি চলে যাচ্ছি—বসো—ওঘরে মীনু আছে, পরের ঘরটায় সেই ছোকরা আছে। ওদের নিয়ে যাও। তোমার কাজ সেরে কলকাতা যেও।

—খুন-খারাপী কিছু করতে পারলে না বুঝি!

—না—রামেশ্বর চোখটা মুছিয়া কম্বলটা ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—রাজীব—তুমি মহান—দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করো না—একটা প্রার্থনা।

—বল! সাধ্য থাকলে নিশ্চয় রাখবো।

—আমার আজকের কু-কীর্তি যেন মীনুকে জানিও না। শুনলে সে মনে বড় কষ্ট পাবে।

—তুমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলে রামেশ্বর?

—হ্যাঁ রাজীব—কিন্তু পারলাম না। কোনদিনই পারবো না। তোমার মেয়ে তোমারই থাক—আমি অভাগা নিঃসন্তানই থাকিলাম—আর—

—বলো—

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন—রাজীব বলিলেন—

—যেও না—বলো...

—না—আর বলবার কিছু নেই। আমি যে এখানে এসেছি তাও জানিও না মীনুকে। যদি সম্ভব হয়—কাল বা পরশু তোমার ক্যাম্পে গিয়ে তাকে একবার দেখে দেশে চলে যাব। যাই রাজীব।

আশ্চর্য! দু'চোখে ঝর-ঝর জল রামেশ্বরের—কিন্তু মুহূর্তে ওদিকের একটা ঘরে-ঢুকিয়া পড়িলেন তিনি। রাজীব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন কেহ নাই—রামেশ্বর চলিয়া গিয়াছেন। রাজীব চিৎকার করিয়া ডাকিলেন—

—ফিরে এসো রামেশ্বর—আজ সত্যি তুমি মীনুকে ভালবাস। ফিরে এসো। তোমার মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও...

না, কোন জবাব পাওয়া গেল না। নিরুপায় অধ্যাপক হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটা লইয়া আবার বারান্দায় আসিলেন এবং চাবির গোছা হইতে দুই তিনটি চাবি বাছিয়া ঘুরাইয়া পাশের ঘরের তালাটা খুলিয়া দেখিলেন—হাত পা বাঁধা শ্যামল শুইয়া আছে।

—স্যার!

—হ্যাঁ আমি—ছুরি দিয়া বাঁধন কাটিয়া দিলেন তিনি। শ্যামল বলিল—

মীনু কোথায়?

—ওঘরে আছে।

—চলুন—দেখি!

দুইজনে পাশের ঘরে আসিয়া তালা খুলিয়া ফেলিলেন। মীনু নিঃশব্দে কাঁদিতেছে—চোখের জল মুছিয়া আনন্দে বলিল—

—আপনি! এখুনি আমাকে খুন করতে এসেছিল একজন...

—কি জন্য আমাদের এমন করে বন্দী করল স্যার? আমরা তো টাকা পয়সার লোক নই...শ্যামল বলিল।

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিলেন—

—তুমি নও—কিন্তু মীনু বড় লোকের মেয়ে। বুঝলে শ্যামল—চোর-ডাকাতরা সব খবর রাখে—তারা মীনুকে ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি হয়তো লিখিয়ে নিত ওর বাপের নামে—"টাকা দিলে মীনুকে ছেড়ে দেব।"—এই রকম কিছু মতলব ছিল বোধ হয়।

—তা হবে স্যার—এরকম হয় নাকি আমেরিকায়—ইউরোপে—কিন্তু এদেশে...

—এখানেও হয়—এসো—

—ওঃ এই রাত্রে আপনাকে বিস্তর কষ্ট পেতে হলো স্যার আমাদের জন্য।

—তা হোক—তোমাদের পেলাম এই যথেষ্ট।

সকলে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল এবং দলের অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্যাম্পের দিকে রওনা হইল। রাত্রি প্রায় দুইটা। রাজীব মীনুকে কোলের কাছে লইয়া হাটিতেছেন। পথ সংকীর্ণ—সর্প-সংকুল এবং পিচ্ছল—অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছেন সকলে। মীনুর চোখে তখনো জল। হঠাৎ সে বলিয়া বসিল—

—বলে কি জানেন—বলে, তোর বাবা তোকে খুন করতে আমাকে পাঠিয়েছে।

—ও রকম কত কথা চোর-ডাকাতরা বলে মা। চলো—রাত বেশী নেই—চলো।

মীনুর কথাটাকে আমলই দিলেন না প্রফেসর অধিকারী। শ্যামল বলিল—

—এবার থেকে আমাদের সাবধানে চলাফেরা করতে হবে স্যার।

প্রফেসর অধিকারী যেন দূর হইতে কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ এসব কথায় কান দিবার মত মন তাঁর নাই। কী যেন বিশেষ ভাবনা ভাবিতেছেন তিনি। ভাবিতেছেন—রামেশ্বর যে মীনুকে ভালবাসে না—তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে বারম্বার, এই সত্য নিজেই তিনি মীনুকে জানাইয়াছেন। বেশ বোঝা যাইতেছে মীনু সেকথা বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস করিবে না কোনদিন। কারণ—রাজীবের কথাটা সত্য নহে। রামেশ্বর মীনুকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্নেহের অভাবের জন্য নহে। তাহা শুধু রামেশ্বরের বংশগৌরবের মিথ্যা অভিমান-জনিত। মীনুকে রামেশ্বর সত্যিই ভালবাসে—আত্মজা দুহিতাকে যতখানি ভালবাসা সম্ভব—রামেশ্বরের স্নেহ তাহা অপেক্ষা কিছুই কম নহে! কিন্তু ঐ বংশঅভিমান কিরূপে ছাড়ানো যাইবে রামেশ্বরের মন হইতে। উহা তাহার মজ্জাগত বিশ্বাস—তাহার শিরার শোনিত। তথাপি আজ রাজীব বুঝিতে পারিলেন, রামেশ্বর মীনুকে অত্যন্ত ভালবাসে। ভালই। আনন্দই হইতেছে রাজীবের। কিন্তু কিরূপে সমস্ত দিক রক্ষা পাইতে পারে।

ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না রাজীব। রামেশ্বরের প্রকৃতিকে ভালই চেনেন রাজীব। আজ উচ্ছ্বাসবশে হয়তো রামেশ্বর মীনুকে ছাড়িয়া দিয়া গেল—কিন্তু আগামীকাল অথবা দুই মাস পরে যে আবার রামেশ্বর ভূয়া বংশ গৌরব তাহাকে জিঘাংসা বৃত্তিতে

জাগ্রত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে। রাজীব জানেন—অকারণ রামেশ্বর তাহার নিরপরাধী পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছেন—শুধু তাহাই নহে—পুত্রকে পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কারণ—আর কিছুই নহে—ভুয়া বংশগৌরব। জমিদারী ঠাট্ এবং মেকী আভিজাত্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিবার মন নাই রামেশ্বরের—এই সত্য রাজীবের ভালই জানা আছে। মীনুকে নিরাপদে রাখিতে হইলে আরো কিছু করা দরকার। কিন্তু কি তিনি করিবেন। মীনুকে লইয়া তিনি সুদূর দেশে চলিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু মীনু যাইবে না। কারণ মীনু সর্ব মন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে সে রামেশ্বরের কন্যা! আশ্চর্য রামেশ্বরের ভাগ্য—আশ্চর্য্য সত্যি!

চাঁদ উঠিতেছে। শেষ রাত্রের চাঁদ—ক্ষীণ হইলেও সুন্দর। রাজীব দেখিলেন—চিন্তার জন্য তাঁহার গতি মন্থর হওয়ায় মীনু ও শ্যামল কিছুটা আগাইয়া গিয়াছে। বন-পথের সর্পিল রাস্তা—পথের পাশে বন্য কুসুম—গাছে গাছে শিশির বিন্দুর পতন শব্দ—বড়ই মনোরম! কাব্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে দিক্‌বধু। সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে আলো দেখাইয়া চলিতেছে। রাজীব বলিলেন—

—বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—আলোটা নিবিয়ে দাও। অন্তত কমিয়ে দাও।

আলো কমাইয়া দেওয়া হইল। প্রকৃতি যেন নিরাবরণা হইয়া উঠিল। রাজীব ধীরে ধীরে চলিতেছেন। আগে আগে চলিতেছে মীনু ও শ্যামল—দেখিতে পাইলেন, পথের পাশের একগুচ্ছ বনফুল তুলিয়া শ্যামল মীনুর খোঁপায় পরাইয়া দিল।

অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন রাজীব। মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ইচ্ছা করিয়াই তিনি চুরুটটা ধরাইবার অছিলায় আরো খানিকটা পিছাইয়া পড়িলেন।

পদ্মার কথা বলিয়া রাজীব কি ভয় দেখাইয়াছিল রামেশ্বরকে? না—পদ্মা সত্যই কোথাও আছে। কিন্তু এতোদিন তো তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়। হয় তো ঐ রাজীবই তাহাকে অন্নবস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।—ভাবিতেছিলেন রায় রামেশ্বর।

বিরাট সহর কলিকাতার ঠিকানা না জানা থাকিলে পদ্মার মত একটি তুচ্ছ মেয়েকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। কোথায় তাঁহার খোঁজ করিবেন রামেশ্বর? বিস্তর ভাবিয়া তিনি অবশেষে কানাই ও দয়ালকে নিযুক্ত করিয়াছেন পদ্মার খোঁজ করিবার জন্য। তাহারা পদ্মাকে কিন্তু চেনে না। না-চেনা কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে।

কিন্তু রামেশ্বরের বরাত ভাল। রাজীবের সহিত মীনুকে একটা বস্তিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন—পদ্মা যদি এখনো বাঁচিয়া থাকে তবে আছে এই বস্তিতে। রাজীবের ঘরে সে নেই—তাহা রামেশ্বর ভালভাবেই দেখিয়াছেন।

ঐ বস্তিতে যে মহিলাটি রাজীবকে অভ্যর্থনা করিল—রামেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন—সে পদ্মা—পদ্মা তবে বাঁচিয়া আছে। আর কেহ আছে কিনা জানিবার সুযোগ হয় নাই তাঁহার—কারণ ঐ বস্তির নোংরা জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ রামেশ্বরের নাসারন্ধ্রে জন্মাইতেছিল। তিনি দয়াল ও কানাইকে বস্তিটা চিনিয়া রাখিতে বলিয়াই ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কানাই মহিলাটিকে চিনিয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বর দয়াল ও কানাইকে হুকুম করিয়াছিলেন—

—ওকে সরাতে হবে—পারবি?

—এ আর এমন কঠিন কি কাজ হুজুর!

—বেশ—হাজার টাকা পুরস্কার।

—আপনারই তো খাচ্ছি হুজুর।

অতঃপর মীনু ও রাজীবের পশ্চাৎ-ধাবন করিয়া রামেশ্বরকে মেদিনীপুর আসিতে হইয়াছে। কানাইকে তিনি হুকুম করিয়া আসিয়াছেন—পদ্মাকে যেন সাবাড় করিয়া দেওয়া হয়। কানাই দয়াল অপেক্ষা কম দক্ষ নহে। হয়তো ইতিমধ্যে কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার—

কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতেছে—না—আর এসব কাজ তিনি করিবেন না। পদ্মা যদি কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়া থাকে তো থাক—তাহাকে মারিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে আর রামেশ্বরের নিকট কোন দাবী করিতে পারিবে না। বহুদিন হইল—পদ্মা রামেশ্বরের জীবন হইতে খসিয়া গিয়াছে।

কিন্তু রায় রামেশ্বর ভাবিতে লাগিলেন—পদ্মার একটা বাচ্চা হইয়াছিল। তাহার ফটো-সহ পদ্মা একবার অর্থের জন্য আবেদন করিয়াছিল রামেশ্বরের নিকট। সেই ফটো ও চিঠি আছে রামেশ্বরের বাক্সে। সে ছেলে কোথায়?

মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিতেছে—রামেশ্বর আর তাকে বাহিরের আলোকে আনিবেন না। না-না-না—কিছুতেই না। রামেশ্বর আজ আর কাহাকেও পুত্ররূপে স্বীকার করিতে পারেন না। মীনুই তাঁহার কন্যা—একমাত্র সন্তান। আর কেহ যদি সত্যই থাকে তবে সে থাক—সে ভগবানের পুত্র হইয়া থাকে—অথবা সে থাক ঐ রাজীবের পুত্র হইয়া। রামেশ্বর তাহাকে কোনদিন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চিন্তায় মুখখানা কালো হইয়া উঠিল রামেশ্বরের। কিন্তু তথাপি ভাবিতেছেন—কয়েকদিন হইয়া গেল—কানাইয়ের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে পদ্মাকে ইহধাম হইতে সরাইবার জন্য! হয়তো কানাই সে আদেশ পালন করিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে। তাহার দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই রামেশ্বরের! কিন্তু যদি তাহা না হইয়া থাকে—তবে রামেশ্বর আর সে চেষ্টা করিবেন না। তবে তিনি কি করিবেন?

তীর্থযাত্রা করিবেন। হ্যাঁ—তীর্থযাত্রীই। কোন তীর্থ? রামেশ্বর নিজের মনেই হাসিয়া ফেলিলেন। তীর্থ তাঁহার জন্য আছে নাকি কোথাও। ঈশ্বর যদি থাকেন তো রামেশ্বরের জন্য নতুন কোন রকম তীর্থ তিনি সৃষ্টি করিবেন—যেখানে শুধু জ্বালা—শুধু তাপ, শুধু যন্ত্রণা..

রামেশ্বরের চোখ জ্বলিতে লাগিল। ভাবিতেছেন—অন্তত বিশ্বে তিনি আজ একা। এমন একাকিত্ব রামেশ্বর আর কোনদিন অনুভব করেন নাই। আর্ত কণ্ঠে রামেশ্বর চেঁচাইয়া উঠিলেন—

—মীনু! মা!

পদ্মা ঘুমাইতেছিল। হয়তো স্বপ্ন দেখিতেছে—কে যেন ঘরে ঢুকিল।—কে?—কে তুমি! পদ্মা প্রশ্ন করিল।

উত্তর নাই। ঘুমটা ভাঙিয়া গেল পদ্মার চমকিয়া জাগিয়া দেখিল—না, ঘুম নয়, সত্যই কে যেন আসিয়াছিল—তাহাকে জাগিতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে। চোর! নিশ্চয় চোর!

কিন্তু তাহার ঘরে চোর কিজন্য আসিবে, পদ্মা ভাবিয়া পাইল না—চোরে তাহার কি চুরি করিতে আসিবে। তবে কি—তবে কি।...

কিন্তু পদ্মা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মন যেন বারম্বার বলিতেছে—হ্যাঁ—সে-ই—সে-ই—আসিয়াছিল। কিন্তু কি মতলবে? মতলব আর কিছু নহে—তাহাকে ইহধাম হইতে সরাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু লোকটা কি নিজেই আসিয়াছিল? না—তাহার নিযুক্ত লোকই আসিয়াছিল।

শ্যামল ঘরে নাই। কয়েকদিন পূর্বে প্রফেসার অধিকারীর সহিত তাহারা মেদিনীপুর গিয়াছে—এবং হয়ত সেদিকেও চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছেন রামেশ্বর। তবে? তবে কি—চিন্তায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল পদ্মা। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালিয়া দেখিল—তাহার ঘরের খিল ওপাশ হইতে খোলা হইয়াছে একটা তার দিয়া—তারটা ওইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। পাশের ঘরে শ্যামল থাকে। পদ্মা আলো লইয়া সেই ঘরের দিকে গেল। সে ঘর ঠিকই আছে—কিন্তু কে যেন ঢুকিয়াছিল। বই-খাতা কিন্তু ওলোটপালট হইয়া রহিয়াছে—কে আসিয়াছিল?

চিন্তায় ঘামিয়া উঠিল পদ্মা। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভয় করিলে তো চলিবে না! নিজের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে না সে—কিন্তু শ্যামল! রামেশ্বর কি তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য কোন চক্রান্ত করিয়াছে? কিছুই আশ্চর্য নয় তাহার পক্ষে। পদ্মা যতখানি তাহার সম্বন্ধে জানে—তাহাতে শ্যামলকে হত্যা করা কিছু বেশী কথা নয়। কারণ শ্যামলকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করিবেন না।

পদ্মা কি করিবে কিছুই ভাবিতে পারিতেছে না! প্রফেসার অধিকারী খুবই বুদ্ধিমান এবং সুচতুর ব্যক্তি। শ্যামল তাঁহার কাছে আছে। তথাপি পদ্মার মাতৃ মন শ্যামলের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল। সে রাত্রে আর ঘুমাইতে পারে নাই পদ্মা।

শ্যামলের পত্র আসিয়াছিল কয়েকদিন পূর্বে—"মা—আমরা ভাল আছি। তোমার কোন চিন্তা নাই।"—লিখিয়াছিল ও ঠিকানা দিয়াছিল।

সকালে পদ্মা পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে বলিল—

—একটা 'টেলি' করে দিতে হবে শ্যামলকে—

—কেন? টেলি কেন?

—ওরা ফিরে আসুক—

—সেকি! প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে গেছে কাজ না সেরে ফিরবে?

—তবে আপনি শুধু 'কেমন আছে সে যেন জানায়'—লিখে দিন।

—অনর্থক টাকা খরচ করবেন? চিঠি দিন না একখানা।

—না—টাকা খরচ হোক—আপনি 'তারটা' করে দিন।

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক জানাইলেন যে তিনি 'তার' করিয়া দিতে রাজী! কিন্তু আজ রবিবার। সাধারণ 'তার' যাইবে না। কাল তিনি শ্যামল বা প্রফেসার অধিকারীকে 'তার' করিয়া দিবেন।

নিরুপায় হইয়া পদ্মা আর কিছু বলিল না। সারাদিন কিন্তু তাহার অন্নজলে রুচি হইল না। রাত্রে প্রায় কিছু না খাইয়াই শুইয়াছে। অকস্মাৎ 'খুট'—শব্দ।

পদ্মা তৎক্ষণাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলিতেছে ; পদ্ম উঠিয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে—পাশ বালিশটায় চাদর চাপা দিয়া সে সরিয়া গেল ঘরের কোণার দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে পদ্মা।

চোর ঘরে ঢুকিল!—বালিশটাকেই সে পদ্মা ভাবিয়াছে। সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল—পদ্মা সুড়ুৎ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দরজাটা টানিয়া দিল এবং শিকল তুলিয়া দিল বাহির হইতে। লোকটা বন্দী হইয়াছে। পদ্মা ইহার পর পাশের ঘরের লোকজন ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে—পদ্মা ত্বরিতে চলিল লোক ডাকিতে।

কানাই ঘরের মধ্যে বন্দী। কিন্তু রায় রামেশ্বরের লোকরা আহাম্মক নহে। কানাই মুহূর্তে বিপদ বুঝিতে পারিল এবং কোমর হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া ঐ ছিটে বেড়ার ঘরের একদিকে যে একটি ছোট জানালা আছে—তাহাই কাটিয়া লাফ দিয়া ওদিকের গলিতে পড়িল।

পাশের বাড়ীর দুইজন লোক লইয়া পদ্মা যখন ফিরিল—দেখিল ঘরে কেহ নাই। জানালাটা কাটা দেখিয়া সকলেই বুঝিল চোর পলাইয়াছে।

বহু অনুসন্ধানই করা হইল চোরের। মস্ত বড় বস্তি—বিস্তর সরু গলি আচ্ছন্ন! চোরকে আর পাওয়া গেল না। সকলেই ঘরে ফিরিল—এবং সকলেই ভাবিল, পদ্মার এমন কি সম্পদ আছে যাহার জন্য চোর আসে! টাকাকড়ি তো তাহার নাই—ঘটিবাটিও বিশেষ নাই। পদ্মা কিন্তু বুঝিয়াছে—যে আসিয়াছিল, সে রামেশ্বরের লোক—এবং আসিয়াছিল তাহাকে হত্যা করিতে। কিন্তু এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু সে বলিল না।

পরদিন শ্যামলকে টেলিগ্রাম করিল পদ্মা। তাহারা যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসে। পদ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে নানা কারণে। প্রফেসার অধিকারীও যেন আসেন।

একটা তাঁবুর বাহিরে প্রফেসার অধিকারী ক্যাম্বিস চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। শ্যামল ও মীনা এখনো রিলিফ ওয়ার্ক করিয়া ফেরে নাই। অদূরবর্তী একটা পুষ্পিত তরুর দিকে চাহিয়া প্রফেসার অধিকারী চুরুট টানিতেছেন। সহসা কে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিছনে বসিয়া পড়িল। প্রফেসার অধিকারী বিস্মিত হইয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন—মীনা।

—চুপ—চুপ, ও আমায় ধরতে পারবে না—বলবেন না যেন।

সামনের দিক হইতে শ্যামল আসিল। বেশবাস অত্যন্ত রুক্ষ, স্নান আহার কিছুই হয় নাই। প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামল হঠাৎ থামিয়া গেল।

—মীনু কৈ—শ্যামল? বড্ড দেরী করে ফেললে তোমরা।

—যেখানেই যাই শুধু আর্তনাদ স্যার! সে দেখে আর খাওয়ার কথা মনে থাকে না। মীনু তো আমার আগেই এলো।

—দেখ—এসেছে তা হলে।

—তাঁবুতে ঢোকেনি তো স্যার? ওঃ। কি সাংঘাতিক ছুটতে পারে স্যার। আমি একদম হার মেনে গেলুম।

মৃদু হাসিয়া প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—হারা উচিত হয়নি তোমার শ্যামল। তুমি যার ছেলে—সে কোথাও কখনো হারেনি।

—আমার বাবাকে কি আপনি চেনেন স্যার?

প্রফেসার অধিকারী আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—কিছু কিছু। যাও, স্নান করে খাও

গিয়ে তোমরা। মীনু!

চেয়ারের পিছন হইতে মীনা বাহির হইয়া আসিল। কবরী খুলিয়া গিয়াছে। মুখে খড়ি উড়িতেছে। ক্লান্তিতে সারা শরীর কোমল হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি হাসিতে এবং আনন্দে সারামুখ উদ্ভাসিত। পরণের কাপড় অবিন্যস্ত। সংযত করিতে করিতে বলিল—ভেবেছেন কলকাতার মেয়ে! সাঁতারে কাল হারিয়েছি, আজ দৌড়ে, আসছে কাল...

—ঘোড়দৌড়ে! কেমন?

—না, ঘোড়ায় আমি চড়তে পারিনে,—আসছে কাল ঝগড়ায়।

—আমি আগেই হেরে রইলাম। স্যার সাক্ষী।

—বেশ—তা হলে অন্য কিছু, গাছে চড়ায়!

—ওতেও হেরে যাব, গাছে চড়া আমার অভ্যাস নেই।

—সত্যি নাকি হে শ্যামল? গাছে চড়তে পার না!—প্রফেসার অধিকারী হাসিতে লাগিলেন।

—না স্যার, আমায় এমন লক্ষ্মী ছেলে করে মানুষ করেছেন যে একেবারে 'বাঙালী' হয়ে উঠেছি।

—আচ্ছা, তাহলে স্যারের পা টেপায়।...

প্রফেসার অধিকারী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—তোরা এখন স্নান করে খেয়ে নে দেখি। কাল কিসের পাল্লা দিবি তা আমি ঠিক করে দেব!

চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মীনা তাকাইয়া দেখিল প্রফেসার অধিকারী অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিল,

(গান)

ও গো সুন্দর!
ধরো ধরো ধরো আমায় ধর গো—সুন্দর।
আমি আছি আকাশ ব্যেপে
তাইতো বাতাস উঠেছে কেঁপে গো...
বনের ফুলের গন্ধে আজি তাই সে হলো মন্থর—
ওগো, সুন্দর...
আছি মেঘের কালো চুলে
আছি তোমার—আছি তোর—আছি তোমা..

—আর বুঝি মিলাতে পারছেন না! আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।—আছ আমার মন মুকুলে—আছে তোমার চোখের জলে—থাকো জুড়ে অন্তর!

মীনা হাসিয়া বলিল—বাঃ আপনি তো বেশ মিলিয়ে দিতে পারেন?

—অপরেরটা খুব পারি—নিজেরটাই পারছি নে।

চোখ পাকাইয়া মীনা বলিল—চুপ! কথার প্যাঁচ তো বেশ আছে দেখছি! এর মধ্যে শয়তানি শিখেছেন!

বলিয়াই মীনা ক্যাম্পে ঢুকিল, শ্যামল অন্য কাজে চলিয়া গেল। বাতাসে মীনার গলার সুর ভাসিয়া আসিতেছে। মধুর করুণ, হৃদয়গ্রাহী—চিত্তহারী।

সরু রাস্তাটির উপর স্বল্পালোকে দুইজন মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছে। ক্রমশ বোঝা গেল উহাদের একজন রামেশ্বর, অপরজন দয়াল।

অন্য দিক হইতে বেদে সম্মুখবর্তী হইল।

—কি কত্তা! এহানে আইছেন? কেমন দেখতিছেন কত্তা?

—হ্যাঁ হে—এসেছি। তোমার মনিব কোথায়? ক্যাম্পেই আছে?

—আজ্ঞে না কত্তা বারাইছেন। কি কাম আমারে বলতি পারেন।

—চমৎকার রিলিফ-ওয়ার্ক করছে তোমার মনিব। আমিও কিছু টাকাকড়ি দিতে চাই, আর যদি—কাজও কিছু করতে পাই—

ও কত্তা, আপনাগোর এমত সুমতি হইছে। আসেন আসেন. শ্যামলবাবু সব ঠিক কইরা দিবার আছেন।

—না—তোমার মনিব আসুন, তাকেই দরকার আমার।

—মীনা মা আছেন। আসেন কত্তা, চা খাইয়া যান, আসেন।

রামেশ্বর দয়ালের দ্রিকে চাহিলেন—দয়ালের সহিত চোখের ইঙ্গিত হইল—পরে বলিলেন—চল—তোমার মনিবের জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

সকলে অগ্রসর হইলেন। ক্যাম্পের সামনে ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসিলেন রামেশ্বর। দয়াল কিছু দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিল। রামেশ্বর একাকী বসিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। মীনা সুসজ্জিতা হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

রামেশ্বরকে দেখিয়া মীনা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাবা—! তুমি কখন এলে বাবা?

—ক'দিনই এসেছি মা, তোকে খুঁজে বার করতে দেরী হলো। রাজীব কোথায়?

—এই তো ছিলেন। কোথায় গেলেন এক্ষুনি। এখনি আসবেন। ওঁর বিস্তর কাজ বাবা। কোথায় কে কতটা কষ্ট পাচ্ছে—তারই খবর করছেন দিনরাত।

মীনার দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন—এই বন্দীজীবন তোর ভাল লাগছে মা। বেশ তো হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস! খুবই আনন্দে আছিস দেখছি!

—বন্দী আমি নেই বাবা—বরং বৃহত্তর জীবনে মুক্তি পেয়েছি। তোমার বিশাল প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে কোনদিন তাকাতে পারিনি ; এখানে এসে দেখলাম, মানুষ কত দুঃখী—কত অসহায়, কি মর্মন্তুদ ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে জীবনের পথে হেঁটে চলে। যিনি আমাকে এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছেন, তিনি মানুষ নন—বাবা—দেবতা।—মীনু রাজীবের উদ্দেশে জোড়হস্ত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—আমি যখন ইচ্ছে, তোমার কাছে যেতে পারি বাবা, তিনি আমায় সে স্বাধীনতাও দিয়ে রেখেছেন—কিন্তু—

—কিন্তু কি মা—মীনু?

—আসবার ইচ্ছে আমার ছিল না বাবা, দৈবচক্রে এসে পড়েছি। কিন্তু আমার মা'র কথা তুমি কোনদিন আমাকে কিছুই জানাও নি বাবা—আমার জানতে ইচ্ছে করে। শুনলাম, আমার অভাগী মা বহু দুঃখ, পেয়েছেন, বহু নির্যাতনও নাকি সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সব কথা আমি শুনিনি বাবা—প্রফেসার অধিকারী জানেন—তিনি আমায় বললেন সব...

—থাক মীনু—বুঝেছি, রাজীব তোকে আমার বিরুদ্ধে—

—ছিঃ বাবা! তাঁর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করো না। তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা আমায় বলেননি! আর আমি অন্যের কথা কেন শুনবো বাবা? আমি আর কারো কথা

বিশ্বাস করি না বাবা। করবো না। তবে আমার মা'র কথা তুমি আমায় সব বলবে বাবা?

—বলবো, কথা খুব বেশী নেই আর। তবু তোকে সবই বলবো, কেমন করে তুই রায় রামেশ্বরের কোল-জোড়া ধন হয়ে আছিস। আমি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি মা. আমার একমাত্র মেয়ে—আমার বংশের শেষ প্রদীপ-শিখা তুই—চল না, বাড়ী চল। এসব কাজ ভালো হতে পারে, কিন্তু তোর নিজের হাতে করবার মতো কাজ নয়—টাকার দরকার—দিচ্ছি আমি।

—প্রফেসার আধিকারীর সামাজিক গর্ব কিছু কম নয় বাবা! ওসব বলে আমাকে আর ভুলাতে পারবে না। এ সব নিজের হাতেই করবার কাজ—তাই তোমার সঙ্গে বাড়ী ফেরার পূর্বে আমি এ কাজ শেষ করতে চাই। এসব কাজের একটা নেশা আছে বাবা। তুমিও যোগ দাওনা, ভাল লাগবে—দেখবে। বাবা কিছু খাও...

একটা বয় খাদ্যাদি লইয়া আসিল। মীনা সারাদিন খায় নাই। তাহার মুখ শুকাইয়া রহিয়াছে। রামেশ্বর দেখিলেন। বলিলেন,

—তুই খা মা, আমি এখন খাব না।

মীনু খাইতে বসিল। রামেশ্বর চাহিয়া আছেন। খাওয়া হইল। অতি সামান্য খাদ্য। রামেশ্বর দেখিলেন মীনু হাত ধুইল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিলেন রাজীব। খদ্দরের পোষাক ঝলমল করিতেছে অঙ্গে। বলিলেন—শোন রামেশ্বর—আমি সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করি। তুমি সবচেয়ে বিষধর সাপ—তাই তোমার বিষটা সমস্তই আমার লেবরেটারীতে আনবার চেষ্টা করেছি। ঐ আমার মীনু মা! তুমি এসেছ রামেশ্বর—তোমার বিষদাঁত ভেঙে আমি তোমার এই বুড়ো বয়সে মানুষ করবো ভেবেছিলাম—ঈশ্বর সদয়—তা হয়েছে। কিন্তু—মীনু ভেতরে যাও তো মা। রামেশ্বরের সঙ্গে আমার কথা আছে।

মীনু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,

—তোমাদের কথা শেষ হলে আমায় ডাকবে বাবা।

—কথা কিছু নাই রাজীব। মীনুকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

—শোনো রামেশ্বর! আমার পিতৃত্বকে তুমি দীর্ঘকাল ভোগ করেছ! চিরকালই করতে পারতে, কারণ মীনুকে সত্যি ভালবাস! আমি তাকে তোমার মেয়ে বলেই জগতে পরিচিত করে দিতে পারতাম রামেশ্বর. কিন্তু...

কিন্তু আর কিছু নেই রাজীব—থাকতে পারে না। সারা পৃথিবী জানে রায়বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী মীনাক্ষী। রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা সে। তার সত্য পরিচয় জানবেন যদি ভগবান কোথাও থাকেন। তার পৃথিবীর পরিচয়—আইন ও আদালতের সাক্ষীপ্রমাণের সকল পরিচয়, সে আমারই মেয়ে এবং সেই পরিচয়ই তার প্রকাশ থাকবে—অন্যথা হবে না। ডাকো মানুকে—মীনু।

—থামো রামেশ্বর—জোর করে কিছু করা তোমার ঠিক হবে না এখানে। এখানে তোমার লাঠিয়াল নাই—বরং আমার ছাত্র-সৈন্যরা আছে। আর আমি জানি—আদালতে তুমি যাবে না...

—আদালতে গেলে তোমাকে জেলে দিতে পারি—জান রাজীব?

—জানি—কিন্তু আদালতে গেলে তোমার বংশের মাথায় তুমিই ঘোল ঢালবে। অতএব

তুমি সেখানে যাবে না। কিন্তু রামেশ্বর আর কি কিছু তোমার শোনাবার নেই? তোমার জীবনের গত দিনের বিস্তৃত বহু ঘটনার কথা?

—না—ওসব কাব্যিপনার আমি ধার ধারি না, মীনুকে ছেড়ে দাও রাজীব। রাজীব যেন কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। পরে বলিলেন—না শোন। এতদিন তুমি মীনুর বাবা ছিলে, এখন আমি কিছুদিন তার পিতৃত্ব ভোগ করতে চাই। তাকে আমি পল্লীগ্রামের একটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে করে রাখতে চাইনে। আমি চাই, সে শিক্ষায়, সমাজ-সেবায়, দেশের নানা কাজে এগিয়ে আসবে। সবার পুরোভাগে তার আসন নেবে। তার লৌকিক পরিচয় যাই হোক তার সত্য পরিচয় তো তোমার অজানা নয় রামেশ্বর! তার রক্তে আছে বিপ্লব বহ্নি, তাকে হতে হবে ভারতমাতার যোগ্য সন্তান। তুমি তাকে জমিদার কন্যা করে, পটের-বিবি করে রেখেছ। তা হয় না রামেশ্বর—তা আমি হতে দেব না।

—তা হলে ভালয় ভালয় দেবে না?

—না—

—বেশ। কিন্তু তুমি জেনে রেখো রাজীব, এই পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই—যা আমার বুক থেকে মীনুকে কেড়ে নিতে পারে।

—বেশ—দেখা যাবে! চোরের ওপর বাটপাড়ী করতে চাও রামেশ্বর। কিন্তু শোন—

—শোনবার আর কিছু দরকার নেই রাজীব—চললুম—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর উঠিলেন। রাজীব হাসিতেছেন। হাসিয়া বলিলেন—

—অত চটাচটির কি দরকার রামেশ্বর—মীনু এখন আমার কাছেই থাক—তাকে সমাজ-সেবার কাজ শেখাচ্ছি—যোগ্য পাত্র খুঁজে তার বিয়ে দেব—তখন অবশ্য নিশ্চয় তোমাকে ডাকবো...আসবে তো?

—বিদ্রূপ করছো রাজীব? ভাল—দেখা যাবে—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর মুহূর্তে চলিয়া গেলেন।

রাজীব হাসিতে লাগিলেন! নিজের মনে বলিলেন—তোমার বিষদাঁত আর নেই। রামেশ্বর—এখন তুমি ঢোঁড়া!

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেছে পদ্মা! শ্যামলের চিঠি আসিয়াছে—তাহারা শীঘ্র ফিরিবে। পদ্মা নিজের মনে বিগত দিনের কথা ভাবিতে লাগিল!

স্বপ্নের মত মনে পড়ে সেই সেই বহু পুরাতন কাহিনী। হ্যাঁ—রূপকথাই তো! 'জমিদার-গৃহিণী হইতে চলিয়াছে গ্রাম্য মেয়ে পদ্মা। সকলেই তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। আবার মজাও দেখিতেছিল অনেকে। রামেশ্বরকে যাহারা চেনে তাহারা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে নাই কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য হইল না! দুর্দান্ত জামিদার একটা ভাঙা শিব মন্দিরে পদ্মার হাতের মালা গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে জানাইলেন—গন্ধর্ব মতে এই বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

প্রতিবাদ কেহই করে নাই। করিবার সাহসও কাহারও ছিল না। ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সকলেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। রহিল পদ্মা ও তাহার বৃদ্ধা মাতা। সুখেই রহিল, কিন্তু ক'দিন? মাত্র বৎসর খানেক। তারপর—

তারপর শোনা গেল, জমিদারের বৃদ্ধ পিতা আপত্তি করিয়াছেন। বলিয়াছেন এইরূপে বিবাহিত বধূকে ঘরে আনা হইবে না—ইহা রক্ষিতার সামিল—বধূ নহে। বড় লোকের ছেলের অমন দু-চারটা থাকে। বংশের কুলবধূ তাহাকে করা যায় না। না—তাহা সম্ভব নহে।

আশ্চর্য! ঐ জমিদার-তনয়—যাহার দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়—তিনি টুঁ শব্দটি করিলেন না। শুধু পদ্মাকে বলিলেন—পেটের ছেলেটাকে ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলো—তারপর চলে যাও দেশান্তরে—ওকে রাখলে বিস্তর বিড়ম্বনা ঘটবে—আজই যাও—

তাই যাব—সেখানে গিয়েই যা হয় করা যাবে—পদ্মা বলিয়াছিল অশ্রুসজল নয়নে।

নিরুপায় পদ্মা ও তাহার মা অতঃপর কি করিয়াছে, কেমন ভাবে সন্তানটিকে বাঁচাইয়াছে—বড় করিয়াছে—ভগবান জানেন ; আর জানেন রাজীব অধিকারী। রাজীবের ঠিকানা জানা ছিল—ঐ জমিদার-পুত্রই জানাইয়াছিল একদিন কথাপ্রসঙ্গে—পদ্মা তাহার মাকে লইয়া তাঁহারই আশ্রয় ভিক্ষা করে। সন্তানটি তখন বৎসর পাঁচের। উদার মহাপ্রাণ রাজীব নির্বিকাব চিত্তে তাহার সব ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তদবধি শ্যামলের অভিভাবকের সবকিছু কাজ তিনিই করিতেছেন।

পদ্মার হাতের টাকা বহু আগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ছেলের ফটোসহ পুনরায় কিছু টাকা দিবার প্রার্থনা জানাইয়া পদ্মা যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহার জবাব আসে নাই।

ইহার পর পদ্মা আর কোন খবর দেয় নাই—খবর রাখেও না। কিন্তু রাজীব রাখেন। খুব ভালভাবেই রাখিয়াছেন—রাখিবার বিশেষ হেতু তাঁহার কন্যা মীনু। নতুবা হয়তো এতো বেশী খবর তিনি রাখিতেন না। খবর লইয়া রাজীব জানিয়াছিলেন—পদ্মার কথা রামেশ্বর আর উচ্চারণ করেন না—হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভুলিয়া গেলে তো চলিবে না। যে সন্তান বড় হইয়া উঠিতেছে—শরীরে স্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায় যে সন্তান সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে—তাহার একটা পিতৃ-পরিচয় অবশ্যই প্রয়োজন। সমাজে বাস করিতে হইলে যাহা দরকার শ্যামলকেও তাহা পাইতে হইবে! পদ্মা একথা বারম্বার ভাবিয়াছে। কিন্তু রাজীব ইহা ভাবিয়াছেন কি না, জানা নাই পদ্মার। হয়তো তিনি ভাবেন নাই—কারণ শ্যামলকে তিনি পুত্রবৎ দেখিয়া থাকেন এবং অনেকেই জানে শ্যামল তাঁহার পালিত পুত্র শুধু নহে দত্তক পুত্র।

অধ্যাপক অধিকারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান যথেষ্ট। তদুপরি তিনি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পুত্রত্বের গৌরব কম কিছু নহে। কিন্তু সে কথা তো সত্য নয়। শ্যামল কি তাহার পিতৃ-পরিচয় কোনদিন পাইবে না। শ্যামল তো বহুবার এ প্রশ্ন করিয়াছে—'জবালা'র মতই হয়ত তাহার মাকে মনে করিতেছে শ্যামল। না—পদ্মা আর বিলম্ব করিবে না—একবার রামেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিবে—শ্যামলের পিতৃত্ব তিনি স্বীকার করিবেন কি না। হয়তো তিনি রাজী হইবেন না—এতোদিন পরে মহা সম্মানিত রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায় অকস্মাৎ পুত্র কোথায় পাইলেন—স্ব-গ্রামে এ প্রশ্ন জনগণের মনে হওয়া স্বাভাবিক—তথাপি পদ্মা একবার শেষবারের মত প্রশ্ন করিবে রায় রামেশ্বরকে।

শ্যামল কোনদিন রামেশ্বরের বিষয়-সম্পত্তি লইলে গ্রামে যাইবেও না। না—কোন প্রয়োজন নাই। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন—তাহাতেই অন্নবস্ত্র সংগ্রহ সে করিতে পারিবে। এখন ভাল দেখিয়া একটি বধূ যোগাড় করিয়া শ্যামলের বিবাহ দিতে হইবে! তাহাও করিবেন ঐ রাজীব অধিকারী। শ্যামলের সব কিছু তিনিই করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঐ মেয়েটি—ঐ মীনু—উহার সহিত শ্যামলের বিবাহ দেওয়া যায় না! চমৎকার মেয়ে! কে জানে এতো ভাগ্য তাহার হইবে কি না। হইলে কিন্তু সত্যি ভাল হয়। অমন সুন্দর মেয়ে কমই দেখিয়াছে পদ্মা।

কিন্তু এসব আকাশ-কুসুম—পদ্মার পুত্রের পরিচয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হইবেন না। তার চেয়ে আরও বড় কারণ, পদ্মা দরিদ্র। দানে তাহার দিন চলিয়া থাকে। শ্যামল এখনও রোজগার করে নাই। কবে করিবে কে জানে! তবে পড়াশুনায় সে খুবই ভাল, আর চেহারাও খুব সুন্দর। এইসব কারণে অনেক বড়লোকের নজর আছে তাহার দিকে।

কিন্তু পদ্মা যেন মনে একটি বিশেষ আশা পোষণ করিতেছে। সেটি অন্য কিছু নহে—মীনুকে পুত্রবধূরূপে লাভ করা। কিন্তু মীনু সত্যই কাহার কন্যা—কি তাহার সত্য পরিচয়? কিছুই জানা নাই পদ্মার। অবশ্য রাজীব অধিকারী নিশ্চয় জানেন—কিন্তু তিনি কি মীনুর বাবাকে রাজী করাইতে পারিবেন পিতৃপরিচয় হীন এক পাত্রের সহিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে? কে জানে। উহারা ফিরিলে পদ্মা জিজ্ঞাসা করিবে।

পত্র তো আসিয়াছে—শীঘ্রই আসিবেন রাজীব। কিন্তু যতক্ষণ না ফেরেন পদ্মা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে না। সেদিনের চোরের ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে সে। উহা যে রামেশ্বরের কীর্তি তাহাতে পদ্মার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ চুরি করিবার মত কিছুই নাই তাহার ঘরে যে চোর আসিবে। রামেশ্বর নিশ্চয় জানিয়াছেন পদ্মা এখনো বাঁচিয়া আছে এবং এখানেই আছে। তাই পদ্মাকে ইহধাম হইতে বিদায় করিবার জন্য রামেশ্বর লোক নিযুক্ত করিয়াছেন!

পদ্মা কোনদিন যদি আদালতে যায়—এই তাঁহার আশঙ্কা—কিম্বা পদ্মা যদি তাহার পুত্র শ্যামলকে লইয়া রামেশ্বরের স্বামীত্ব দাবী করে এবং শ্যামলকে পুত্র বলিয়া প্রচার করে তবে রায় রামেশ্বরের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে—এই আশঙ্কাও কম নহে।

কিন্তু পদ্মা যতদূর জানে—রামেশ্বর বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নী সর্পাঘাতে মারা যায়, তাহার একটি কন্যা ছিল। রামেশ্বর আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। কে জানে করিয়াছেন কি না—পদ্মা কোন খবর রাখে না।

কিন্তু আজ খবরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে পদ্মার। যদি রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার না করেন তবে কি হইবে! কোন পরিচয়ে শ্যামল জনসাধারণে পরিচিত হইবে।

চিন্তাটা অগাধ হইয়া উঠিল পদ্মার। কিন্তু সে সমস্ত দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল—শ্যামল এতকাল যে ভাবে পরিচিত হইয়াছে, প্রফেসার রাজীব অধিকারীর পুত্র বা পালিত পুত্ররূপে—তাহাই থাকিবে। ইহার জন্য চিন্তার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।

অবশ্য একবার শেষবারের মত পদ্মা রামেশ্বরকে প্রশ্ন করিবে—পুত্রকে স্বীকার করিতে

তিনি সম্মত কি না—যদি তিনি সম্মত না হন—হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না—তবে পদ্মা আর সে চেষ্টা করিবে না। শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর পালিত পুত্ররূপেই আত্মপরিচয় দান করিবে...শ্যামল অবশ্য সবই জানিবে। তাহাকে সবই জানাইবে পদ্মা কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইবেন—শ্যামল যেন তাহার পর কোনদিন আর রামেশ্বরের পিতৃত্ব কামনা করিতে না যায়।

বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে! পদ্মা দরজা খুলিয়া দেখিল—মীনু ও শ্যামল।

শ্যামল ও মীনু চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—মা—মাগো—মা, দরজা খোল—আমরা এসেছি।

তাড়াতাড়ি প্রদীপ রাখিয়া মা দরজা খুলিয়া দিল। মীনু আগেই আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামল পশ্চাতে।

—মা—আমরা ফিরে এলাম, মা—মা—মা!

—চুপ—আমার মায়ের উপর ভাগ বসাতে এসেছে—দেখো মা।

—খুব করবো—ভাগ বসাবো। মা—ওমা—মাগো—মা—ওমা—

—ভালো হচ্ছে না কিন্তু—আমি কাকে মা বলবো তা হলে!

পদ্মা হাসিয়া বলিল—দেশমাতাকে মা বলবি—খোকন এখন থেকে দেশমাতৃকাকে তুই মা বলিস, আর আমি মীনুর মা হয়েই থাকবো।

—আশ্চর্য করলে মা, তুমি ' ভয় করছে না তোমার? তুমি এই ক'দিনে এতখানি সাহস কি ক'রে পেলে মা?

—সাহস আমার চিরদিনই দুর্জয় খোকা এতকাল তার প্রকাশ ছিল না ; তুই বড়ো হয়েছিস—আমার দায়িত্ব থেকে এবার আমি মুক্ত হতে চাই। আয়...ঘরে আয় বাবা!

মীনুকে সস্নেহে টানিয়া একটা কক্ষে লইয়া গেল পদ্মা। শ্যামল অন্য কক্ষে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে গেল। শূন্য উঠানে দীপশিখা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন প্রফেসার অধিকারী। দুইজন মুটে ব্যাগ, সুটকেস ও বেডিং রাখিয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী উঠানের এককোণে রাখা একটা মোড়ায় বসিয়া একটা চুরুট ধরাইলেন। পকেট হইতে একটা নোট-বুক বাহির করিয়া কি কয়েকটা লিখিলেন। তারপর ডাকিলেন—

—শ্যামল!

শ্যামলের মা বাহির হইয়া নমস্কার করিল।

বলিল—ওরা দু'জনেই স্নান করছে! কাপড় ছাড়া হলে কিছু খেতে দেব। আপনি স্নান করে কাপড় ছাড়ুন কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,—না—না—কিছু দরকার হবে না। আমি বরং ঘণ্টা দুই পরে এসে মীনুকে নিয়ে যাবো। ওরা থাক—খাওয়া-দাওয়া করুক।

—বাড়িতে তো আর আপনার জন্যে কেউ রেঁধে রাখেনি!

—তা হোক—চাকর-বাকর আছে। অন্য একটা কথা বলতে আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বলুন!

—শ্যামল বোধ হয় তার বাবার নাম জানতে চাইবে. বলবেন না আপনি—ওতে বিপদ আছে।

—জানতে চেয়েছিলো—আমি বলিনি সেদিন, কিন্তু আবার যদি জিজ্ঞেস করে—

—না, কোন রকমেই বলবেন না। আমি চললুম।

—আমার ইচ্ছে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি—

—রামেশ্বরের সঙ্গে?—তা মন্দ কথা নয়—তাই করুন। তবে ফল কতটা হবে কে জানে।

প্রফেসার চলিয়া গেলেন।

—ও খোকা—আয় বাবা, খাবি।

শ্যামল নিকটে আসিয়া বলিল,

—প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে তুমি চক্রান্ত করেছ মা! আচ্ছা মা, যা গোপন আছে—তা গোপনই থাক। আমি শুনতে চাই না।

—চুপ কর খোকা, মীনু রয়েছে। সব কথাই তোকে যথাসময়ে বলে যাবো। তোর মা এমন কিছুই পাপ বা অকর্ম করেনি, যা শুনে তোর লজ্জার কারণ ঘটবে। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি তোকে বুকে নিয়ে তোর বাবার আসার আশায় বসে আছি। আমার এই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ ধন তুই—এই গর্ব যেন তোকে পৃথিবীর বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শক্তি দেয়!

—সে শক্তি আমি পেয়েছি মা—তোমার অমোঘ আশিস ফলেছে আমার জীবনে। আমি দানব পিতার সন্তান, তবু আমি মানুষ হবো—ধ্রুব যেমন অসুরকুলে জন্মেও তার ধ্রুবকে হারায়নি। কিন্তু তাকে আমি সঠিকভাবে জানতে চাইছিলুম মা।

—আরো কিছুদিন যাক বাবা।

—আচ্ছা মা—যাক্! যদি কোন দিন জানতে পারি কে সেই শয়তান পিতা, যে আমার চিরদুঃখিনী মাকে এমন করে চোখের জলে ভাসিয়েছে—

—না খোকন! চোখের জল ফেলিনি আমি। তোকে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে আছি বাবা! তুই আমার মাতৃত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী, দেশমাতার হাতে তোকে দিতে পারবো—সেই আমার নারীজন্মের সার্থকতা!

কাপড় ছাড়িয়া মীনা আসিয়া দাঁড়াইল।

—চল মা—খাবি চল।

মা তাহাদিগকে খাইতে দিল।

রামেশ্বর মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার মনে নানা দুর্ভাবনা জাগিতেছিল। কানাই ওখানে কি কতদূর করিল, তাহা জানা দরকার। রামেশ্বর আর কাহাকেও হত্যা করার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কানাই নিশ্চয় তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

সকালে পৌঁছিয়াই রামেশ্বর নিভৃত কক্ষে কানাইকে ডাকিলেন। প্রভুর আদেশ পালন করিতে অক্ষম হওয়ার জন্য কানাইয়ের চিন্তার অবধি ছিল না। সে ভীত হইয়া ভাবিতেছিল—রামেশ্বর হয়তো তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিবেন—হয়তো চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবেন—কিম্বা কয়েক ঘা স্বহস্তে-জুতা মারিবেন। তাই অতিশয় শঙ্কিত চিত্তে কানাই আসিয়া দাঁড়াইল। রামেশ্বর চুরুটটা মুখ হইতে না সরাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—ও

কাজটার কতদূর?

—ও কাজটা এখনও শেষ হয়নি হুজুর—ওটা বস্তি হলেও খুব লোকজন ওখানে। আর উনি—মানে ঐ মেয়েটি অত্যন্ত সজাগ-সতর্ক—

—হয়নি তাহলে?

—এজ্ঞে না হুজুব—

—আচ্ছা—যা—আর দরকার নেই। ওটা আর করতে হবে না।

কানাই তাহার চাকুরী জীবনে এমন আর দেখে নাই। রায় রামেশ্বরের আদেশ পালিত হয় নাই—তবুও অপরাধীকে তিনি কিছুই বলিলেন না—ইহা কানাই-এর চাকুরীজীবনে এই প্রথম। সে যেন বাঁচিয়া গেল—এমনি তাহার অবস্থা—কানাই চলিয়া আসিতেছিল। রামেশ্বর ডাকিলেন—শোন—

কানাই দাঁড়াইল। রামেশ্বর বলিলেন—ওদিকে আর যাবি না—বুঝলি?

—যে আজ্ঞে হুজুর।

—এখন আর একটা কাজ করতে হবে—দয়ালকে ডাক।

কানাই তৎক্ষণাৎ দয়ালকে ডাকিয়া আনিল। রামেশ্বর তাহাকে বলিলেন—শোন দয়াল—শীঘ্রই আমি দেশে যাব। তোমরা আগে, আজই চলে যাও—সেখানে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—আদেশ করুন।

—রাজীব হয় তো এখনো মেদিনীপুরেই আছে। আরো অন্তত তিন-চার দিন থাকবে। তারা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। মীনুকে নিয়েই আমি ফিরতে চাই। নইলে দেশে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেশের লোকদের দেবো।

—সেকথা নিশ্চয় সত্য হুজুর।

—আমি কোনদিন কারো কাছে হার স্বীকার করিনি দয়াল। তোমরা জান—ঐ রাজীব আমাকে হারিয়ে দেবে—এ হতে পারে না। যেমন করে হোক মীনুকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। আদালত নয়—আইন নয়—গায়ের জোরও ওখানে ঠিক কাজ করছে না—

তা হলে হুজুর কি করা যায়? দয়াল প্রশ্নটা করিয়াই রামেশ্বরের মুখপানে তাকাইল।

—তোমাদের আর এখানে কিছু করতে হবে না—বাড়ী যাও। দেশে গিয়ে বলবে—আমি মীনুর বিয়ের চেষ্টা করছি। ভাল পাত্র যোগাড়ের জন্যই তাকে কলকাতায় এনেছি! এখানকার বড়লোকেরা দেশে-গ্রামে গিয়ে মেয়ে দেখতে চান না—তাই কলকাতায় মীনুকে আনা হয়েছে। বুঝলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—হুজুর। এ তো সোজা কথা! কিন্তু হুজুর...

—কি বলো!

—ঐ রাজীব যদি মীনুকে না দেন তো একা আপনি কি করবেন এখানে?

—আমার মেয়ে—দেবে না কি?—না-না-না, সেরকম কোন মতলব নেই রাজীবের। রাজীব তাকে চুরি করেছে কেন তা বোঝা গেছে। মীনু আমার এক মাত্র কন্যা। আমার সম্পত্তির আয় কয়েক লক্ষ টাকা—মীনুই তার মালিক। রাজীব চায় মীনুকে হাত করার পর নির্বাচিত কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার সর্বস্ব অধিকার করে নিতে। সে-সবই রাজীব ঐ দান-খয়রাতে খরচ করবে। বুঝলে, রাজীব মহান হতে চায়—মহামানব হতে চায়।

নিজের টাকা তো সব দিচ্ছেই—এখন আমারটাও অধিকার করতে চায়।

—তা হতে পারে হুজুর—কিন্তু আমাদের দিদিমণি তো খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—

—হ্যাঁ—তাতে কি! রাজীব তাকে বুঝিয়েছে—ঐসব নোংরা কাজই পৃথিবীতে নিদারুণ ভাল কাজ—অবতার হবার কাজ! কিন্তু শোন দয়াল, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না—মীনুর বিয়ে হবে কোনো এক রাজকুমারের সঙ্গে!

—সে তো নিশ্চয় হুজুর!

—হ্যাঁ—তোমরা যাও—আজই সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী চলে যাও তোমরা।

—যে আজ্ঞে—

দয়াল ও কানাই চলিয়া গেল। কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন—দয়াল ও কানাইকে যেকথা তিনি এখনই বলিলেন তাহার বর্ণমাত্রও সত্য নহে। রাজীব কেন মীনুকে আনিয়াছে—তাহা রামেশ্বর ভালরূপেই জানেন। কিন্তু সেই সব সত্য কথা বাইরে প্রকাশ করা অসম্ভব। মীনু তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে এই সত্য তাঁহার জমিদারীর সকলেরই জানা। অতএব মীনু যে তাঁহারই কন্যা—ইহা সর্বলোক বিদিত।

রাজীব আজ তাঁহাকে দাবী করিতে চাহে—যদি করে তবে রামেশ্বরের কাছে একটি মাত্র দরজা খোলা থাকিবে—আত্মহত্যা। কারণ, এতকাল পরে নিজে জীবনের সেই গ্লানিকর অধ্যায়কে প্রকাশ করার ব্যথা সহ্য করিতে পারিবেন না তিনি!

তা ছাড়া মীনুকেই তিনি ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। মীনু তাঁহার কেহ না হইয়াও যে সব। মীনু যে তাহার বুক জোড়া ধন—চোখ-জোড়া আলো!

রায় রামেশ্বরের চোখে জল আসিতেছে নাকি! হ্যাঁ—জলই। মনে পড়িল ছোরা হাতে রামেশ্বর গিয়াছিলেন মীনুকে হত্যা করিতে। মীনু তারস্বরে ঘোষণা করিল—"আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়। আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর..."

ওঃ! রায় রামেশ্বর নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার বাবা—আমার বাবা...' যেন মীনুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। আত্মসংবরণ করিতে সময় লাগিল তাঁহার। আপন মনে বলিলেন—হ্যাঁ মা—হ্যাঁ—রায় রামেশ্বরই তোর বাবা! বাবা কি শুধু জন্ম দিলেই হয়? না—বাবা হওয়ার জন্য অনেক কিছু লাগে। বুকের রক্ত লাগে, চোখের জল লাগে, সুদূরূহ আত্মত্যাগ লাগে...

রায় রামেশ্বরের মনে পড়িতেছে—অসুস্থ মীনুর জন্য ডাক্তার রক্ত দিবার কথা বলিলেন। রায় রামেশ্বর রক্ত কিনিলেন না—নিজের ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তিনি—হ্যাঁ—রায় বংশের রক্ত—রায় রামেশ্বরের রক্ত—আছে ঐ মীনুর শরীরে—আছে—আছে!

উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন রায় রামেশ্বর। আপন মনে বলিতে লাগিলেন—মীনু আমার মেয়ে—আত্মজা কন্যা। কার সাধ্য তাকে ছিনিয়ে নেয়?—রাজীব কি তার করেছে—কী করেছে রাজীব তার? কোনদিন কোন খবরও কি রেখেছে! তার প্রতিপালন, তার শিক্ষা-সহবৎ—তার আচার-আভিজাত্য—কি আর দেখেছে রাজীব? আজ এসেছে দাবী করতে। করলেই হলো। বাবা হওয়া অত সোজা কিনা!

নাঃ—এভাবে পারিবেন না রায় রামেশ্বর বাঁচিতে। মদের বোতলটা বাহির করিলেন—ছিপি খুলিলেন—পান করিবেন। মীনু এটা পছন্দ করে না। মদ খাওয়া সে

কোনদিন ভাল চোখে দেখে নাই। নাঃ—মদ আর খাইবেন না রায় রামেশ্বর। বোতলটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন।

মীনু বড় হইয়াছে। বিবাহ দিতে হবে। এখানেই কোন একটি ভাল ছেলে দেখিয়া মীনুর বিবাহ দিয়া মেয়ে-জামাই লইয়া রামেশ্বর দেশে যাইবেন। তাহা করিতে পারিলেই মীনুকে চুরি করিয়া আনার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যাইবে। দেশে গিয়া ভাল রকম ভোজ খাওয়াইয়া দিবেন সকলকে। ভাল যাত্রা শুনাইয়া দিবেন গ্রামবাসীদের—এবং কবিগানও। মীনু কবিগান ভালবাসে। হ্যাঁ—কবিগান তাহার বিবাহে অবশ্যই করাইতে হইবে। রাজীবকে কথাটা বলা দরকার। হ্যাঁ—রাজীবের হাতে অনেক ভাল ছেলে আছে।

কিন্তু রাজীব মীনুকে দিবে না বলিয়াছে। রাজীব মীনুকে দিয়া সমাজ-সেবা করাইবে। দেশের কাজ করাইবে—হয় তো রেডক্রশে যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিবে। কে জানে কি করিতে চায় রাজীব তাহাকে লইয়া। কিন্তু রামেশ্বরের যে আর কেহ থাকিবে না—কিছুই থাকিবে না—না-না—মীনুকে যেমন করিয়াই হোক বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে।

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল—একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে হুজুর।

কে আবার আসিল! রামেশ্বর তো কলকাতার আসিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন! কাহাকেও জানান নাই যে তিনি এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতায় বহু বন্ধু এবং বহু পরিচিত তাঁহার—কিন্তু তাঁহারা কেহই রামেশ্বরের এখানে আগমনবার্তা জানেন না। কে আসিল তবে?

—ডাক—আসতে বল।

অল্পক্ষণ পরে যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি রামেশ্বরের বিশেষ পরিচিত বন্ধু—ডাক্তার সোমনাথ চৌধুরী। রামেশ্বর ব্যস্তভাবে বলিলেন—

—আরে, তুমি! এসো...এসো...এসো—কেমন আছ সব?

—ভালই! কিন্তু তুমি হঠাৎ কলকাতায় কেন? মীনু কি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি?

—না। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার বিয়ে দিতে হবে।

—খুব ভাল কথা! তা কোথায় সে? এনেছ এখানে?

—হ্যাঁ। তবে গেছে একটু বেড়াতে! আমার বন্ধু রাজীব—চেন তো?

প্রফেসার রাজীব অধিকারী? হ্যাঁ—ওকে কে না চেনে। সাপের বিষেয় ওষুধ বার করলো—আবার ঐ বিষ নিয়ে কি সব জটিল রোগের ভাল ভাল ওষুধ বার করেছে। ও তো সর্বজন-পরিচিত। কিন্তু প্রফেসার রাজীব তো শুনেছি চিরকুমার! কে কে আছে তাঁর বাড়ীতে?

চিরকুমার ঠিক নয়। আছে কেউ, অন্ততঃ ছিল—ওসব যুবা বয়সের ভালবাসার ব্যাপার। যাক্—রাজীব মীনুকে মেয়ের মত ভালবাসে! সে গেছে মেদিনীপুর বন্যাত্রাণ করতে। তার আরো সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মীনুকেও নিয়ে গেছে। দু'তিন দিন পরে ফিরবে ওরা...

—বেশ! বস! আমি রুগী দেখে ফিরছিলাম—দেখি তোমার দরজায় 'রায় রামেশ্বর ইন্' লেখা। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তুমি এসেছ। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। অনেক দিন দেখা হয়নি।

—খুব ভাল করছ। আর কি খবর বলো।

—খবর তো আপাতত ভালই। ছেলেটা আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া থেকে ডাক্তারী

ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে মাস দুই হোল। প্র্যাক্‌টিশও এরই মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। এখন তাঁর মা'র ইচ্ছে বিয়ে দেওয়ার...

—বেশ তো—ভাল একটি মেয়ে দেখো...

—মেয়েও দেখা আছে আমার, চমৎকার মেয়ে—এখন মেয়েপক্ষের মত হলেই হয়!

—মত না হবার কোন কারণ নেই। তুমি ভাল, তোমার ছেলে ভাল, অমতের আশঙ্কা করছো কেন?

—শোন তা হলে! জমিদারী আজ না থাকলেও তুমি পুরোনো জমিদার ব্যক্তি। তাই সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে—বলি তা হলে কথাটা!

রামেশ্বর কি যেন ভাবিলেন। কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন—বল—সঙ্কোচ কেন?

—মেয়ে আমাদের পছন্দই আছে। তোমারই মেয়ে মীনু!

রামেশ্বর ডাঃ সোমনাথের পানে তাকাইলেন এবং বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকাইয়াই রহিলেন! কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

—আশা করি তোমার অমত হবে না রামেশ্বর।

—না। আমার অমতের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু সোমনাথ, মীনু আমার মা-মরা মেয়ে। তাকে চোখের আড়াল করতেও পারিনে আমি। তার বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই মনে হয় সব আমার অন্ধকার হয়ে যাবে।

—সেকি রামেশ্বর! একটু আগেই বলেছিলে মীনুর বিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ! বিয়ে তার দিতে হবে সোমনাথ! দিতেই হবে—কিন্তু...

—কি বলো!

রামেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ইতিমধ্যে চা-খাবার আসিল। রামেশ্বরে উত্তর দিতেছেন না। ডাঃ সোমনাথ কিছুটা আশ্চর্য কিছুটা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তোমার অসুবিধেটা কোথায়?

—শোন সোমনাথ। তোমার ঘরে মেয়ে দেওয়া আনন্দের এবং গৌরবের কথা। কিন্তু কি জান। আজকালকার বড় বড় ছেলেমেয়ে! তাদের মত না নিয়ে কিছু করা যায় না। মীনু ফিরে আসুক, তার মত নিয়ে তবে আমি এগুবো।

—বেশ! বেশ! এ খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার মতলব শোন। মীনু ফিরলে ওকে নিয়ে একদিন বিকালে এসে আমার বাড়ী! ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ছেলেকে দেখে অপছন্দ করবে এমন মেয়ে তো দেখিনি।

পুত্র-গর্বে ডাঃ সোমনাথের মুখ জ্যোতির্ময় দেখাইতেছে।

রামেশ্বর অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। কি বলিবেন তিনি! অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার সময় নাই। ডাঃ সোমনাথ তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং আরো বড় কথা—মীনুর অসুখের সময় এই সোমনাথই চিকিৎসা করিয়া মীনুকে ভাল করিয়াছিলেন। তখন হইতেই মীনুকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা ডাঃ সোমনাথের। কিন্তু আজ মীনু তো রাজীবের কন্যা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য রাজীব মীনুর বিবাহ নিশ্চয় দিবে কিন্তু তাহাতে রামেশ্বরের কি! রামেশ্বর সেখানে কেহই হইবে না। রামেশ্বরের বিপুল বিত্ত কে ভোগ করিবে কে জানে! রাজীবের শেষ বিদ্রূপটা মনে পড়িল। "আসবে তো?" উঃ, রায়বাহাদুর রামেশ্বরকে কী কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছে

রাজীব! ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই লইতে হইবে। মীনুকে চুরি করিয়া অথবা অন্য কোনো রকমে হউক রামেশ্বর লইয়া যাইবেন—কিন্তু এটা সহর কলিকাতা—এখানে রাজীবের অগাধ প্রতিপত্তি...

—কথা বলছো না কেন রামেশ্বর? তোমার কি অমত আছে।

—না। অমতের কোন কথাই নাই সোমনাথ। তবে কি জান। আজকালকার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে ; দেখাশোনা এবং আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার পর যদি কোন কারণে বিয়ে না হয় তো বিপদ ঘটে! যাই-হোক মীনু ফিরে আসুক—দেখি আমি কি করতে পারি।

—বেশ, তাই করবে। খবরটা কবে নাগাদ জানতে পারবো আমি?

—ওরা খুব সম্ভব দিন চার-পাঁচ পরে ফিরবে। তোমাকে ফোন্ করে জানাব।

—আচ্ছা। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা মীনুকেই পুত্রবধু করে আনবো বাড়ীতে। এখন তোমার আর তোমার মেয়ের মত...

—তোমার ছেলের মতামত? সে আবার বিগড়াবে না তো!

—সে সব ঠিক আছে। আমার ছেলে ওবিষয়ে প্রাচীনপন্থী। বাপমার উপর সে কোন কথা বলবে না। অবশ্য সে জানে আমরা তার জন্য যোগ্যতমাকেই নির্বাচন করছি।

রামেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। ডাঃ সোমনাথ সিগারেটটা এ্যাষ্ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন,

—তা হলে ঐ ঠিক রইল—কেমন!

—হ্যাঁ—ঐ ঠিক রইল।

ডাঃ সোমনাথ চলিয়া গেলেন। বসিয়া রহিলেন রামেশ্বর রায়। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন তিনি :

সারা পৃথিবী জানে—অতুল সম্পদেব অধিকারী রায় রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা মীনাক্ষী। পরমাসুন্দরী সর্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা সে—তাহাকে যে বিবাহ করিবে—সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ডাঃ সোমনাথ ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। গরীবের ছেলে সোমনাথ ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চাকুরী করিয়া ও প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিয়া বাড়ী একখানা করিয়াছেন এবং ছেলেটিকেও ডাক্তার করিয়াছেন—কিন্তু আর কি: ডাঃ সোমনাথ মীনুকে পুত্রবধূ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন—বাংলাদেশে এ ব্যাপাব একান্ত বিরল। মীনু তাঁহার এমন অপরূপ কন্যা যে...কিন্তু থামিলেন রামেশ্বর। মীনু, আর তাঁহার কন্যা নহে—না—কেহই নহে মীনু তাঁহার! ওঃ—রামেশ্বর কাঁদিয়া উঠিলেন যেন...মীনু তাঁহার কেহ নহে—এ চিন্তা কিরূপে করিতেছেন রামেশ্বর! মীনু যে তাঁর চক্ষের মণি—বক্ষের শোণিত—অন্তরের অন্তঃস্থলের ললিত-লাবণ্য!

মীনুকে ছাড়িয়া রামেশ্বর বাঁচিবেন কিরূপে! না—মীনুকে তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। প্রয়োজন হইলে রাজীবের পায়ে ধরিয়াও তিনি মীনুকে গৃহে লইয়া যাইবেন—মীনুর পিতারূপে তাঁহার পরিচয় চিরদিন বহাল থাকিবে—ইহা করিতেই হইবে। রাজীব উদার—রাজীব মহান—নিশ্চয় রাজীব মীনুকে ছাড়িয়া দিবে রামেশ্বরের নিকট! রাজীবের বিস্তর আছে ছাত্র-ছাত্রী—আছে বিদ্যা-বুদ্ধি গবেষণা—আছে নাম যশ -কিন্তু রামেশ্বরের কি আছে! একমাত্র সম্বল ঐ মীনু।

কে যেন আসিতেছে! রামেশ্বর ত্বরিতে চোখ মুছিয়া লইলেন।

—কে? কে? কে?—কে ওখানে?

রামেশ্বর আবার ভূত দেখিতেছেন নাকি? না—ভূত নয়। নিশ্চয় কেহ আসিয়াছেন। রামেশ্বর পুনর্বার চীৎকার করিলেন—কে—? দয়াল!

একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বিস্মিত রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন। যেন চিনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না।

স্ত্রীলোক বলিল—দয়াল বাইরে গেছে।

রামেশ্বর তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—কে তুমি—তুমি কে?

—আমি? আমি কে চিনতে পারো না? অনেক দিন পরে এসেছি, তবু চিনতে পারবে—দেখো!

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রামেশ্বর চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,

—পদ্মা! কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?

—জাহান্নামে—যেখানে তুমি যেতে বলেছিলে?

—বেশ, সেইখানেই যাও—আমার কাছে কেন?

—দরকার আছে—আমার মত অনেক মেয়েকে পথে বসিয়েছ তুমি, জান। ও শরীরে অনুতাপের আগুন কোন দিন জ্বলবে না—তাও জানি। তাই জানতে এসেছি, হে আমার প্রাণেশ্বর—তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে কোনদিন আসবো না। প্রিয়তম আমার! মনে আছে কি, আমার গর্ভে তোমার সন্তান ছিলো?

এই কঠোর বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে সময় লাগিতেছে। রামেশ্বর একটু থামিয়া শুধাইলেন,

—হ্যাঁ—কোথা সে? সে কি বেঁচে আছে?—যেন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে রামেশ্বর।

—আছে—এই পৃথিবীর এক অন্ধ গহ্বরে আছে। পরিচয়হীন পথের কাঙাল হয়ে—

—পরিচয়! পরিচয় কি দেবে তুমি তার?

—সেইটুকুই জানতে এসেছি। আজ সে বড় হয়েছে। তার পিতৃপরিচয় জানতে চায়—জানতে চায় তার ভীরু কাপুরুষ পিতা কে?

—গালমন্দ দিয়ে কিছু লাভ নেই পদ্মা, তার পিতৃপরিচয় পৃথিবীতে অজ্ঞাতেই থাকতে দাও। তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে এই বিড়ম্বনায় ফেলেছ তুমি।

—ঠিক—নিজের ছেলেকে যে নিজের বলে পরিচয় দিতে ভয় পায়, তার পিতৃত্বও যেন আমার ছেলে কামনা না করে। কিন্তু জেনে রেখো, তাকে গ্রহণ করলে তোমার মুখ, তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হতো। কিন্তু থাক—চললাম!

পদ্মা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রামেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কি যেন একটা ঘাটিয়া গেল, তাঁহার অন্তরে—কে যেন একটা না-ছোঁয়া তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়া গেল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া আপন মনে রামেশ্বর বলিলেন—রায়বংশের একজন আছে তাহলে! কিন্তু রায়বংশের সে কেউ হতে পারবে না। আশ্চর্য দৈববিড়ম্বনা! পদ্মা—পদ্মা!

কানাই আসিয়া দাঁড়াইল।

রামেশ্বর বলিলেন—একটি মেয়ে এসেছিল—ডাক তাকে।

—তিনি চলে গেছেন হুজুর।

—এর মধ্যে চলে গেছেন! দেখ—দেখ বাইরে।

কানাই দ্রুত চলিয়া গেল।

রামেশ্বর আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, রাজীব যদি এতকাল পরে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে পারে—তা হলে আমিই বা কেন পদ্মার ছেলেকে...কিন্তু রাজীব থাকে কলকাতায়—এখানে কে কার খবর রাখে। আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে—না—এ অসম্ভব। কানাই!

কানাই প্রবেশ করিল। রামেশ্বর বলিলেন—গাড়ী বের করতে বল—বেরুবো।

রামেশ্বর পিরাণ লইয়া পরিতেছেন! কিন্তু কোথায় বাহির হইবেন তিনি? কোনো নির্দিষ্ট স্থান তো নাই। কোথাও কোন কাজও নাই তাঁহার, কাজ যাহা আছে একটি মাত্র। মীনুকে ফিরাইয়া আনা। তাহারই জন্য হয়তো কোথাও যাইবেন—কিন্তু কোথায়?

অকস্মাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—রাজীব? আমার বাড়ীতে?

হ্যাঁ! আশ্চর্য হচ্ছো রামেশ্বর! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় আছে। তুমি আজও অপরাজেয়।

—বিদ্রূপ করছো রাজীব?

—না বন্ধু! সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। তুমি চিরদিনই অপরাজেয় রইলে। ভদ্রা তোমায় ভালোবাসেনি, কিন্তু তার মেয়ে ভালবেসেছে, ভালবেসেছে বিশেষ এক জনকে। চলো—দেখবে চলো।

—মীনু ভালবেসেছে? বেশ! কি আর দেখবো? কে আমি তার! আমার বিরুদ্ধে তো তুমি তাকে—

উস্কে দিয়েছি। তুমি তার মা'র হত্যাকারী। তার বাবার জীবনের দারুণ কুগ্রহ। তবু তুমি জয়ী হয়েছে।

—ভেঙে বলো রাজীব! সে কি ফিরে আসতে চায়?

—চলো, দেখবে—সে ভালোবেসেছে—ভালোবেসেছে দুর্দান্ত নরপশু রামেশ্বরের আত্মজ সন্তানকে। ভদ্রা যাকে ভালোবাসেনি, তারই ছেলেকে ভালোবাসলো ভদ্রারই মেয়ে। তোমার জয়-পতাকা দেখবে না রামেশ্বর?

—কে সে? কোথায় সে ছেলে আমার!

বিস্মিত রামেশ্বরের হাতের পিরাণটা হাতেই রহিয়া গেল।

রাজীব বলিলেন—শ্রীমান শ্যামল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। এবার সে প্রথম হয়েছে উচ্চতর বিজ্ঞানে—হয়তো স্টেট-স্কলারশিপ পাবে। রূপে-গুণে বিদ্যায় তোমার ছেলে তোমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে বন্ধু—চরিত্র-গৌরবে তুমি তাহ হাঁটুর সমানও নও!

—শ্যামল—শ্যামল পুত্র আমার! যে শ্যামলকে...তুমি সত্যি বলছো রাজীব। বিদ্রূপ করছো না তো এক অভাগা সন্তানহীন পিতাকে?

—না রামেশ্বর! তোমাকে আজো বন্ধু বলে মনে করি—তাই মানুষ করে তুলতে চাই। চলো, দেখবে—ভদ্রার মেয়ে মীনু তোমারই আত্মজ সন্তান শ্যামলকে কেমন গভীরভাবে

ভালবাসে।

রামেশ্বর মিনিটখানেক নির্জীবের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন কোন মন্ত্রবলে। পরে বলিলেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে রাজীব—না. আর উপায় নেই। মীনু শ্যামলকে ভালবাসলো রাজীব! আনন্দের কথা। তুমি দেখো। তুমিই জয়ী হলে। রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় শ্যামলকে আজ পুত্র বলে স্বীকার করতে পারবে না। আমার অন্তরেই সে স্বীকৃত থাক—বাইরে সে আমার কেউ নয়—কেউ হবে না।

—বেশ! কিন্তু দেখতে চাও না তাদের?

—না, কোন প্রয়োজন নাই! কালই আমি দেশে যাচ্ছি।

—মীনুকে নিয়ে যাবে না?

রামেশ্বর একটুখানি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিলেন। পরে বলিলেন—মীনু যদি তোমার কাছে থাকতে চায় তো থাকবে কিছু দিন।

—আচ্ছা! ধন্যবাদ—বলিয়া রাজীব তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। মুখে তাঁহার হাসি।

রামেশ্বর আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—সারা জীবনটার উপর কালো যবনিকা টেনে দাও ভগবান—যদি থাকো তুমি কোথাও!

সক্রোধে বাহির হইয়া আসিল পদ্মা রামেশ্বরের প্রাসাদ হইতে। কিন্তু তাহার বুকের ভেতরটা জ্বলিতেছে। নিরাশার মধ্যেও পদ্মা আশা করিয়াছিল, হয়তো রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। কারণ শ্যামল আজ সুন্দর সুপুরুষ যুবক—বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ডিগ্রিধারী এবং প্রফেসার অধিকারীর গর্বের ধন। তাহাকে পুত্ররূপে পাইতে যে কোন পিতা আগ্রহান্বিত হইবেন—এই বিশ্বাস লইয়াই পদ্মা আজ সাহস করিয়া আসিয়াছিল এখানে। কিন্তু কি হইল? রামেশ্বর পুত্রের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না। সে কে? সে কেমন—কি করে এতটা পড়িয়াছে—নাঃ, কিছুই জানিতে চাহিলেন না তিনি।—আশ্চর্য!

কিন্তু পদ্মা আর কি করিতে পারে! আদালত অবশ্য আছে। তবে এতোকাল পরে ওসব ঝামেলা আর করিতে চাহে না পদ্মা—তা ছাড়া আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে ওসব ব্যাপারে। রায় রামেশ্বর যে কোন মুহূর্তে শ্যামলকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে পারেন—সে চেষ্টাও হয়তো তিনি করিয়াছেন! ভালই হইয়াছে শ্যামলের কোন সংবাদ তিনি জানিতে চাহেন নাই। কিন্তু শ্যামলকে কি বলিবে পদ্মা! প্রফেসর রাজীব অধিকারী সবই জানেন—তিনিই যাহা কিছু বলিবেন। পদ্মা কিছুই বলিবে না। প্রফেসর অধিকারী শ্যামলকে সর্বত্র 'অরফ্যান'—কুড়োনো ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেই তাহার অভিভাবক হইয়াছেন। কারণ তিনি গোড়া হইতেই জানিতেন—রামেশ্বর পুত্রকে কোনদিন স্বীকার করিবেন না। এইজন্য প্রফেসর রাজীবই শ্যামলের অভিভাবক হইয়া আছেন। স্কুল-কলেজে তাহার পিতার কি নাম আছে—আছে কি না পদ্মার জানা নাই—খুব সম্ভব শ্যামলের পিতৃনাম অজ্ঞাতই রহিয়াছে স্কুল-কলেজে—কিন্তু এসব ভাবিয়া কি হইবে।

পদ্মা নিজেকে সম্বৃত করিয়া গৃহে ফিরিল। চিন্তায় মন তাহার জ্বলিতেছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে চায়। নিরপরাধী পদ্মা তাহা বলিতে পারিতেছে না—মনে হইতেছে, এ কালা-মুখ সে শ্যামলকে আর দেখাইবে না। বহুবার তাহার আত্মহত্যা করিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়াছে—শুধু শ্যামলের মুখ চাহিয়াই পদ্মা এযাবৎ নিজেকে ধরিয়া

রাখিয়াছে।

শ্যামল ঘরেই ছিল—পদ্মা আসিতেই অভিমানের সুরে বলিল—কোথায় গিয়েছিলে মা?

—এই একটু ও-বাড়ী গিয়েছিলাম বাবা—এখনও পড়তে যাসনি তুই?

—ওখান থেকেই আসছি মা—প্রফেসর অধিকারীই পাঠালেন। শোন মা—একটা সুখবর আছে। আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি—বিজ্ঞানের বড় পরীক্ষা মা—বুঝেছ?

—ভগবান আশীর্বাদ দান করুন—বলিয়া সর্বাগ্রে পদ্মা গিয়া তুলসী মঞ্চতলে প্রণাম করিল ও ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—প্রফেসর অধিকারী জানেন?

—হ্যাঁ মা—তিনি নিশ্চয় জানেন। আরো সবাই জানবে মা—কাল কাগজে ছাপা হয়ে যাবে—আমার ফটোশুদ্ধ। দেখবে তুমিও। কিন্তু মা—

—কি? বল!—

পদ্মা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল। সে যেন বুঝিয়াছে, কি প্রশ্ন শ্যামল করিবে। শ্যামল বলিল—কাগজে ছাপাবার জন্য প্রফেসর অধিকারী প্রেসের লোককে একটা নোট লেখালেন—

—বেশ তো—কি লেখালেন?

—লেখালেন—"শ্রীমান শ্যামলকুমার রায় এই বৎসর বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান শ্যামল বাংলার এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সন্তান—তাহার প্রাচীন পিতৃবংশের গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়—অতি শৈশবে শ্যামল পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে আজ সে ছাত্রমণ্ডলীতে উচ্চস্থান লাভ করিল—তাহা সংবাই গৌরবময়। আমরা শ্রীমানের দীর্ঘজীবন ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি—"

—বেশ তো লিখেছেন!

—হ্যাঁ—কিন্তু মা—আমি কি সত্যি কোন জমিদারের ছেলে?

—ও নিয়ে আর গর্ব করার কিছু নেই শ্যামল—জমিদারবংশ লুপ্ত আজ। আর জমিদার বংশ বহু সময়েই অত্যাচারী বংশ। জমিদারের ছেলে বলে আজ আর কোন সম্মান কেউ আদায় করতে চায় না শ্যামল। প্রফেসর অধিকারী ওসব একটু বাড়িয়ে লিখেছেন। ও নিয়ে তুই মাথা ঘামাস নে।

—না মা—কিন্তু আমার পিতৃপরিচয় জেনেও তিনি গোপন করলেন কেন?

—কারণ তুই তোর মার ছেলে, তুই বাংলার—ভারতমাতার পুত্র। তোর বাপের পরিচয়ে গৌরবের কিছু নেই খোকন—সে জানবার তোর কোন দরকার নেই।

শ্যামল মাকে উত্তেজিত দেখিয়া আর কিছুই বলিল না। কিন্তু মনে তাহার অদম্য পিপাসা জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা কে? কেমন তিনি—যিনি পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না! কোথায় তাঁহার বাবা!—কিন্তু শ্যামল আর কোন কথা বলিতে চাহে না। একটা কিছু রহস্য তার জন্ম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে, ইহা শ্যামল বহুদিন হইতেই জানে। এতদিন সে নিজেকে 'অরফান' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু 'অরফ্যান' সে নহে। তাহার মা তো আছেই—বাবাও আছেন। এই বস্তিতে মা কি বলিয়া স্বামীর পরিচয় দেয়—শ্যামল জানে। মা বলে তাহার স্বামী আবার বিবাহ করায় পদ্মা চলিয়া আসিয়াছে।

যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না তাহাকে তাহার পুত্রের পিতা বলিয়াও পরিচয় দিতে চাহে না পদ্মা—অনেকে অনেক কিছু ভাবিয়াছিল—কিন্তু সে সব বহু দিনের কথা। উহা লইয়া এখন আর কেহ কোন প্রশ্ন করে না।

—আয়—চা খা।

শ্যামল ফিরিয়া দেখিল, পদ্মা চোখের জলটা আঁচলে মুছিতেছে। শ্যামল বলিল—তোমাকে আমি দুঃখ দিলাম মা। আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কখনো আমি আমার পিতৃপরিচয় জানতে চাইব না। তুমি কেঁদো না মা। আমার পরিচয়েই তোমার পরিচয় হবে। এমন যেন আমি হতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

পদ্মা শ্যামলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা, তাই যেন হয়।

শ্যামল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—আর কোনদিন সে পিতৃপরিচয় জানিতে চাহিবে না।

রাজীবের কলিকাতার বাড়ী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটা বড় ঘড়িতে দেখা যাইতেছে সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। ঘরখানারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাপের প্রত্যেকটি শো-কেশের উপর বড় বড় হরফে লেখা—ভারতীয়—বাংলা, ভারতীয়— মধ্যপ্রদেশ, ভারতীয়—দক্ষিণ প্রদেশ, ভারতীয়—সাঁওতাল পরগণা, ভারতীয়— আসাম—ইত্যাদি। আবার কতকগুলিতে লেখা—চীন, জাপান, তিব্বত, মালয়, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা—ইত্যাদি প্রত্যেক দেশের সাপ ও তাহার কঙ্কাল সেই দেশের লেবেল মারা আলমারীতে রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সাপ যেভাবে স্বাধীন জীবনে জীবন্ত অবস্থায় থাকে—যথাসম্ভব তাহার অনুকরণও ঐ ক্ষুদ্রস্থানে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় টেবিলের যন্ত্রগুলি মাজাঘষা, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোফা ও চেয়ারে সুন্দর সিল্কের আচ্ছাদন পড়িয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে টিপয় এবং টবসমেত ছোট ফুলের গাছ। রাজীবের বসিবার চেয়ারটায় একটা ভাল কুশন এবং সম্মুখে বড় ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল।

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ভদ্রার মৃন্ময়ী মূর্তিটির। উঁচু বেদীর উপর সেটি বসানো হইয়াছে, কোন সময়েই আর আবৃত থাকে না। মূর্তিটি ঘিরিয়া কয়েকটি ফুলের টব পিতলের পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। মীনু কতকগুলি ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে—

(গান)

আমি সন্ধ্যালগনে আপনার মনে
গেঁথেছি মালা, গেঁথেছি মালা।
আকাশের আলো নিবে এলো ধীরে
এই নিরালা—এই নিরালা।

অকস্মাৎ শ্যামল ঢুকিয়া জুতার শব্দ করিল।

মীনু যেন শুনিতে পায় নাই। গান গাহিতেছে—

দলে দলে খেলে সোহাগ-সুবাস
কাজ হারা বুকে জাগে অবকাশ—
হতাশা ঢালা—নিরাশা ঢালা...

শ্যামল পুনরায় শব্দ করিল।

মীনু গাহিয়া চলিয়াছে।

শ্যামল সুর করিয়া বলিল—ওরে ও কালা—কানে কি তালা?

শ্যামল চেয়ারের পিছনে গিয়া হাত দিল।

মীনু বলিল—ও মা কি জ্বালা! বড্ড ইয়ে আপনি যান!

—মিললো না—মিল হলো না. বুদ্ধির ছালা —!

মীনু অকস্মাৎ কৃত্রিম ভয়ে বলিল—স্যার আসছেন—পালা রে পালা।

—কে? কোথায়?

শ্যামল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা টুলে বসিয়া পড়িল সুবোধ ছাত্রের মতো।

—হিঃ হিঃ হিঃ—কেমন জব্দ! মাগো—কি ভীতু আপনি! স্যারের ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত খোঁজেন।

—ভয় করিনে—ভক্তি করি! ভয় আমি কাউকে করিনে!

—আমাকে?

—ওহো থুড়ি, তোমায়—খুবই ভয় করি!

—যাঃ—খোসামুদে কোথাকার!

—না লক্ষ্মীটি, সত্যি ভয় করে তোমায়—বিশ্বাস করো!

শ্যামল মীনুর আঁচলটা ধরিল।

—এই যাঃ, ছুঁয়ে দিলেন যে! এখনো মা'র গলায় মালা দিইনি ; যাই—আবার কাপড় ছাড়তে হবে।

—আমি কি অভাজন যে ছুঁলেই জাত যাবে?

অভাজনদের ছুঁলে মোটেই আমার জাত যায় না, আপনি অপবিত্র।

—কেন?

—কারণ আপনি শুধু শ্যামল। ওর আগে, একটা শ্রীও নেই—পরে একটা বিশ্রী কিছুও নেই। কিন্তু ছাড়ুন কাপড় ছাড়বো—মা'র গলায় মালা দিতে হবে।

পথ আগলাইয়া শ্যামল বলিল—পরে বিশ্রী কিছু তুমি জুড়ে দিও মীনু.আগে কিন্তু আমি একটা শ্রী জুড়ে নেব।

—কি রকম করে?

—মীনা করে!

—যাঃ—ফের দুষ্টুমী! কে-ওখানে?

বাহিরে একটি মনুষ্যমূর্তির ছায়া নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ঢুকিলেন রায় রামেশ্বর রায়বাহাদুর।

রামেশ্বর বলিলেন—এ ভালোই হয়েছে মা মীনু? সুখে থাকো। আমি আজই চলে যাচ্ছি। রায় বাড়ীর দরজা তোমার কাছে খোলাই রইল—যখন ইচ্ছে, যেও। রামেশ্বর-রায়ের সর্বস্ব তোমারই থাকবে।

অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া মীনু বলিল—কী সব বলছো তুমি বাবা! চলো. আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাবো। এখানে আসার জন্য আমার অপরাধ নিও না বাবা. আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমি জানি. তুমিই আমার বাবা। আমায় ভুল বুঝো

না বাবা—আমি তোমাকেই আমার বাবা বলে জানবো। এ বিশ্বাস আমার ভেঙে দিও না তুমি।

মীনু রামেশ্বরের পায়ে ধরিল।

ওঠ মা, তোর বাবা আমি নই। তবে পিতা অর্থে যদি প্রতিপালক হয়, তাহলে আমি হয় তো—কিন্তু থাক সে কথা! আসবার ইচ্ছে ছিলো না এখানে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না তোকে আর একবার দেখবার! তোর এই অভাগা পিতাকে যদি রক্ষা করতে পারিস মীনু—তোর মাতৃহন্তা, তোর জন্মদাতার, মহাশত্রুকে যদি কোনদিন—

ত্বরিতে মীনু বলিল—থামো, বাবা থামো! আমি সইতে পারছি নে। আমি তোমার কাছে যে অগাধ স্নেহ পেয়েছি—তাই আমার সারা জীবন দিয়ে অনুভব করবো বাবা? তুমিই আমার বাবা—তুমিই—বাবা আমার!

—আচ্ছা মা, আশীর্বাদ করি, সুখী হ'। রাজীব তোকে এখন ছাড়বে না। থাক কিছুদিন। আমি আসবো আবার। তোকে নিয়ে যাব...

রামেশ্বর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজীব প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—যেও না হে রামেশ্বর—দাঁড়াও!

—থাক—রাজীব! দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করা তোমার মত মহান্ ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশা করিনে!

—দুর্ভাগা তুমি নও রামেশ্বর! তুমিই চির-বিজয়ী হয়ে রইলে। ভাগ্যদেবী চিরদিনই তোমার অনুকূলে। নইলে ভদ্রা যাকে চোখের কোণেও দেখেনি, ভদ্রার মেয়ে তারই পুত্রকে আত্মদান করবে কেন?

—ও কথা থাক রাজীব! ভদ্রার মেয়ের উপর পিতার অধিকার তুমি গ্রহণ কর—আমি নিঃসন্তানই থাকতে চাই।

—সন্তান থাকতেও!

—না! সন্তান আছে বলে স্বীকার করিনে আমি আর।

শ্যামল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। বিস্মিত সে কম হয় নাই। রাজীব তাহাকে বলিলেন—শ্যামল—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় তোমার জন্মদাতা পিতা। প্রণাম কর!

—না—না রাজীব—না। আমি অপুত্রক—আমি অন্য কারো বাবা নই। আমার মীনুই রইল—যদি বাবা কারো হই তো ঐ মীনুর। না, আর কারো বাবা হবার যোগ্য নই আমি। আমি ব্যভিচারী লম্পট...

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। শ্যামল পথ আগুলিয়া পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল—বাবা! এই মুহূর্তে জানলাম আপনিই আমার জন্মদাতা পিতা।

—না-না-না—আমি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান—যাও—

—হোন, তাতে আমার কি! আমার তো বাবা।

রামেশ্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ যেন স্নেহের সমুদ্র তাঁহার অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। হিমালয় গলিয়া পড়িতেছে নাকি। তথাপি কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন—ছাড়ো! পথ ছাড়ো হে ছোকরা—ছাড়ো!

শ্যামল তাঁহার পায়ের উপর দু'হাত রাখিয়া বলিল—কে আপনি—কি আপনি—আমার জানবার আর কিছুই দরকার নেই বাবা, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার নেই

আমার! আমি আজ জানলাম, আপনি আমার বাবা—এই আমার সৌভাগ্য! আমাকে স্বীকার না করেন ক্ষতি নেই। আমি স্বীকার করতে তো বাধ্য—বাবা—আপন জন্মদাতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আপনার যদি অসুবিধা হয়, থাক্। আমার পিতৃ-পরিচয় গোপনই থাকবে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক থাকেন—আমিও তাদের একজন হয়ে রইলাম। তবু আজ জানলাম আমার বাবা রামেশ্বর রায়! এই আমার সৌভাগ্য! যান—আর কিছু আমার বলবার নেই...প্রণাম।

শ্যামল পথ ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছিলেন—অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ছুটিয়া গিয়া মীনুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং রাজীবকে বলিলেন—আমার ছেলে নেই—মেয়ে আছে রাজীব! ছেলে তোমার।

তুমিই তার বাপের কাজ করেছ। রাজীব, শীগ্‌গির আয়োজন কর—আমার মেয়ে মীনুর সঙ্গে তোমার ছেলে শ্যামলের বিয়ে। খুব শীগ্‌গির—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি রাজীব—বুঝেছি. পৃথিবীতে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, শুধু আছে নয়—জীবন্ত, জাগ্রত, মূর্ত হয়ে আছে, বজ্রের চেয়ে কঠোর হয়ে আছে—নিয়তির চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে আছে। রাজীব! কথা বলছো না যে? আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে কি হতে পারে না রাজীব?

—তুমিই জিতলে হে রামেশ্বর—তুমিই জিতে গেলে।

রাজীব ধীরে ধীরে মীনুর গাঁথা মালাটি ভদ্রার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং পদ প্রান্তে মালা রাখিয়া বলিলেন—মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিলাম রাঙায়ে—।

স্বাক্ষর

আশার বিয়ের বয়স হোল...

বাপের অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু মেয়েকে ভাল করে শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা এবং সাংসারিক কাজে নিপুণা করতেই মেয়ের বয়স উনিশ পার হয়ে গেল। কলেজে পড়েনি আশা ; কিন্তু বাড়ীতে যা পড়েছে, কলেজে তা পড়ানো হয় না। বিশেষ করে বাপের কাছ থেকে যন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীত সে আয়ত্ত করেছে খুবই ভালভাবে। দৈহিক সৌন্দর্যও যথেষ্ট তার। এরকম মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনার কিছু নেই, তবু আশার বিয়ে আটকে রয়েছে।

বিয়ের ব্যাপারে আশার কোনো ব্যস্ততা নেই, এমন কি কোনো মতামতও নেই ওর ; বাবা যখন দেবেন তখন হবে বিয়ে, এবং যার সঙ্গে দেবেন তারই সঙ্গে আশা জীবনের পথে চলে যাবে—এই ওর মত। প্রাচীন পরিবারের কন্যা,—এতোটা লেখাপড়া শিখে এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী হয়েও আশা আধুনিকা হোল না। শহরতলীর নির্জ্জনতা এবং সহরের সবরকম সুবিধায় ও বাস করে। বিজলী-আলোর সঙ্গে রেডিওর গান ওর পাঠকক্ষকে পরিপূর্ণ রাখে, বিলিতী মরশুমী ফুলও ওর বাগানে প্রচুর—তবু আশা ধূপ দীপ জ্বালে যথারীতি। বাদ্যযন্ত্রকে দুবেলা প্রণাম করে শ্বেতপুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে। ওর মা-বাবা দেখেন আর হাসেন ; বলেন,

—মেয়েটা সেকেলে হয়েই রইল!

কিন্তু বিয়ে এবার দিতে হবে—বাবা তাই ভাবছেন, রবিবারের খবরের কাগজগুলোতে বিয়ের বিজ্ঞাপন পড়ছেন ক'দিন থেকে, কিন্তু পছন্দমতো বর পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ সেদিন নজরে পড়লো : "পাত্রী চাই—বয়স্থা, সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। সঙ্গীতজ্ঞা হইলে ভাল হয়। পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ছাত্র। বৈজ্ঞানিক। নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে গবেষণারত। আয় লক্ষ টাকারও অধিক। কলিকাতায় বাড়ী ও গাড়ী আছে। অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন। ঠিকানা—শ্রীঅরুন্ধতী আচার্য, ১৬ সূর্য্য সাহা লেন, কলিকাতা।"

'চমৎকার হবে'! কথাটা ভাবতেই আশার বাবার মনে কেমন যেন উত্তেজনা জেগে উঠলো। ছেলে বৈজ্ঞানিক, মেয়ে সঙ্গীতজ্ঞা—আর্টের পূজারী—বাঃ, এই তো রাজযোটক মিল। কোষ্ঠীর মিলের আর কি দরকার।

চাদরখানা গলায় ফেলে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন সূর্য্য সাহা লেনে। কিন্তু ভাবতে লাগলেন পথে—বছরে লক্ষ টাকা আয়, তার ঘরে মেয়ে দেবার মতো কী সম্বল ওঁর আছে? গিয়ে মিছে হাস্যাস্পদ হওয়া। কিন্তু বেরিয়েছেন যখন—যা হয় হবে, যাওয়াই যাক্ না একবার। আশার একখানা ফটোও সঙ্গে নিয়েছেন উনি। একবার সেটা দেখলেন, তার পর বাসে চড়ে বসলেন।

সকাল ন'টা—সূর্য্য সাহা লেনের তিনতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরে গেল ভদ্রলোকের!

বাড়ী নয়—প্রাসাদ। বিঘে আড়াই জমিতে বাড়ী, বাগান, আর ল্যাবরেটরী রয়েছে ওপাশে! বর্তমান যুগে কলকাতা শহরে যখন এককাঠা জমির দাম কয়েক হাজার টাকা, তখন এতখানি জমি নিয়ে কেউ বাস করে, জানতেন না উনি। ঢুকবেন কিনা ভাবছেন— গেটের দারোয়ান শুধুলো,

—কিস্‌কো মাংতা, বাবু?

—অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই...

—যাইয়ে ভিতর...দারোয়ান আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল ভিতরটা।

আশার বাবা বিরাট এই বাড়ী আর বাইরে বন্দুকধারী দারোয়ান দেখেই ঘাবড়ে গেছেন। এখানে কি করে তাঁর মতো লোক মেয়ের বিয়ের জন্য ঢুকবেন! কিন্তু দারোয়ান আবার বলল,

—যাইয়ে, বাবুসাব্‌!

চলেই এলেন আশার বাবা। বসবার ঘরখানা যেন সেকালের রাজা-মহারাজার দরবার। এতবড় তার আকার আর এতো আসবাব যে, ঘণ্টাখানেক ধরে সেগুলো দেখা চলে। এখানে কী আশা করতে পারেন আশার বাবা? তাঁর দৌড় বড়ো পাঁচ-সাত হাজার টাকা। এখানে মেয়ে দিতে হলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার দরকার। ফিরেই আসবেন ভাবছেন—হঠাৎ বৃদ্ধা একজন ঝি এসে বলল,

—কাকে চাইছেন, বাবু?

—অরুন্ধতী দেবী আছেন?

—হ্যাঁ। কি দরকার?

—আমি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। যদি একবার দেখা হয় তাঁর সঙ্গে তো...

—বসুন বসুন। মা পূজোর ঘরে আছেন। আমি খবর দিচ্ছি।

ঝি চলে গেল। আশার বাবা প্রকাণ্ড চেয়ারটার গদীতে বসে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাতে গিয়েই থেমে গেলেন—নাঃ, বিড়ি এ বাড়ীতে মানাবে না। এখানে সিগারেটও মানায় না। এখানে মানায় গোলাপজল-ভরা রূপার ফরসী যার লম্বা নলে মালতী ফুলের মালা জড়ানো থাকবে—যে নলের মুখ হবে সোনায় বাঁধানো...

পুঁথিতে-পড়া নবাবী আমলের বৈঠক-বিলাসের কথাই মনে পড়ছে ওঁর। কিন্তু বাড়ীটা এতো নির্জ্জন যে সহনাতীত হয়ে উঠছে ক্রমশ। কেউ যেন কোথাও নেই—যেন পরিত্যক্ত নবাবী প্রাসাদ! গলির মধ্যে বাড়ী, তাই শহরের গোলমাল এখানে প্রবেশ করে কম—দূরে কোথায় একটা পাখী ডাকছে, তার কণ্ঠে যা একটু জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। দীর্ঘক্ষণ বসে বসে ভাবছেন,—এখান থেকে তাঁর চলেই যাওয়া উচিত।

কিন্তু যেতে হোল না। এক মহিলা প্রবেশ করলেন—প্রৌঢ়া, কিন্তু এখনো তাকিয়ে দেখবার মতো রূপৈশ্বর্য্য তাঁর। নমস্কার জানিয়ে বললেন,

—আপনারই তো মেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন তার ফটো...পকেট থেকে ফটোখানা বার করে দিলেন। পাঁচ মিনিট ধরে দেখলেন মহিলাটি ঐ ফটোখানা, তার পর বললেন,

—ফটো দেখে ঠিক 'সুন্দরী' বোঝা যায় না। কী নাম আপনার মেয়ের?

—আশালতা।

—লেখাপড়া? গান-বাজনা?

—ইংরাজি-বাংলা-সংস্কৃত বাড়ীতেই পড়েছে। গান আমি শিখিয়েছি। নাচ জানে না, বাজাতে পারে ভালই। দেখলে আপনি অপছন্দ করবেন না।

—চলুন, দেখে আসি। ঝি, গাড়ী আনতে বল তো?—একটু জল খান—বলে ঝির হাত থেকে মিষ্টির থালা নিয়ে এগিয়ে দিলেন উনি। রূপার থালায় ফল-মিষ্টান্ন—রূপার গেলাসে জল।

—দেখুন, আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি। এতবড় বাড়ীতে মেয়ে দেবার মতো কোনো সম্বল আমার নেই। যদি দয়া করে তাকে গ্রহণ করেন...

—আমি ছেলের জন্য বৌ চাইছি, আর চাইছি আমার একটা সঙ্গী!—দয়ার কোনো কথা ওঠে না। ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক তো আমি হতে চাইনে? আপনার মেয়েকে পছন্দ হলেই নিয়ে আসবো। জল খান। আজ দিন ভাল, আমি আজই মেয়ে দেখতে চাই।

—ছেলেটি কি করে?

—গবেষণা করে। ঐ ওখানে আছে।—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝিকে ইঙ্গিত করলেন। ঝি বার হয়ে গেল। আশার বাবা জল খেতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তিনি ভাবছেন, এ বাড়ীতে মেয়ে দেওয়ার আশা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। তবু দুরাশাও তো মানুষ করে! দেখাই যাক্ না, আশার বরাতে কী আছে।

জলযোগ শেষ হওয়ার আগেই দুজন যুবক এসে দাঁড়ালো ঘরে।

—আমায় ডাকছো, মা,?—বলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়েই চুপ হয়ে গেল। দুটি ছেলে, দুজনেরই পরণে বৈজ্ঞানিকের অ্যাপ্রন। বেশ বোঝা যায়, কাজ করতে করতে মা'র আহ্বানে উঠে এসেছে। মা হাতের ফটোখানা ওদের একজনের হাতে দিয়ে বললেন,

—দেখ বাবা নীতীশ, তোদের পছন্দ হয়?

ছেলেটি দেখতে লাগলো ফটোখানা।

মহিলাটি বললেন আশার বাবাকে দেখিয়ে,

—ইনি এসেছেন মেয়ের বিয়ের জন্য। আমি এখুনি দেখতে যাচ্ছি। যদি পছন্দ হয় তো আশীর্বাদ করেই আসবো।—আশার বাবাকে বললেন,

—এই আমার একমাত্র ছেলে আশিস। সাত-বছরে বাপহারা, পঁচিশ বছরের হোল। এই দীর্ঘকাল ওকে বুকে করে মানুষ করেছি। আর আমি পারি না একা থাকতে। এবার ওর বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে আমায় মানুষ আনতে হবে ; বৌ—ছেলে— মেয়ে...দেখুন আমার ছেলেকে।

দেখবেন কি! 'হাঁ' করে রয়েছেন আশার বাবা। ছেলে তো নয়, রাজপুত্র বললে খুব বেশী কি আর বলা হয়? আশার কি এমন ভাগ্য হবে! কিছুই বলতে পারছেন না আশার বাবা। দুটি ছেলেই সুন্দর, তবে ফটো যে দেখছে তার থেকে অন্যটি অনেক বেশী সুন্দর—সেই-ই পাত্র!

—আপনার ছেলে পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ—এতো ভাগ্যি যদি আমার মেয়ের হয়।

—আচ্ছা, চলুন তাহলে—দেখে আসি তাকে।—তোর কী মত, আশিস?

—আমার সম্বন্ধে তোমার মতই শেষ মত, মা...ওর পর আর কারও মত নেই।

—আপনি নিজেই যাবেন?—আশার বাবা শুধুলো।

—নিশ্চয়, একি বাজারের বাক্স-কেনার কথা! বউ পছন্দ করতে হবে—নিজেই যাব—আশার বাবা বুঝলেন, পরীক্ষাটা খুবই কড়া হবে আশার।

আশিস প্রণাম করলো মাকে, তারপর আশার বাবাকে। অসাধারণ মাতৃভক্ত সন্তান। এক মুহূর্তে পছন্দ হয়ে গেল আশার বাবার। কিন্তু কে জানে, ইনি আশাকে পছন্দ করবেন কি না! গাড়ীতে যেতে যেতে ভদ্রলোক ভাবছিলেন হঠাৎ ইনি মেয়ে দেখতে যাচ্ছে—কে জানে,—কী অবস্থায় এখন আছে আশা! হয়তো কাপড়ে সাবান দিচ্ছে, না-হয় রান্নার কালিঝুলি মেখে কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে আছে। ইনি মহিলা—সটান নিশ্চয় অন্দরে ঢুকে যাবেন। একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে যে মেয়ে দেখাবেন, তার অবসর পাবেন না ভদ্রলোক। এমন করে এত তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখতে আসছেন কেন তিনি?—প্রশ্নটা করবেন কিনা ভাবছেন। কিন্তু মহিলাটিই বললেন,

—এভাবে আমি কেন মেয়ে দেখতে যাচ্ছি ভেবে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। কিন্তু শুনুন, সাধারণভাবে আমি অনেকগুলো মেয়েই দেখলাম—কাউকে আমার পছন্দ হোল না। ওতে মেয়ের রূপ দেখা যায়, তার গুণের ফিরিস্তি শোনা যায়—কিন্তু অন্তর চেনা যায় না। আকস্মিকভাবে আমি আমার 'ঘরের লক্ষ্মী'কে দেখতে চাই—যার অন্তরের ঐশ্বর্য্য আমার শূন্য ঘরখানা পূর্ণ করবে...একটু থেমে বললেন,—আমি কে, কেন এসেছি আপনি কিছু বলবেন না, এই অনুরোধ!

আশার বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, কিন্তু তিনি চিন্তায় বিশেষ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। অবস্থা খারাপ না হলেও বড়লোক তিনি নন ; আশাকে গৃহের বহু কাজ করতে হয় তার মা'র সঙ্গে। কে জানে, এখন কেমন অবস্থায় আছে সে!

গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াতেই নিজের হাতে দরজা খুলে ভদ্রমহিলা নেমে সটান ঢুকে গেলেন ভিতরে। আশার বাবা তখনো গাড়ীতে বসে।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আশা শীলের উপর সর্ষে বাটছে—আধময়লা শাড়ী, ভিজে চুল লুটোচ্ছে মাটিতে, মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু, ক্লান্তিতে মুখখানা লাল—ভদ্রমহিলা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন। আশা তখনো দেখেনি। অকস্মাৎ চোখ তুলেই অবাক হয়ে গেল আশা, কিন্তু ওর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ওকে সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ—বাবা গেছেন কোথায় পাত্রের খোঁজে—নিশ্চয় ইনি সেই পাত্রের কেউ হবেন! কারণ বাবাও তো ফিরলেন মনে হচ্ছে। বাটনাটা চট্ করে একপাশে টেনে রেখে আশা উঠে চলে এল। নতজানু হয়ে প্রণাম করলো মহিলার চরণে! মহিলাটি বললেন,

—আমি কে, কী জাত, কিছু না-জেনেই যে প্রণাম করলে?

—আপনি 'মা'! মার আবার জাত কি, মা! মা'র থেকে বড় কি জাত আছে?—আশার ভিজে চুলগুলো লুটিয়ে পড়ছে ওঁর পায়ে। যেন পা-দুখানা মুছে দিচ্ছে।

আশা বলল,—বসুন, মা।

—কোথায় বসবো?

—যেখানে আপনার ইচ্ছে, মা—

—আমি লক্ষপতির মা—আমাকে তুই বসবার জায়গা দিতে পারবি?

—হ্যাঁ, মা! আপনি লক্ষপতির ঘরে সিংহাসনে বসেন—আমার ভাঙাঘরে কাঠের

পিঁড়িতেও বসবেন। নইলে আপনি 'মা' হবেন কেন?

—সাবাস! চল দেখি, তুই কি রান্না করছিস্—

—ডাল-ভাত-সুক্ত হয়েছে, মা—এবার পোস্তর বড়ার অম্বল বাঁধবো—বাবা খেতে ভালবাসন...আসুন!—আশা এগিয়ে এল ওঁর বসবার ঠাঁই করবার জন্য।

—আমি কি খেতে ভালবাসি, বল তো?

আশা আধমিনিট চুপ করে ভাবলো, তারপর হেসে বলল,

—মেয়ে আপনাকে যা দেবে তাই আপনি ভালবাসবেন। আপনি যে 'মা'।

—দেখি তোর মুখখানা তোল তো—বলে নিজেই উনি আশার মুখখানা ধরে দেখলেন কিছুক্ষণ। সস্নেহে চুমু দিয়ে বললেন,

—ভেবেছিলাম, তোকে অনেক করে দেখবো, অনেক প্রশ্ন করবো, কিছু যে করতে দিলি নে? কে জানে, তোর সঙ্গে কত জন্মের সম্বন্ধ! আয়, আরো কাছে আয় মা—কোলে জড়িয়ে ধরলেন আশাকে।

আশার মা ইতিমধ্যে স্বামীর কাছে সংবাদ শুনে শাঁখ বাজিয়ে দিলেন। গলার মোটা হারটা খুলে পরিয়ে দিলেন অরুন্ধতী দেবী আশার শুভ্র-সুন্দর কণ্ঠে।

নিস্তব্ধ বাড়ীখানা লোক-লস্করে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো—বিয়ে। কিন্তু যার বিয়ে সে ল্যাবরেটরীতেই দিন গুজরান করে। মা সব ব্যবস্থাই করছেন। যথারীতি রসুনচৌকী থেকে মোটর-সাজানো এবং আলো জ্বালা ঠিক-ই হোল—যথাকালে বিয়ে করতে গেল ছেলে পাড়ার এবং পরিচিত আত্মীয়দের বরযাত্রী করে! বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরে বলল,

—এবার খুসী তো, মা? তোমার সঙ্গী তুমিই বেছে এনেছ। আমাকে এবার গবেষণাটা শেষ করতে দাও!

—বিয়ের একটা দায়িত্ব আছে, জানিস?—মা হেসে বললেন,—তোর গবেষণার থেকে সেটা অনেক বড় দায়িত্ব। যার সারা জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের ভার নিলি, তাকে দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, মা! নিশ্চয়। কিন্তু আপাতত তোমার শ্রীচরণেই সে-ভার অর্পণ করে আমি দিনকতক ছুটি চাই পড়াশুনো করতে।

—তোর পড়াশুনায় কেউ বাধা দিচ্ছে না, আশিস, কিন্তু কর্তব্য, বিশেষ পত্নীর প্রতি কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়।

—হবে না, মা—কিন্তু মাসখানেক সময় দাও। আসছে মাসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমার 'থিসিস' দাখিল কববার দিন! ওটা প্রায় শেষ করে এনেছি। দিন-পনেরর মধ্যে হয়ে যাবে। বলে মা'র চরণে আবার প্রণাম জানিয়ে ছেলে গিয়ে ঢুকলো ল্যাবরেটরীর ঘরে।

আশা তখন তিনতলার সাজানো ঘরখানায় বসে প্রতিবেশিনী সখীদের সঙ্গে প্রথম আলাপ করছে। 'বৌ কেমন হয়েছে?'—প্রশ্নের উত্তরে সকলেই একবাক্যে বলল—'চমৎকার'। আশিসদার উপযুক্ত বৌ হয়েছে, একথা রাষ্ট্র হয়ে গেল পাড়াতে। বৌভাতের বিরাট আয়োজনে বিস্তর উপহার লাভ করলো আশা—বই থেকে বাক্স ভর্ত্তি অলঙ্কার পর্যন্ত। শাশুড়ী স্বয়ং যে চন্দ্রহারখানি দিয়েছেন, তার ওজন ছত্রিশ ভরি। আশা দেখছে আর ভাবছে, এতো সৌভাগ্য তার কোথায় লুকিয়ে ছিল! রাজপ্রাসাদে এসে সে-

যে একেবারে রাণী হয়ে বসলো। নতুন একখানা মোটর কিনে দিয়েছেন শাশুড়ী, ঐ গাড়ীতেই বৌ নিয়ে এসেছে আশিস! এখনো ওর ফুলে-গড়া হংসমূর্তি খোলা হয়নি—দেখছিল আশা শোবার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বাড়ী আর ল্যাবরেটরীর মাঝে শ'খানেক গজ ব্যবধান—বাগান, মাঝে রাস্তা—কেয়ারী করা ফুলগাছ—মাধবীলতায় অজস্র পুষ্পস্তবক! চাঁপা গাছটায় সহস্র কুঁড়ি এসেছে—ফুটেছেও দু'চারটে। মনোরম পরিবেশ। আশার আনন্দে গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নতুন বধূ সে, যখন-তখন গান গাওয়া উচিৎ হবে না।

স্বামীকে কিন্তু ভাল করে এখনো দেখেনি আশা। আজ দেখবে। আজই ফুল শয্যা। সবাই তো বলল, চমৎকার বর হয়েছে আশার। চমৎকার নিশ্চয়ই হবে, নইলে বাবা এখানে বিয়ে দিতেন না। বাবার পছন্দের ওপর আশার অগাধ বিশ্বাস। তবু নিজের বরকে নিজে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না।

কী মধুর উৎকণ্ঠা! কখন সে আসবে, তার আশায় জাগর-ক্লান্ত আঁখিতে জানালাপানে চেয়ে থাকা—আশার উনিশ বছরের জীবনে এমন মধুর-বেদনা কখনো আসেনি। কিন্তু রাত বাড়ছে। সখীরা পর পর তিনখানা গান ওকে গাইয়ে তবে ছাড়লো, অথচ যাকে শোনাবার জন্য তার কণ্ঠে আজ গান ঝরছে—সে এল না। শেষে সখীরা খবর দিলো। উত্তরে আশিস বলে পাঠালো যে তার যেতে দেরী হবে। অবশেষে যে-যার বাড়ী চলে গেল প্রতিবেশিনীগণ। আশা একা। হাতের বীণাটায় মাথা রেখে চোখ বুজলো...ঘুমিয়ে গেল আশা!

উঠে দেখে বেলা হয়ে গেছে। কে জানে স্বামী এসেছিল কিনা! এসেছিল যদি তো ওকে জাগায়নি কেন? শোফাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল আশা—কেউ যে ওকে ছুঁয়েছে, এমন তো মনে হয় না? কপালের চন্দন, গলার মালা, চুলের খোঁপা ঠিকই তো রয়েছে! এক কাতেই ঘুমিয়েছিল আশা। আসেনি তা'হলে? আশ্চর্য্য তো! কিন্তু কে জানে, হয়তো এসে ওকে ঘুমন্ত দেখে ডাক দেয়নি!...ভাবতে ভাবতে আশা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিরাট বাড়ীটায় তখনো আত্মীয়স্বজন রয়েছেন দু'চারজন! শাশুড়ী সস্নেহে বললেন,—স্নানটা সেরে নে, মা—তোর আবার সকালেই নাওয়া অভ্যাস।

আশা নীরবে চলে গেল স্নানাগারে। ওর অপরূপ দেহসুষমার সঙ্গে নিঃশব্দে আদেশ-পালনের মধুর ভঙ্গী যে দেখলো, সেই বলল,—যেমন মাতৃভক্ত ছেলে, তেমন বৌ হয়েছে! ভাগ্যবতী মা তুমি!

স্নান করে বেরিয়ে আসতে শাশুড়ী চা-জলখাবার এগিয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু আশা বলল,—আপনার পূজার ঘরে আগে যাব, মা!

—আয়—সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আশাকে। ঠাকুরকে প্রণাম করলো আশা। শ্বশুরের ফটোতে মালা দিল। তার পর শাশুড়ীকে প্রণাম করলো আঁচল দিয়ে। বলল,

—আশীর্বাদ করুন, আপনাদের সেবায় যেন ত্রুটি না করি!

—চিরায়ুষ্মতী হও, মা!—শাশুড়ী ওর ললাটে চুম্বন করলেন। পুত্র-গর্বের সঙ্গে বধূর গৌরবে সর্বাঙ্গ ঝলমল করে উঠলো তাঁর। বললেন,

—সাত বছরের আশিসকে আমি পঁচিশ-বছরেব করেছি, মা আশা, আজ থেকে ওর

সব ভার তোর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ও নির্দোষ নিরীহ ছেলে আমার—আপনভোলা বৈজ্ঞানিক! ওর সাধনার রাজ্যে ও একা। ওকে সঙ্গ দিস—ওর সঙ্গিনী হোস—আর একটু থেমে বললেন,—বাড়ীটা বড় নিঝুম হয়ে আছে বহুদিন, তুই যেন শিগ্রি দু'একটা ছেলেমেয়ে এনে আমার ঘর ভর্তি করতে পারিস...

আশা আবার ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পদধূলি নিল! প্রণামের এতোটা বাড়াবাড়ি বর্তমান যুগে প্রচলিত নেই। বিশেষত কলকাতা শহরে। কিন্তু শাশুড়ী খুশী হচ্ছিলেন। ওকে টেনে তুলে বললেন,

—আশিস চা খেয়ে গেছে। আয়, তোকে খেতে দিই—বলেই আবার বললেন,—আজই আমি দিচ্ছি তোকে, এর পর তুই-ই আমার আশিষকে, আমাকে—আমার সকলকে খাওয়াবি, মা! এই নে চাবি—বলেই আঁচলের খুঁট থেকে চাবির গোছাটা খুলে দিলেন আশার হাতে।

আশা কপালে ঠেকালো চাবিগোছা। শাশুড়ী হেসে বললেন,

—চাবির গোছাকেও তুই প্রণাম করিস আশা!

—এ তো শুধু চাবি নয় মা, আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য্য—আশীর্বাদ! এর মর্য্যাদা যেন রাখতে পারি আমি—

আনন্দে শাশুড়ীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ভাবলেন, এমন সুন্দর বৌ হয়েছে—যদি আজ আশিসের বাবা থাকতেন।

আঁচলে চোখ মুছে তিনি বধূর হাত ধরে খাবার-ঘরে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু আশা জেনেছে আশিস রাত্রে এসেছিল। সকালে চা খেয়ে আবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকেছে গিয়ে। রাত্রে কেন সে ডাকেনি আশাকে? ডাকলে কি এমন ক্ষতি হোত? ফুলশয্যার দিনে সব স্বামীই তো বৌকে ডেকে কথা বলে। ইনি এমন কি যে, একবার ডাকলেন না! অভিমানটা গুমরে উঠবার আগেই কিন্তু আশার মনে হোল, সে ঘুমালো কেন? তারও কি জেগে থাকা উচিত ছিল না? স্বামীর প্রতি অভিমান করতে গিয়ে আশার নিজের উপর রাগ হয়ে উঠলো। ঘুমিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে আশার। আর আশার ঘুম কিছু বেশী। হয়তো তিনি ডেকেছিলেন, আশা জাগেনি...হয়তো ঘুমন্ত আশার মনেই ছিল না যে—আজ তার ফুলবাসর।

প্রাতঃরাশ শেষ করে আশা আবার নিজের ঘরে যেতে যেতে ভাবল—স্বামী সত্যি এসে পালঙ্কে শুয়েছিলেন কি না, বিছানাটা পরীক্ষা করে সে জানবে। সকালে লোকলজ্জার ভয়ে, ও তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে এসেছে। কিন্তু উপরে গিয়া আশা দেখলো—তার জন্য নব-নিযুক্তা ঝি পালঙ্কের বিছানা তুলে ঝেড়ে আবার পেতে দিয়েছে। ঘর ঝাট দিয়ে ফুলপাতাগুলোও সরিয়ে ফেলেছে। রাত্রের কোন চিহ্নই নেই সে-ঘরে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে একঝলক হাওয়া আশার কানে কানে নিরাশার বাণী ক'যে গেল! নাঃ, কিছুই বোঝা গেল না। জীবনের পরম শুভক্ষণটিকে এমন করে ব্যর্থ হতে দেখার দুঃখ ওর তরুণ মনে পাথরের মতো বাজছে। চোখদুটিতে সে-ব্যথার প্রকাশ যে-কেউ দেখলেই বুঝবে—কিন্তু ঘরে কেউ নেই এখন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আশা দূরে ল্যাবরেটরীটা দেখতে লাগল। একতলা ঘর—লম্বা হল্, তাতে কয়েকটা যন্ত্রপাতিও কিঞ্চিৎ দেখা যায় জানালা পথে ; ঘরের মানুষটিকে দেখা যায় না। কে জানে কিসের গবেষণা উনি করেন!

আশা বিস্তর পড়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বাড়ীতে। বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে ওর পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে। অবশ্য বিজ্ঞানের কোনো খোঁজই যে সে রাখে না, তা নয়। তবে সে খবর সংবাদপত্রের প্রবন্ধ মারফত। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকের সম্মান সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে নিজে বিজ্ঞানের কিছুই সে জানে না। বৈজ্ঞানিক স্বামীকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার কোনো যোগ্যতাই নেই আশার। কেন যে উনি আশাকে বিয়ে করলেন! কোনো বিজ্ঞানের ছাত্রীকে বিয়ে করলেই ভাল হোত। আজকাল তার অভাব তো নেই। কিন্তু ভাবতেই মনে পড়লো—স্বামী ওকে নির্বাচন করেননি, নির্বাচন করেছেন শাশুড়ী। কে জানে, আশার অদৃষ্টে কী আছে।

করুণ-কোমল চোখদুটি ঘরের দিকে ফেরাতেই আশা দেখতে পেল, যে শোফাটায় সে ঘুমিয়ে ছিল, তারই হাতার উপর ঝক্‌ঝক্ করছে সোনা-ব্যান্ড-শুদ্ধ একটা রিস্টওয়াচ। পুরুষের রিস্টওয়াচ। হ্যাঁ, আশার বাবাই দিয়েছেন এটা জামাইকে। আশা ত্বরিতে এসে ঘড়িটা তুলে দেখলো। পৌনে তিনটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে! তাহলে এসেছিল, আশার পাশেই বসেছিল ঐ শোফাতে—ঘুমন্ত আশাকে দু'হাতে জড়িয়ে...হ্যাঁ, মনে পড়েছে আশার, এতক্ষণে মনে পড়েছে—ঘুমন্ত আশার ললাটে কে যেন নিবিড় স্নেহে চুম্বন করেছে। কপালটা ছুঁয়ে দেখলো আশা—স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে এখনো। আশা বেশ বুঝতে পারলো—কাঁটা-ঘুরোবার কলটা টেনে রেখে, ঘড়িটা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পৌঁনে-তিনটার সময়। এই কাজ ওরই, ঐ বৈজ্ঞানিকের বিচিত্র বুদ্ধি। আশা ঘড়ির মাথাটা ঠেলে দিতেই সেটা আবার চলতে আরম্ভ করলো। পৌনে তিনটার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে ঘড়িতে!...মধুর হাসির সঙ্গে ওর চোখ ছেপে জল গড়িয়ে পড়ল ঘড়িটার উপর। ব্যান্ড-শুদ্ধ ঘড়িটা আশা সীমন্তে ছোঁয়ালো।

না, ব্যর্থ হয়নি। বিফল হয়নি তার ফুল-রজনী। আশার বেশ মনে পড়ছে—ওকে ডাক দিয়েছিল সে। ঘুমের ঘোরে আশা কী বলেছিল মনে নেই। কিন্তু এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে, সে ওর মাথাটা বুকে নিয়েই ওখানে বসে ছিল। স্বপ্ন নয়, সত্যিই!

আনন্দ যেন ডানা মেলে উড়তে চাইছে আশার বুকে! চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে খানিক ঘুরলো সে। এ-ঘরে এসে বড় অর্গানটার চাবি টিপে বাজলো আধ মিনিট, ওঘরে গিয়ে রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে একটা ফরাসী গৎ শুনলো সিকি মিনিট—তার পর মনে পড়ল, শাশুড়ীর কাছে যাওয়া দরকার।

ওর জন্য নিযুক্ত ঝি কাছে-কাছেই আছে, ডাকলেই আসবে। কিন্তু আশা কাউকে ডাকলো না ; আপন আনন্দে বারান্দার ফুলের টবগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ফুলগুলোকে আদর করে নীচে নেমে এল। শাশুড়ী কয়েকটি আত্মীয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বললেন,—এঁদের একটা গান শুনিয়ে দে তো, মা! ওঁরা বলছেন, কাল রাত্রে তোর গান শুনে নাকি ভুলতে পারছেন না।—হাসলেন শাশুড়ী। আশা ঝিকে ইঙ্গিত করলো যন্ত্র আনতে। যন্ত্র এলে আশা গাইতে আরম্ভ করলো শ্যামাসঙ্গীত—

"আর কিছু ধন নাই মা, শ্যামা, কেবল দুটি চরণ রাঙা..."

অপরূপ কণ্ঠ ওর! ভক্তি-সজল হৃদয়ে শুনলেন সকলে।

সংসারটা অন্য সব দিক দিয়েই ভাল। অভাব নেই, অশান্তি নেই। আদর-সোহাগ শাশুড়ীর কাছ থেকে অজস্র পাচ্ছে আশা। ওর জন্য নিযুক্ত ঝি-ও বেশ ভাল মেয়ে।

ভদ্রঘরের দুঃস্থা কন্যা, বালবিধবা। স্বল্প শিক্ষিতা। আশাকে নানা কাজে সে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু...

বড় একটা 'কিন্তু' থেকে গেছে আশার বিশেষ স্থানটিতেই। পুরো পাঁচটি দিন শ্বশুরবাড়ী ক'রে আশা বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ী এল দু'চার দিনের জন্য। কিন্তু মনে মনে সে ভেবে রেখেছে মাস-দুই যাবে না শ্বশুরবাড়ী। স্বামীর গবেষণাটা শেষ হোক। সে যখন নিজে এসে নিয়ে যাবে তখন যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। ওর বাল্য-সঙ্গিনীরা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে—'বরকে কেমন লেগেছে,' কী কী কথা হোল তার সঙ্গে ; কবে ওর নামে বরের চিঠি আসবে...' ইত্যাদি। বানিয়ে গল্প আর কত বলা যায়! বিরক্ত হয়ে আশা তৃতীয় দিনেই শাশুড়ীকে চিঠি লিখে দিল, 'আপনার সেবায় ত্রুটি হচ্ছে মা—আমায় নিয়ে যান।' সেইদিনই শাশুড়ী গাড়ী আর বুড়ো দারোয়ান পাঠিয়ে ওকে বাড়ী নিয়ে এলেন। আশা আবার এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন আসবে স্বামী তার ঘরে।

না! ঐ ল্যাবরেটারীতেই আস্তানা আশিসের। বাইরে সে কখন বেরোয়, জানে না আশা। কোথায় শোয়, তাও জানে ন্যা। শুধু জানে, দুপুরে কোনো কোনো দিন এসে মা'র কাছে খেয়ে যায়। আশা তখন ওখানে থাকে না। অন্যদিন চাকর খাবার দিয়ে আসে ঐ ল্যাবরেটরীতেই। কী এক নিদারুণ গবেষণায় নাকি নিযুক্ত আছে আশিস—শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই।...নিঃশ্বাসটা দীর্ঘতর হতে থাকে আশার। নিঃশব্দে আকাশপানে চেয়ে থাকে।

অভিমান কার ওপর করবে আশা! যার সঙ্গে বিয়ের কয়েকটা মন্ত্র ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ হোল না, তার উপর অভিমান করবে কোন্ অধিকারে? কে সে আশার! প্রশ্নটা মনে জাগলেও কিন্তু ওর চিরযুগের হিন্দু-নারী-মন বলতে থাকে, সে-ই আশার সব!

কিন্তু এভাবে দিন কাটানো যায় না। শাশুড়ীর সেবা নিখুঁতভাবে করার মধ্যে বন্ধুত্বের গৌরব যতই থাক্, তরুণী-মনের পত্নীত্ববোধ তাতে পরিতৃপ্ত হয় না। ঝি চাকর-দারোয়ানের 'বৌরাণী' ডাক যতই মিষ্টি লাগুক, প্রিয়তমের 'নাম' ধরে ডাকার মতো তাতে অমৃত নেই। অতৃপ্ত আশা আশ্রয় খুঁজে পায় না! শাশুড়ী লক্ষ্য করেন—মাঝে মাঝে বলেন,

—ছেলেটা ওর গবেষণা নিয়ে বড্ড ব্যস্ত রয়েছে, বৌমা—তুই একটু বাইরে বেড়িয়ে আয় গে না? গাড়ী নিয়ে যা। সিনেমা দেখে আয়, না-হয় গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আয়।

আশা চুপ করে থাকে। দেখে, তিনি নিজেই কয়েকদিন ওকে নিয়ে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনলেন। দু'একজন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়িয়ে আনলেন। একগাদা মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজের গ্রহক করে দিলেন। শেষে ওস্তাদী গান শেখাবার জন্য একজন মাষ্টার রেখে দিলেন—আশা একটা অবলম্বন পেল।

শাশুড়ী কিন্তু সত্যি জানেন না, পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর কতখানি আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। বেশী সময় বধূ একলা থাকে, এই ভেবেই তিনি গানের মাষ্টার রেখে দিলেন। কিন্তু ওঁর ধারণা, ল্যাবরেটরীর কাজ শেষ করে অধিক রাত্রে নিশ্চয় আশিস বাড়ীতে আসে। অতএব ভাবনার কিছু নেই। কারণ ছেলে তাঁর অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ—নিষ্পাপ নিষ্কলুষ চরিত্র তার।

—কাল অত রাত্রে গান করছিলি, মা—আশিস শুনতে চেয়েছিল বুঝি?

এই স্নেহপরায়ণা শাশুড়ীর অন্তরে তিলমাত্র ব্যথা দিতে চায় না আশা—চুপ করে রইল। গভীর রাত্রে একা-একা কেন যে সে গাইছিল, এঁকে বলে কি হবে। অনর্থক উনি

দুঃখ পাবেন। শাশুড়ী নিজেই আবার বললেন,

—তুই ওকে আরো সকাল সকাল আসতে বলিস্ না কেন, মা?

আশা এবারও উত্তর দিল না, নিঃশব্দে শাশুড়ীর পিছনে বসে পাকা চুল বাছতে লাগলো। শাশুড়ী যদি ওর মুখের কারুণ্য দেখতে পেতেন তো বুঝতেন, কী গভীর বেদনায় সে-মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি আবার বললেন,

—বলবি। বুঝলি?

—হুঁ।—আশার মধুর কণ্ঠে প্রায় কান্নার মতই বেরুলো 'হুঁ' শব্দটা।

কিন্তু শাশুড়ী লক্ষ্য করলেন না ; মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের জন্য চোখ বুঝলেন। আশা ওঁর মাথার পাকা চুল তুলতে তুলতে কখন উদাস হয়ে হাত-গুটিয়ে বসেছে, খেয়াল নেই। অন্তরের গভীর বেদনাকে প্রচ্ছন্ন করে এভাবে শাশুড়ীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ওর ইচ্ছে করে না। মনে হয়, আশা কঠিন স্বরে তাঁকে জানিয়ে দেবে—কেন তিনি এমন উদাসী পুত্রের জন্য বধূ এনে একটা নারী-জীবন নষ্ট করলেন! কিন্তু কিছুই বলতে পারে না আশা। শাশুড়ীর এমন মাতৃস্নেহ এ-যুগে দুর্লভ—গল্পের বিষয়। আশা ভাবে, এঁকে দুঃখ না দিয়ে ধীর ভাবে সে কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখবে। অভাব কিছু নেই এখানে। লেখাপড়া গান-বাজনা নিয়ে আশা কাটাবে আরো কিছুদিন। শাশুড়ীকে সে কিছুই জানাবে না, বরং নিজেই একবার চেষ্টা করবে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

ভাবতে ভাবতে আশা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। উঠে পড়লো মার্বেলের মেঝে ছেড়ে। শাশুড়ী ঐ মেঝেতে শুয়েই ঘুমান কিছুক্ষণ দুপুরবেলা। বৈশাখের দুঃসহ গরম বাইরে তখনও আগুনের হল্কা ছুটিয়ে দিচ্ছে। আশা স্নানগারে ঢুকলো এসে।

স্নান সেরে নিজেকে পরিপাটি করে সাজালো—দর্পণে দেখলো একবার—হ্যাঁ, চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা ঠিক করলো, সটান আশিসের ল্যাবরেটরী-ঘরে গিয়ে ঢুকবে। আশিস হয়তো ওকে চিনতেই পারবে না, বেশ মজা হবে! ও যেন কোথাকার কে—দেখা করতে এসেছে একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে, এই ভাবেই যাবে আশা। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটায় ঝাঁকুনি দিয়ে আশা সটান চলে এল বাগানের পথে।

লম্বা রাস্তা—দু'পাশে নানান ফুলের গাছ—বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওকে। অতি নির্জন এই পথটুকু কী মনোরম —কী আবেশ-মাখা।

আশার অভিসার-পথ আনন্দে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ওর অকথিত মনোবেদনা ভাষায় ব্যঞ্জিত হতে লাগলো দুপাশের ফুল-বল্লরীদের ওপর। কত কথাই না সে বলবে আজ তার প্রিয়তমকে!—কিন্তু, হয়তো লজ্জায় কণ্ঠে ভাষা জাগবে না, হয়তো কিছুই বলা হবে না! না, আশা বলার কথাগুলো সব গুছিয়ে নিচ্ছে মনের মধ্যে। বেশ সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভঙ্গীতে সে জানাবে তার অভিযোগ—তার অন্তরের গোপন বেদনা।

নৃত্যচঞ্চল ওর ভঙ্গী যদি দেখে কেউ তো দেখুক! কিন্তু বাগানের এই বনপথে কোথাও কেউ নেই। মালীরাও এসময় এদিকে থাকে না। আশা চারদিক তাকিয়ে দেখলো—না, কেউ কোথাও নেই। নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ালো ল্যাবরেটারী-ঘরটার দরজার কাছে। উঁচু ঘর, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল আশা—প্রকাণ্ড ঘরখানা দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে, অনেকটা দূরে একখানা বড় গোল টেবিল ঘিরে কয়েকজনই, যুবক-প্রৌঢ় এবং

দুটি যুবতীও কথা বলছেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কারা ওরা? আশা ওদের কাউকে চেনে না। ওদের মধ্যে কে ওর স্বামী? আশা বুঝতে পারছে না। দু'জন যুবকের চুল-দাড়ি রয়েছে; একজনের মুখ সদ্য কামানো, চোখে চশমা। অপর জন প্রৌঢ়—কাঁচাপাকা চুল, বেশ সৌম্য মূর্তি। হয়তো উনি দিব্যেন্দুবাবু। আর একজন রোগা ফর্সা, হয়তো লম্বাও, কিন্তু মুখশ্রী খারাপ নয়। এর পর দুটি তরুণী। একজন কিছু স্থূলকায়া। অপরটা তন্বী, সুন্দরীই বলা যায়। কিন্তু সকলেই তাদের আলোচনায় নিবিষ্ট। আণবিক শক্তির ভয়াবহতা এবং তার কল্যাণকরী প্রয়োগ নিয়ে কথা হচ্ছে ওঁদের—আশা বুঝতে পারলো।

ল্যাবরেটরীর ওদিকে হয়তো বড় রাস্তা আছে, আর সেই দিকের দরজা দিয়ে এঁরা আসেন—আশা আন্দাজ করতে লাগলো দাঁড়িয়ে। এদিকের দরজাটা তাহলে 'প্রাইভেট'—অন্দরে যাবার পথ। হয়তো এঁরা সব রোজই আসেন—প্রতিদিনই হয়তো বিকালে এঁদের বৈঠক বসে। আশা দেখতে পেল, ওপাশের ছোট ঘর থেকে একজন চাকর ট্রে ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। তন্বী তরুণীটি চা করতে আরম্ভ করলো। কথা চলছে ওদের, সেই সঙ্গে চা-ও। না, অপরিচিতা আশা ওখানে যেতে পারবে না। যাওয়া ওর উচিত হবে না। স্বামীর সঙ্গেও যখন ওর পরিচয় নেই, তখন ওখানে সে যাবে কোন্ ভরসায়? কী অধিকারে?

অভিমানিনী আশার অধিকারের কথাটাই মনে হোল বেশী করে। মনে হোল, এখন তো বেশ গল্প করবার সময় থাকে! সারা দিনরাত্রির মধ্যে আশাকে একটু দেখতে যাবার সময় হয় না। চমৎকার! এই বুঝি স্বামীর কর্তব্য!

কিন্তু কে ওর স্বামী? কোন্‌টি? আশা বহু চেষ্টা করেও অতদূর থেকে চিনতে পারছে না বিয়ের রাতে প্রায়-না-দেখা বরকে। ঐ লম্বামতনটিই হবে বোধহয়। কিন্তু ওঁরা তো সকলেই প্রায় লম্বা। তাহলে ঐ চুলদাড়ি...ঐ হবে নিশ্চয়। কিন্তু যদি না হয়...

নিজের স্বামীকে না চিনে আশা কাউকে 'স্বামী' ভাবতে যাবে কেন! না। ভাল করে জেনে নেবে আশা কোন্‌টি তার স্বামী

কাছাকাছি কোন লোক পেল না আশা ; আর বেশিক্ষণ থাকতে ওর লজ্জা করছে ওখানে। চলে এল বাগানে। অজস্র মাধবী গুচ্ছ দুলছে ওখানকার ছোট গেট্‌টাতে—তারই আড়ালে দাঁড়ালো।

অভিমানে অন্তরটা মুচড়ে উঠছে, কিন্তু চোখে ওর জল আসছে না। একটা জ্বালা যেন অনুভব করছে আশা সর্বেন্দ্রিয়মনে। কিন্তু তার চিরসহিষ্ণু অন্তর অকস্মাৎ কিছু করতে চায় না। ধীরভাবে নিজেকে ধরে আশা আবার চাইল ঐ একতলা ঘর খানার দিকে। দেখতে পেল—দু'পাশে ইঁটের কোণা দিয়ে সাজানো একটি সরু রাস্তা ঘরখানার দেওয়াল-বরাবর চলে গেছে ওপাশের আর একটা সিঁড়ির কাছে। ওটাও তাহলে এই ঘরে ঢুকবার পথ? দেখা যাক, ওখানে গেলে ওদের ভাল ভাবে দেখা যায় কিনা। আশা চলে এল। ভেজানো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। আশা এসে পৌঁছাল একটা ছোট ঘরে। সেখানে একজন লোকের থাকা-খাওয়া-শোয়ার সব ব্যবস্থাই রয়েছে। টেবিলে ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ, কুকারও। ওপাশে দুটি আরামচেয়ার। পূর্ব-দক্ষিণে একখানা মেহগিনি কাঠের খাট, তাতে বিছানা! বাঃ, সবই ঠিক আছে অর্থাৎ দেখলেই বোঝা যায় ল্যাবরেটরীর মালিকটি এখানেই দিব্যি দিনরাত্রি যাপন করতে পারেন, এবং করেনও। পূর্বদিকের ছোট বারান্দায় একজন চাকরের

খাটিয়াও দেখতে পেল আশা। চাকরটার নাম ক্যালিচরণ।

সে চায়ের ট্রে নিয়ে এ-ঘরে ফিরেই আশাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। আশা চাকরে কাছে নিজেকে অসম্বৃত না করে ধীরে ধীরে বলল,

—ঘরখানা পরিষ্কার কর না কেন, কালিচরণ?

—এজ্ঞে, দু'বেলা ঝাঁট দি,—তবে ওঁরা সব এসে বসেন কিনা। কাগজ-পত্তর—চিনা বাদাম, চানাচুর খান সব—আর চা হরদম করতে হয়...

—হরদম! কত কাপ চা রোজ খান তোমার বাবু?

—এজ্ঞে, বাবু বেশী খান না। খান সব ওনারা। বাবু দু'বেলা দু'কাপ।

—রান্নাও কর এখানে তুমি?

—এজ্ঞে, করি। মুরগী, আন্ডা সব তৈরী করতে হয় কিনা। বাড়ীতে তো হবার জো নেই। মা হতে দেবেন না।

—আচ্ছা, আমার জন্য এককাপ চা কর—বলে, বসলো আশা বিছানায়। ওর আশা যদি কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে আশিস আসে এ ঘরে তো দেখা হয়ে যাবে। ওদের কথ বেশ শোনা যাচ্ছে এ-ঘর থেকে। আশা বসে রইল। কালিচরণ ফুটন্ত জলে চা ছেড়ে স সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও যেন আশাই করেনি আশাকে এখানে দেখবার। কিন্তু কালিচর জানে এ-বাড়ীর মালিক ঐ মেয়েটি। বলল,

—বাবুকে খবর দেব, বৌরাণী-মা?

—না, থাক্।

খবর দিতে বলাই উচিত ছিল আশার, কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল। একান্ত অনালাপী স্বামীকে কেমন করে অকস্মাৎ ডেকে পাঠাতে পারে। তিনি কী মনে করবেন? আশার খুব ইচ্ছে করছে, কালিচরণ ডেকে আনুক আশিসকে। কিন্তু ডাকতে সে বলতে পারে না। যদি নিজেই কোনো কারণে এসে পড়ে আশিস তো, আশা সৌভাগ্য মনে করবে। কালিচর ভাল একটা কাপ বের করে চা তৈরী করে আনলো ট্রে-তে। আশা চায়ের কাপটা নিয়ে চিনি মেশাচ্ছে—শুনতে পেল সদলবলে ওঁরা সব বাইরে বেরিয়ে গেলেন কোথা।

কোথায় ওঁরা গেলেন কালিচরণ?—আশা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলে দলটি।

—কি জানি কোথায় কী মিটিন্ আছে। -জবাব দিল কালিচরণ।

আশা দেখতে পেল তিনখানা মোটরে চড়ে ওঁরা সব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চায়ে আর রুচি নেই আশার। কাপটা হাতে নিয়ে সে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই রইল আশা। কাপের চা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

লেকের কাছে ক্লাব। সেখানেই সব নামলো এসে! বিশেষ একটা ব্যাপার ওঁদের আজ আছে, বেশ বোঝা যায়। ওঁরা সাতজন সবশুদ্ধ। পাঁচজন পুরুষ দুটি মেয়ে। এঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়। আশিসের বিজ্ঞানের প্রফেসার। বাকী সবাই ওরা বন্ধু। কিন্তু ক্লাবঘরে আরো বহু ব্যক্তি এসে জমায়েৎ হয়েছেন—আরো আসছেন।

নবীন বৈজ্ঞানিক আশিসের আবিষ্কার নাকি একটা বিস্ময় জাগাবে জগতে—তাই ওঁরা সব আশিসকে অভিনন্দন জানাতে সমবেত হয়েছেন! আশিসের প্রফেসার দিব্যেন্দুবাবুই এর আয়োজনকারী। ভারতের এক বিশিষ্ট বাঙালী বৈজ্ঞানিক সভাপতিত্ব করবেন

দিব্যেন্দুবাবু আশিসের বাবার বন্ধু—তিনিই সভার উদ্বোধন বক্তৃতায় বললেন,

—আপনারা অনেক হয়তো জানেন না, আশিসের বাবা অমৃতবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন ছিলেন। তিনিও ছিলেন বৈজ্ঞানিক। আশিস যে ল্যাববেটরীতে গবেষণা করে সফল হয়েছে, সেই ল্যাবরেটরী ওর বাবার তৈরী। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। এবং ঐ ল্যাবরেটরীতে আমিও তাঁর সঙ্গে গবেষণা করেছি। সে-দিনের কথা মনে হলে চোখের জল সামলাতে পারিনে। কিন্তু আশিসের সাতবছর বয়সেই অমৃত অমৃতলোকে চলে গেলেন—যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, আশিসকে যেন আমি মানুষ কব্বার চেষ্টা করি...দিব্যেন্দুবাবুর আবেগময় কণ্ঠ আরো করুণ হয়ে উঠলো—কাউকে মানুষ করা কারও হাতে নয়, সবই ঈশ্বরের হাত বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁরই করুণায় আশিস যে আজ সাফল্য অর্জন করতে চলেছে, তাতে আমার আনন্দ সর্বাধিক। সকলে ওকে আশীর্বাদ করুন ও যেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দরবারে ওর গবেষিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এর পর আশিসকে বলতে অনুরোধ করা হোল—সে কী সম্বন্ধে গবেষণা করছে, এবং তার লব্ধ সত্য কোথায়, কবে সে প্রকাশ করবে। আশিস সকলকে যথারীতি সম্ভাষণ করে দাঁড়াবার পূর্বে, ওর হাতের ব্রীফ-কেস্‌টা টেবিলের একপাশে ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সকলের উদ্দেশে সবিনয় নমস্কার নিবেদন করে বলতে আরম্ভ করলো,

—বাবাকে আমার কিছুমাত্র মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁর গবেষণাগার আমাকে শিশুকাল থেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আমার বৈজ্ঞানিক বৃত্তি পৈতৃক। আমার ঠাকুরদা ছিলেন মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়। তিনি আমাকে আঠারো বছরের রেখে স্বর্গে গেছেন। ঠাকুরদাই আমাকে শৈশব থেকে শিক্ষা দিয়েছেন—'আমাদের ঋষি-দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ না হলেও এমন একটা দৃষ্টি তাঁরা লাভ করেছিলেন, তাকে জ্ঞানদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি যাই বলা হোক, সে দৃষ্টি অভ্রান্ত। শত-সহস্র বছর আগে তাঁরা যে-কথা বলে গেছেন, আজকের বৈজ্ঞানিক আধুনিক যন্ত্রযোগে তার পরীক্ষা ক'রে নির্ণয় করে যে—সে-কথা সত্য। অতএব বিজ্ঞানের সাধনায় ঋষিদের কথা সর্বদা মনে রাখবে...'আশিস একটু থামলো। ওর বলার ভঙ্গী মধুর। সবাই শুনছে। টেবিলটাকে ঘিরে সভাপতি, দিব্যেন্দুবাবু আশিস এবং তার বন্ধুবান্ধবরা। অপর সকলে একটু তফাতে বসে শুনেছে। আশিসের ব্রীফ-কেস্‌টা কখন যেন একটুখানি সরে এলো—কেউ লক্ষ্য করলো না। ওর মুখের চেন্‌টা কে-যেন টেনে, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে কী একটা বের করে নিল।

লোকটা উঠে চলে গেল সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগে। অত লোকের মধ্যে এই সামান্য কাজটুকু কেউ দেখলো না। আশিস বলছে,—তখন আমি বি. এস. সি. ক্লাশে, ঠাকুরদা একদিন কথায় কথায় বললেন,—ব্রহ্মা বললেন—"একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়—"অর্থাৎ এক আমিই বহু হব। একের এই বহুত্বই সৃষ্টি, এই বৈচিত্র্য সেই একেরই বিকাশ অথবা বিবর্তন। অতএব সৃষ্টির আদিতে ফিরে যেতে পারলে সেই নির্বিশেষ "এক"-কেই পাওয়া যাবে। যার পর আর কিছু নেই। আমার গবেষণার বিষয় সেই একের আবিষ্কার—একটু থামলো আশিস, দেখলো একবার চারদিকে তাকিয়ে—সবাই শুনছে ওর কথা!.বলতে লাগল,—বিশ্ববৈচিত্র্যের সেই পরম 'এক'-কে পরমাণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ধরা বড় সহজ নয়—অ্যাটম্-নিউট্রন-পজিট্রনের পারে যেখানে সেই 'এক' শুধু জ্যোতিস্বরূপ—শুধু নাদ-বিন্দুতে প্রকাশমান, আমাকে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের

মাধ্যমে সেই কৈবল্য-বিন্দুতে পৌঁছাতে হবে! ব্যাপারটা অতিশয় জটিল। কিন্তু আপনাদের সকলের আশীর্বাদ আর আমার পিতৃসম গুরুদেব দিব্যেন্দু কাকাবাবুর বিরামহীন উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি ঐ মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমি যুক্তি এবং যন্ত্রযোগে প্রমাণ করতে পেরেছি যে, এক-ই 'বহু' হয়েছেন—এই বিচিত্র 'বহু'র পূর্ণ পরিণামও সেই 'এক'---সেই নাদ-বিন্দু—সেই শব্দব্রহ্ম সেই ওঁকার! আর্যঋষির চরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে আমিও আপনাদের কাছে আজ স্বীকার করছি যে, তাঁদের আবিষ্কৃত সত্য অভ্রান্ত...।

সকলে হাততালি দিয়ে আনন্দ জানালেন। এর পর সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত ভাষণে আশিসের বর্ণিত গবেষণার সাফল্য সম্বন্ধে সারা বিশ্বের বিস্মিত হবার আশা এবং জননী ভারতের গৌরবান্বিত হবার কথা ব্যক্ত করে সভা শেষ করলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা আছে। সকলে পাশের 'লন' এ বসলো গিয়ে। আশিসও এল। সে-ই খাওয়াচ্ছে সকলকে। অতএব সবাই এল কিনা, খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলো, ওর নিকট-বন্ধু নীতিশ অনুপস্থিত। অথচ নীতীশ তো এসেছিল ওদের সঙ্গেই। গেল কোথায়? এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে নর্মদাকে শুধুলো,

—নীতীশ কোথায় গেল?

—কি জানি! ছিল তো ওখানেই। হয়তো আমাদের প্লেটগুলো পাঠাবার তাদিগ করতে গেছে কিচেন্-এ।

হবে।—এতো লোককে চা-জলখাবার দেওয়াতে হবে, নীতীশ নিশ্চয় তারই তদ্বির করতে গেছে। বন্ধুর কাজ তো করবেই সে।

আশিস বসলো সকলের সঙ্গে। সভাপতি প্রশ্ন করলেন ওকে,

—কবে যাচ্ছ তুমি বোম্বাই? পরশু তো তোমার প্রবন্ধ-পাঠের দিন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কাল 'এয়ারে' চলে যাব—সীট বুক্ করা আছে—বলতে গিয়েই আশিসের মনে পড়ে গেল, কথাটা এখনও সকলকে বলা হয়নি। আজই মাকে এবং আশাকে বলবে গিয়ে! আজ তার ছুটির দিন পরম শুভদিন—আজ সে আশার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলবে। বিয়ের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রে ঘুমন্ত আশাকে দেখেছে আশিস, তারপর আর সময় হয়নি। ওর মুখখানা বিষাদিত হতে হতে আনন্দিত হয়ে উঠলো। আজ তার আবিষ্কৃত সত্য জগতের সম্মুখে জানাবায় সুযোগ এসেছে -আশাকেও জানাবে সে-কথা।

—আপনার বউকে আজ এখানে আনা উচিত ছিল।—বলল নর্মদা।

—সে তো মার আঁচলেই ঘোরে। এ যাবৎ আমি-ই তাকে ভাল করে দেখিনি।

—দেখেছি আমরা। অতিমাত্রায় 'পতি-পরম গুরু' টাইপ!

—আমার জননীর নির্বাচন...গর্বে আশিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—'পতি পরম গুরু' আর 'সতী-সীমন্তিনী'ই ভারতের আদর্শ...হাসল আশিস।

—কিন্তু আশিসদা...নর্মদা বলল—আমরা ভাবতেই পারি না—এতবড় মডার্ণ, শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক হয়েও আপনি মার নির্বাচনকেই প্রেফারেন্স দিলেন কি করে?

—মা'র থেকে সন্তানের বেশী মঙ্গল কেউ করে না, নর্মদা দেবী—মা বিশ্বমাতার মূর্তরূপ। মা'র নির্বাচনের প্রেফারেন্স দেব কি—মা'র নির্বাচন অমোঘ, অপ্রতিবাদনীয় আপনাদের ইংরাজি ভাষায়..

—থাক, ধন্যবাদ! আপনার মাতৃভক্তিকেও ধন্যবাদ।—বলল নর্মদা।

হাসলো সবাই। দিব্যেন্দুবাবুও বসেছিলেন ওখানে। বললেন,

—আশিসের মা—আশিসের মা-বাবা একাধারে। অমন মা-ও কদাচিৎ মেলে। তোমরা তাঁর পূজারিণী বেশ আর অভিভাবিকা-মূর্তিই দেখেছ, তাঁর মাতৃরূপ দেখনি। দেখলে বুঝতে, তিনি শুধু আশিসের মা নন, আমাদেরও মা!

—জানি স্যার, আমরাও জানি। অমন মা কম আছে পৃথিবীতে!

—খাবারের আর চায়ের ট্রে এসে গেল বয়'দের হাতে। সকলেই জলযোগ করতে আরম্ভ করলেন। নীতিশ এসে পৌঁছাল। ঘামে গায়ের জামা ভিজে গেছে—কপালের ঘাম ঝরে পড়ছে চিবুকে। ব্যাপার কি! কোথায় ছুটোছুটি করছিল নীতীশ? আশিস হেসে বলল,

—তুই কি রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছিলি নীতীশ?

সবাই হাসলো। নীতীশও হাসলো সেই সঙ্গে ; বলল হেসেই,

—মাংসের শিঙাড়াটা কেমন হয়েছে, বলুন তো স্যার?

—চমৎকার! কে তৈরী করলো? তুমি?—শুধুলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই বৈজ্ঞানিক মিশ্রণ...

—ও একটা দ্রৌপদী, স্যার—রন্ধনে ও কালিচরণকে হার মানায়। প্রায়ই ল্যাবরেটারীতে ষ্টোভে মাংস রান্না করে, মোগলাই রান্না—বলল আশিস।

—তুই খাওয়াচ্ছিস—একবার সবটা ঘুরে দেখে আয়। সবাইকে বল, কার কী চাই—বুঝলি?—নীতীশ বলল আশিসকে।

—হ্যাঁ, যাওয়া উচিত।—আশিস উঠে গেল। ওর ব্রীফ-কেসটা পড়ে রইল ওখানেই। সবাই খাচ্ছে! মাংসের শিঙাড়া সত্যি ভাল হয়েছে। চেয়ে নিচ্ছে অনেকেই। আশিস সবাইকে বলে বেড়ালো,

—আমার বৈজ্ঞানিক সহপাঠী এবং সহকর্মী নীতিশ এই মাংসের শিঙাড়া তৈরী...উঁহু, রচনা করেছে। রন্ধনে ওর হাত কাব্যের মতো খোলে—কেন যে সে নীতীশ না-হয়ে নিত্যকালী হোল না...

আমরাও তাই ভাবছি!—হেসে বলল বন্ধুগণ। কাবেরী, কৃষ্ণা নন্দিতা, নর্মদা সবাই স্বীকার করলো নীতিশবাবুর রন্ধনের হাত নারীদের থেকে দক্ষ। রাঁধুনি বামুন হলে ওর মাইনে হোত শ'খানেক, বাবুর্চি হলে হোত হাজার...কেন যে ও বৈজ্ঞানিক হতে গেল!

আশিস ফিরে এল নিজের খাবার টেবিলে। নীতীশ চুপচাপ বসে আছে। মুখখানা লাল। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ওর। ক্লান্ত, বিষণ্ণ...

—শরীর খারাপ লাগছে, নীতীশ?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ...মাথাটা...

—চা খা। খোলা হাওয়ায় একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে। রান্নাঘরে অতক্ষণ কেন থাকতে গেলি তুই? গরম সহ্য হবে কেন!

—না, ও কিছু না—বলে নীতীশ চা খেতে আরম্ভ করলো...কিন্তু ভাবছে। ক্রমাগত ভাবছে চুপচাপ! এদিকে পার্টিতে হাসির হুল্লোড় চলেছে। আশিসও সানন্দে যোগ দিয়েছে সেই হাসিতে, কিন্তু নীতীশ যেন নিবে গেছে। অথচ সবাই জানে নীতীশ বিশেষ বন্ধু আশিসের। নীতীশেব গবেষণা করবার মতো ল্যাবরেটরী বা আর্থিক সামর্থ্য নেই,—কিন্তু

সেও বৈজ্ঞানিক এবং সহপাঠী আশিসের। গরীবের ছেলে নীতীশ। কোনোরকমে টিউশ্যনি ক'রে এবং আশিসের সাহায্য নিয়ে এম-এস-সি পাশ করেছে, তারপর আর এগুতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধি তার অসাধারণ। সেও সুযোগ-সুবিধা পেলে আবিষ্কারক হতে পারতো। এখন দু'বেলা দুটো টিউশ্যনি করে, আর বাকী সময়টা আশিসকে সাহায্য করে। ঢাকুরিয়ার একখানা জীর্ণ বাড়ীতে ও থাকে একা। নিজেই রান্না করে খায়। বেশিরভাগ দিন খায় আশিসের বাড়ীতেই। লম্বা, ফর্সা—মুখশ্রীও মন্দ নয়। আশিসের থেকে বয়সে কিঞ্চিৎ বড়। আত্মীয়ের মধ্যে আছে ওর এক বিধবা পিসিমা—মাসে তাঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হয় কাশীতে। বিয়ে ও করেনি। করবার ইচ্ছেও নেই। কারণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো কোনো সুবিধাই নেই ওর। বড় জোর মাষ্টার বা কেরাণী হতে পারে। কিন্তু ওর উচ্চাশা ওকে অত নীচুতে নামতে দিতে চায় না। নীতীশ ভাবে, যদি কখনো সুযোগ সে পায় তো দেখিয়ে দেবে—সে বড় হতে পারে।

ছেলের বন্ধু এবং ভালছেলে ব'লে আশিসের মা ওকে খুবই স্নেহ করেন! এখন কি, আশিস সম্বন্ধে বিশেষ-বিশেষ কথা উনি নীতিশকেই বলেন। নীতীশ তাঁকে মা বলে ডাকে। অবারিত দ্বার নীতীশের ওখানে। কিন্তু আশিস এই মাসখানেক অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, আর নীতীশ তাকে সর্ব্বন্তঃকরণে সাহায্য করছিল, তাই নীতীশ মা'র সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। তবু একদিন ভেতরে এসে কথা বলে গেছে সন্ধ্যার দিকে।

পার্টি শেষ হোল। সবাই উঠলেন। আশিসও প্রফেসর দিব্যেন্দুকে প্রণাম করে নিজের 'কার'-এ উঠলো নীতীশকে ডাক দিল,

—আয়—

—থাক আশিস, শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি রিক্সা করে বাসায় চলে যাচ্ছি। এই দিকে বাসা কাছে হবে। তুই যা...

নীতীশেব জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো আশিসের মুখাখানা। বলল,—যা,—যা, শুয়ে থাক্‌গে। সকালেই আসিস্! না-হলে আমি খুব চিন্তিত থাকবো। আমারও সময় নেই যে যাব তোর ওখানে। বোম্বাই রওনা হয়ে যেতে হবে সকালেই।

—আচ্ছা...নীতিশ চলে গেল।

আশিসও বাড়ী ফিরতে আদেশ করলো শোফারকে।

সেই আধো-অন্ধকারে গবেষণাগারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আশা—ওর অন্তরে বেদনার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে! স্বামী তার বন্ধু-বান্ধব এবং বান্ধবী নিয়ে এমন উৎসব করতে পারেন—এতো হৈ-হল্লা চলে এখানে আর নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবার অবসর হয় না! অবসর যথেষ্টই আছে—ইচ্ছারই অভাব। কিন্তু কেন? কিছুই বুঝতে পারছে না আশা! ওর বুক থেকে বড় একটা শ্বাস ঝরে পড়লো গবেষণাগারের অন্ধকার আকাশে। কিন্তু আশা অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল মেয়ে—ভারত-নারীর সহনশীলতার মূর্তি ও। প্রায় মাসখানেক তার বিয়ে হয়েছে, অথচ এখানে স্বামীর সঙ্গে একটা কথা হোল না—তাকে চোখে দেখা পর্যন্ত হোল না! ওর মতো তরুণীর মনে সে বেদনা দুঃসহ, তবু ও ধৈর্য্য ধরেই ভাবলো—শোবার ঘরখানা একটু গুছিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে পেতে রেখে যাবে সে আজ।

সন্ধ্যার কালোছায়া নেমে আসছে সর্বত্র। সন্ধ্যাদীপ জ্বালার সময়! আশার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগলো, এখানেই সে আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবে। কিন্তু প্রদীপ তো নেই!

কালিচরণকে বললো,

—কিছু ধূপ এনে দিতে পার, কালিচরণ? চন্দন-ধূপ!

—এজ্ঞে, আমি তো বাজারে যাবই—লিয়ে আসবো। আপনি থাকুন—ঘর খুলা রইল। আমি চট্ করে আসছি—কালী চলে গেল বাজার থলি হাতে।

আশা একা ল্যাবরেটরীর বড় হল্‌টায়। চারিদিকে নানান যন্ত্রপাতি, আলমারী আলনা—কত কি! আলো জ্বালা হয়নি—কালী জ্বেলে গেল না। কেমন যেন থমথমে ভাব ঘরখানায়—আশার ভয় ভয় করছে! কিন্তু এখানে খুব বেশী বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হয় বলে, সুইচ প্লেটের উপর লেখা রয়েছে 'সাবধান! বিপদ!' আশা আগেই ওটা পড়েছে, তাই আলো জ্বালাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। শোবার ঘরের বড় টেবিলটার উপর একটা শেড-দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেছে কালিচরণ, আর ওদিকের গেটের আর্চিং-এ মাধবীলতার ফুল-পাতার আড়ালে আর একটা আলো জ্বলছে। বাড়ীটার দুই অংশের দু'দিকে দুটো রাস্তা—সূর্য্য সাহা লেনের দরজাটায় বাস্তুবাড়ী আর এদিকের বড় রাস্তাটার নাম মনীরুদ্দীন স্ট্রীট—নম্বর কত কে জানে! ল্যাবরেটরীতে যাঁরা আসেন, তাঁরা এই মনীরুদ্দীন ষ্ট্রীট দিয়েই আসেন—আশা বুঝলো। এদিকে ল্যাবরেটরীর-বাড়ীর সম্মুখে হাত কুড়ি চওড়া আর হাত পঞ্চাশ লম্বা বাগান, তার পর গেট, তারপরই মনীরুদ্দীন ষ্ট্রীট, কিন্তু মনীরুদ্দিন ষ্ট্রীট জনবিরল পথ—আশা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৈ কেউ তো পথ দিয়ে গেল না!

আশা গেটের আলোতে দেখতে পেল—আর্চিং-গেটের ওপর লতানো মাধবীলতাটায় অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। কেমন যেন সাধ জাগলো ওর কতকগুলো ফুল তুলে আশিসের বিছানায় রেখে যাবে, আর চন্দন ধূপ জ্বেলে দিয়ে যাবে—তার অভিসারে আসার চিহ্ন! আশা গেটের কাছে এসে ফুল তুলতে আরম্ভ করলো! স্বপ্নের মতো সুন্দর মনে হচ্ছে নিজেকে—যেন রূপকথার রাজকুমারী মনে হচ্ছে ওর। আঁচল ভর্তি ফুল তুললো মৃদুস্বরে গান গাইতে গাইতে—তারপর অন্ধকার ল্যাবরেটরী পার হয়ে নীলাভ আলোতে আশিসের শোবার ঘরটায় ঢুকলো এসে। বিছানাটা এবার ঝেড়ে পাতবে—টেবিলে ফুলগুলো নামাতে যাচ্ছে আশা, হঠাৎ গেটে যেন কে ঢুকলো মনে হোল। জানালাপথে থাকিয়ে দেখলো আধো অন্ধকার পথ বেয়ে কে যেন ল্যাবরেটরীতে ঢুকলো এসে। আশিসই এল নাকি? আশা চকিতে সরে দাঁড়ালো একটা বড় আলমারীর আড়ালে।

ল্যাবরেটরীর অন্ধকার ঘরে ঢুকে আগন্তুক ডাক দিল মৃদুস্বরে,—কালিচরণ—কালী...

কেউ সাড়া দিল না। কোথায় গেছে কালিচরণ? হয়তো বাজারে আগন্তুক সটান এসে ঢুকলো শোবার ঘরে। হাতে একতাড়া চাবি। ল্যাবরেটরীর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় টেবিলটা, রাজ্যের জিনিস তার উপর—বই খাতা কলম, আর ওরই উপর দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট তাক-এ বড় বড় মোটা মোটা বই। মাঝে খাটখানা তার এদিকে বড় আলমারীর আড়ালে আছে আশা! ল্যাম্পে শেড-দেওয়া, তাই আশা আগন্তুকের কোমর থেকে নীচের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর স্যুট-পরা যুবক। নিশ্চয় আশিস। নইলে এমন স্বচ্ছন্নদভাবে কে আর ঘরে ঢুকতে পারে! তারপর হাতে চাবিও রয়েছে। আশা নিঃশব্দে দেখতে লাগলো আশিস কী করে।

টেবিলের উপর বই এর ছোট তাকটা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে নিতেই পিছনে দেওয়ালে গাঁথা আয়রন-সেফ নজরে পড়ল। আশিস তোড়া থেকে একটা চাবি নির্বাচন করে তালা

খুলে ফেললো সেফ-এর। তার মাঝের ড্রয়ার টেনে বের করলো একটি চামড়ার কেস্। বেশ বড় এবং মোটা। হয়তো টাকাকড়ি আছে। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে আশিস তালাটা আবার বন্ধ করছে।...

আঁচল ভর্তি ফুল নিয়ে আশা অপেক্ষা করছে আলমারীর আড়ালে। আলোটায় শেড্-দেওয়া থাকায়, আর আগন্তুক দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে সেফ বন্ধ করায় আশা তার মুখ দেখেতে পাচ্ছে না। কিন্তু শোবার ঘরে এমন সহজভাবে চাবি দিয়ে সে সেফ খুলছে, সে নিশ্চয় আশিস! আশার কেমন যেন উত্তেজনা এসে গেল। এই ঘরে মনোরম পরিবেশের একান্ত নির্জ্জনতায় আশা তার প্রথম মিলন ঘটাবে স্বামীর সঙ্গে?

—শুনছেন? শুনুন...আশা ডাক দিল মৃদুকণ্ঠে।

অকস্মাৎ অতর্কিত আহ্বানে আকস্তুক চমকে উঠলো—হাত থেকে পড়ে গেল চাবির গোছাটা ঝনাৎ করে! কিন্তু সে মুখ ফেরালো না। আশা আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে বলল,

—ভয় নেই। ভূত নয়। আমি আশা—

—ও...হ্যাঁ। কি...হেঁট হয়ে চাবির গোছাটা কুড়লো আগন্তুক।

—কী আবার! একমাস আমি এসেছি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করবারও সময় হয় না আপনার? এদিকে তো দেখি বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে খুব হৈ-হুল্লোড়! এই বুঝি গবেষণা?

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা সেফের দিকে মুখ করে। আশা বলল,

—ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে হাত-ঘড়িটা দিয়ে এসেছেন। ঘড়িতে তো বছর লেখা থাকে না—ঘণ্টা-মিনিট কবে পার হয়েছে। ক'বছর আমি একা থাকবো!

আগন্তুক তথাপি নিশ্চল। আশা নিদারুণ উত্তেজনায় বলল—কথা বলছেন না যে? আমি কি এতই কুচ্ছিৎ যে, আপনি দেওয়ালের পানেই মুখ করে থাকবেন! কি হয়েছে? আমি কি অপরাধ করেছি? বৈজ্ঞানিকের বুকে কি বউ এর জন্য একটু মমতাও থাকে না।

আগন্তুক যেন ভাবছে, কি করতে হবে...কি বলতে হবে এই আবস্থায়...

আশা এগিয়ে এল এপাশে টেবিলের কাছাকাছি! আগন্তুক এতক্ষণে বই-এর তাকটা দু'হাত দিয়ে যথাস্থানে রাখতে বলল,

—আমি বড় ব্যস্ত আছি লক্ষ্মী আর দিন-পনেবো পরেই আমার কাজ শেষ হবে...

—কাজ পৃথিবীতে সবাই করে! আপনি একাই বিজ্ঞানের সাধনা করছেন না! কাজ আছে বলে আমার পানে তাকাতেও মানা নাকি? নাকি আর কোনো কারণ আছে ভেতরে? থাকে তো বলুন...আশার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল—আবেগ-মাখা কণ্ঠে বলল সে,

—আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম আজ...যা হয় করবেন...আশা আঁচলের ফুলগুলো ঢেলে দিল ওর পায়ে!

নতজানু আশার নয়নাসার-বিগলিত মুখপানে তাকালো সে এতক্ষণে। নীলাভ আলোকোজ্জ্বল কক্ষে আশার অসাধারণ কারুণ্য-সুন্দর মুখশ্রী আবেদন বিহ্বল করে দিল যুবককে!

বিস্ময়-স্তম্ভিত কয়েকটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত!...

আপনার অজ্ঞাতসারে হাতখানা ওর এগিয়ে এল আশার চিবুক স্পর্শ করতে, কিন্তু

অকস্মাৎ থেমে গেল...

—আমি—আমি আজই তোমার সঙ্গে দেখা করবো, লক্ষ্মীটি! এখন বড্ড ব্যস্ত আছি—ওখানে আমাকে অভিনন্দন দেবেন বন্ধুরা। তাঁরা অপেক্ষা করছেন।—আসি এখন—

চলে যাচ্ছে—আশা চোখের জলে আচ্ছন্ন চোখদুটো আঁচলে মুছে দেখলো, চলে গেল স্বামী চাবির তোড়া হাতে। চামড়ার কেস্‌টা নিতে ভুলে গেছে! আশা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল,

—আপনার কেস্‌টা ভুলে যাচ্ছেন যে! বউ ভুললে চলে, বিজ্ঞান ভুললে তো চলে না।

আবার অসীম অভিযোগ ধ্বনিত হোল কণ্ঠে ওর—যুবক অন্ধকার ল্যাবরেটরী থেকে বাইরে বাগানে নামছে। মুখখানা বাগানের দিকেই। জায়গাটা অন্ধকার। আশা ভাল করে স্বামীকে দেখতে চাইলেও দেখা গেল না। যুবক ওখান থেকেই হাত বাড়িয়ে বলল,

—ও...দাও, ধন্যবাদ ত্বরিতে বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে। তারপর মোড়ের মাথায়-দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল।

আশা তখনো দাঁড়িয়ে ল্যাবরেটরীর সিঁড়ির ধাপে। কালিচরণ বাজার নিয়ে ঢুকলো। এই প্রেমাভিনয়ের কিছুই কালিচরণকে সে জানতে দিতে চায় না। নিজেকে সামলে শোবার ঘরে চলে এল আশা। কালিচরণ ভেতরে এসেই আলো জ্বালালো এ-ঘরটার—ধুপের গোছাটা দিল আশার হাতে। আশা ওর থেকে কয়েকগাছা ধুপ টেনে নিয়ে জ্বেলে দিল। বিছানাটাও ঝেড়ে পেতে দিল। তারপর কালিচরণকে বলল,

—আমি যাচ্ছি, কালিচরণ!

ভেতর দিকের বাগানের পথ ধরে অন্তঃপুরে ফিরছে সে।

অন্তরটা আনন্দে নৃত্য করছে যেন! আজ সে কথা বলেছে স্বামীর সঙ্গে। স্বামীও বলেছে আজই দেখা করবে। আশা আবেগ-বিহ্বল ভাবে ভাবছে, আজ তার পরম দিন! সে গিয়ে প্রস্তুত হবে স্বামীর জন্য। কিন্তু শাশুড়ী হয়তো জানতে পেরেছেন আশা এখানে এসেছে। এতক্ষণে লজ্জা অনুভব করলো আশা। নিত্য সন্ধ্যা প্রদীপ সে জ্বালে শাশুড়ীর পূজার ঘরে। তাড়াতাড়ি ফিরে দেখলো পূজা শেষ করে শাশুড়ী দাঁড়িয়ে আছেন। আশাকে দেখে আনন্দের হাসি হাসলেন তিনি। যেন বুঝিয়ে দিলেন হাসি দিয়ে যে, আশার অভিসার-যাত্রার কথা তিনি জানেন। সঙ্কুচিতা আশা কিছু বলবার পূর্বে তিনি বললেন,

—আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, মা—যা, তুই কাপড় ছেড়ে আয়।

আশা আরো লজ্জিত হলো, ঘাড় নীচু করে তিনতলায় নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো ; কিন্তু লজ্জিত হলেও মাতৃসমা শাশুড়ীর স্নেহভরা কথায় আশা পরম আশ্বাস লাভ করলো। বর্তমান যুগে এমন অসাধারণ শাশুড়ী সত্যি দুর্লভ। উনি কাপড় ছেড়ে আবার ফিরে যেতে বললেন পূজার ঘরে। আশা তারই আয়োজন করছে।

তেতলায় তিনখানা ঘর, দুটো শোবার পাশা-পাশি, একটা বসবার। বাকিটা ছাদ। কিন্তু তারই খানিকটা টালি-ছাওয়া বারান্দা দক্ষিণ দিকে। ওখানে টবের উপর নানান ফুলের গাছ, আর আছে একটা দোলনা টাঙানো। আশা ঐ দোলনটায় ব'সে আশিসের ল্যাবরেটরীর দিকে তাকিয়ে থাকে—বেশ দেখা যায় এখান থেকে ল্যাবরেটরীটা। সংলগ্ন স্নানঘরে ঢুকেও আশা তার আজকের বেশ ছাড়তে চাইছে না—এই বেশে সে তার প্রিয়তমের স্পর্শ...না-

না-না, আশার মনে পড়লো আশিস তাকে ছোঁয়ও নি। এ বেশ তার ব্যর্থ হয়েছে। আবার সে নতুন করে সজ্জা করবে। ভাবতেই কেমন যেন মুখখানা মলিন হয়ে উঠলো ওর। একটু ছুঁলো না কেন তাকে আশিস। কেউ তো ছিল না ওখানে! কালিচরণও না। অত নির্জন—অত সুন্দর পরিবেশ, তবু আশিস এমন করলো কেন? বৈজ্ঞানিক কি মানুষ নয়? নির্লজ্জের মতো আবেদন জানিয়েছিল আশা—এতক্ষণে ওর যেন লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু এখন আর করবার কিছু নেই। কাপড় বদলাতে-বদলাতে আশা ভাবতে লাগলো, কে জানে কি মনে করছে আশিস। হয়তো খুবই নির্লজ্জ ভবছে আশাকে।—যা ভাবে ভাবুক গে। আজ এলে ওর-সঙ্গে আলাপের পর জানিয়ে দেবে যে, ঐভাবে স্মরণ করিয়ে না দিলে আশিসের হয়তো মনেই পড়তো না আশাকে।

গা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে আশা নীচে নেমে এল। সমস্ত দেহখানা যেন গান গাইছে ওর। কিন্তু আশিস নিশ্চয় এখানে খেতে আসবে না। ওর রান্না তো ওখানেই করছে কালিচরণ—দেখে এল সে। আশা আজ বলবে যে খাবারটা অন্তত আশিস যেন বাড়ীতে এসেই খায় মুরগী, ডিম না-হয় যেদিন খাবে, ওখানেই খাবে।

—আশিস কি এখানে খেতে আসবে রে আজ? শাশুড়ী প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি, মা—ওদের আজ কিসের পার্টি আছে। খুব ব্যস্ত সব।

শাশুড়ী আর কিছু বললেন না। ছেলে তাঁর পড়াশুনা নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করে—মাংস-ডিম না খেলে তার শরীর টিকবে না। তাই মা ওখানে বাড়ীর পুরাতন চাকর কালিচরণকে রেখে দিয়েছেন। কালিচরণ ভাল রাঁধতে পারে, আর আশিসকে মানুষ করছে ছোট থেকে। আশাকে বললেন,

—তা হলে আর কি আছে? যা গান-টান কর গে!

আশা তবু কিছুক্ষণ বসে রইল শাশুড়ীর কাছে খামোকা—লজ্জা করছে বলা মাত্র উঠে যেতে। শাশুড়ী আবার বললেন,

—আশিস বোধহয় কালই বোম্বাই যাবে। তোকে বলেছে কিছু?

—না, মা...বোম্বাই কেন, মা?

—ওর কী-সব গবেষণা নাকি সেখানে বৈজ্ঞানিকদের শোনাবে। তুই জিজ্ঞেস করিস নে কেন? আমি কি অত সব বিজ্ঞানের ব্যাপার বুঝি। ওর বাবা বিজ্ঞান বিষয়ে আমাকে কত-কি বলতেন, আমি কিছু বুঝতাম না!—হাসলেন মা—শেষে একদিন একটা মজার অঙ্ক দিলেন—

—কী অঙ্ক, মা?—আশা হাসিমুখে শুধালো।

—বললেন, 'দুই বাপ আর দুই ব্যাটায় তিনজন লোক কি করে হয়, বলো?'...

—তা কি করে হবে, মা। দুই আর দুই—চার..

—ঐ তো মজা! ধাঁধা একটা। শোন—তোর ঠাকুরদা আর তোর শ্বশুর—বাপ-বেটা, তোর শ্বশুর আর আশিস—বাপ-বেটা, তাহলে দুই বাপ, বেটা...কিন্তু ওরা হলেন...

—তিন জন—আশাই হেসে বলল,—বেশ তো মজার অঙ্ক, মা!—এমনি আরো কত-কি বলতেন উনি।...যা মা, ওপরে যা!...

হয়তো স্মৃতির বেদনা ঘনিয়ে এল মুখে ওঁর। আশা আর কথা বলল না। ওঁর পায়ে আর অল্পক্ষণ হাত বুলিয়ে চলে এল। ঝি ওর বিছানা পেতে রেখেছে। আশা আবার সাজ

করলো। ঝি-কে শুতে পাঠিয়ে দিল। সারা ছাদটাতে সুন্দর জ্যোৎস্না। রজনীগন্ধার ফুলগুলো টবে-টবে যেন চন্দ্রালোক ধরবার ফাঁদ পেতেছে। টালির ছাদে লতানো মালতীর গন্ধে বাতাস মন্থর-মদির। আশা ফুলসাজে সেজে দোলনটায় বসলো ট্যাবরেটরীটায় আলো জ্বলছে। হয়তো এখনো পার্টি চলছে তাদের। চলুক। বসে বসে গান গাইতে লাগলো।

—"পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি..."

নিজের গাড়ীতে ফিরলো আশিস। ফেরার পথে প্রফেসর দিব্যেন্দুবাবুকে নামিয়ে দিতে হোল তাঁর রসা-রোডের বাড়ীতে। সুতরাং কিছু দেরী হোল তার। অন্যান্য বন্ধুরা যে-যার বাড়ী চলে গেছে। গাড়ী থেকে নামবার সময় বিদ্যেন্দুবাবু ওর পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন,

—বিজ্ঞান-আকাশের জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক হও...আমার আশীর্বাদ।

ল্যাবরেটরীটা অন্ধকারই রয়েছে। কালিচরণ আলো জ্বালেনি।—কালিচরণ—ও কালিচরণ...ডাক দিল আশিস। কালী জবাব দিল,

—যাই...

কিন্তু কালিচরণ আসার পূর্ব্বেই আশিস শোবার ঘরে ঢুকে শিলিং-এর আলোটার সুইচ টিপলো। আলোয় আলোময় হয়ে গেল ঘর। ধূপের গন্ধে বাতাস ভারী—বিছানাটা ভাল করে পাতা রয়েছে। মেঝেতে মাধবীগুচ্ছের ছড়াছড়ি। ব্যাপার কি! কে এসেছিল এখানে! আশিসকে বেশী ভাববার অবসর না দিয়েই কালিচরণ এসে দাঁড়াল।

—এসব কি, কালিচরণ? কে এসব করলো! ধূপ? ফুল—

—বউরাণীমা এসেছিলেন, দাদাবাবু!

—এখানে?

—এজ্ঞে—

বিস্ময়ের সঙ্গে অপূর্ব আনন্দের সুরে আশিস শুধু বলল,

—আচ্ছা, যাও। তুমি কি করছো?

—এজ্ঞে রান্না করছি।

আশিস আর কিছু বলল না, বিছানায় শুলো বিশ্রমের জন্য। কালিচরণ চলে গেছে। আশিস কিন্তু দেখতে পেল টেবিলের বইগুলো যেন ঠিকমত নেই। আশাই হয়তো নাড়াচাড়া করছে। মৃদু মৃদু হাসছিল আশিস—আপন মনে গাইতে লাগল,

—"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত-সুদূর—আমার সাধের সাধনা..."

মেঝে থেকে একমুঠো ফুল তুলে নিল আশিস গানটুকু গাইতে গাইতে—বুকে রাখছে, অকস্মাৎ দেখতে পেল—কোমল-সুন্দর মাধবী-গুচ্ছে কাদা লেগে রয়েছে। পুরুষের ভারী জুতার তলার কাদা। একি! কাদা কেন ফুলে? বৈজ্ঞানিক আশিস বিস্মিত হয়ে পরীক্ষা করছে—কাদাটা হাতে লাগলো ওর। কেমন যেন সন্দেহ জেগে উঠলো মনে। ত্বরিতে উঠে ঘরখানা তদারক করতে আরম্ভ করলো—

টেবিলের কাছে এসে বই-এর তাকটা দেখলো, সরিয়ে আয়রন-সেফের ডালাটা খুলে ড্রয়ার টানলো—চামড়ার ব্রীফ-কেসটা নেই!

চোখ দুটো কপালে উঠে গেল আশিসের! একি আশ্চর্য্য! কী হোল তার চামড়ার কেস্‌টা! বিবর্ণমুখে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে আশিস ডাক দিল,

—কালিচরণ?

কঠোর কঠিন আহ্বান-স্বর। উনুনে খোন্তা চালাচ্ছিল কালিচরণ, সব ফেলে ছুটে এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। আশিস বলল,

—বউরাণী কতক্ষণ ছিল এখানে?

—এজ্ঞে অনেকক্ষণ...

—আর কেউ ছিল? ওর কোন বন্ধু বা ওর ঝি...

—এজ্ঞে...না,...নীতিশ দাদাবাবু এসেছিলেন!

—নীতিশ?

—এজ্ঞে! আপনারা সব চলে যাবার পর বৌরাণী আমাকে ধূপ আনতে বললেন, আমি বাজারে গেলাম—ফেরার সময়...

—কী দেখলে...আশিস তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কালীমাথা নীচু করে বলল,

—দেখলুম...আমি তখনো গেটে ঢুকি নাই, হুজুর—হে বাইরে আমি রাস্তায় দেখতে পেলুম...নীতিশ দাদাবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্চেলেন, বৌরাণী তাঁকে ডাক দিয়ে কি-যেন একটা...

—দিলেন?

—এজ্ঞে! নীতিশ দাদাবাবু সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন..., কি হইছে হুজুর?

আশিস উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইল! কালীর প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হোল ওর। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—কিছু না সব ঠিক আছে। যাও, তুমি রান্না করো-গে।

কালিচরণ কিন্তু তার পরেও আধমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল পাশের রান্নাঘরে। আশিস জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল আলোতে ঝলসে যাচ্ছে যেন ঘরখানা। আয়রন-সেফটা খোলা, বইগুলো বিপর্যস্ত! আশিস আকাশের চাঁদটা মেঘের আড়ালে সরে সরে যাওয়ার খেলা দেখছে। চাঁদটা লুকিয়ে গেল মেঘে। হ্যাঁ, লুকিয়ে গেল! আশিসের জীবন-চন্দ্রিমাও লুকালো বুঝি। সবই পরিষ্কার হয়ে গেল কালিচরণের কথায়। নীতিশ এ কাজ করলো? নীতীশ! তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু—তার মার পুত্রসম স্নেহপাত্র! হ্যাঁ, অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ নেই। তাই নীতীশ আর এল না এখানে। কিন্তু...আশিস এমুখো হতেই আলোর ছটা চোখে লাগল ওর—জলভরা ওর চোখ যেন জ্বলছে! আলোটা নিবিয়ে দিল। অন্ধকার! আশিস মাতালের মতো টলতে টলতে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে দাঁড়ালো—আরো জমাট অন্ধকার। যেন ভুতুড়ে বাড়ী। কিন্তু শোবার ঘরটা ওর সহ্য হচ্ছে না—যেখানে ঐ ধূপ ঐ ফুল-ছড়ানো মেঝে—ঐ রচিত শয্যা...না, আর ঢুকবেনা ও-ঘরে! স্তব্ধ আঁধারে একা দাঁড়িয়ে আশিস ভাবতে লাগলো, আগামী কাল 'এয়ারে, তার বোম্বাই যাবার কথা। সেখানে বিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে সে তার গবেষণার সত্য শোনাবে—এই ঠিক আছে। কিন্তু...কী শোনাবে আশিস আর! কোথায় তার গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার! হয়তো নীতীশই এতক্ষণ রওনা হয়ে গেল তার নিজের নামে সেটা দাখিল করতে।

চক্রান্ত! দীর্ঘদিনের 'ডেলিবারেট্'—সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এরই জন্য নীতীশ এমন করে তার সাহায্য করেছে গবেষণাগার কাজে। সব অন্ধিসন্ধি ভাল করে জেনে নিয়েছে, তার পর পূর্ণতা-প্রাপ্ত থিসিসটি চুরি করলো। ওঃ।

—'মা,—মা!'...আশিস যেন আর্তনাদ করে উঠলো অন্য একটা চিন্তায়। একি হোল! একি সর্বনাশ ঘটলো তার জীবনে? সব আলো যে নিবে গেল তার চোখে আজ!—তার থিসিস্ চুরি করতে নীতীশকে সাহায্য করেছে তার-ই মার নির্বাচিতা বধূ আশা! সে-ই নিজের হাতে নীতীশকে দিয়েছে ঐ থিসিস! সর্বনাশের আর বাকী কী আছে। থিসিস্ গেল, যাক্। 'ডক্টরেট' না-হয় নাই হোল আশিস। নাই-বা পেল বৈজ্ঞানিকের সম্মান। কিন্তু মুধুর গৃহকোণ যে তার অন্ধকার হয়ে গেল আজ। তার বিবাহিত বধূ বিশ্বাসঘাতিনী! ব্যাভিচারিণী...আশিস আর ভাবতে পারছে না।

—'উঃ!'—আর্তনাদ করে ল্যাবরেটরীর টেবিলটায় বুক রাখলো সে, মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে।

সমস্তই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে চোখের উপর। বরাহনগরেই কে-যেন আত্মীয় আছে নীতীশের। মাঝে মাঝে যায় সে সেখানে। আশার সঙ্গে নিশ্চয় তার আগের আলাপ আছে, তাই এমন অঘটন ঘটলো। আশা তার প্রেমাস্পদকে সাহায্য করলো এইভাবে। কিন্তু লোহার সিন্দুকের চাবি কোথ্যয় পেল আশা। হ্যাঁ, মনে পড়ল, ওর ডুপ্লিকেট চাবি মার কাছে আছে। সেখান থেকে চাবি সংগ্রহ করা আশার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। মার আদরিণী বধূ সে! ওঃ?...

পার্টিতে কিছুক্ষণের জন্য নীতীশের অনুপস্থিতির কথা—তার পর তার অস্বাভাবিক ব্যবহার, তার অসংলগ্ন কথা, অসুখের অছিলা—সবই মনে পড়লো। আর মনে পড়লো এখানকার ধূপসুরভিত ঘর-ফুল ছড়ানো বিছানা...'উঃ'—আশিস আবার আর্তনাদ করে উঠলো।

—দাদাবাবু। দাদাবাবু?—কালিচরণ ডাকছে,—কী হোল, দাদাবাবু?

—নাঃ, কিছু না!—আশিস মাথা তুলে বলল,—মাথা ব্যথা করছে, কালিচরণ।

—মাথা টিপে দিই এসো, দাদাবাবু—শোও বিছানায়—

—না, যা তুই! যা...আশিস নিজেকে সামলে বসলো চেয়ারে। কালিচরণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশিস আবার ধমক দিল।

—যা-না এখান থেকে!

নিরুপায় কালিচরণ চলে যাওয়ার পর আশিস ডায়্যাল ঘুরিয়ে ফোন করলো দিব্যেন্দুবাবুকে। তিনি সাড়া দিতেই বলল,

—আমি আশিস, কাকাবাবু—আপনাকে এত রাত্রে ডাকছি, ক্ষমা করবেন!

—না-না, ক্ষমার কি হয়েছে? কী ব্যাপার, আশিস? তোমার গলা অমন করুণ কেন?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে কাকাবাবু—থিসিস্ চুরি হয়ে গেছে।

—অ্যাঃ। চুরি?

দিব্যেন্দুবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, বসে পড়লেন একেবারে। ঘুম-চোখেই উঠে এসেছেন নি। কিন্তু কী তিনি বলবেন আশিসকে। বললনে,

—চুরি কি করে হোল, আশিস? কোথায় ছিল? কাকে তোমার সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ করার কিছু নেই, কাকাবাবু! ও গেছে, যাক্! কিন্তু আপনিই আমার বোম্বাই যাবার ব্যবস্থা করেছেন—আমার যা-হয় হোক, আপনার মাথাও হেঁট হবে!

—না-না, আশিস, ওর জন্য ভেবো না। আমি সকালেই বিজ্ঞান-পরিষদে 'টেলী' করে

দেবো—'অনিবার্য্য কারণে তুমি যেতে পারবে না'। কিন্তু চোরকে ধরতেই হবে, আশিস আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি...

—না না, কাকাবাবু...আশিস কান্নাভরা গলায় বলল, পুলিসে খবর দেবেন না। ওর সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে...

—পা—রি—বারি—ক্...বিস্ময়ে ফোনের রিসিভার পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে ওঁর.

—আ—জ্ঞে...হ্যাঁ। 'হ্যাঁ' কথাটুকু আটকে যাচ্ছে ওর গলায়। আশিস আবার কোনো রকমে বলল,—আপনি শোন-গে, কাকাবাবু, সকালেই 'টেলি' করে দিতে হবে বোম্বাই এ...ফোন ছেড়ে দিচ্ছে আশিস।

—শোনো আশিস—দিব্যেন্দুবাবু বললেন,—শোনো। কে সেই কাল্‌প্রিট? কে? কে চুরি করেছে?

—মাফ করুন, কাকাবাবু—আজ আর কিছু প্রশ্ন করবেন না!—

আশিস লুটিয়ে পড়লো টেবিলের উপর। হাতে রিসিভারটা। কালিচরণ আস্তে আস্তে এসে উঁকি দিয়ে দেখলো ওকে! একি! হোল কি? কাঁধের গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে সে মাকে খবর দিতে গেল।

ঢং...সাড়ে বারোটা বাজছে দেওয়াল-ঘড়িটায়। দুটি কাঁটায় প্রায় একটি সরলরেখার সৃষ্টি হয়েছে। অমনি সরল হয়ে গেল থিসিস্-চুরির রহস্যটাও। কিন্তু না—ঠিক সরলরেখা তো হয়নি কাঁটা-দুটো! একটু বাঁকা রয়েছে। থিসিস-চুরির ব্যাপারটাও রয়েছে যেন বাঁকা, রহস্যাবৃত! আশা—যাকে এখনো ভাল করে দেখেনি আশিস, যে কোনোদিন এখানে আসে নি, সে আজ এসেছিল এখানে। তৈরী হয়েই এসেছিল নীতীশের জন্য। আর, নীতীশ হয়তো চিঠি লিখে, অথবা টেলিফোনে—অথবা যে-ভাবেই হোক আশাকে অনুরোধ করেছিল তার চুরিতে সাহায্য করতে! তাই আশা ধূপ কেনার ছলনায় কালিচরণকে সরিয়ে নীতীশের সঙ্গে...নাঃ, আশিস আর ভাবতে পারে না।

মার নির্বাচিতাই শুধু সে নয়, মার আদরিণী পুত্রবধূ। মার স্নেহদুলালী! তার আজকের কীর্তি মাকে জানালে মার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। না-না-না...যত ক্ষতি আশিসের হয় হোক, মার মনে সে ব্যথা দেবে না। নিশ্চল, নিঝুম পড়ে রইল আশিস টেবিলে মাথা রেখে...

—আশিস, বাপ আমার! কি হোল রে?—এই যে আমি এসেছি, আমি—মা তোর.

—'মা...মা—' আশিস দু'হাতে বাড়িয়ে মার কোলে মুখ লুকুলো! মা ওর মাথার স্নেহ-হস্ত বুলুতে বুলুতে—কালিচরণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন,

—তুই যা, কালিচরণ, যা এখান থেকে এখন—

কালিচরণ সরে গেল মাতা-পুত্রের পানে সকরুণ দৃষ্টি দিয়ে। কী হোল তার মনিবের কিছুই সে বুঝতে পারছে না। রান্নাঘরে এসে খাবারগুলোর দিকে চোখ দিয়ে ওর চোখ জলে ভরে এল।

—আশিস?...মা ডাকলেন,—কী হয়েছে, বল আমায়।

—আমার থিসিস্‌টা চুরি হয়ে গেছে ; মা—যাক্‌গে মা, তুমি দুঃখ পেও না।

—না, মাণিক! না! আমি দুঃখ পাব না। কিন্তু কি করে চুরি হোল?

—হোল, মা—হোক গে! তোমার আশীর্ব্বাদ তো চুরি করেনি কেউ?...মা! বালকের

মতো আর্তকণ্ঠে ডাক দিল আশিস! বলল,

—তুমি কিছু দুঃখ কোরো না, মা...আমি আবার গবেষণা করবো আবার লিখবো—

—না, মাণিক আমার, দুঃখ কি! কিন্তু—কে সে আশিস, কে চুরি করলো থিসিস্ তোর? বল, আমি জানতে চাই কি-ভাবে চুরি হোল। নিশ্চয় তোর কোনো বন্ধুই...

—হ্যাঁ, মা...হয়তো এতক্ষণ সেটা নিজের নামে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করছে। হয়তো...যাক্ গে, মা, যাক্—যেতে দাও...

—যাক্...মা চোখের জল আঁচলে মুছে বললেন,—তোর কোনো ক্ষতি হবে না, আশিস আমি মা তোর, আমার আশীর্বাদ অমোঘ হোক তোর জীবনে...

—হবে, মা—হবে...আশিস মার কোলে আরো ডুবে গেল।

মাতা-পুত্র স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ওখানে। মুহূর্ত গুনছে দেওয়ালের ঘড়িটা মা নিজেই সামলে বললেন,—পুলিশে খবর দিবিনে তুই?

—না! হয়তো সে আমার বিশেষ বন্ধু—তোমারও স্নেহপাত্র হয়তো সে—

—ও—বুঝেছি আমি—আশিস। একটু থেমে বললেন,—শুনেছি শ্রীচৈতন্যদেব বন্ধুর জন্য নিজের লেখা ন্যায়শাস্ত্র গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন! তাতে ভগবান শ্রীচৈতন্যের গৌরব মলিন হয়নি আশিস! তোরও হবে না। তোরও গৌরব উজ্জ্বল হবে!

হ্যাঁ, মা—তোমার আশীর্বাদ ফলবেই!—কিন্তু মা—আশিস বলল,—আমার লোহার সিন্দুকের ডুপ্লিকেট চাবিটা কোথায় রেখেছ তুমি?

—সে তো আমার পূজোর ঘরে বাক্সে আছে, আশিস! আমি দেখছি গিয়ে, ঠিক আছে কিনা—

—কিছু দরকার নেই মা! সে-চাবি হয়তো সেখানেই আছে।—তাহলে?—মা উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে আছেন। আশিস বলল,

—না, মা কিছু না! আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে চাবি খোলা কিছু কঠিন নয় মা—চোরে সেটা খুলতে পারে—আমি সকালেই বোম্বাই যাব, মা—ওখানে গিয়ে বলতে হবে যে অনিবার্য্য কারণে আমার থিসিস্ দাখিল করা সম্ভব হোল না এখন—

—তাই যাবি, বাবা...

চাঁদের হাসি ছড়ানো সন্ধ্যা—

রিক্সার ওপর যে লোকটা বসে আছে, সে কি মদ খেয়েছে! অথবা অত্যন্ত অসুস্থ ও? চোখদুটো লাল—মুখখানাও কেমন যেন—

মোড়ের দোকানদার ভাবছিল নীতীশের এলানো দেহখানা দেখে। ওকে চেনে এখানকার সকলেই। ঐ ভাঙা বাড়ীটার ওদিকের ঘরখানায় একাই থাকে। টিউশানি করে, আরো কি যেন করে—কেউ খবর রাখে না! হয়তো সিনেমায় অভিনয় করে।

এমন সন্ধ্যায় ওকে কদাচিৎ বাড়ী ফিরতে দেখা যায়। আজ ফিরলো হয়তো অসুস্থ বলে। নীতীশ ঘাড় তুলে দোকানীকে বলল,

—পাঁচ প্যাকেট কাঁচি—

—টিন-ই নিন না একটা—

দাম দিয়ে টিনটা নিয়ে নীতীশ রিক্সাওয়ালাকে চলতে বলল,

চলেছে রিক্সা। আরো খানিক এসে গলি—রিক্সা ঢোকে না! নীতীশ নামলো। ভাড়া দিয়ে টলতে টলতে ঢুকলো গলির মধ্যে, তারপর একতলার একটা ঘর খুলে ঢুকে পড়লো। আলো নেই। একটা মোমবাতি জ্বালালো ও! দেশী লণ্ঠন একটা আছে, কিন্তু কে জ্বালায়! হয়তো তেল নেই। নীতীশ দেখেনি গতকাল থেকে।

বড় ব্যস্ত ছিল সে। ব্যস্ত ছিল বিশেষ একটা কাজে।

মোমবাতির আলোতেই তক্তাপোষের উপর অর্দ্ধমলিন বিছানাটা দেখে নিল—সিগারেটের টিনটার ঢাকনা ঘুরিয়ে খুলে একটা বের করে ধরালো ঐ মোমবাতির শিখাতেই। তার পর শুয়ে পড়লো।

শুয়েই রইল খানিকক্ষণ। মোমবাতিটা প্রায় অর্দ্ধেক পুড়ে গেছে। অকস্মাৎ উঠে বসলো নীতীশ—পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করে শেষেরটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, বালিশের তলা থেকে বের করলো একটা কেস। সুন্দর শোভন কেস্‌টি। সোনালী অক্ষরে নাম লেখা—'আশিস আচার্য্য। উন্মনা হয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো সে কেস্‌টা, তার পর চেন টেনে খুলে ফেললো! ভেতর থেকে টেনে বের করলো একতাড়া কাগজ, টাইপ করা, ক্লিপ আঁটা 'থিসিস্‌।' পূর্ণাঙ্গ—পরিপূর্ণ। শুধু শেষের সইটা করা নেই। ডুপ্লিকেট কপিও রয়েছে। সহি করে দাখিল করে দিলেই হয়! কিসের থিসিস্‌ কী ওতে আছে—সবই জানা নীতীশের। থিওরী-র সবটাই প্রায় সে জেনেছে, শুধু প্র্যাকটিস-এর কিছু অংশ জানা হয়নি। কারণ সকল সময় আশিসের কাছে সে থাকবার সময় পেত না কিন্তু তাতে কিছুই এসে যাবে না! সেও বৈজ্ঞানিক এবং প্রতিভা তাকে কিছু কম দেননি ভগবান!

ঐ থিসিসের সত্যতা প্রমাণ করতে পারলে একদিনেই নীতীশ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে! কাগজগুলোর পানে তাকিয়ে ওর চোখদুটো জ্বলে উঠলো একবার—বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো সে কাগজের তাড়াটি। তারপর সবগুলো ভরলো কেসের মধ্যে। একখানা চাকু-ছুরি তুলে নিয়ে সোনালী নামটা চেঁচে তুলে ফেলছে—আর ভাবছে, এই 'থিসিস্‌' দাখিল করবে সে বিজ্ঞান পরিষদে—নিজের নামেই দাখিল করবে! অভাগা, অন্নবস্ত্রহীন নীতীশ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সম্মান লাভ করবে—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-খ্যাতি লাভও বিচিত্র নয় তার পক্ষে এখন আর ...কিন্তু নামটা সহজে উঠছে না!

—"ধুত্তোর!'...নীতীশ ছুরিখানা ফেলে কেস্‌ থেকে আবার কাগজগুলো বের করলো. খাটের তলা থেকে ধূলিমলিন টিনের সুটকেস্‌টা টেনে বের করে চাবি খুলে রাখলো থিসিস্‌টি তার ভেতর। ডালা বন্ধ করে চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাইরে এল। সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা আকাশ! নীতীশ নিঃশব্দে গলির ওদিকের একটা খাটা পাইখানার ময়লার ভেতর ফেলে দিল চামড়ার ব্যাগটা। ব্যাস সকালেই মেথর ওটা নিয়ে চলে যাবে!

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরলো নীতীশ। এতক্ষণে মনে হোল বেশী সময় নেই এখুনি ওকে পালাতে হবে! এরই মধ্যে হয়তো পুলিশ এসে খোঁজ করছে চোরকে। হয়তো নীতীশের কাছেও খোঁজ করতে আসবে পুলিশ। হ্যাঁ, আশিসের সব বন্ধুদেরই বাড়ী তল্লাসী হতে পারে—দিব্যেন্দুবাবুও বাদ যাবেন না।...ঘরে ঢুকে নীতীশ ভাবলো, আজ খোঁজ না-ও করতে পারে আশিস তার থিসিসের। সে তো জানে যে, ওটা নিরাপদ জায়গায় লোহার-সিন্দুকেই আছে...কিন্তু যদি খোঁজ করে? ত্বরিতে জামা-কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে নীতীশ ভাবলো, একখানা চিঠি সে লিখে রেখে যাবে এখানে। লিখলো তৎক্ষণাৎ :

"ভাই আশিস, কুম্ভমেলায় বহু ব্যক্তির হতাহত হওয়ার খবরে বিচলিত হয়ে আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি। পিসিমা গেছেন ওখানে। কে জানে তাঁর কি হোল! শিগ্রি ফিরবো—নীতীশ।"

বড় বড় করে চিঠিখানা লিখে দেবদারু কাঠের আড়াই টাকার টেবিলে চাপা দিয়ে রাখতে গেল—অকস্মাৎ ঐ টেবিল থেকে কী একটা পড়লো ওর পায়ের উপর...কী ওটা! নীতীশ মোমবাতীর ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেল 'ফটো'—আশার বাবার আনীত সেই ফটোখানা। চমকে উঠলো নীতীশ। বাঁ পায়ের উপর পড়ে ফটোটা যেন মিনতি জানাচ্ছে! নীতীশ এক দু'সেকেন্ড কিছু ভাবতে পারলো না, তারপর তুললো ফটোখানা—আশিসের মা ওকে দেখতে দিয়েছিলেন। নীতীশ নিজে দেখে আশিসকে বলেছিল,

—দ্যাখ ফটোখানা—

—মা যাকে দেখে আনবেন, তাকে আবার আমি দেখবো কি-রে?—আশিস বলেছিল।

—কিন্তু মা যদি তোর মনের মতো না আনতে পারেন। যদি কালো কুচ্ছিৎ কাউকে...

—চুপ কর, নীতীশ—মা প্যাঁচা আনলেও, সে আমার লক্ষ্মী হবে।

আশিসের কড়া জবাবে নীতীশ আর কিছু না-বলে ফটোখানা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিল। তারপর হয়তো জামা খুলবার সময় টেবিলে রেখেছিল! এযাবৎ সেটা ওখানেই আছে! মোমবাতীর কাছে এসে ফটোটা দেখতে লাগলো নীতীশ। আজই শরীরিণী আশাকে দেখেছে সে। কী করুণ আবেদন জানিয়েছিল আশা!—

—'আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম...যা-হয় করবেন...'

নীতীশ জানে আশার সঙ্গে আশিসের এখনো মিলন হয়নি। হলে নীতীশই সর্বাগ্রে সেটা জানতো। আর, হয়নি তাঁর প্রমাণ তো নীতীশ আজই পেয়েছে। আশা, নীতীশকেই 'আশিস' ভেবে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিলো—এবং, সেই অকল্পিত সুযোগটুকু গ্রহণ করেই নীতীশ নিরাপদে কেস্‌টা আনতে পেরেছে, এবং এখনো নিরাপদে রয়েছে। কিন্তু, এর মধ্যে যদি আশা বলে দিয়ে থাকে আশিসকে! না, নীতীশ জানে, আশিসের সঙ্গে আশার এখনো পূর্ণ-মিলন ঘটেনি। তবে আজই ঘটতে পারে—হয়তো...আর একটা কথা মনে পড়লো নীতীশের।

—'বউকে ভোলা যায়—বিজ্ঞান ভুললে কি চলে?''...

কী করুণ আবেদন! কী মরম-ভাঙা কথা...নীতীশ ভাল করে দেখলো ফটোটা। কয়েকটা মিনিটের জন্য সে আজ এই অপরূপার স্বামী সাজবার সুযোগ পেয়েছিল! অনায়াসে নীতীশ আজ ওকে স্পর্শ ক'রে—প্রেমাভিনয় করে...না না না, নীতীশ অতটা নীচ নয়। থিসিস্ চুরি করেছে বলে কী অতখানি নীচে নেমে যাবে নীতীশ? না। নিশ্চয় না!—ফটোটা বুক-পকেটে ভরলো নীতীশ।

পালিয়ে যাওয়ার বেশ পরেও নীতীশ থেমে রইল বেশ কিছুক্ষণ! নিশ্চল ওর মূর্তি। যেন পাথরের! হঠাৎ কোথায় একটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। নীতীশ চমকে উঠে প্যান্টের পকেটে সিগারেটের টিনটা ভ'রে, সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো পথে। দরজায় শেকল টেনে তালা দিল বেরুবার সময়।

চলেছে নীতীশ প্রায়ান্ধকার পথ বেয়ে। চিন্তিত। চঞ্চল ওর চরণক্ষেপ—কিন্তু তবু ও

চলেছে। আশার অর্ঘ্য দেওয়ার ব্যাপারটাই স্বপ্ন দেখছে যেন—'বউ ভুললে চলে, বিজ্ঞান ভুললে চলে না!'

গভীর রাত্রির স্তব্ধ পল্লীপথ অতিক্রম করে নীতীশ একটা লাইট-পোষ্টের নীচে এসে দাঁড়ালো—বুক-পকেট থেকে বার করলো ফটোখানা। আলোতে দেখলো; পকেটে রাখতে গিয়ে আবার ভাল করে দেখলো নীতীশ। আশা যেন বলছে—'বৈজ্ঞানিকের বুকে কি বউ-এর জন্য একটু মমতাও থাকে না?...মমতাও থাকে না!—'

'মনুষ্যত্বও থাকে না' কথাটা সে বলেনি। বলতেও তো পারতো! অসত্য হোত না সে-কথা। নীতীশ বিহ্বলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইল! জায়গাটা ফাঁকা কাউকে দেখতে পেল না।

না-না, মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ করবে না নীতীশ! 'না, তোমার কিছু আমি চুরি করবো না! কিছু না...কিছু না—' নীতীশ যেন ফটোটাকেই শুনিয়ে বলছে,—'দেবী! এক মুহূর্তের জন্য তোমার স্বামীত্বের অধিকার আমি চুরি করেছি—আর না, আর কিছুই আমি চুরি করবো না তোমার! তোমার কুমারী-প্রেমের প্রথম অর্ঘ্য আমি চুরি করেছি....আর না...

নীতীশ ফটোখানা বুকে ছুঁইয়ে পকেটে রাখলো। ওখানে দুটো রাস্তা দু'দিকে গেছে। নীতীশ যেটায় যাবে ঠিক করেছিল, সেটা ছেড়ে অন্যটায় হাঁটতে লাগলো—বালিগঞ্জের দিকে, আশিসের ল্যাবরেটরীর দিকে।

মনীরুদ্দিন ষ্ট্রীটের গেটে এসে দাঁড়ালো নীতীশ। হাতে সুটকেস। কিন্তু গেট বন্ধ। নিস্তব্ধ বাড়ীখানায় কোথাও আলো জ্বলছে না। হয়তো সব ঘুমুচ্ছে। তাহলে এখনো চুরির ব্যাপারটা জানাজানি হয়নি নিশ্চয়ই! হোলে পুলিশ আসতো—পাহারা বসতো, কত কী হোত তাহলে আশিসও আজ হয়তো বাড়ীতে শুয়েছে। নইলে এখানে একটা আলো অন্তত জ্বালা থাকতো। থাকে, জানে নীতীশ। কেউ তবে এখনো টের পায়নি চুরির কথা। ভালই হোল নীতীশ থিসিস্‌টা ভেতরে রেখে দেবে—কিন্তু চাবি কোথায়? ঢুকবে কেমন করে! নীতীশ গেটের কাছে এসে সুটকেস্‌টা নামিয়ে কাগজগুলো বের করলো, তারপর গেট ডিঙিয়ে ভেতরে যাবে—অকস্মাৎ...

—কে! কে ওখানে?—কালিচরণের কঠিন কণ্ঠস্বর।

কাগজের তাড়াটা চট করে বাঁ বগলে চেপে নীতীশ সুটকেস্ নিয়ে মুহূর্তে সরে গেল কোণের দিকে। কিন্তু দেখতে পেল ল্যাবরেটরীটা আলোতে আকীর্ণ হয়ে উঠলো তৎক্ষণাৎ। নিস্তব্ধ রাত্রে মার কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

—কে এসেছিল কালিচরণ?

—এজ্ঞে, চোর হবেক...

—চোরের স্বপ্ন দেখছো নাকি তুমি ঘুমুতে ঘুমুতে? চুরি যা হবার, হয়েছে—আর কি চুরি হবে! আলো নিবিয়ে দাও। ছেলেটা একটু ঘুমিয়েছে এইমাত্র—

নীতীশ মার কথাগুলো সবই শুনলো দাঁড়িয়ে, বুঝলো, চুরির কথা প্রকাশ হয়ে গেছে এবং মা ঐ ল্যাবলেটরীতেই রয়েছেন। বেশ শুনতে পেল নীতীশ ল্যাবরেটরীর কোণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে! হয়তো আশাও আছে ওখানেই।

আলোগুলো নিবে গেল ল্যাবরেটরীর। নীতীশ কি করবে! কি-ভাবে সে যাবে থিসিস্‌টা আবার ওখানে রেখে দেবার জন্য? না, কোনো পথ নেই। নীতীশ উন্মনা হয়ে হাঁটতে লাগলো জনহীন রাজপথে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ... একখানা খালি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো

নীতীশ। ড্রাইভারকে বলল, 'হাওড়া ষ্টেশন।' অনেকখন এসে খেয়াল হোল, থিসিস্‌টা বগলেই রয়েছে। সুটকেসে ভরলো সেটা। দীর্ঘপথ নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে বসে আছে নীতীশ সুটকেসটা পাশে নিয়ে। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আর টানছে—মাঝে মাঝে চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আবার নিবে যাচ্ছে আকস্মিকভাবে। কী যে ও ভাবছে ঠিক নেই! চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। ভাবছে, এই থিসিস্‌টা চুরি করবার মতলব ওর মাথায় তিন চার দিন পূর্বেও ছিল না—অকস্মাৎ আশিস গবেষণায় সাফল্যের কথা শোনালো তার বন্ধুদের এবং দিব্যেন্দুবাবুকে ; দিব্যেন্দুবাবু সব শুনে বললেন,—"অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করেছ। এ থিসিসের একটা ভগ্নাংশ পেলেও যে কোনো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপরিষদে স্থান পাবে। খুব সাবধান, যেন চুরি না যায়...'

চুরির কথাটা কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুই বলেছিলেন। অনেক বন্ধুই ছিল সেখানে। কিন্তু চুরি করে ওটাকে কাজে লাগাতে নীতীশ ছাড়া অপর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, অত ভেতরের কথা কেউ আর জানে না। চুরির প্ল্যানটা কে জানে কেন, তখুনি মাথায় এসেছিল নীতীশের। তার এই পরিণাম। এর জন্য সে প্ল্যান করেছে, প্রোগ্রাম করেছে—এবং পার্টির দিন ওটা চুরি করবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করেছে। কিন্তু কে জানতো যে, আশার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে!

নীতীশ ভাবতে লাগলো—'থিসিস্' যে চুরি হয়েছে, সেটা আশিস এবং আর সকলে জানলেও, কে চুরি করেছে তা তো জানবার কথা নয়। আশা তাকে দেখেছে। কিন্তু 'নীতীশ' বলে তাকে চিনতে পারেনি আশা। 'আশিস' ভেবে সে-ই শেষকালে কেস-টা নীতীশের হাতে তুলে দিয়েছে। তখনি নীতীশ বলতে পারতো, সে আশিস নয়, নীতীশ। তার পূর্বেও বলতে পারতো আশার ভুল হচ্ছে, সে নীতীশ! কিন্তু আশার ভুল ভাঙাতে ওর ইচ্ছে হয়নি। কেন?

নিজেকে কঠোর প্রশ্ন করলো নীতীশ—কেন সে ভুল ভেঙে দিল না আশার? বলতে তো পারতো যে 'সে নীতীশ, আশিসের বন্ধু। এ বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার। সে এসেছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে'...না, ইচ্ছে করেই বলেনি নীতীশ—থিসিস্‌টা চুরি করে পালিয়ে আসবার জন্য নয়—থিসিস্ সে ভুলেই গিয়েছিল মানসিক উত্তেজনায় ; নীতীশ আশার ভুল ভেঙে দেয়নি একমুহূর্তের জন্য তার স্বামী হবার প্রচণ্ড প্রলোভনে! তার অপরূপ সুন্দর নয়নাসার-বিগলিত মুখখানাকে একবার ছোঁবার আকাঙ্ক্ষায় একটি মধুর চুম্বন... না—না—না। নীতীশ এসব কি ভাবছে? চোর সে। শুধু থিসিস্ চোরই নয়—এক সতী বধূর স্বামিত্ব চুরি করে পালাচ্ছে সে। যখন জানবে আশা—জানবেই, হয়তো জেনেছে এতক্ষণ তার পুষ্পার্ঘ্য যে নিয়ে গেল সে ঘৃণিত চোর—সে বিশ্বাসঘাতক, সে বন্ধুদ্রোহী...

থিসিস্ চুরির থেকে যে এই চুরিটাই বড় হয়ে উঠলো এখন! আশা নিশ্চয় এতক্ষণ জেনেছে যে, যাকে সে স্বামী ভেবে অন্তরভরা প্রেম নিবেদন করেছে—সে চোর! হয়তো তার সেই আয়ত-সুন্দর চোখে ঘৃণার বহ্নি জ্বলছে এতক্ষণ!

কিন্তু সে যে 'নীতীশ', আশা তা জানবে কেমন করে? না, জানবে না। কারণ কোনো সময়ই নীতীশ তাকে মুখ দেখায়নি ; আর দেখলেও, আশিসের অত বন্ধুর মধ্যে নীতীশকে তার চিনে রাখবার কথা নয়। চিনতে পারলে, শেষের কথাটা সে বলতো না আসবার সময়—'বৌ ভুললে চলে...'

কী করুণ আবেদন! পূর্ণাঙ্গী এক তরুণীর কণ্ঠের ঐ কথাটুকু যেন সিদ্ধমন্ত্র! 'নীতীশ' নিজেকে আশিসের স্থানে বসিয়ে ভাবতে লাগলো—সে সত্যি আশিস হলে থিসিস্ খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আশাকেই বুকে ধরতো চেপে। কিন্তু সে 'আশিস' নয়। দুর্ভাগ্য!.

না, দুর্ভাগ্য কেন? যা সে করেছে, করেছে! অনুতাপ কেন? সে বড় হবে। এই থিসিস্ সে দাখিল করবে বিজ্ঞান-পরিষদে। বিশ্বজোড়া নাম কিনবে বিশ্ব-বিদিত বৈজ্ঞানিক হবে—আশাকে দেখিয়ে দেবে—তার একমুহূর্তের ভুলের জন্য এক ভিখারী সম্রাট হয়ে গেল!

উত্তেজিত নীতীশ চেয়ে দেখলো হাওড়া ব্রীজ পার হচ্চে ট্যাক্সিখানা। ষ্টেশনে গিয়ে কোনো লাভ নেই। এখন কোনো গাড়ী ছাড়ার সময় নয়! নীতীশ ড্রাইভারকে বলল,—রোকো—

ব্রেক কষে ড্রাইভার প্রশ্ন করলো, ব্রীজের মাঝে কী করবে নীতীশ। নীতীশ বলল,—আভি কোই গাড়ী নাহি হ্যায়—তোম্ ভাড়া লে-লেও। হাম হিঁয়া পায়চারী করেগা...

চলে গেল ড্রাইভার টাকা নিয়ে। নীতীশ গঙ্গার জলের পানে তাকালো। সুটকেস্‌টা ওর হাতে। একজন রেলকর্মী আসছেন। নীতীশ তাঁকে প্রশ্ন করলো,—বর্ধমান লোক্যাল কখন ছাড়ে?

—সাড়ে চার বাজে।

এখন মাত্র দু'টো! নীতীশ পায়চারী করছে।

আশিসের অবসন্ন দেহ মার কোলে মাথা রেখেই এলিয়ে পড়েছিল। নিটোল নিবিড় ঘুম ঘুমোলো সে উষার আলো আসা পর্যন্ত। মা ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বধূ বাড়ীতে একা রয়েছে, সে-কথা ভেবেও মা আশিসকে ভেতরে যেতে বলেননি। কারণ আশিস অত্যাধিক ক্লান্ত ছিল। এত ক্লান্ত তিনি কখনো দেখেননি আশিসকে। ভোরে ঘুম ভাঙতেই আশিস দেখলো মাও রয়েছেন সোফাতে শুয়ে। কিন্তু তিনি আগেই জেগেছেন। আশিসকে উঠতে দেখে বললেন,

—আজই বোম্বাই যেতে চাইছিস তুই?

—হ্যাঁ, মা! এয়ার-এর টিকিট করা আছে—আজই যাবার টিকিট। জামা কাপড়ও সব গোছানো আছে আমার—

—বৌমাকে বলা হয়নি তো?

—না, মা—না! ওকে থিসিস্-চুরির কথা কিছু বোলো না। ছেলেমানুষ, অনর্থক দুঃখ পাবে।—আশিস যেন খুব বিব্রত হয়েই বলল কথাগুলো। মা বলিলেন,

—বেশ, চুরির কথা নাই বললি! বোম্বাই যাবার কথাটা তো বলতে হবে?

—আচ্ছা, মা, সে সব হবে এখন—বলে আশিস বাথরুমে ঢুকলো গিয়ে।

মা আর কিছু বললেন না। সন্তানের মানসিক অবস্থা অনুমান করে গভীর বেদনার্ত বুকে তিনি উঠে অন্দরে গেলেন। যাবার সময় কালীকে বললেন আশিস যেন ভেতরে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে যায়। খাবারও ওখানেই খাবে।

আশিস বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবছিলো—আশার সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হয়নি,

আজও হবার কোনো কারণ ঘটছে না। কী ভাবে সেটা এড়ানো যায় সেই চিন্তাই করছিল আশিস। ওর আর আশাকে মুখ দেখাবার ইচ্ছে নেই। আশার মুখ দেখবারও ইচ্ছে নেই আর। যে স্ত্রী নিজের বিবাহিত স্বামীর সযত্ন অর্জিত সম্পদ অনায়াসে দান করতে পারে তার প্রেমাস্পদকে, সে আবার স্ত্রী কিসের! ভাবতে ভাবতে আশিসের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠলো।...আশা নীতীশের পূর্ব-পরিচিতা বান্ধবী...আরো বেশী নিশ্চয়! যার জন্য সে থিসিস্‌টা তাকে দেবার ব্যবস্থা করতে এতবড় চক্রান্ত করেছে। ওর সঙ্গে আর কী সম্পর্ক আশিসের? নাঃ, আশিস দেখা করতে চায় না আশার সঙ্গে!

কিন্তু মা দুঃখ পাবেন। আশিস চিন্তা করলো মার কথা। পরক্ষণেই ভাবলো দুঃখ তো মা পাবেন-ই। হঠাৎ ওভাবে বধূ নির্বাচন করা ভুল হয়েছে তাঁর...না না-না, মার ভুলেও আশিসের অমঙ্গল হবে না। আশাকে সে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা করবে, আশা সত্যি কতখানি নেমেছে। কিন্তু কিভাবে করবে পরীক্ষা? আশিস মাথা মুছতে মুছতে চিন্তা করতে লাগলো—কোনোদিন সে আশার সঙ্গে আলাপ করেনি। ফুলশয্যার রাতেও না। ওর ঘড়িটা রেখে এসেছিল তার শয্যাগৃহে প্রবেশ করার চিহ্নস্বরূপ। সে-ঘড়ি আজও ফিরে দেয়নি আশা। ও-ও চায়নি। সেদিন নীলাভ আলোতে আশার ঘুমন্ত মুখখানা স্বপ্নের মতো মনে পড়ল আশিসের। খুব বেশিদিন নয়। মাসখানেক মাত্র। গবেষণার কাজে অতিশয় ব্যস্ত থাকার জন্যই আশিস দেখা করতে পারেনি আশার সঙ্গে। ভালই হয়েছে। এখন দেখা করার দরকার হবে না।

জামাকাপড় প'রে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল আশিস 'বাথরুম' থেকে। কালিচরণ জানালো মার আদেশ। আশিস নিজের ব্যাগ-বিছানা তাকে গাড়ীতে তুলতে বলে মা'র কাছে গেল।

মা পূজা শেষ করে খাবার ঠিক করছেন আশিসের জন্য। তাড়াতাড়িই উনি সব করেছেন। আশিস দেখলো আশা ওখানে নেই। ভালই। প্রণাম করলো আশিস মার ঠাকুরকে। তারপর মাকে। বেশ নির্মল ওর মুখশ্রী।

—আমি আবার থিসিস্ লিখবো, মা, তুমি বর দাও! তাহলেই হবে।

—হ্যাঁ, বাবা, আবার লিখবি—তবে আমার মনে হচ্ছে, ওটাও তোর যাবে না! তোর কোনো অমঙ্গল হবে না, মানিক! মা সস্নেহে ওর মাথায় চুম্বন করলেন। তার পর একটু থেমে বললেন,

—আশা হয়তো দুশ্চিন্তায় ঘুমায়নি সারা রাত—ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে দেখা কর, আশিস!

—ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুক, মা—ওকে চুরির কথা কিছু বোলো না তুমি। ও যেন ব্যথা না পায়। আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো...তোমার কাছেই তো রইল ও!—দাও, খেতে দাও—

—তা হয় না, আশিস—দেখা করতে হবে! আশা উঠেছে। নাইতে গেছে, এখুনি আসবে। রাত জেগেছিল তাই ভোরে উঠতে পারেনি।—বলে মা ওকে খেতে দিলেন।

আশিস যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ভাবছে—কী করবে! ঠিক ঐ সময় আশা এসে দাঁড়ালো দরজার আড়ালে। আশিস মুখ ফেরালো না।

মা সরে গেছেন। আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। উপবাসিনী তাপসীর মতো মূর্তি

ওর—একরাত্রে যেন রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা! আশিস যদি মুহূর্তের জন্যও তাকাতো ওর মুখপানে, তাহলে তখুনি বুঝতো, উমার তপস্যাগ্নিতে ওর অন্তর পুতঃপবিত্র—ওর জীবন অলকানন্দার মতো নির্মল। কিন্তু তাকালো না আশিস...তাকাতে ওর ইচ্ছে করলো না!

আশা নীরবে এগিয়ে এল ওর পায়ের কাছে। আশিস ত্বরিতে সরে যেতে যেতে বলল,

—থাক্ থাক্—ও-সব অতিভক্তি...প্রণাম কেন আবার!—পাশ কেটে চলে গেল আশিস বাইরে। গাড়ী আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে। মা সেখানে পূর্ণঘট দেখিয়ে আশীর্বাদ করলেন ওকে। আশিস উঠলো গাড়ীতে। গাড়ী গলি পার হয়ে গেল। আশার মনে হোল, সূর্য সাহা লেন থেকে তার জীবনের সূর্য অস্ত গেল যেন! কিন্তু কেন? ও জানে না!...

জানালার রড্ ধরে সে দাঁড়িয়ে- চোখে জল নেই, নেই কোনো অভিমান, অহঙ্কারও! উদাস সে-দৃষ্টি অসহনীয় ব্যথায় স্তম্ভিত যেন। যেন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ এক মানবী অকস্মাৎ অকারণে পাষাণে পরিণত হয়ে গেছে!

মা দেখলেন গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারপর পূর্ণঘট পূজার ঘরে রাখতে এসে দেখতে পেলেন আশার মুখ! মৃত না জীবিত, বুঝবার জো নেই। তাড়াতাড়ি ঘট নামিলে মা ওকে সস্নেহে ধরে প্রশ্ন করলেন,

—আশা, মা আমার! কি হয়েছে? হোল কি তোর?...

কম্পিত মুখখানা শুধু তুলে ধরলো আশা ওঁর বুকের উপর—জলহীন, জ্বালাহীন—জীবনহীন যেন এক প্রতিমার চোখ! বিস্মিতা মা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

—আশা! আ—শা...

—মা!...আশা এলিয়ে পড়লো ওঁর কোলে।

অবাক-আশ্চর্য হয়ে মা ওকে শুইয়ে দিলেন মেঝেতে। মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন,

—কি হোল, মা! 'প্লেনে'-এ গেল, তাই ভাবছিস?

উত্তর না পেয়ে আবার বললেন,—ভাবনার কি আছে রে? আজকাল আক্‌চার লোক প্লেনে যাচ্ছে-আসছে। ওবেলাই আমরা খবর পেয়ে যাব। আশা!...

—উঁ—এতক্ষণে আশার চোখের জলধারা জানিয়ে দিল, এক পাষাণ-মূর্তি মানবী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। মা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন ওকে এভাবে দেখে। এবার বললেন,

—চুপ্ কর, মা। আপনার জন বিদেশে গেলে কাঁদতে নেই। ওঠ্। উঠে বোস!

আশাকে ধরে বসিয়ে দিলেন তিনি! নিজের স্বামীর বিদেশে যাবার ক্ষণগুলো মনে পড়ছে তাঁর। কিন্তু এমন তো হয় না! এ যেন বাড়াবাড়ি। এতখানির কী হয়েছে? তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বধূর মুখের পানে তাকালেন তিনি। আশা নতমুখে বসে আছে। চোখের জলে দুই গণ্ড প্লাবিত। মা ওকে প্রশ্ন করবেন কিনা ভাবছেন।

—তোদের কিছু কি হয়েছে, আশা? ঝগড়াঝাঁটি বা আর কিছু? আশা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানালো—'না'।

মা বিব্রত বোধ করছেন। তিনি আবার বললেন,

—তবে এমন করছিস কেন, মা! 'প্লেনে'-এ যাওয়ায় যদি তোর এত ভয় তো, আগে বলিসনি কেন? ওর মনের অবস্থা ভাল নেই, মা! একটা বিশেষ কারণে ও খব চিন্তায়

রয়েছে। তাই আমি ওকে যেতে মানা করলাম না। ওর ভবিষ্যৎ তো দেখতে হবে! মান-সম্মান নিয়ে যে ব্যাপার, তাকে অগ্রাহ্য করতে পারা যায় না..

আশা চুপ করে মার পায়ে হাত বুলুচ্ছে—মা তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন,

—যা, উঠে যাহোক কিছু কাজ করগে। মনকে বাঁধতে হবে, মা! অমন করলে কি চলে?...উঠিয়ে দিলেন আশাকে।

আশা কোথায় যাবে? কী কাজ করবে? কার কাজ করবে আশা! এ সংসারটা যেন একান্ত পর হয়ে গেল ওর কাছে এক মুহূর্তে। আশিসের কথাটা শত-বজ্রের মতো বিদীর্ণ করে দিচ্ছে বুক ওর। কী হোল? কী অপরাধ করেছে আশা, যার জন্য তার প্রণাম 'অতিভক্তি' রূপে প্রতিভাত হয় আশিসের কাছে! আপনার বিবাহিত স্বামীকে প্রণাম করা কি অতিভক্তি।

আশা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে—সংস্কৃত সাহিত্যে সে বিশেষ ব্যুৎপন্না এবং ইংরাজী সাহিত্যও তার ভালরকমই পড়া আছে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানোকে কেউ তো কোথাও অতিভক্তি বলেননি! আশিস কেন বলল?

তাহলে কি গতকাল ল্যাবরেটরীতে আশার যাওয়া এবং কথা বলাই তার অপরাধ হয়েছে? নির্লজ্জতা হয়তো হয়েছে আশার। কিন্তু তাতে তো কোনো অপরাধ হয় না! আশিস কি আশাকে অকারণ এতবড় আঘাত করবে! নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কিন্তু কি সে কারণ?...

করবার মতো কিছুই কাজ নেই আশার। মার জন্য নিষ্ঠাবান রাঁধুনী-ঠাকুর নিযুক্ত আছে। আশার জন্য আর ঝি-চাকরের জন্য কয়েকখানা মাছ হয়তো আশা নিজের হাতেই রান্না করে—তাও সব দিন নয়। আশিস তো খুব কম দিনই খায় এখানে। যদি বা খায় তো, খাবার পাঠাতে হয়। ওখানে কালিচরণ তার জন্য মাছ-মাংস রান্না করে রাখে। শুধু ভাতটাই যায়। আশার জন্যও কালিচরণ তার রান্না কতদিন এনে দিয়েছে, কিন্তু আশা পছন্দ করে না। নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে সে খাওয়াতে পায় না—স্বামীর জন্য রান্না-করা বস্তুর প্রতি লোভ হবার মতো তার শিক্ষাই নয়। স্বামী আশার কাছে 'পরম দেবতা'! এই মন ওর মা বাবার দেওয়া মন—হোক সে-মন যতই প্রাচীনপন্থী—আশা তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে। ও শিক্ষা পেয়েছে নারী-জীবনের বল্লভ এবং বান্ধব একমাত্র 'স্বামী'!—এতটা প্রাচীন মতের জন্য বিস্তর বান্ধবীর ঠাট্টা বিদ্রূপ ওকে সহ্য করতে হয়েছে। ও গ্রাহ্য করে না! ও বলে,

—নিজে একনিষ্ঠ না হলে, স্বামীকে একনিষ্ঠ করার কোনো সম্ভাবনা নেই।...আমার মতে বিবাহিতা নারী স্বামীর অংশ, তার কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকা উচিত নয়।...

হাসে ওর বন্ধুরা ওর কথা শুনে। সবাই বলে,—

—দময়ন্তীর যুগে তুই জন্মালেই পারতিস! ডাইভোর্সের যুগে জন্মালি কেন?

আশা জবাব দেয়,—ডাইভোর্স-ওয়ালীদের দময়ন্তী যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—

কিন্তু ওর মত আগ্রাহ্য হয়ে গেছে বর্তমান সমাজে। ওর মতো কার কি এসে যায়? বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হচ্ছে ; এখনো তাতে কতকগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্কারকালে একেবারে পশ্চিম গোলার্ধের অনুকরণ করা হবে...পড়ে আর হাসে আশা। ভাবে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব দাম্পত্য জীবনের জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী যাত্রা-পথকে এঁরা সংক্ষিপ্ত করে দিলেন আইন ক'রে।

কিন্তু একি হোল সেই আশার জীবনে! অকারণ একি বজ্রাঘাত। কিন্তু কারণ একটা কিছু আছে। নিশ্চয় আছে। আশা খুঁজে বের করবে, কী সে কারণ। একমাত্র অপরাধ তার, সে কাল ল্যাবরেটরীতে গিয়েছিল, আর কয়েকটা তুচ্ছ কথায় আবেদন জানিয়েছিল আশিসের কাছে, তার অন্তর-ব্যথা বোঝাবার জন্য। এতে কি এমন অপরাধ হয়! আশা তো সহজে যায়নি? আশিস তার সঙ্গে যথারীতি ব্যবহার করলে সে যেতোই না ওখানে! ওখানে তার কোনো কাজ ছিল না। মনের অশান্তিতে সে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?...আশা বারম্বার ভাবছে।

শাশুড়ী আড়াল থেকে দেখছিলেন ওর চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ। কাজ কিছু করবার নেই, করতেও পারবে না। তাই বললেন এসে,

-যা, মা, উপরে যা। রেডিও শোন গে, না হয় গান কর-গে।

আশা জানে শাশুড়ীর মনও অতিশয় বিষণ্ণ। নিজে ধৈর্য্য ধরে ও রইল ওখানেই। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়।

—ল্যাবরেটরীতে কে এখন থাকবে, মা!—আশা শুধুলো।

—কালিচরণ থাকবে। আর যদি দিব্যেন্দুবাবু আসেন তো, দেখাশুনো করবেন সব।

—আমি যাচ্ছি মা একবার ওখানে!

—যা-না, যা,—মা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

আশা সটান চলে এল ল্যাবরেটরীতে। কালিচরণ আজ অন্দরে খাবে। বসে রামায়ণ পড়ছিল। আশাকে দেখে বলল,

—এজ্ঞে, ঘর খুলে দিব?

—হ্যাঁ—

আশা বলল কিন্তু ঘরে ঢুকতে ওর কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে আজ। এ ঘরে যেন ওর অধিকার নেই ঢুকবার। অথচ কাল সে অবাধে এই ঘরে কত কি করছে। কিন্তু কালী ঘর খুলতেই ঢুকলো আশা। ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা সব। বিছানাটাও ঝেড়ে পাতা। আশা নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ঘুম নেই চোখে—আছে একটা অবসন্ন আর্ততা, যা ঘুমের থেকেও নিঝুম, মরণের থেকেও মর্মান্তিক।

পায়চারী করছে নীতীশ হাওড়া-ব্রীজের ওপর একা। হাওড়া ষ্টেশনের বড় ঘড়িটার পানে চাইছে মাঝে-মাঝে ; রাত শেষ হয়ে আসছে। সাড়ে তিনটে বাজলো...আর ঘণ্টাখানেক, তারপর ট্রেন ধরে নীতীশ চলে যাবে কলকাতার সান্নিধ্য হোতে—দূরে বহু দূরে বিজন কোনো স্থানে। কিন্তু..বুক পকেটে হাত দিল নীতীশ : কাঁপছে হাতখানা—টেনে বের করলো আশার কার্ড-সাইজ সেই ফটোটি—দেখলো...ছুঁড়ে ওটা ফেলে দেবে গঙ্গার জলে, কিন্তু মনে পড়ল—'বৈজ্ঞানিকের বুকে মমতাও থাকে না?'...ফেলে দিতে গিয়েও আবার ওটা দেখলো নীতীশ, আদর করে পকেটে রাখলো আবার। ও-ফটো সে ফেলতে পারবে না! নিজের মনেই বলতে লাগলো,

—তোমার এক-নিমেষের 'স্বামী' আমি হয়েছি—এই তো সুখ! এই তো সম্বল!..না, তোমাকে বুকের কাছ থেকে সরাবো না। তার থেকে থিসিস টাই

নীতীশ সুটকেসের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে—একটা ষ্টিমারের সার্চলাইট এসে পড়লো। তরঙ্গ সঙ্কুল জলরাশির ছন্দ-বিলাস—সৃষ্টির প্রবাহমানতার পরিপূর্ণ প্রকাশ যেন! উত্তাল উদ্দাম গঙ্গার অবাধ স্রোতধারা বয়ে চলেছে জোয়ারের উজান পথে ; নিম্নগামিত্বের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে ও যেন আবার গোমুখী-গুহায় ফিরতে চায়। এই তো প্রবহমানতার লক্ষণ। নীতীশ ভাবতে লাগলো কাগজগুলো হাতে নিয়ে...নীচে যেতে যেতেও জলধারা উর্ধ্বগামী হয়, অন্তত হবার চেষ্টা করে। সেই-বা কেন করবে না? স্রোত অচেতন ; সে আবার ভাঁটার টানে নীচেই নেমে যাবে। কিন্তু নীতীশ মানুষ। সে খানিকটা উঠতে পারলে তাকে আর নামায় কে? একবার একটা খুঁটো পেলেই, একটুখানি উঁচুতে উঠতে পারলেই নীতীশ আকাশ-ছোঁয়া হিমালয়ে পরিণত হতে পারে।

কাগজগুলো পাছে জলে পড়ে যায় এই ভয়েই যেন নীতীশ ত্বরিতে সরে এল রেলিং এর কাছ থেকে। না, এ থিসিস্ সে নষ্ট করবে না। নীতীশ পুনরায় সুটকেস্ খুলে ভরলো সেগুলো সযত্নে, তারপর কলকাতার পানেই হাঁটতে লাগলো আবার। ওদিকে ষ্টেশনের বড়-ঘড়িটায় চারটে বাজলো।

নীতীশ তাকাল না—হাঁটছে। মোড়ের মাথায় খাবারের দোকানের দরজা খুললো...রাস্তায় জল দিচ্ছে...প্রথম ট্রাম আলো জ্বেলে এগিয়ে আসছে—নীতীশ দাঁড়িয়ে ওখানেই।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছিল সে। মনেই পড়ছে না নীতীশের। হোল কি তার? হ্যাঁ, ও কলকাতার পানেই ফিরছিল। কিন্তু কেন? কলকাতায় সে তো আর ফিরতে পারে না! ঢাকুরিযার বাসাতেও না। সে চোর—চুরি করে পালাচ্ছিল। সে-ই যে চুরি করেছে, আশিস এটা অনায়াসে বুঝতে পারবে। আর,. .

আর একখানি মধুর মুখের প্রদীপের মতো সুন্দর দুটি-চোখে জেগে উঠবে অপরিসীম ঘৃণা—অপরিমেয় মৌন তিরষ্কার। না-না-না, নীতীশ তা সহ্য করতে পারবে না! তার থেকে সে পালিয়ে যাক্ দূরে কোনো দেশে—যেখানে হুলিয়া করে পুলিশ তাকে ধরবে, আর একেবারে হাজতে পুরবে! ঐ মধুর চোখের ঘৃণা আর মুখের মৌন ভর্ৎসনা নীতীশকে সইতে হবে না।

নীতীশ ষ্টেশন-গামী ট্রামটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাওড়া ষ্টেশনে তখনো ভিড় জমেনি। তবু বহু লোক, বহু বিচিত্র শব্দ। নীতীশ টিকিট কিনে নিঃশব্দে বর্ধমান গামী ট্রেনটার একটা কামরায় বসলো এসে। পাশেই সুটকেস্‌টি। সারারাত ঘুমায়নি। না, তার আগের রাতেও ঘুমায়নি নীতীশ। সুটকেসে মাথা রেখে চোখ বুজলো। তন্দ্রার মতো একটু ঘুম এসেছে ওর—না, ঘুম নয়, স্বপ্ন...আশা আত্মনিবেদন করছে আশিসকে নয়, নীতীশকে—ওকেই!...

—'আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম—যা হয় করবেন...' ফুলগুলো ঢেলে দিল আশা ওর পায়ে...নীতীশ সযত্নে, সাদরে তুলে ধরলো মুখখানা...দু'হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। কত কি, কত যে কী কথা—আর অকস্মাৎ ঝনাৎ করে শব্দ। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলো কে একজন। তন্দ্রা ভেঙে গেল নীতীশের।

উঠে বসলো নীতীশ। কী মধুর স্বপ্ন! কী অপরূপ প্রিয়স্পর্শের অনভূতি!

স্বপ্ন না সত্যি? বিস্মিত নীতীশ বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল খানিক বাইরের দিকে। না, সত্যি নয়। আশাকে সে স্পর্শ করেনি!—নাকি করেছিল মনে তো পড়ছে না! হ্যাঁ, ছুঁয়েছিল সে আশাকে। তার আরক্ত সীমন্ত স্পর্শ করেছিল নীতীশ...না, করেনি। কিন্তু জাগরণে যা সে করতে পারেনি, ঘুমের মধ্যে তো তা করতে পারলো! তাব মন তাহলে অমনি মলিন! ঐ রকমই অভদ্র। অথচ জাগরণে নিজেকে বোধহয় সম্বৃত করেছিল সে। না-না, ছুঁয়েছিল সে আশাকে! এতক্ষণে মনে পড়ছে, ছুঁয়েছিল...ফটোখানা টেনে বের করলো নীতীশ পকেট থেকে। উষার আলোকে দেখলো,

—হ্যাঁ...তোমায় তো ছুঁয়েছি!—আঙুল দিয়ে আশার ছবির ললাট স্পর্শ করলো। 'ছুঁয়েছি!'...আপন মনে বসে ফটোটায় চুম্বন করলো নীতীশ।

কিন্তু একি করছে নীতীশ? একি অন্যায়? একি ন্যায়বিরোধী, নীতি-বিরোধী কাজ তার? থিসিস্ সে চুরি করেছে লোভে প'ড়ে—কিন্তু, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি তার এই দুর্জয় লোভকে নিশ্চয় ক্ষমা করা যায় না!—যায় না!—যায় না। নীতীশ ফটোখানা সুটকেসের ডালার উপর ফেলে দিল। ওপাশের বেঞ্চে বসে ছিল এক যুবক দেখছিল নীতীশকে। বলল,

—কোথায় যাচ্ছেন নীতীশবাবু? কার ফটো ওটি? আপনার প্রিয়তমার? দেখি।

বলেই সে তুলে নিল ফটোটি। নীতীশ নির্বাক। মুখখানা যেন কেমন ছাই-এর মতো হয়ে গেছে তার। যুবকটি দেখছে ফটোখানা। কিন্তু নীতীশের ভয়ের কি আছে। এখনো তো কেউ জানে না যে, সে পালাচ্ছে! নীতীশ স্থির হয়ে একটা সিগারেট ধরালো। এতক্ষণ সিগারেটের কথাই মনে ছিল না ওর। বড় আরাম লাগছে টানতে।

—বাঃ, চমৎকার চেহারা তো! বরাত ভালো, নীতীশবাবু! রূপকথার কন্যা যেন...

—হুঁ—হাসলো নীতীশ। রূপকথাই বটে! রূপের কথা নয়, কথার রূপ।

—কথার রূপ! সে কি, নীতীশবাবু? বুঝতে পারলাম না।

অনেক কথা আছে যা রূপময়। তার রূপ থাকে। যেমন ধরুন 'বধূ' কথাটা বলতেই একখানি মধুর মিষ্টিমুখ মনে হবে। তেমনি।

—কিন্তু বধূর রূপও তো থাকে—হাসলো ছোকরা কথাটা বলে।

—সব বধূর না থাকতে পারে। 'বধূ' শব্দটাই রূপময়।—ব'লে নীতীশ জোরে টান দিল সিগারেটে। যুবকটি ওর পানে এক মিনিট চেয়ে বলল,

—কিন্তু ইনি রূপময়ী বধূ। ওখানেই যাবেন বুঝি?

—না। ওকে ছেড়ে যাচ্ছি—বলে নীতীশ বাইরে তাকালো।

—ও! তাই মনের অবস্থা এমন। আমি ভাবছিলাম নীতীশবাবুর হোল কি?

—আপনি এখন কি করছেন, রমানাথবাবু?—নীতীশ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো।

—কি আর করবো! খরচার অভাবে আই. এস্-সি. তেই ইস্তফা দিলাম। এখন বর্ধমানে 'হোমিওপ্যাথি' করি। ওষুধ কিনতে এসেছিলাম। ফিরেই ডিস্পেনসারী খুলতে হবে, তাই এই সাড়ে চারটের ট্রেন-ধরা—

—বর্ধমানেই আছেন তাহলে? চলুন, আমিও বর্ধমানে নামবো। যাব দেশের বাড়ীতে।—নীতীশ বললো।

—চলুন। অনেকদিন পর দেখা। আমার ওখানে একবেলা থেকেও যেতে পারেন। আপনি এখন কি করছেন?—রমানাথ প্রশ্ন করলো।

—বিশেষ কিছু না। গবেষণা করছিলাম। হাতুড়ে ওষুধ সম্বন্ধে গবেষণা। জড়ি-বড়ি!—নীতীশ জবাব দিল।

—বাঃ, বেশ তো! ও একটা ভাল লাইন, নীতীশবাবু—খুব ভাল জিনিস পাবেন ওর মধ্যে—

সোৎসাহে বলে উঠলো রমানাথ। বসলো ওর কাছে। কিন্তু নীতীশের ভাল লাগছে না। অনর্থক একটা মিথ্যা কথা বলে আবার অনেক মিথ্যা দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে সত্য বলেছে। কিন্তু উপায় নেই। নীতীশের আপদ মনে হচ্ছে রমানাথকে। রমানাথ কিন্তু আত্মীয়তা জানিয়ে বলল,

—এবেলা আমার ওখানে শাক-ভাত দুটি খেয়েই যাবেন—

কেন যে রমানাথ এতেখানি আগ্রহ জানিয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করছে বুঝতে পারছে না নীতীশ। রমানাথ কলেজের অতি অল্পপরিচিত সহপাঠি—চেনা-জানা আছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু আজ রমানাথের হৃদ্যতা যেন অত্যধিক মনে হচ্ছে। নীতীশ বলল,

—আমি বর্ধমানে নেমে 'বাস' ধরে চলে যেতে পারবো। কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার ওখানে কি জন্য যাব আর!

চলুন না একটুখানি! ওবেলা বাস ধরে যাবেন আপনি। আমার কিছু দরকার আছে। মানে, একটু স্বার্থ রয়েছে আমার।

—স্বার্থ আমার কাছে! আমি আপনার থেকেও দীন, রমানাথবাবু!

—জানি।—হাসলো রমানাথ।—গরীবের ছেলে না হোলে আপনি আজ বিখ্যাত না-হোক, বাংলার রত্ন বলে পরিচিত হতেন। আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অজানা নেই আমাদের—আবার হাসলো রমানাথ।

—ও দিয়ে কি হবে, রমানাথবাবু? বনে অনেক ভাল ফুল ফুটে শুকিয়ে যায়—

—হ্যাঁ, কিন্তু এমন অনেক ফুল আছে যা শুকিয়েও গন্ধ দেয় যেমন কেতকী।

—থাক্, রমানাথবাবু! নিজের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগছে না! আপনার কি দরকার বলুন তো?

—শুনুন দাদা! আমার হোমিওপ্যাথির কারবার। কিন্তু শুধু হোমিওপ্যাথি দিয়ে পয়সা হয় না। তাড়াতাড়ি রোগ সারাতে হলে ঝাঁঝালো ওষুধ দিতে হয়। তাই আমিও কতকগুলো জড়ি-বড়ি রাখি, মানে তৈরী করি। কিন্তু 'ফরমূলা' তো জানা নেই! আপনি বৈজ্ঞানিক—ওষুধ-অরিষ্ট কি করে 'অ্যালকহল' দিয়ে প্রিজার্ভ করতে হয় আমাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন—

—ও, এই!—হাসলো নীতীশ—ও কিছু কঠিন না। আপনি কী কী তৈরী করেন?

—চলুন দেখবেন। নিম-নিশিন্দে-বাসক, কষ্টিকার-তালমূলী, শতমূল-অনন্তমূল সব রয়েছে আমার। একটা ভাল সালসা তৈরী করছি। আর একটা ম্যালেরিয়ার টনিকও। ওর সঙ্গে হোমিও-পোটেন্সি চেষ্টাও আছে আমার...

—যন্ত্রপাতি?

—তৈরী করেছি কিছু-কিছু নিজেই। আমার ল্যাবরেটরী দেখে হাসবেন আপনি।

—কিন্তু এভাবে মানুষের জীবন-নিয়ে-খেলা ঠিক হচ্ছে না, রমানাথবাবু।

নীতীশ যেন একটু কড়া ভাবেই বলল। হাসছিল রমানাথ ; ওর কড়া কথাটা শুনে

কিঞ্চিৎ দমে গিয়ে যেন একটু মনমরা হয়ে বলল,

—ওতে অনেক রোগী ভাল হয়, নীতীশদা...

—না, তারা আপনিই ভাল হয়। আপনার ওষুধে নয়!

—শতকরা নব্বইটা রোগী আপনিই ভাল হয়, নীতীশদা, ওষুধ উপলক্ষ। আপনি দেখবেন, আমি খারাপ কিছু দিই না রোগীকে। তবে ওগুলো প্রিজার্ভ করে রাখতে পারলে আমার সুবিধা হয়। নামও হতে পারে।

—চলুন, দেখা যাবে।—নীতীশ সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

—না, আমি খাই না।—বলল রমানাথ।

নীতীশ সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। রমানাথ মোটা একখানা হোমিওপ্যাথি বই পড়ছে। লোক্যাল ট্রেন থেমে-থেমে চলেছে! হঠাৎ নীতীশ বলল,

—আপনার বাসায় কে কে আছেন? মা-বোন-স্ত্রী?

—না, ওসব কেউ না। একটা মেয়ে আছে 'কম্‌বাইন্ড'—কুক্-সারভেন্ট,...আই মিন...

—বুঝেছি।—নীতীশ বলল।—আশার ছবিখানা পকেটে রাখলো সে। ট্রেন বর্ধমান ষ্টেশনে ঢুকছে। নীতীশ সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল রমাকে,

—আপনার ওখানে যেতে পারলে ভাল হোত, কিন্তু আমার একটু তাড়া আছে।

—তাহলে কি আর বলবো, নীতীশদা ;—দুঃখের সঙ্গে জানালো রমানাথ।—গেলে সুখী হতাম!

নীতীশ সুটকেস-হাতে দাঁড়ালো। রমানাথও তার জিনিসগুলি নিয়ে নামবে। গাড়ী থামতেই নীতীশ নেমে পড়লো। আর কারও সঙ্গে দেখা হয় এটা সে চায় না। কিন্তু বর্ধমানে অনেকেই আসেন, অনেকেই চিনতে পারেন তাকে। নীতীশ তাড়াতাড়ি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মোটর-বাস ধরবার জন্য গ্র্যান্ড-ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বাস আসতে দেরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে রমানাথ সাইকেল-রিক্সায় আসছে। নীতীশ বলল,

—থামান—আপনার অনুরোধটা রক্ষা-ই করে যাই!—রিক্সায় উঠবে নীতীশ।

—আসুন আসুন—বলে রমানাথ সাদর আহ্বান জানালো ওকে। কিন্তু সে ভাবছে নীতীশের এমন ক্ষণে-ক্ষণে মত পরিবর্তনের কারণ কি? এমন তো ছিল না নীতীশ! কিন্তু কিছু সে বলল না।

সাইকেল-রিক্সা ওদের নিয়ে গেল বর্ধমান সহরের একটা পল্লীতে। জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর বলে মনে হচ্ছে না নীতীশের। একতলা বাড়ী একখানা, সামনের ঘরের দরজায় সাইনবোর্ড 'হোমিও কিংডম।' ডাঃ রমানাথ, এম্ বি. (Homoeo)—সে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ও-পাশের দরজাও বন্ধ। রমানাথ ডাক দিল,

—কুমকুম!

—যাই।—ভেতরে পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। দরজাটা খুলতেই রমানাথ বলল,

—ডিস্‌পেনসারিটা খুলে দাও, সঙ্গে লোক আছেন।—ওরা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

ওদিকের দরজা খুলতেই রমানাথ সাদরে ডাক দিল নীতীশকে। নীতীশ ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলো ঘরখানাকে আর মেয়েটিকে ; ওপাশের উঠানের দিকটাও।

—আমাদের হাত-মুখ ধোবার জল দাও। আর, চা করো।—রমানাথ বলল মেয়েটিকে।

চলে যাচ্ছে মেয়েটি। বয়স ধরা যায় না! বিশ-পঁচিশের মধ্যে ; রোগা-ফর্সা, মুখের গঠন

অপরূপ না হলেও সুশ্রী। কেমন একটা কামনীয় মাধুর্য্য আছে মুখে ওর। ও চলে যাওয়াব পর নীতীশ আবার ঘরখানা দেখলো। দুটো অল্পদামী আলমারী. শিশি-বোতলে ভরা। একটা টেবিল, তিনখানা চেয়ার আর একটা বেঞ্চি। হয়তো রোগীদের বসবার জন্য। বাস। একটা টুলে কতকগুলো বই, মাসিকপত্র, আর টেবিলের উপর ষ্টেথিসকোপ, থার্মোমিটার, ইনজেকশন-সিরিঞ্জ ইত্যাদি। একখানা চেয়ারে বসল নীতীশ, রমানাথ গেল ভেতরে। নীতীশ দেখতে পেল উঠানে মাটির গামলায় কি সব ভেজানো রয়েছে। হয়তে রমানাথের জড়ি-বড়ি বাসক-কন্টিকারী-ই হবে। ইতিমধ্যে দু-তিনজন রোগী এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে। নীতীশ অবাক হয়ে ভাবলো—চলে তো বেশ! এভাবেও মানুষ পয়সা রোজগার করে! এক রোগী বলল,

ডাগদারবাবু আয়া, বাবুজি?

—হ্যাঁ আতা হ্যায়।—নীতীশ জবাব দিল। কিন্তু সে ভাবছে—ক্রমাগত ভাবছে। কত কি ভাবছে, নীতীশ নিজেই জানে না। ভাবছে, বেশ আছে রমানাথ! অল্প রোজগার, কিন্তু অভাব তো বোধ করে না! আবার ভাবলো, নিশ্চয় বোধ করে অভাব নইলে অ্যালকোহল মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে চালাবার চেষ্টা কেন করে সে! অন্তত, বড় হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। রমানাথ ফিরে ওকে হাত-মুখ ধুতে বলল এবং নিজে সে রোগী দেখতে আরম্ভ করলো। নীতীশ উঠানে গিয়ে দেখলো কুমকুম সব ঠিক করে রেখেছে। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নীতীশ কিছু সুস্থ বোধ করে বলল, রমানাথকে,—

—বলো তো এবার তোমার কি ব্যাপার?

—আমি একটা কাজে যাচ্ছি, দাদা, ফিরে আসবো আধঘণ্টার মধ্যে; তারপর কথা হবে। চলে গেল রমানাথ ষ্টেথিসকোপ হাতে। নীতীশ একা বসে রয়েছে। কুমকুম এসে বলল,—

—চা দেব আর আপনাকে?

—না। তুমি কোথা থেকে এসেছো, কুমকুম? কিভাবে আছ এখানে? মাইনে পাও না নাকি—?

—না, দাদা। আমি খুব ভাল জায়গায় ছিলাম না। রমাবাবু আমার চিকিৎসা করতে গিয়ে আলাপ হয়, তারপর ওঁর দয়ায় এখানে এসে আছি—হাসলো কুমকুম।

—ভালই আছ?

—হ্যাঁ, তা চলে তো যাচ্ছে, দাদা। আছিও বছরখানেক।—আপনি খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। একটু বিশ্রাম করতে চাইছি।

—আসুন!—কুমকুম পাশের ঘরের বিছানা দেখিয়ে দিল ওকে।

ফোনে খবর পেয়ে দিব্যেন্দুবাবু এসেছেন ওকে 'সি-অফ' করতে। এসেছে আরো কয়েকটি বন্ধুও।—আশিস তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো নীতীশ আসেনি। আসবে না, জানে আশিস। তবু শেষ পর্যন্ত আশা করছিল তার সন্দেহ মিথ্যে হোক—নীতীশ এসে তার থিসিস্‌টা ফেরৎ দিয়ে বলুক যে, ওটা পড়বার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। অথবা বলুক সে, ওটা সে ভিক্ষে চায়—

—আমি 'তার' করে দিয়েছি, আশিস, তোমার আর বোম্বাই না গেলেও চলতো।

—খুব খেটেছি, কাকাবাবু—দিনকয়েক বেড়িয়ে আসি।—আশিস বলল

বিদ্যেন্দুবাবুকে।

—হ্যাঁ, তা যাও। পুনা-ও যেও। দেখে আসবে সব ঘুরে-ফিরে।

—মা রইলেন, কাকাবাবু, আর ল্যাবরেটরীটা আপনি দেখবেন এসে মাঝে মাঝে। বাবার গড়া জিনিস যেন নষ্ট না হয়।

—আমি দেখবো আশিস, আমি সব খবর নেব—দিব্যেন্দুবাবু বললেন।

এক সহপাঠী হঠাৎ প্রশ্ন করলো,—নীতীশ আসেনি তো!

—না। কাল ওর শরীরটা খারাপ ছিল। কে জানে কেমন আছে!—আশিস জবাব দিল।

—আমি ওবেলা খবর নেব তার—দিব্যেন্দুবাবু বললেন।

—কিছু দরকার নেই। সামান্য অসুখ। সর্দি। হয়ত কালই ভাল হয়ে যাবে আপনি আবার ঢাকুরিয়ায় কিজন্য যাবেন।—আশিস ওঁকে থামাতে চায়। থিসিস্ নিয়ে নীতীশ যা করবার করুক, আশিস তাকে কোনোরকম অসুবিধায় ফেলতে চায় না। নীতীশ বড় হোক, বিখ্যাত হোক—তারপর একদিন আশাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাক্ কোনো অজানা দেশে যেখানে আশিস যাবে না কখনো!

উদার হতে গিয়ে আশিস যেন আগুনের কুণ্ডে পড়ে জ্বলতে লাগলো। নীতীশকে কঠিন শাস্তি সে দিতে পারতো, কিন্তু দিয়ে কি হবে? সামান্য থিসিস। বিদ্যাবুদ্ধি আর অধ্যবসায় থাকলে যে কোনো মানুষ ও-বস্তু আয়ত্ত করতে পারে...কিন্তু নীতীশ চুরি করেছে আশিসের অন্তরলক্ষ্মীকে! চুরি করেছে তার চোখের ঘুম, তার চিত্তের শান্তি।

দিব্যেন্দুবাবু সকলের অজান্তে আশিসকে বললেন,

—খুবই দুঃখের বিষয়, আশিস—অমন সুন্দর থিসিস্‌টা চুরি হোল...

—যাক্-গে, কাকাবাবু—আপনার আশীর্বাদে আমি আবার অন্য কিছু নিয়ে গবেষণা করবো। ও-থিসিসের জন্য আমার কিছু দুঃখ নেই।

—তুমি যে এতো সহজে অতবড় আঘাত সামলাতে পেরেছ, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—বলে দিব্যেন্দুবাবু ওকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু আশিস ভাবছিল—আঘাত সে কতখানি সামলেছে। যদি শুধু থিসিস্‌টাই চুরি হোত তো, সে আঘাত আশিস অনায়াসে সইতে পারতো। কিন্তু এ তো থিসিস্ চুরি নয়—তার বিবাহিতা বধূর 'অন্তর-চুরি'...আশিসের মুখখানা কেমন কালিমাঙ্কিত হয়ে উঠলো কথাটা ভাবতেই।

নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ আঘাত করে এল আশিস আশাকে!...বলে এল 'অতিভক্তি!' সমস্ত প্রবাদ-বাক্যটা বলেনি। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। ওর ফল কি দাঁড়ালো, চেয়ে দেখলো না আশিস। কিছু না-বলে যে-অসৌজন্য দেখিয়ে চলে আসতে পারতো আশিস, তাতেই যে-কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ে বুঝতো আশা-সম্বন্ধে আশিসের কোনো দরদ নেই। কথাটা কিন্তু না-বলে পারলো না আশিস! গতকাল থেকে যে-জ্বালায় সে জ্বলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ওটা!

কিন্তু বাড়ী থেকে সে কিছুদূর এসে ভেবেছিল, কথাটা বলা ভাল হয়নি! মাকে সে বলেছে—'বউ ছেলে মানুষ থিসিস্-চুরির কথা শুনলে দুঃখ পাবে—' এ কথাটা অবশ্য একটা কূটনীতির চাল। কিন্তু আশাকে মর্মান্তিক দুঃখ সে নিজেই দিয়ে এল!

দিল, কিন্তু দুঃখ আশা পাবে কি? যার অন্তরে অপর পুরুষের মূর্তি জাগ্রত, সে আশিসের

দেওয়া দুঃখ অনুভবই করবে না। তবু আশিস কথাটা না বলে পারেনি। হয়তো ব্যর্থ হয়েছে তার শর, তবু শরক্ষেপ সে করে এসেছে! শরটা যেন অতিরিক্ত বিষ-মাখানো। বিষ ঐ কথাটুকু।...

বন্ধুরা কেউ জানে না থিসিস্ চুরির কথা। তারা আনন্দ ধ্বনি করে বিদায় দিল ওকে। আকাশের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল আশিসের প্লেন। দিব্যেন্দুবাবু একটা ভারী নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিজের গাড়িতে উঠলেন এসে। আশিস তার পুত্রসম স্নেহপাত্র—তার এই ভাগ্য-বিপর্যয় ওকে অতিশয় ম্রিয়মাণ করে তুলেছে কিন্তু কি তিনি করতে পারেন! আশিস হয়তো আবার থিসিস্ লিখে পাঠাতে পারতো বিজ্ঞান পরিষদে। কিন্তু আশিস-ই সেটা চায় না। চোরকে ধরবার জন্যও কোনো উৎসাহ নেই তার। কেন! কারণ কি? আশিস বলল—'পারিবারিক ব্যাপার রয়েছে ঐ চুরির মধ্যে'—কথাটা অবাক করে দিয়েছে দিব্যেন্দুবাবুকে। তাঁর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক আলোড়িত হচ্ছে ঐ 'পারিবারিক' শব্দটাকে ঘুরে ঘুরে। কিন্তু কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না। আর একবার আকাশপানে চেয়ে দেখলেন প্লেনটা দেখা যায় কিনা নাঃ, বহু দূরে চলে গেছে আশিস এই কয়েক মিনিটের মধ্যে।

দিব্যেন্দুবাবু নিজের বাড়ী ফিরে এলেন। কালিচরণকে ফোন.করছেন :

—হ্যালো...সাড়া এল।

—কালিচরণ?—দিব্যেন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন

আজ্ঞে, না! আমি 'আশা' কথা বলছি। আপনি কাকে চান?

—ও, বৌমা!—দিব্যেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহের কোমলতায় সুমিষ্ট হয়ে উঠলো।

—তুমি ওখানে রয়েছে? বেশ মা, বেশ। আমি কালীকে বলছিলাম, সে যেন ল্যাবরেটরীর দরজা-জানালা ভাবভাবে বন্ধ করে রাখে। আমি কাল কোনো এক-সময় গিয়ে দেখে আসবো! তুমি এটা করিয়ে রেখো, মা।

—হ্যাঁ, কাকাবাবু!—আপনি আজ আসবেন না?

—না, মা!—কেন? দরকার আছে কিছু?

—না, একবার শুধু এসে দেখে যেতেন? আশা যেন মিনতি জানাচ্ছে।

—আচ্ছা. মা! ওবেলা যদি পারি তো দেখবো। তোমরা কিছু ভেবো না। বৌঠানকে বোলো, দরকার পড়লে আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ জানান।

—আচ্ছা কাকাবাবু বলবো—

—আর তুমি যেন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করো না, মা—ওগুলো বড্ড বিপজ্জনক—

—না, কাকাবাবু!

—আচ্ছা মা, আসি—দিব্যেন্দুবাবু ফোন ছেড়ে দিলেন। আশা তখনো ফোনের রিসিভার-হাতে দাঁড়িয়ে। দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা সে বলেছে ফোনে আরো দু'-একদিন। কিন্তু সে-ফোন বাড়ীর ভেতরের ফোন। মুখোমুখী কথা বিশেষ হয়নি ওঁর সঙ্গে। আজ আশার মনে হোল এই পরিবারের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী এই স্নেহশীল বৃদ্ধকে সে জানাতে পারে—তার প্রতি ওঁর প্রিয়-শিষ্যের নিষ্ঠুর ব্যবহার! কিন্তু...

'না!'...কী সব অন্যায় কথা ভাবছে আশা! 'ছি!...' আশা স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করবে! এ কথা ভাবতে ওর লজ্জা করলো না? নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে ফোন রেখে কালিচরণকে দিব্যেন্দুবাবুর আদেশ জানালো। নিজেই তদারক করলো সব দরজা-জানালা

বন্ধ করা হোল কিনা। আশিসের বিছানাগুলো সযত্নে তুলে রাখলো পাট ক'রে। বইগুলোও গুছিয়ে রাখলো যথাসম্ভব। তারপর এলো ভেতরে, মার কাছে।

-আয়, খাবি। মা তাকে খেতে দিলেন। মাও খুবই বিমর্ষ। তবে আশা যেন ছ'মাস জ্বরে ভুগছে এমনি অবস্থা! মা হেসে বললেন,—

—তুই গেলিনে কেন বাপু ওর সঙ্গে?

আশা নীরবে নতমুখে নখ খুঁটিতে লাগলো।

খেতে বসাই হোল মাত্র। প্রিয়-বিচ্ছেদে-বিধুরা এই দুটি নারীর কেউ আজ খেতে পারলো না। আশা কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে তার নিজের ঘরে শুলো গিয়ে। ঘুম আসে না। আসবে না ঘুম। নিশ্চুপ পড়ে রইল বিছানায়।

কী ওর হয়েছে, ও জানে না! ওর তরুণ মনের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করেও জানতে পারলো না, কোথায় ত্রুটি। কী তার অপরাধ। বার বার মনে হয় আশিসের তীক্ষ্ণ কথাটা :

—'থাক,—অতি ভক্তি...

'চোরের লক্ষণ' কথাটা তো বলেনি আশিস! তাহলে কি আশা বুঝবে যে, ঐ রকম প্রণামের বাড়াবাড়ি আধুনিক যুবক অপছন্দ করে বলেই আশিস ওকথা বলেছে? না-না-না, ওর মুখে যতটুকু দেখতে পেয়েছে আশা, তাতেই দেখেছে পুঞ্জীকৃত ঘৃণা, অসীম উপেক্ষা, অপরিমিত নিষ্ঠুরতা! তার চলে-যাওয়ার ভঙ্গীতে আশা দেখেছে হৃদয়হীনতার পৈশাচিক প্রকাশ! 'পৈশাচিক প্রকাশ' কথাটা ভাবতে আশার কষ্ট হচ্ছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো ওর! কিন্তু সত্য। ঐ চলে-যাওয়াকে আর কোন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করার মতো ভাষা জানে না আশা। কিন্তু আশার সংস্কারান্ধ সতী-মন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলো। স্বামীর নিষ্ঠুরতা-সহ্য-করা সীতার আদর্শ!—আশা ভুল করবে না। সে বরং ধীরে ধীরে নিবে যাবে, তবু স্বামীর সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববে না। কাউকে নালিশও করবে না। নিঃশব্দে নির্বাণ লাভ করবে আশা!

কিন্তু এই অসাধারণ মনের জোর কতদিন রাখতে পারবে আশা! হয়তো...হয়তো ধীরে ধীরে তার মনোবল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাবে! যখন সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হবে। সে কথাও ভাবলো আশা। ভাবলো বর্তমান যুগ এবং জগতের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান স্বামী-সমাজের অমানুষিক আচরণের জন্য। আশার অপরাধটা তো আশিস বুঝিয়ে দিয়ে গেলেই পারতো।

কিম্বা হয়তো আশার কোনো অপরাধ-ই নেই। কিছুই নয় ব্যাপারটা। অনর্থক সে ভাবছে এতো বেশী। পাছে সে বোম্বাই যেতে মানা করে তাই হয়তো আশিস নিষ্ঠুরের মতো চলে গেল। হয়তো প্রণামটাকেই 'অতিভক্তি' বলেছে। নইলে, কাল সন্ধ্যায় যে অমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে শুনলো কথাগুলো--আজ সে ওরকম করবে কেন?...কথাটা ভাবতেই আশার মনে পড়লো, কাল আশিস আশার দিকে মুখ ফেরায়নি। দেওয়ালের দিকে মুখ করে ছিল সব সময়। শেষে এসেও ছোঁয়নি আশাকে। আর আজও ঠিক সেই রকম...মুখখানা দেখাতেই চায় না যেন। যদিও আশা আজ তাকে দেখে ফেলেছে এক নিমেষের জন্য! কিন্তু কেন! আশার মুখ কি এমন কুৎসিত যে...না..অন্য কোনো কারণ নিশ্চয় আছে!

কী সে কারণ, আশা যেমন করে হোক বের করবে! যদি না পারে তো আশিসকে সরাসরি প্রশ্নই করবে সে, যেমন কাল করেছিল। প্রয়োজন হলে মাকে মধ্যস্থ রেখেও প্রশ্ন করবে সে...আশার বিদ্রোহী অন্তর অশান্ত হয়ে উঠলো।

হিন্দুনারীর একটা বিশেষত্ব, সাত পাকের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীকে ভালবেসে ফেলে। দেখা নেই, শোনা নেই, আলাপ নেই, পরিচয় নেই—রাতে একজন অদ্ভুত এক মুকুট পরে এলো...ক'নে তার চারিদিকে ঘুরে মালা পরিয়ে দিল...ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করে দিল তার পায়ে! এ ব্যাপার আর কোথাও আছে কিনা জানে না আশা। কিন্তু এদেশে এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। প্রায় না-দেখা স্বামীর জন্য নিজের অন্তরের ব্যাকুলতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশা নিজের মনে বলল—শত-শতাব্দীর সংস্কার-সঞ্চিত এই যে অহেতুক প্রেম, একে অস্বীকার করার উপায় কি? আইন দিয়ে কি একে ঠেকানো যাবে! বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইনের বন্যায় কি নিবে যাবে রক্তগত প্রেমবহ্নি? হয়তো যাবে! কারণ, সংস্কার-অর্জিত ধারণা মাত্র—তা স্বাভাবিক নয়।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই আশার। অকস্মাৎ রেডিওতে ঘোষণা করলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনানো হচ্ছে। আশা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে অত্যন্ত ভালবাসে। কিন্তু কেমন যেন আজ উৎসাহ এল না ওর। মৃদুকণ্ঠে-বাজা রেডিওটা সে অন্যদিন জোর করে দেয়, আজ কিন্তু উঠে একেবারে বন্ধ করে দিল।

•

বোম্বাই-এ পৌঁছে আশিসের প্রথম কাজ তার নিরাপদে নামার সংবাদ মাকে 'তার'-এ জানিয়ে দেওয়া। সে কাজ চুকিয়ে আশিস একটা বড় হোটেলে আশ্রয় নিল। এর আগে বোম্বাই সে যায়নি কোনোদিন। দিনকয়েক থাকবে ; দেখবে ভারতের এই দিকটা।

কিন্তু দেখবে কে? আশিসের অন্তরের আগুন ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলেছে। এমন অশান্ত মন নিয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না। হোটেলের নির্জন ঘরখানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবতে থাকে। ভাবতে থাকে—অত তাড়াতাড়ি বধূ নির্বাচন করা মার খুবই ভুল হয়েছে ; আবার ভাবে, তার গবেষণাটা শেষ হতে বেশী দেরী ছিল না—শেষ হওয়ার পর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই মা ভাল করতেন। কিন্তু বিয়ে দিয়ে মা অন্যায়ই বা কি করেছেন? দীর্ঘদিন বাড়িতে একা রয়েছেন তিনি। ইদানীং আশিস গবেষণার জন্য ভেতর-বাড়ীতে যেতেই সময় পেত না। মার সঙ্গীর বড্ড অভাব ছিল, তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলেন—মা কি জানতেন যে অমন পদ্মফুলে পোকা ধরে আছে। মা কি করবেন? আশিসের অদৃষ্ট!

মার কাজের কোনো অন্যায়ই আশিসের চোখে ধরা পড়ে না। তবু আজ সে মার সমালোচনা মনে মনে করলো। কিন্তু তখুনি ওর মন পীড়িত হয়ে উঠলো এর জন্য। ভাবতে লাগলো...

আশা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আর, ওরকম মেয়েদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণই হয়। ও মাকে একমুহূর্তে 'ক্যাপচার' করে নিয়েছিল ক'নে দেখার সময়। মা নিতান্তই সরলমনা স্নেহশীলা মা, তাই অমন অঘটন ঘটল।

সাতাশ দিন মাত্র তার বিয়ে হয়েছে, হিসাব করে দেখলো আশিস। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল জীবনের সুখ সৌভাগ্যের। পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করার মতো তীব্র জ্বালা বোধহয় মানুষের জীবনে আর কিছুই নেই। আশিস পড়ে রইল বিছানায়—ওর শব-

বং দেহের অভ্যন্তরে চলছে আগ্নেয়গিরির আলোড়ন।

কিন্তু আশিস তার অসাধারণ ধৈর্য্যশীলা মার কাছে শিক্ষা পেয়েছে—ধৈর্য্যই দুঃখকে অতিক্রম করবার একমাত্র উপায়। কথাটা মনে হতেই জামা-কাপড় পরে সে বেরিয়ে গেল শহর দেখতে। বিজ্ঞান-পরিষদের দিকেই যাবে। যদি এর মধ্যে নীতীশও এসে থাকে থিসিস্ নিয়ে, এই চিন্তাটাও এল ওর মনের কিনারায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবলো, নীতীশ এতো কাঁচা ছেলে নয়। এতো তাড়াতাড়ি সে কিছু করবে না। অন্তত বিজ্ঞান-পরিষদের আগামী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করবে। কিম্বা হয়তো অন্যত্র, বিলাত বা আমেরিকায় পাঠাবে থিসিস্। অথবা এখানেই ওটাকে নিজের নামে চালাবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য প্রার্থনা করবে সে। সেও বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রতিভাবান ছাত্র। তার পক্ষে ও থিসিস্ কাজে লাগানো কঠিন হবে না।

নাঃ, কাজেই লাগাক্ সে ওটা! বড় হোগ নীতীশ। আশিসের কিছুমাত্র দুঃখ নেই। যদি সে আশিসের জীবনটাকে এমনভাবে অগ্নিময় করে না দিত তাহলে আশিস নিজেই গিয়ে তাকে বলে আসত, থিসিসটা সে নিক্, আশিস তাকে ওটা দান করলো।

কিন্তু নীতীশ কি করেছে! কতখানি সর্বনাশ করছে সে আশিসের। তার বিবাহিতা...

আশিস আর ভাবতে পারলো না...একখানা ট্যাক্সিতে উঠে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য রওনা হোল। কিন্তু মনের অশান্তি ওকে কোথাও কিছু উপভোগ করবার মতো সুযোগ দিচ্ছে না। অবশেষে একটা সিনেমা-হলে ঢুকে চুপচাপ বসলো এসে একখানা আসনে।

হিন্দী ছবি। হাসি, গান আর নানান তামাসায় ভর্তি ছবিখানা। শ্লীল-অশ্লীল সবই আছে, আর আছে এক বৃদ্ধ ডাক্তারের বিচিত্র জীবন-কাহিনী—যাঁর আইন মতে বিবাহিতা পত্নী সারা জীবন তাঁর কাছে খোরপোস আদায় করলেন, অথচ একটা দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন না। শেষের সম্বলটুকুও শেষ দিনে মনিঅর্ডার করে নিসম্বল ডাক্তার শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন এক অনাথ-বান্ধব আরোগ্য-শালায়। আইন তখনও স্ত্রীর পক্ষে, তাই কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ অধিকার করবার জন্য স্ত্রীকে খবর পাঠালেন। তিনি এসে একখানা শক্ত ভারী তার-বাঁধা গোল মালা (বীদ্) চড়িয়ে দিলেন স্বামীর জীর্ণপ্রায় বুকের উপর...। বসে বসে দেখলো আশিস।

চমৎকার! আইন তো অন্তর দেখে না। সারা জীবন যিনি পত্নীর বিচ্ছেদ সহ্য করেও তাকে টাকা পাঠিয়েছেন আইন মতো, তাঁর মৃতদেহে মাল্যদানের অধিকার আইন-ই দিয়েছে ঐ পত্নীকে। কিন্তু অধিকার মৃতের আত্মার পক্ষে যে কতখানি অপমানকর সে কথা কেউ কি ভাবে!

খোরপোষই হয়তো দিতে হবে আশিসকেও। হ্যাঁ, এ ছাড়া কি আর করবার আছে? অথবা, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হচ্ছে এখন...কিন্তু আশিস ভাবতে ভাবতেও থামলো। আশা মার নির্বাচিতা বধূ—মার অঞ্চলের ধন; অবশ্য মা যদি তার চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পারেন তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করবেন। কিন্তু কি মর্মান্তিক দুঃখ মা পাবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো আশিস। না-না, মাকে কিছু জানানো হবে না। মা যাতে কিছুই জানতে না পারেন তারই ব্যবস্থা করবে আশিস। থিসিস্ চুরি গেছে, চোর নিয়েছে—এতে আশার কোনোরকম সংস্পর্শ আছে, একথা আশিস কিছুতেই মাকে জানতে দেবে না। কিন্তু আশার

মুখ দেখতেও আর ইচ্ছে নেই আশিসের। অতএব বেশ কিছুদিন বাইরে-বাইরেই কাটাবে। ইতিমধ্যে ঘটনা কোন দিকে যায় দেখা যাক...

আশিস হোটেলে ফিরে মাকে চিঠি লিখলো। লিখলো :

এখানে সে খুব ভাল আছে, ভাল থাকবে। ভাল হোটেল! ভাল খাওয়া-দাওয়া কোন অসুবিধা নেই। এখানকার 'টাটা বিজ্ঞান মন্দিরে' কিছু গবেষণা সে করতে চায়, মা যেন অনুমতি দেন। একটা কিছু না-করে তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে নেই। কারণ সকলের কাছে সে হাস্যাস্পদ হয়ে রয়েছে। মা যেন বোঝেন আশিসের কথাগুলো...

আবার লিখলো : মার তো এখন একটা সঙ্গী হয়েছে—আশাকে নিয়ে মা মাস কতক থাকুন, এর মধ্যে আশিস কিছু একটা বড় কাজ করে ফিরবে মার চরণ-বন্দনা করবার জন্য। 'আশা মার খুব ভাল সঙ্গিনী হয়েছে' কথাটায় কোটেশন্ এবং আন্ডার-লাইন করে দিল সে। অশান্ত মনের বিদ্রূপ-ব্যঞ্জনা হয়তো। কিন্তু উত্তেজিত আশিস ভেবে দেখলো না, কাকে কি লিখলো। এ পত্র নিশ্চয় আশা পড়বে একথাও তার মনে এল না। আরও লিখলো, দক্ষিণ ভারতটাও সে একবার ঘুরে দেখবে। এদিকের বিজ্ঞানাগারগুলিও তার দেখা দরকার। তার বাড়ী ফিরতে দেরীর জন্য মা যেন না ভাবনে। সে প্রায় প্রতিদিন মাকে চিঠি দেবে।

চিঠিখানা এয়ার-মেলে রওনা করে দিয়ে, খেয়ে এসে শুলো আশিস। এতক্ষণে মনে পড়লো 'আশা মার ভাল সঙ্গিনী' কথাটায় আন্ডার-লাইন করেছে সে। কেন সে করলো এমন কাজ? মা এবং অতি বুদ্ধিমতী আশাও নিশ্চয় বুঝবে আশিস বিদ্রূপ করছে আশাকে এবং মার নির্বাচনকে।

বুঝুক। বোঝাই ভাল। আশিসের যেন একটা জ্বালাময় আনন্দ বোধ হচ্ছে ঐ কথাটুকু লিখতে পারার জন্য। কিন্তু ওর মাতৃভক্ত অন্তর পরমুহূর্তেই বুঝলো সে অন্যায় করেছে। মার নির্বাচনকে বিদ্রূপ করেছে, মার মঙ্গল-ইচ্ছাকে আঘাত করেছে। চিঠিখানা রওয়ানা হয়ে গেছে, নইলে আশিস হয়তো ও কথাটা কেটে দিত। এখন আর উপায় নেই। আশাকে তো চিঠি লিখবার কথা নয়। কিন্তু মা সন্দেহ করবেন, কেন আশিস বধূকে চিঠি লিখলো না। করবেনই। করুন। কী আর করা যাবে। আশাকে প্রেমপত্র লিখবার মতো সদিচ্ছা আর থাকার কথা নয় আশিসের। তবু সে ভাবলো, দিলেই হোত দু'লাইন লিখে যে, 'ভাল আছি ব্যস্ত আছি'। না ওকে চিঠি লিখে কলম কলঙ্কিত করবে না আশিস। যে যা ভাবে, ভাবুক! আশিসের কিছুই করবাব নেই। মাও একদিন জানবেন সবই, আঘাত তিনি পাবেন প্রচণ্ড। কিন্তু কি আর যেতে পারে? সবই নিয়তির ইচ্ছাধীন। ভাবতে-ভাবতে আশিস কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল—উঠেই দেখলো বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। মনে পড়লো এখনকার বিজ্ঞান-পরিষদের অধিকর্তার নামে বিদ্যেন্দুবাবু একখানা পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন তার হাতে। চা খেয়ে, পোষাক পরে আশিস দেখা করতে গেল অধিকর্তা ডাঃ চিন্তামনের সঙ্গে।

ওকে সাদরে গ্রহণ করলেন ডাঃ চিন্তামন ; কিন্তু বললেন,—

—এখানে নতুন কোনো গবেষকের জন্য স্থান করে দেওয়া এখন সম্ভব হবে না। তবে আপনি যদি দিল্লী যেতে চান তো, আমি সেখানকার অধিকর্তাকে অনুরোধ-পত্র লিখে দিতে পারি।

দিল্লীর গবেষণাগার কিন্তু তৈরী হয়নি এখনো, জানে আশিস। তবে তৈরী হবার সব ব্যবস্থাই হয়েছে। এখন থেকে ওখানে ঢুকলে কাজের সুবিধা হবে একথাও জানালেন ডাঃ

চিন্তামন।

আশিস বোম্বাই-এ থাকতে পারলেই খুশি হোত। কিন্তু অনর্থক বসে থাকার তো কোন অর্থ হয় না। তাই বলল,

—দিল্লীতেই যেতে হবে তাহলে। তবে বোম্বাই-এ দিন কয়েক থাকবার ইচ্ছে আমার।

—বেশ, দিন-পনেরো পরে যাবেন! বললেন ডাঃ চিন্তামন।

অতঃপর আশিস কী করবে ভেবে পায় না। হোটেলে শুয়েই কি কাটিয়ে দেবে দিনগুলো। অথবা এদিককার দ্রষ্টব্যগুলো সব দেখে বেড়াবে? ওর তরুণ অন্তর একটা সঙ্গিনীর জন্য ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। অথচ আশার ভালবাসা যদি সে পেত তাহলে আজ এখানে সে আশাকে নিয়েই তো আসতে পারতো! তার বিদেশ ভ্রমণ প্রিয়সান্নিধ্যে পূর্ণ আনন্দের অলকা হয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু...ভাবতে গিয়েই আশিসের যেন একবার মনে হোল, বিয়ের পর আশার সঙ্গে ব্যবহারটা সে ঠিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে করেনি। ফুলশয্যার রাত্রে গবেষণা—কাজের চাপে অতখানি রাত হয়ে গিয়েছিল—ঘুমন্ত আশার কাছে হাতঘড়িটা রেখে, তার সঙ্গে কথা না বলে চলে আসাও ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে বড় ব্যস্ত ছিল। ভেবেছিল বধূর সঙ্গে প্রেম করা পালিয়ে যাবে না। অন্যদিকে মনোনিবেশ করলে বিজ্ঞানে চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। একথা সে জানিয়েও ছিল মাকে, এবং আশা নিশ্চয় তা শুনেছে! তবু অতখানি দূরত্ব রক্ষা না করলেও পারতো আশিস। হয়তো এতে আশার প্রতি তার অবহেলাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আশা তো তার জন্য শয্যা-রচনা করে বসে ছিল না। সে অন্যের জন্যই অপেক্ষা করে! সামান্য সুযোগটুকুও গ্রহণ ক'রে সে নীতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, আর—আশিসের জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, তার গবেষণালব্ধ সত্যজ্ঞান অনায়াসে দান করেছে এক পথের কুকুরকে...

হ্যাঁ পথের কুকুর ছাড়া কি আর! আশিসের মা না থাকলে অভাগা নীতীশ কোথায় তলিয়ে যেতো, কে জানে। মা-ই তো তাকে সকল রকম সাহায্য করে স্নেহ মমতা দিয়ে, অর্থ দিয়ে—আশীর্বাদ দিয়ে এতোখানি এনেছেন! আশিসও তার জন্য কম কিছু করেনি কিন্তু নীতীশ কী করলো! নিশ্চয় সে আশার সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত—প্রেমাসক্ত ছিল। সে-ই হয়তো আশার বাবাকে খবর দিয়ে মার সঙ্গে দেখা করিয়ে, মাকে নির্বাচন করিয়েছে আশার মতো একটা অসচ্চরিত্রা মেয়েকে বধূরূপে। মা হয়তো প্রতারিতা হয়েছেন নীতীশের দ্বারা! আর নীতীশের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সে ভালভাবেই জানে এর পরে আশিস কিছুতেই আশাকে গ্রহণ করবে না! অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদ—অথবা খোরপোষ আদায়ের চক্রান্ত! তারপর আশাকে নিয়ে নীতিশের আরামে জীবন যাপন...চমৎকার অভিনয়টা কিন্তু করেছে ওরা! আশা এবং নীতীশ। বাঃ!...

'বাঃ'! শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে শানিত ছুরির মতো ফিরে এল ওরই কানে।

স্বপ্নহীন ঘুম...নীতীশ যথেষ্ট সুস্থ বোধ করেছে। রমানাথ এসে না-ডাকলে আরও হয়তো কিছুক্ষণ ঘুমুতো সে। কিন্তু ক্ষিদেও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রমানাথের সঙ্গে খেতে বসল। কুমকুম দিল খাবার। ভাল রান্না করে কুমকুম। রান্নায় ওস্তাদ সে। নীতীশ প্রশংসা ক'রে প্রশ্ন করলো,

—ক'রকম মাংস রান্না করতে জান, কুমকুম?

—না, দাদা—রকমারি জানি নে। এই সাধারণ রান্না করতে পারি।—হাসলো সে।

—আচ্ছা, ফিরতি পথে তোমাকে মুরগী-মসল্লাম রান্না শিখিয়ে দেব। নীতীশ বললো।

—ফিরতি পথে কেন, দাদা? আজই হয়ে যাক্। ওবেলাই। থেকেই যান-না আজ দিন-রাতটা। কিই-বা এমন কাজ আপনার? কাল সকালে যাবেন।—বলল রমানাথ।

কুমকুমও যোগ দিল রমানাথের আবেদনে। নীতীশের মন্দ লাগছিল না। এখানে দু'একদিন থেকে যেতেও যেন তার আর আপত্তি নেই। বেশ নিরিবিলি পল্লীটা সামনেই বড় পুকুর, তার চারিদিকে বাগান। বড়ই মনোরম মনে হচ্ছিল। বর্দ্ধমান শহরের বাইরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। ভাবলো নীতীশ—বিদ্যাসুন্দরের বিচরণভূমি। হাসলো নিজের মনে।

—'আচ্ছা, থাকা যাবে, বলে জবাব দিল ওদের। কুমকুম শুধালো, তাপসীপুরে আপনার কে আছেন দাদা?

ছিলেন পিসিমা। তিনি কাশীতে। এখন আছে একতলা একটা বাড়ী—তিনখানা কুঠরী তার উঠানে একটা জামরুল গাছ...আর ইঁদুর-আরশোলা! হয়তো সাপও।—হাসলো নীতীশ কথাটা বলতে বলতে।

—চলুন কালই আপনার ঘরখানা গুছিয়ে দিয়ে আসি। বৌদি এসে যেন অসুবিধায় না পড়েন—কুমকুম হেসে বলল।

—বৌদি! নীতীশ কিঞ্চিত বিস্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার পকেটে রাখা আশার ফটোখানার কথা, এবং রমানাথের সঙ্গে গাড়ীতে আলাপের কথাও শুনেছে নিশ্চয় কুমকুম রমানাথের কাছে। কিন্তু কিছুই জবাব দিল না নীতীশ। কুমকুম আবার বলল,

—কখন তিনি আসবেন তাপসীপুরে? নাকি এখন আসবেন না?

—ওর মধ্যে অনেক বিদঘুটে ব্যাপার আছে, কুমকুম—ওসব কথা এখন থাক। নীতীশ ...না বন্ধ করতে চায়। কুমকুমও কী যেন বুঝে আর কোনো প্রশ্ন করলো না, চামচেতে করে দই তুলে দিতে লাগলো নীতীশের পাতে। কিন্তু রমানাথ বলল,

—বিদঘুটে।

—নারী সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলোই প্রায় বিদঘুটে, রমানাথবাবু।

—তা যা বলেছেন। এই দেখুন না, কুমকুমকে নিয়ে আমার...

—এই—চুপ...কুমকুম ধমক দিল রমানাথকে।

নীতীশ নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো। কুমকুমের ধমকটা ও যেন শুনতেই পায়নি, এমনি ভাব দেখালো নীতীশ। রমানাথ বলল,

—নীতীশদাকে আরো খানিক ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দাও ; উনি হয়তো মাসখানেক ঘুমান নি।—নাকি নীতীশদা?

মাসখানেক নয়, তিন দিন।—নীতীশ কুমকুমের হাতের পান নিতে নিতে বলল,—ঘুম জিনিসটা জীবের পক্ষে বড় আশীর্বাদ, রমাবাবু!

—হ্যাঁ নিশ্চয়! কিন্তু দুস্বপ্ন দেখলে ঘুম-ই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে দাদা।

হাসলো রমানাথ। কথাটাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আবার বলল,—গান আছে "স্বপ্ন দি মধুর এমন..." কিন্তু স্বপ্ন এমন উৎকট রকমের কদর্য হতে পারে দাদা, যে মানুষকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ে। হোমিওপ্যাথিতে...

—থাক, রমাবাবু। নীতীশ বাধা দিল—আপনার হোমিও-বক্তৃতা থাক এখন। ও শুনলেই আমি দুঃস্বপ্ন দেখবো। একটু আরাম করে ঘুমুতে চাই।

—থাক,...লজ্জিত রমানাথ হাসলো।

কুমকুম ওঘরে আবার নীতীশের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য নীতীশ ঘুমুচ্ছে না, ভাবছে। ভাবছে গভীরভাবে। মাথাটা বালিশের মধ্যে গুঁজে নীতীশ ভাবছে—স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়...হয়। আজই সকালে ট্রেনে দেখা স্বপ্নটা কিন্তু সুখ-স্বপ্ন—মধুর, মধুরতম স্বপ্ন তার জীবনের। এর স্মৃতিটাই ভুলতে পারছে না নীতীশ. ভুলতে চাইছে না। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্ন-ই। ওর মধ্য সত্যতা কোথায়! যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই ওর মর্য্যাদা। না, ওর স্মৃতিও থাকে! দীর্ঘদিনই থাকে হয়তো। কে জানে। কিন্তু ট্রেনের স্বপ্নটা শুধু, বাস্তবে নীতীশ স্পর্শও করেনি আশাকে। না, করেনি। এখনো বেশ মনে পড়ছে তার। হাতখানা বাড়িয়েও কি-জানি-কেন—হয়তো নৈতিক দুর্বলতাবশে নীতীশ অতবড় সুযোগটা অবহেলা করেছে। হ্যাঁ, করেছে। নীতীশ ওকে ছোঁয়নি! ছুঁলেই পারতো। আশা তো আশিস ভেবেই এগিয়ে এসেছিল ওর কাছে! আলোও খুব কম—একেবারে নিবিয়েও দিতে পারতো নীতীশ সেটা। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি, স্বপ্নে সেটা ঘটে গেল। আশ্চর্য তো। এতে প্রমাণ হচ্ছে নীতীশের অন্তর উন্মুখ হয়ে রয়েছে আশার দিকে। হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ কি! জাগ্রত অবস্থায় নৈতিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারলেই নীতীশ একটা সত্যিকার 'ভিলেন'। হ্যাঁ 'ভিলেন'। নীতীশ আর ভদ্র নেই। নীতীশ আর নীতিবান নয়। না। জন্মগত অপরাধ-প্রবণতার কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ ওর মধ্যে পূর্ণভাবেই প্রকট। কিন্তু নীতীশ ভদ্রবংশজাত, নীতীশ শিক্ষিত, নীতীশ আজন্ম নীতিবান—তবু এই পাপপ্রবণতা কেমন করে এল নীতীশের মধ্যে। লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করতে লাগলো নীতীশ—প্রথম, থিসিস্-চুরির কথা তার কল্পনাতেও ছিল না! দিব্যেন্দুবাবু যখন বললেন 'সাবধানে রেখো, চুরি না যায়' : তখুনি নীতীশের অন্তরে চুরির মনোবৃত্তি জাগ্রত হোল। কেন হোল? নীতীশের পাপপ্রবণতার জন্যই। দ্বিতীয়, চুরি করবার মতলবটা ঠিক হবার সঙ্গে চাবি-চুরিরও প্ল্যান তার মাথায় এসে গেল—পার্টির হুল্লোড়ের মধ্যে সেটা সে চুরি করবে। সবগুলোই চুরি করতে হবে, কারণ কালিচরণ ঘর বন্ধ করে বাজারে যেতে পারে। তৃতীয়, চুরির প্ল্যানটা এমনভাবে করেছে যাতে সন্দেহ বহু বন্ধুর উপর পড়তে পারে। কারণ সবাই তখন পার্টিতে ছিল আর নীতীশ ছিল বান্নার তদ্বিরে! এ-পর্যন্ত সাধারণ চোরের মতো কাজ করেছে নীতীশ। কিন্তু চুরি করতে ঢুকে ঘরের মধ্যে আশাকে দেখে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেও কর্তব্য তখুনি ঠিক করে নিয়েছিল। বুদ্ধি এই প্রয়োগ ক্ষিপ্রতা পাকা অপরাধীর লক্ষণ—জানে নীতীশ। সে জানে তার মুখ দেখলেই আশার সন্দেহ হতে পারে তার উপর। তাই নীতীশ দেওয়ালের দিকেই মুখ করে রইল সর্বক্ষণ। ওই সময়টুকুর মধ্যেই ভেবে নিল কী তার করণীয়। কী ভাবে সে পালাতে পারে। বুদ্ধি সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ—'আশিস' হয়ে আশাকে ধোঁকা দিয়েই সরে পড়তে হবে। তখন যে কথাটুকু বলেছিল, তা অত্যন্ত চাপা গলায়। বিখ্যাত ডাকাতেও এত তাড়াতাড়ি এমন বুদ্ধি খাটাতে পারে কিনা কে জানে?

কিন্তু নীতীশের সন্দেহ হচ্ছে তার অপরাধী মনের প্রয়োগ-চাতুর্য্যে, তার পাপী মনের ক্রিয়া-সামর্থ্যে। নইলে থিসিস্টা পেলেই বেরিয়ে আসবে কেন? ঐখানেই যে নীতীশের

চুরি-বিদ্যায় সবটা কেঁচে গেল? আশার কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি থাকলেই বুঝে নিতে পারতো থিসিস্‌টা ফেলে যে পালাচ্ছে, সে চোর ; সে 'আশিস' নয়। নিজের বৌকে দেখে কেউ অমন করে পালায় না, তা-সে তার যতই কাজ থাকুক। তার উপর নতুন-বউ। যে বউকে এক সেকেন্ড দেখে নীতীশ কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

কিন্তু থিসিস্‌টা না-নিয়ে-বেরুনো নীতীশের চুরিবিদ্যাবত্তার নৈতিক অধঃপতন। সে চোর নয়, এখনো চোর হতে পারেনি। এখনো সে ভদ্রলোক ছেলেই আছে... হ্যাঁ, এখনো সে ভদ্র, এখনো সে সুযোগ পেয়েও বন্ধুপত্নীর নারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চ'লে আসতে পারে। নীতীশের চোখ-মুখ দৃঢ় হয়ে উঠলো অকস্মাৎ।

যা হবার হয়েছে। নীতীশকে ভদ্র থাকতে হবে, মানুষ থাকতে হবে। ভুল সে করেছে এক্ষুনি সংশোধন করবে। নীতীশ ফিরিয়ে দেবে আশিসের থিসিস্‌। তার সঙ্গে সমস্ত ঘটনা—দিব্যেন্দুবাবুর কথার সূত্র ধরে তার অপরাধী নিজের অধঃপতন এবং থিসিস্‌-চুরির ইতিহাস পরিষ্কার ভাষায় লিখে রেজেস্টারী ডাকে পাঠিয়ে দেবে আশিসকে। এজন্মে আশিসকে আর মুখ দেখানো সম্ভব হবে না। না হোক, তবু আশিস জানবে মুহূর্তের প্রলোভনে নীতীশ অধঃপতিত হয়েছিল।

আর আশা?...ভাবতে গিয়ে নীতীশের মনটা যেন ধাক্কা খেল। কিন্তু আশাও নিশ্চয় এতক্ষণ জেনেছে যে ল্যাবরেটরীতে নীতীশ-ই তার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছে। ঘৃণাই হবে আশার মনে। কিন্তু আশার কাছেও ঐ মুহূর্তটুকুর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে নীতীশ। এখনি লিখতে হবে, আর দেরী নয়। দুর্জয় প্রলোভন আবার হয়তো ওকে প্রতারিত করতে পারে। নীতীশ সুটকেশ খুলে কাগজ-কলম বের করলো।

সুন্দর কলম। মূল্যবান। অভিজাত স্বর্ণলেখনি। এরও একটা ইতিহাসে আছে। ভাবতে লাগলো নীতীশ কলমটা হাতে নিয়ে। ওর মতো গরীবের এতো দামী কলম থাকবার কথা নয়। ছিলও না। একদিন আশিসের মার কাছে কি একটা লিখতে তার সাড়ে বারো-আনা দামের ফুটপাত-মার্কা কলমটা বের করে লিখতে গিয়ে আর কালি বেরুলো না। ক্রমাগত ঝাড়তে লাগলো নীতীশ। মা বললেন,—

—কি হোল বাবা, নীতীশ?

—কম-দামী কলম, মা—খারাপ হয়ে গেছে।—বলে করুণ হাসি হেসে ছিল নীতীশ।

—তোর এতোগুলো ভাল কলম, আর আমার নীতীশ লেখে একটা ভাঙা কলমে! কেনরে আশিস?—মা কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়েছিলেন আশিসকে।

খুবই ভুল হয়ে গেছে, মা—বলে আশিস তৎক্ষণাৎ নিজের বুক-পকেট থেকে মূল্যবান কলমটা টেনে মার হাতে দিয়ে বলেছিল,

—তুমি নিজের হাতে এটা দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করো, মা।

সেই 'মা' আর সেই 'আশিস'...ওঃ! কতখানি অমানুষের কাজ করেছে নীতীশ। ঐ স্নেহময়ী মার কাছে আর কোন মুখে যাবে নীতীশ। না, নীতীশের জীবনে আর ওখানে যাওয়া হবে না।

চোখে জল এল নীতীশের।

জলটা মুছতে গিয়ে আনন্দিত হোল। এখনও তার চোখে আসে। এখনো সে মানুষ আছে তাহলে? হ্যাঁ, আছে।

নীতীশ পত্র লিখতে আরম্ভ করলো।

বিশদভাবেই সব ঘটনা লিখলো নীতীশ : আশার ভুল করে 'আশিস' ভেবে তাকে পুষ্পাঞ্জলি-দেওয়া এবং নীতীশেরও আশিস রূপে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করার কথাও লিখলো। আরও লিখলো, প্রচণ্ড প্রলোভনে আশার অঙ্গ স্পর্শ করতে সে হাত বাড়িয়েছিল—অকস্মাৎ হয়তো তার পিতৃপুরুষের পুণ্য তাকে রক্ষা করেছে! নীতীশ বন্ধু পত্নীকে স্পর্শ করবার অভিশপ্ত ক্ষণটিকে ব্যর্থ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তার নারী-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই। কিন্তু নীতীশ অপরাধী। এক বিরহাতুরা সতীর স্বামীত্ব চুরি করে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য সুখী করতে চাওয়ার অপরাধে অপরাধী সে। নীতীশ লিখে চলল,...শ্রীভগবান নাকি শঙ্খচুড়ের ছদ্মবেশে শ্রীমতী তুলসীর সতীত্ব অপহরণ করেছিলেন। তিনি শ্রীভগবান, তাই রেহাই পেয়ে গেছেন। কিন্তু নীতীশ বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুদ্রোহী! নীতীশ এক বালিকা বধূর স্বামীত্ব অপহরণ-লুব্ধ 'ভিলেন'! তার অপরাধ ক্ষমার অতীত আশিস যেন তাকে ক্ষমা না করে। যেন তাকে মমতা না করে! আর আশাকে যেন জানিয়ে দেয়, নীতীশ তার ঘৃণা পাবারও অযোগ্য।...

পত্র শেষ করে নীতীশ সেটা খামে মুড়ে থিসিস্-এর সঙ্গে রাখলো। তারপর সবগুলো একখানা মোটা খামে ভরে বন্ধ করলো, নাম-ঠিকানা লিখলো আশিসের। এখন রেজিষ্টারী করতে হবে। উঠছে—

—কোথায় যাচ্ছেন, দাদা?—কুমকুম প্রশ্ন করলো।

—এই চিঠিটা রেজিষ্টরী করে আসি।

—আজ তো আর হবে না, সময় চলে গেছে। কাল রবিবার! পরশু হবে।

—আজ না? কালও না? নীতীশের মুখ অত্যন্ত ম্লান।

—কেন দাদা! কি এমন জরুরী ওটা?

—হ্যাঁ, জরুরী ছিল, কুমকুম!—নীতীশ ফিরে এসে প্যাকেটটি সযত্নে রাখলো সুটকেসে। কুমকুম ভেতরে এসে বসলো চেয়ারে। বলল,

—আপনাকে কেমন যেন ল্যাগছে, দাদা। কী ব্যাপার? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া নয় তো?—হাসলো কুমকুম।

—বৌদি। বৌদি কে? আমার বিয়ে হয়নি, কুমকুম। যার ফটো তোমরা দেখেছে, সে আমার এক বান্ধবী। বউ নয়।

—ও, বান্ধবী। কুমকুম বলল,—তা বিয়ে তো হতে পারে?

নীতীশ উত্তর দিল—না। সে তখন ভাবছে আশাকে বন্ধুর স্ত্রী' বলে পরিচয় না দিয়ে সে 'বান্ধবী বললো কেন? এও তো অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ। তাহলে কি সত্যিই নীতীশ অপরাধী? সত্যিই কি নীতীশ কাল সন্ধ্যায় আশার প্রেম লাভের জনাই আশিসের অভিনয় করেছিল? পালিয়ে আসবার জন্য নয় শুধু, মোটেই পালিয়ে আসবার জন্য নয়। নীতীশ আনন্দ বোধ করছিল আশার স্বামী হওয়ার চিন্তায়। হোক সে চিন্তা ক্ষণিকের জন্য, তবু সে ক্ষণ সত্য—সে ক্ষণ শিলালিপির ক্ষণলেখা...সে ক্ষণ ক্ষণ-স্বাক্ষর।

সে ক্ষণকে নীতীশ ভুলবে কি করে। নীতীশ শুধু অপরাধী নয়, নীতীশ অপরাধ প্রবণতার প্রশ্রয়দাতা ; মনের কদর্য্য প্রলোভনকে সে লালন করছে সস্নেহে। তাই ঐ স্বপ্নে আশাকে নিবিড়ভাবে...কিন্তু কোনটা স্বপ্ন? নীতীশ তো সত্যিই ধরেছিল আশাকে সে দিন

হ্যাঁ হ্যাঁ...ধরেছিল...

জিভটা শুকিয়ে গেছে নীতীশের ; কুমকুমকে বলল,

—একটু জল দাও, কুমকুম!

উদয়লগ্নে স্নান করা আশার অভ্যাস চিরদিন। স্নানকে সে বিলাস মনে করে না, পূজার প্রস্তুতি বলে জানে! কদাচিৎ ভোরে উঠে স্নান করা ওর বাদ যায়। আজও অতি প্রত্যূষে স্নান-ঘরে ঢুকছে সে। শাশুড়িও সকালেই স্নান সেরে পূজায় বসেন। হয়তো এতক্ষণ তিনিও উঠেছেন।...আশা নিজের মনে ভাবছিল গায়ে জল ঢালতে ঢালতে। ভাবছিল এই বিশাল প্রাসাদের অধিশ্বরী সে। কিন্তু কী সুখ তার রয়েছে এখানে! এর থেকে কোনো গরীবের ঘরে বধূ হলে সে এতোক্ষণ স্বামীর অফিস যাবার জন্য রান্না চড়াতো, ব্যস্ততার অন্ত থাকতো না। আর এখানে আজ কাজ খুঁজে ওকে কাজ করতে হয়। পূজার আয়োজনে কয় মিনিট-ই বা লাগে তার? এতোকাল ঝি চাকরেই করতো সব। আশা এখন ইচ্ছে করে সেগুলো নিজে করছে—ফুল তোলা, চন্দন ঘষা। খুবই ভাল কাজ, কিন্তু কার জন্য এসব করে আশা।

ভাবতেই মনটা ধাক্কা লাগলো। স্বামীর মঙ্গলের জন্যই করে। আশা হাতের নোয়াটা মাথায় ঠেকালো। ভাগ্যিস বাথরুমের ভেতর, নইলে কেউ হয়তো দেখে ফেলতো আর ঠাট্টা করতো আশাকে। হাতের নোয়া কে আর আজকালকার দিনে মাথায় ঠেকায়। শাঁখাই পরে না সব। সিঁদুরও প্রায় উঠে যাচ্ছে পরা। কিন্তু আশা অতটা আধুনিক হবে না। নিশ্চয় না।

স্নান সেরে মার পূজার সরঞ্জাম ঠিক করে দিযে আশা বেকার। ওর আর কিছু করবার নেই। গান করবে, না হয় বই পড়বে, অথবা চুপ করে বসে থাকবে। কিন্তু কিছু একটা না করলে ও টিকতে পারবে কি করে! মনের অশান্ত আবহাওয়াকে এভাবে এলোমেলো বয়ে যেতে দেওয়া খুবই খারাপ হচ্ছে। আশা ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে উপস্থিত হোল—কালিচরণ দরজা খুলে দিল।

ওর শ্বশুরের তৈরী গবেষণাগার—ওর প্রিয়তম স্বামীর পাঠ-নিকুঞ্জ। না-না তপস্যাভূমি! আশা নিজের মনে সংশোধন করলো কথাটি। কী কঠোর তপস্যাই না করলো আশিস এখানে! গবেষণা তো শেষ হয়েছে, এখন তার কাজ চুকিয়ে আশিস নিশ্চয় এসে দেখা করবে আশার সঙ্গে। তখন বোঝা যাবে কেন সে আশাকে 'অতিভক্তি' কথা বলে গেল যাবার সময়। ওর আভ্যন্তরীণ অর্থ না জানলে চলবে না আশার! প্রণাম পছন্দ করে না তো, বললেই হোত সে-কথা!

আশা স্তব্ধ ল্যাবরেটরীর মাঝে দাঁড়িয়ে দেখছে যন্ত্রপাতিগুলো। সবই কিম্ভূতকিমাকার। কিছুই সে বোঝে না এসবের। কালিচরণকে শুধুবে নাকি কোন্‌টায় কি কাজ হয়? না। কালিচরণকে কোনো প্রশ্ন করলে এই বংশের অভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যার জন্য আশা খুব দরকারী প্রশ্নও করেনি কালীকে। সেদিন রাত্রে আশিস কেন ভেতর-বাড়ীতে গেল না, আশা অনায়াসে কালিকে শুধুতে পারতো। পারেনি, আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে। শাশুড়িও কিছু বললেন না আশাকে। কেউ কিছুই বলল না! অথচ আশা যেন আন্দাজ করছে কোথায় কি একটা গলদ হয়েছে। কি সেটা! কাউকে শুধুবার পাত্র পাচ্ছে না আশা!

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘরখানা কিছুক্ষণ দেখলো আশা। তারপর একটা 'ডাস্টার' তুলে নিয়ে

যন্ত্রগুলো মুছতে আরম্ভ করলো। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো সব। কালীকে বললো, মেঝেতে ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলো সাফ করে দিতে। বড় টেবিলের বই-কাগজ সব গুছিয়ে রাখলো। টেলিফোনের কলটাও মুছলো যত্ন করে। সাজালো সমস্তটা নিজের খুসী-খেয়াল-মতো। সেদিনের-আনা ধূপ থেকে কয়েকটা কাঠি নিয়ে জ্বালিয়ে দিল এখানে সেখানে। কতকগুলো ফুল সাজিয়ে রাখলো একটা কাঁচের মোটা টিউবে। ফুলদানি নেই এখানে। আজই কিনে আনবে আশা। সব শেষ করে নিজেই দেখছে নিজের কাজের পারিপাট্য—চমৎকার হয়েছে! আশিস যদি উপস্থিত থাকতো! সুদীর্ঘ শ্বাসটা আটকে যাচ্ছে বুকে ওর। হাতজোড় করে আশা উদিত সূর্যের পানে তাকালো—নমস্কার করবে!

হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলছেন,

—কী ডিভোশ্যন! এ যুগেও এমন মেয়ে থাকে, বৌঠান?

আশা ত্বরিতে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, অন্দরের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে মা আর দিব্যেন্দু বাবু। মা হাসি-ছলছল চোখে দেখছেন ওকে। আশা তাড়াতাড়ি গিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করলো দিব্যেন্দুবাবুকে!

—জন্ম এয়োস্ত্রী হও, মা!—অত্যন্ত প্রাচীন আশীর্বাদই করলেন তিনি। বললেন,

—তোমার মতো মেয়ের কাকাবাবু হওয়া ভাগ্যির কথা, মা! আমার নিজের মা-ই যেন তুমি, বয়স বদলে এসেছ! মাথায় হাত দিলেন তিনি আশার।

—আপনি একবার সব যন্ত্রগুলো দেখুন, কাকাবাবু—সব ঠিক আছে কিনা!

ঠিকই আছে, মা! তুমি যখন নিজে দেখছো তখন আমি আর কি দেখবো?

—না, কাকাবাবু! আশা আব্‌দার করলো,—আপনাকে আসতে হবে। আমার কিছু প্রার্থনা আছে—

—প্রার্থনা! কী মা? ছেলের কাছে যা চাইবে, পাবে। বলো—

—আপনি আমাকে কিছু 'বিজ্ঞান' পড়ান...মা আপনি অনুমতি করুন।

—পড়-না! ওঁর কাছে পড়বি তার আবার আপত্তি কি!

—কিন্তু মা!—দিব্যেন্দু বললেন,—বিজ্ঞান বড় কঠিন বিষয়। বিশেষত যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কাজ করি—

আমাকে আপনি সহজ বিজ্ঞান কিছু শেখান—যা আমি শিখতে পারবো...

—বেশ, মা! আচ্ছা বলো তো—ওরা এর মধ্যে ভেতরে এসে বসেছেন চেয়ারে, আশা-ই দাঁড়িয়ে আছে! দিব্যেন্দু এক সেকেন্ড আশার পানে চেয়ে বললেন,

—তুমি একটা রেলগাড়ীর কামরায় আছ—গাড়ীটা ষ্টেশনে ঢুকছে। ষ্টেশনে দাঁড়ানো অন্য একখানা গাড়ী রয়েছে। তোমার নিজেকে স্থির, আর দাঁড়ানো গাড়ীটাকে চলমান মনে হবে। তোমার কামরার মধ্যে থেকে তোমার ভুল কি করে বুঝতে পারবে?

—বোঝা মুস্কিল, কাকাবাবু!—আশা হেসে বলল,—এতে কী প্রমাণ হয়, কাকাবাবু?

প্রমাণ হয় যে, সত্য সর্বদাই আপেক্ষিক। কারণ, যে ইন্দ্রিয় আর যন্ত্র দিয়ে তুমি সত্যটা নিরূপণ করবে, সেই যন্ত্রাদি সবই সত্যকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে—যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব। তার বেশী নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষার মধ্যেই আমরা সত্যকে দেখি, কিন্তু সেইটাই একমাত্র সত্য নয়। আরো সত্য আছে, যা আমরা হয়তো আরো শক্তি অর্জন করে জানতে পারবো।

আশা হাসিমুখেই শুনছিল। ওর বোধশক্তি তীক্ষ্ণ, তবু বলল,

—বড় কঠিন লাগছে, কাকাবাবু! পারবো না হয়তো আমি...

—এটা খুব কঠিন নয়, মা, এ অতি পুরোনো কথা। আচ্ছা, তোমাকে আমি কিছু গৃহস্থালী-বিজ্ঞান শেখাবো।

—হ্যাঁ, তাই শেখাবেন! যা আমার কাজে লাগবে।—হাসলো আশা—আপনার জন্য কিছু খাবার আনি, কাকাবাবু!—আশা চলে গেল।

এতক্ষণে দিব্যেন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন,—'চুরির কথা ও কি জানে, শুনেছে?

—না, ঠাকুরপো!—মা তাড়াতাড়ি বললেন,—ওকে কিছু বলবেন না! একেই তো মনমরা হয়ে আছে, তারপর থিসিস্-চুরির কথা শুনলে নিজেকে 'অপয়া' ভেবে আধমরা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক! ওকে কিছু না-বলাই ভাল। আর বলে তো কিছু লাভ নেই? কিন্তু বৌঠান, আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—কে চুরি করলো ওটা?

—চোরকে খুঁজতে দূরে যেতে হবে না ঠাকুরপো! আমাদের নিতান্ত নিকট সে। আশিসের বিশেষ বন্ধু না হলে, ও-বস্তু কেউ চুরি করতে পারতো না।

—নীতীশের কথা বলছেন, বৌঠান?

—হ্যাঁ। কিন্তু যাক্। ওকেও ছেলের মতো ভালবাসতাম আমি! নিক্‌গে। ওর যেন ভাল হয়...

দিব্যেন্দুবাবুর মুখে ভাষা যোগাচ্ছে না।

—প্রমাণ কিছু পেয়েছেন, বৌঠান?—আবার আধমিনিট পরে শুধোলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—প্রমাণ নিতেও ইচ্ছে করেনি, ঠাকুরপো! নীতীশ চোর, একথা মনে করতেও আমার নিজেরই লজ্জা হয়। ঈশ্বর প্রমাণ মিলিয়ে দিলেন। চুরির দিন রাত্রে আশিসকে এখানেই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি নানা কথা চিন্তা করছিলাম। আলো সব নেবানো ছিল। দেখতে পেলাম একটা সুটকেস-বগলে একজন লোক গেটের ওদিকে। আমি অন্ধকারে ছিলাম তাই চোখের জ্যোতি কিছু বেড়েছিল। ওদিকে রাস্তার আলোটাও গেটের খানিকটা আলো করে ছিল। দেখলাম সে সুটকেস নামিয়ে ফটক ডিঙিয়ে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে...

—কে! কে সে বৌঠান? নীতীশ?

—হ্যাঁ। অকস্মাৎ কালিচরণ চেঁচিয়ে ওঠায় নীতীশ পালিয়ে গেল।

—শুঃ!—ডাঃ দিব্যেন্দু একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু চুরির পর আবার সে কি জান্য আসতে চাইল?

—জানি না! হয়তো কোন যন্ত্র-চুরির মতলব ছিল ওর। আমি কালীকে আলো নিবিয়ে দিতে বলে সারারাত অপেক্ষা করছি, যদি সে আবার আসে। না, এলো না। নীতীশ চোর একথা কালিচরণকেও বলা যায় না, ঠাকুরপো। তার এতখানি অধঃপতন আমাকে চোখে দেখতে হোল।—মা গভীর শ্বাস ত্যাগ করলেন।

—সত্যি দুঃখের কথা, বৌঠান! সে আর আসেনি তো এখানে?

—না। সে আর আসতে পারবে না!

আশা জলখাবার নিয়ে এল ডাঃ দিব্যেন্দুর জন্য। তিনি সস্নেহে বললেন,—রন্ধন-বিজ্ঞান কতখানি শিখেছে, মা-মণি?

—কৈ শেখা হোল, কাকাবাবু? কাঁচকলার ঝোল কালো হয়ে যায় রাঁধবার সময়।

—আচ্ছা মা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কী করলে কলার কষটা ঝোলের রস কালো করবে না।—খেতে আরম্ভ করলেন তিনি।

—শেখাবেন! কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন সম্বন্ধে কিছু জানা বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য নাকি ওতেই লুকিয়ে রয়েছে।

—যতটুকু আধুনিক বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, মা—তাতে মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ুক আজও পূর্ণ হয়নি! হয়তো কোনদিন হবে না। কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। তবু বিজ্ঞান যতটা জেনেছে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে—তোমাকে আমি তা বোঝাবার চেষ্টা করবো। কখন তোমার সময়?

—সব সময়ই আমার সময়, কাকাবাবু। আমার কোনো কাজ নেই এখানে।

আশার কথার করুণ স্বরে মা ওর মুখের পানে তাকালেন। সকরুণ মুখখানি। শীলে বাটনা-বাটা অবস্থায় এই কর্মিষ্ঠা মেয়েটিকে তিনি পছন্দ করে এনেছেন। ওর কোনো কাজ নেই এখন। নেই সংসারের কাজ, নেই সাহচর্য। বেদনায় অন্তর মুচড়ে উঠলো ওঁর, মুখে জোর করে হাসি এনে বললেন,

—কাজ তো বিস্তর করেছিস্ বাপের বাড়ীতে, এখন দিনকয়েক না-হয় বিশ্রাম করিস।

—বিশ্রাম করে-করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মা!...

ওর কণ্ঠের আবেদন অসহনীয়তায় ঘরের আকাশকেও ভারি করে তুলেছে—মা এবং ডাঃ দিব্যেন্দু মুহূর্তে বুঝলেন এই তরুণীর বুকের অসহ্য বেদনা!

কিন্তু কিছুই ওঁদের বলবার নেই, কিছু করবারও নেই। এমন কোনো বস্তু ওঁদের কাছে নেই, যা দিয়ে ওকে কিঞ্চিৎ আনন্দিত করা যায়। ডাঃ দিবেন্দু বললেন,

—ওবেলা তোমাকে আমি খানকতক বিজ্ঞানের বই এনে দেব মা, অণুবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলোও বুঝিয়ে দেব। আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদও বোঝাবো তোমায় ধীরে ধীরে।

আশা নিঃশব্দে শুনছিল। ডাঃ দিব্যেন্দু উঠলেন। যাবার সময় আবার ওকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, ওবেলা বই নিয়ে আসবেন। এই স্নেহশীল বৃদ্ধ আপন কন্যার মতো যত্নে ওকে বিজ্ঞান পড়াবেন ঠিক করলেন মনে-মনে। কিন্তু একটা বিশেষ ব্যথা তিনি অনুভব করছিলেন..। আশা পিছনে আসছে। মা এবং দিব্যেন্দুবাবু এগিয়ে যাচ্ছেন অন্দরের পথে। জনান্তিকে মাকে তিনি বললেন,

—আমার মনে হচ্ছে বৌঠান, গবেষণায় ব্যস্ত থাকার জন্য আশিস ওকে অবহেলা করছে—

—আমারও তাই মনে হয়, ঠাকুরপো। আশিস তো আপনার হাতে গড়া—এরকম যদি হয়ে থাকে তো, আশিসকে কি সমর্থন করবেন আপনি?

—না-না-না, বৌঠান—দিব্যেন্দুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন.—কখনই ওকাজ সমর্থন করিনে আমি! অবশ্য আমাদের ভুলও হতে পারে...

—না, ভুল নয়! আশিস ওকে অবহেলাই করেছে, ঠাকুরপো! আমিও খুবই চিন্তিত আছি এই নিয়ে। মেয়েটা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজার করতে যাবার মেয়ে ও নয়। বন্ধুদের সঙ্গে পিক্‌নিক করতেও যাবে না! হয়তো আমার নির্বাচনের ভুল হয়ে গেছে।

—না।—দিব্যেন্দুবাবু বললেন,—এতো ভাল নির্বাচন হতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, বৌঠান—ও বিজ্ঞান পড়েনি বলে আশিস হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই ও বিজ্ঞান পড়তে চায়...আশিস ওকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয়নি—তাই ও বিজ্ঞান পড়তে চায়--

—এরকম হতে পারে, ঠাকুরপো! আপনার দাদা আমাকে বিজ্ঞান শেখাবার জন্য কত হাস্যকর ব্যাপার করতেন, আপনি তো জানেন।

—হ্যাঁ।—হাসলেন ডাঃ দিব্যেন্দু। বললেন,

—ওকে আমি বিজ্ঞানে ওস্তাদ করে দিচ্ছি, তবু কিন্তু আমি আশিসকে মাফ করতে পারছি না, বৌঠান! এরকম অসাধারণ স্বামীপরায়ণা মেয়ে আমি এ যুগে দেখিনি। আচ্ছা, আসি এবেলা—

ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়িতে উঠে চলে গেলেন বাড়ী। কিন্তু বাড়ী গিয়েই তিনি আশিসকে পত্র লিখলেন তার মা-বৌ এবং ল্যাবরেটরীর শুভ খবর দিয়ে। ঐ সঙ্গে লিখলেন :

—আশাকে দেখে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেছেন। এমন অপরূপ বধূ দুর্লভ। শিক্ষিতা বা সুরূপা অনেক মিলতে পারে, কিন্তু এমন 'ডিভোশান' কমই দেখা যায়। স্বামীর ব্যবহৃত জড় যন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত তার কাছে—স্বামীর আদরের মূক সহচর! আশা যেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে আস্বাদন করে বিরহ, অনুভব করে তাদের সুখ-দুঃখ...তিনি নিজের চোখে দেখেছেন আশাকে এই অবস্থায়।

অবশেষে তিনি লিখলেন, আশিস ফিরে এসে অন্য কিছুর গবেষণা করুক। দেরী যেন না-করে ফিরতে।

চিঠিখানা রওনা করে দিয়ে ডাঃ দিব্যেন্দু যেন কিঞ্চিৎ বোধ করলেন। কারণ তাঁর নিশ্চিত ধারণা আশার অন্তর-গভীর ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। পিতার মতো তিনি আশার কল্যাণ কামনা করতে লাগলেন।

আসন্ন সন্ধ্যা। কুমকুম প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে তুলসীমূলে। নীতীশ নিশ্চুপ পড়ে আছে উঠানের একখানা তক্তাপোষে। আকাশ মেঘলা। রমানাথ গেছে বাইরে রুগী দেখতে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। মুরগী-মসল্লাম রাঁধবার সব ব্যবস্থাই অবশ্য করে গেছে সে, কিন্তু রান্না করবে কে? নীতীশ ক্রমাগত ভাবছে—কত যে কি ভাববে, নীতীশই জানে। ততোধিক আশ্চর্য্য, রমানাথ যে-কাজের জন্য নীতীশকে ডেকে আনলো বাড়ীতে, সে কাজের কিছুই হয়নি। হবার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজালো কুমকুম। নীতীশ ভাবছে বাংলার সংস্কৃতি আজও নারীর আঁচলে গ্রন্থিবদ্ধ। কুমকুমের মতো মেয়েও সন্ধ্যা জ্বালে, শাঁখ বাজায়, প্রমাণ করে তুলসীমূলে। কুমকুম এসে প্রণাম করল নীতীশকে।

—কল্যাণ হোক—বলল নীতীশ।

—আপনি দেশে গিয়ে কি করবেন, দাদা?—কুমকুম শুধোলো।

—হোমিওপ্যাথি।—খামোখা বলে ফেললো নীতীশ। কিন্তু বলেই ভাবলো, কথাটা নেহাৎ সে মন্দ বলেনি! পল্লীর নিভৃত কোণে কিছুদিন নীতীশ কাটাবে—কাটতে বাধ্য সে। সে সময় হোমিওপ্যাথি করলে মন্দ কি? কিছু রোজগার তো ওকে করতে হবে। পাড়াগাঁয়ে ভাল টিউশ্যনি মেলে না।

—রমানাথের কি রকম রোজগার হয়, কুমকুম?—নীতীশ শুধোলো।

—তা, ভালোই।—বলে কুমকুম একটা বাঁশের মোড়ায় বসে বলল,—ভিজিট নেন এক টাকা। দাগ-পিছু ওষুধের দাম চার আনা। এক দাগ কি দু 'দাগ সত্যিকার ওষুধ—মানে দু'ফোঁটা, বাকী আট-দশ ভাগ জল,...বিশুদ্ধ জল।

হাসলো কুমকুম। বলল হেসেই,—আর ঐ-যে সাদা গুড়ো সুগার-অব মিল্ক ওটাও খুব চলে। পুরিয়া বেঁধে দেন। আর টনিক। নিম-বাসক-কষ্টিকারির সঙ্গে কুইনাইন মিশিয়ে কী যে এক বস্তু করেন দাদা, আপনার মুরগী মসল্লাম হার মানবে। ওটা রাঁধবেন কখন?

—তুমিই করো রান্না। আমার কাজে গা উঠছে না।—বলল নীতীশ।

—ওমা! সে কি?। সব ঠিক করা রয়েছে। রমাবাবু এসেই খেতে চাইবেন।

—আচ্ছা চলো তাহলে, কিছু রান্না করি—নীতীশ উৎসাহের সঙ্গেই উঠলো, কিন্তু রান্নাঘরে এসেই ওর সব উৎসাহ নিবে আসছে। কারণ কুমকুম খুব কাছাকাছি রয়েছে ওর। অল্পক্ষণ পূর্বে কুমকুমের প্রণাম-করা দেখে আশার কথাটাই মনে পড়েছিল ; কে জানে কোথায় যেন কি সাদৃশ্য রয়েছে! নীতীশ ভাবতে লাগলো...তেমনি সন্ধ্যা, তেমনি প্রসাধন-স্নিগ্ধা নারী, তেমনি নির্জন ঘর—গতকাল এমনি সন্ধ্যায় যা ঘটে গেছে তার জীবনে, আজও যেন তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

—আপনি কি যেন ভাবছেন, দাদা! নিশ্চয় সেই আপনার বান্ধবীর কথা।

—হ্যাঁ, তার কথাই ভাবছি সারাক্ষণ!—বলল নীতীশ, এবং আরো বলল,

—তোমার সঙ্গে তার যেন খুব সামঞ্জস্য রয়েছে!

—তাহলে আমার কথাই ভাবুন, তার কথা কেন ভাবছেন আর?

—কিন্তু তুমি তো পর হয়ে গেছে!

—ওমা! কেন? রমাবাবুর কথা বলছেন? না, কিছু না। আছি তো আছি—যেদিন খুসি চলে যাব। ওর সঙ্গে তো আমার গাঁটছড়া বাঁধা নেই...

পরিষ্কার কণ্ঠে জানিয়ে দিল কুমকুম যে, সে 'কে'—এবং কী ধরনের নারী।

নীতীশ কিন্তু চুপ করে রইল। কুমকুমের কথা ওকে যেন পীড়িত করছে। কুমকুম বুঝতে পেরে বলল,—আমি কথার কথা বলছি নীতীশদা! আপনি সত্যি ভাবলেন? ছিঃ। রমাবাবু আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। এই যে মশলা-বাটা—

—হুঁ...

নীতীশ নিঃশব্দে নিল মসলা বাটা। কিন্তু কুমকুমের কথাগুলোর কোনটা সত্যি' আগেরটা না পরেরটা? নীতীশ ভাবছে...কুমকুম বলল,

—আপনার সেই বান্ধবীকে বিয়ে করে ফেললেই তো পারেন, নীতীশদা!

—না, বিয়ে তাকে করা যায় না। বিয়ের শেকলে প্রেম থাকে না, কুমকুম।

—কিন্তু শান্তি থাকে। সম্পর্ক থাকে একটা মানুষের সঙ্গে—মাটির সঙ্গেও। মেয়েদের পক্ষে বিয়ে-না-করে কারও সঙ্গে ঘর-করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। যে কোনো মুহূর্তে সেই পুরুষটি পর হয়ে যেতে পারে। যে-কোনো দিন মেয়েটির পায়ের তলায় মাটি সরে যেতে পারে...

কুমকুমের কথাগুলো অকথ্য বেদনায় উত্তেজিত—নীতীশ শুধুলো,

—তুমি এরকম করে ভাবো, কুমকুম?

—হ্যাঁ, দাদা ভাবি।

—তুমি কতটা লেখাপড়া শিখেছ, কুমকুম?

—শিখেছিলাম! খারাপ ঘরে জন্মালেও আমার মা আমাকে লেখাপড়া নাচ-গান-বাজনা শিখিয়েছিল। এখানকার মেয়ে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। মা এখানকার নামকরা বাঈজী ছিল ; কিন্তু ও-জীবন আমার ভাল লাগেনি, দাদা! কিছুদিন আগে যখন 'ওদের' উচ্ছেদ করবার কথা উঠলো—তখনি মা গেল মারা। আমি যে কী করবো, ভেবে পাই নি। সেই সময় হোল আমার অসুখ। তারপর...

—রমানাথ তোমাকে আরোগ্য করে এখানে আনলো?

—না! আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে তখনই। তবে আমি এখানে তখন আসিনি। কলকাতা চলে গিয়েছিলাম, থিয়েটার বা সিনেমায় অভিনয়ের জন্য। ওখানে কিন্তু আমার সুবিধা হোল না, দাদা! অভিনয় ভালোই করেছিলাম, নামও হচ্ছিল—হঠাৎ একটা লোক, শ্যামল তার নাম, আমাকে এমন প্রলোভন দেখালো তার নতুন সিনেমা কোম্পানীতে নায়িকা সাজাবার জন্য যে, থিয়েটার ছেড়ে চলে এলাম তার সঙ্গে বেলেঘাটার ফ্ল্যাটে। সেখানে সেই শ্যামলবাবু পুরো তিনটি বছর আমাকে আট্‌কে রাখলো। সিনেমার কথা বললেই বলতো'—অত তাড়াতাড়ি ওসব কাজ হয় না।' শেযে আমি একদিন সকালে বেরিয়ে 'বাস' ধরে সটান হাওড়ায় এসে টিকিট কিনে চলে এলাম বর্দ্ধমান। তারপর এসে রমাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম।

—সেই থেকেই আছ এখানে?

—হ্যাঁ...ওটা নেড়ে দিন, দাদা, ধরে যাবে—কুমকুম রান্নাটা দেখালো।

নীতীশ ওরই হাতে খোন্তাটা দিয়ে বলল,—তুমিই নাড়ো।

কুমকুমের জীবনের বিপর্যয়কর কাহিনীটাই ভাবছিল নীতীশ। বলল,

—শ্যামলের কাছে টাকাকড়ি কিছু পেয়েছিলে, কুমকুম?

হ্যাঁ, খুব বেশী না। হাজারখানেক ঐ তিন বছরে। আর গহনাও হাজার-তিন-টাকার। কিন্তু সে টাকা আমার হাতে নেই, দাদা! রমাবাবু তাঁর ডিসপেনসারী করতে খরচ করেছেন।

—তুমি দিলে কেন?

—আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন উনি, দাদা—নইলে আমি কোথায় যেতাম। নীতীশ বুঝলো কুমকুম খুব ভাল মেয়ে ; উদারতা তার যে-কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের থেকে কম নয়।

নীতীশ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো,

—আচ্ছা, কুমকুম, তুমি অনেক ঘুরেছ! এপর্যন্ত কাউকে ভালবেসেছো তুমি?

—পুঁথিতে যাকে 'ভালবাসা' বলে ; আমাদের তো হয় না, দাদা!

—কেন কুমকুম! তোমারও নারী-অন্তর, তোমারও মানুষের মন...

হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ওসব হোতে নেই, দাদা! হলেও, মুখে স্বীকার করতে নেই।

—কেন?

—কারণ...খোন্তা নাড়তে নাড়তে হাসছিল কুমকুম। মৃদুমধুর—বলল,—ভাল যাকে বাসবো, সে যদি ঘৃণা করে তো বড়ই অসহ্য লাগে,—দাদা। আর, যে কোনো পুরুষ ঘৃণা

আমাদের করবেই—এটা পুরুষের স্বভাব। আমরা বিলাসের-ব্যসনের বস্তু—বধূর মর্য্যাদা তো পেতে পারি নে...

ওর কথার সুরে কেমন একটা মিশ্রিত অভিমান। কিন্তু কার উপর?—ভাবছিল নীতীশ। হয়তো রমানাথের উপরই আবার প্রশ্ন করলো সে.

—তুমি নিশ্চয় কাউকে ভালবেসেছ, কুমকুম—হয়তো রমানাথকেই...

—ভালবাসা অত্যন্ত গোপন ধন, দাদা—ওকথা কাউকে বলতে নেই।—হেসে বলল কুমকুম—এমন কি, যাকে, ভালবাসি, তাকেও না! বললেই ও মর্যাদা-হানি হয়...হ্যাংলা হয়ে যায় প্রেমটি। তাকে তখন আর প্রেম বলা চলে না।

—তুমি তো চমৎকার করে কথা বলতে পার, কুমকুম?

—শিখেছি! ওরকম না-বলতে পারলে চলবে কেন? ব্যবসায়ী মানুষ! কুমকুম যেন অতি অনায়াসে নিজেকে দেহ-ব্যবসায়িনী বলে পরিচয় দিল। কিন্তু কেন? নারীরা সাধারণত এসব কথা গোপন করে রাখতে চায়। কুমকুম যেন অন্য ধাতুতে-গড়া...অথবা আর কোনো কারণ আছে!

রান্নাটা আগুনে ফুটছে। কুমকুম মুখের ঘাম মুছে বলল,

—আপনি ঐ বান্ধবীর প্রেমে পড়ে গেছেন, না দাদা?

—না...কেন? বান্ধবী—বান্ধবী-ই!—নীতীশ তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু প্রেমে-পড়া তো একটা রোগ-বিশেষ! রমাবাবু বললেন,—হোমিওপ্যাথিতে নাকি প্রেমে-পড়া-রোগীকে ভাল করবার ওষুধ আছে!—হাসলো কুমকুম! প্রেমে-পড়ার ওষুধ আছে!—হাসলো কুমকুম! প্রেমে-পড়ার ওষুধ থাকে নাকি?

—আছে, দাদা—হোমিওপ্যাথিতে প্রেমে-পড়া, ভূতে-পাওয়া, ডাইনী-লাগার ঔষধ আছে।

হাসছে কুমকুম ; নীতীশ বলল,—হোমিওপ্যাথি তুমি পছন্দ কর না?

—কেন! খুব পছন্দ করি। অতি অল্প পয়সায়, আর খেতে কোনো কষ্ট নেই তাছাড়া.. কুমকুম আবার হেসে বলল,—তাছাড়া, অত লাভ আর কোনো ব্যবসায় নেই। ওষুধ আর জল...মানে জল-ই ওষুধ!

—না কুমকুম, হোমিওপ্যাথি অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি। ওর আবিষ্কর্তা মহাত্মা হ্যানিম্যান দধীচির মতো ঋষি ; নিজেকে নিঃশেষ করে হোমিও বিজ্ঞান তিনি পৃথিবীর রোগক্লিষ্ট মানুষকে দান করেছেন। আমি সত্যি হোমিওপ্যাথি আরম্ভ করবো—নীতীশ বললো।

—করবেন! প্রেমে যদি পড়ি কখনো তো, যাব আপনার ডাক্তারখানায়...হেসেই বলল কুমকুম। কিন্তু নীতীশ ওর কথাটা ধরে বলল,

—তুমি আগে বলেছ প্রেমে-পড়া গোপন ব্যাপার। আমার কাছে সেটা বলবে কি করে?

—ডাক্তারকে সব বলতে হয়, নইলে ওষুধ দেবেন কেমন করে? আর আপনি তো শুধু ডাক্তার নন—প্রেমে-পড়া ডাক্তার। তুমি আমাকে একেবারে রসাতলে পাঠালে, কুমকুম! কখন কার প্রেমে পড়লাম আমি?

—পড়েছেন!—হাসতে লাগলো কুমকুম। ওর তরল হাসি কিন্তু গরল ছড়াচ্ছে নীতীশের মনে। সত্যি কি সে প্রেমেই পড়ে গেছে আশার!

কুমকুমের হাতটা ধরে ধমক দিল নীতীশ। বলল,

—হেসো না। কিসে বুঝলে যে আমি প্রেমে পড়েছি?

নীতীশের মুখের পানে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল কুমকুম। তাকিয়ে রইল ওর চোখের পানে। তারপর আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল,

—প্রেমে পড়া কিছু অপরাধ নয়, দাদা—ওটা মানুষের হৃদয়ের একটা বৃত্তি—

—হোল, মানলাম 'বৃত্তি'! কিন্তু আমি কোথায় কার প্রেমে পড়লাম? তোমার?

—বেশ তো, পড়ুন না!—যেন আত্মরক্ষার জন্যই বলে উঠলে কুমকুম।

—কিন্তু রমানাথ...

—তিনি তো প্রেমে পড়েননি। প্রয়োজনে পড়ে আমাকে রেখেছেন আমিও রয়েছি।

নীতীশ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল হাতখানা।

—প্রয়োজনে-পড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না, কুমকুম?

—প্রয়োজনটা বাইরের বাস্তব ব্যাপার। তাকে অস্বীকার করা যায় না, দাদা? প্রেম অন্তরের উপলব্ধ সম্পদ, তাকে রূঢ় বাস্তবে আনতে নেই।—বলে কুমকুম চলে গেল ও-ঘরে। নীতীশ একা বসে কত-কি ভাবতে লাগলো।

অনেকক্ষণ আর এলো না কুমকুম। নীতীশ অবশেষে ডাক দিল,

—কুমকুম...

সাড়া নেই। হোল কি ওর! নীতীশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখলো বালিসে মাথা রেখে কুমকুম শুয়ে রয়েছে। কান্নায় তার সারা দেহ দুলে-দুলে উঠছে বারম্বার। অবাক নীতীশ এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল,—কি হোল, কুমকুম? কেন কাঁদছো?

কুমকুম সাড়া দিল না। নীতীশ বিহ্বল হয়ে একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর সবলে ওকে তুলে ধরে নিজের কোলে ওর মাথাটা নিয়ে বলল,

—কী তোমার ব্যথা, বলো আমাকে! এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে নেই? কিম্বা...

—আপনি কেন এলেন!—কুমকুম বলল খানিকটা উত্তেজিত অভিমানে,—আমি বেশ ছিলাম! আমি প্রেমহীন জীবন যাপন করি, এই সত্য আপনি কেন জেনে নিলেন আমার মুখ থেকে! আপনি কি আমাকে 'প্রেম' দিতে পারবেন? না, পারবেন না! আপনার মন ঐ ধান্ধবী'তে বাঁধা আছে। আমি পথের এঁটো ঠোঙা,—আমাকে কুকুরে চাটবে! তারপর আমি গলে যাব ময়লা জলের নর্দমায়। আমাকে কেন 'সোনার প্রেম' শোনাতে আসেন আপনি!...

কুমকুমের চোখের জল শুকিয়ে গেছে!—জ্বলছে যেন চোখ দুটো। ওর উত্তেজিত আঁখিপল্লব অপরূপ দেখাচ্ছে! ওর অভিমান-স্ফুরিতাধর ঠিক আশার মতই চুম্বকমদির! নীতীশ অজ্ঞানের মতো আকর্ষিত হচ্ছে যেন। আগুনে পতঙ্গ-পড়ার-মতই প্রলুব্ধ সে...কিন্তু...

—'কুমকুম!'—বাইরে ডাকছে রমানাথ।

নীতীশ-ই গিয়ে দরজার খিল খুলে দিল। ফিরে এসে দেখলো, কুমকুম নিঃশব্দে নিজের কাজ করছে রান্নাঘরে।

নীতীশ বারান্দার বেঞ্চে বসে পড়ল। রমানাথ শুধলো,

—আপনার মুরগী-মসল্লাম রান্না হয়ে গেছে তো?

—হ্যাঁ।—বলল নীতীশ। তারপর বলল,

—আমার ইচ্ছে, তাপসীপুরে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করি। আপনি যদি আমার জন্য কলকাতা থেকে কিছু ওষুধ আর দু'একখানা বই এনে দেন তো ভাল হয়। আমি আর যেতে চাই নে, কারণ আমি তো বিশেষ কিছু জানিনা ও বিষয়ে। কত টাকা হলে হবে বলুন তো।

—শ'-খানেক।—বলে রমানাথবাবু একটা ফর্দ করতে লাগলেন মহা উৎসাহের সঙ্গে।

খাওয়ার সময় ঠিক হোল, সকালের ট্রেন ধরে রমানাথ কলকাতা গিয়ে বেলা একটায় ফিরে আসবে ওষুধ নিয়ে। কুমকুম সব শুনেছিল। নীতীশের শোবার ব্যবস্থা করে একটি ছোট্ট কথা বলল,

—আমি বধূ নই, বান্ধবী নই—আমি বীর বধূ...

—তোমাকে 'শুধু বধূর' সম্মান দিতে চাই আমি!

—তা হয় না নীতীশদা! আপনি পারবেন না।—চলে গেল কুমকুম। কিন্তু নীতীশ দেখতে পেল ওর চোখের কানায় কানায় জল।

রবিবার। তাই ডাঃ দিব্যেন্দুর ছুটি। তিনি সকালেই বেরুলেন আশাকে পড়াবার জন্য। কিন্তু পথে তাঁর মনে হোল, নীতীশের একবার খবর করা দরকার। সে চোর...কিন্তু নাও তো হতে পারে! নীতীশের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে না তো! ড্রাইভারকে তিনি ঢাকুরিয়া যেতে বললেন।

মোড়ের মাথায় দোকানীদের জিজ্ঞাসা করতেই সে দেখিয়ে দিল কোন্ বাড়ীতে নীতীশ থাকে। ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়ী থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকে দেখলেন তালা ঝুলছে। পালিয়েছে নীতীশ! আর কোনো সন্দেহ নেই তার 'চুরি' সম্বন্ধে। তবু তিনি পাশের বাড়ীতে খবর করলেন,

—নীতীশ কবে গেছে এখান থেকে?

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকই বাড়ীওয়ালা। তিনি বললেন,

—নীতীশ প্রায়ই বাইরে থাকে, কেউ তার খোঁজ করে না। তবে গতকাল অথবা পরশু, ঠিক মনে নেই—সে বাড়ী ফেরেনি।

—তালাটা কি খোলা যেতে পারে? শুধোলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আজ্ঞে, তা কি করে হবে! তাহলে পুলিস ডাকতে হয়।

—থাক্—বলে দিব্যেন্দুবাবু চলে এলেন। কিন্তু তার মনে আর কোনো সন্দেহই রইল না নীতীশের চুরি সম্বন্ধে। খুবই দুঃখিত হলেন তিনি। কিন্তু কি করা যায়।

আশিসের বাড়ীতে গাড়ী ঢুকতেই আশা এসে প্রণাম করলো। যেন সে অপেক্ষাই করছিল ওঁর জন্য। দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—চলো মা, ল্যাবরেটরীতেই পড়াবো তোমাকে।

—চলুন!—আশা এগোলো।

দিব্যেন্দুবাবু মার সাথে একটু কথা কয়ে যেতে চান।

—নীতীশ পালিয়েছে, বৌঠান! ওর ঘর দেখে এলাম আমি।

...হতভাগ্য হয়তো দেশত্যাগ করে যাবে, ঠাকুরপো! সে যদি আমার কাছে চাইতো 'থিসিস্টা' তো, আশিসকে বলে তাকে দিতাম আমি...

—আশিস নিজেই ওকে দিতে পারতো, বৌঠান...কি যে ভুল করলো নীতীশ!

মা চুপ করেই আছেন। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—চোরকে ক্ষমা করা যায় না, বৌঠান! ওর আর মুখ দেখতে চাই নে!

—হ্যাঁ ঠাকুরপো! কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কি কথা, বৌঠান?

—নীতীশ যদি ওটা নিজে না-নিয়ে কাউকে বিক্রি করে দেয়! অভাবী ছেলে! আর, নিজের নামে বের করবার সাহস নাও থাকতে পারে তো?

—তার জন্য কি করা যেতে পারে, বৌঠান!—দিব্যেন্দুবাবুর কণ্ঠ কঠিন শোনাচ্ছে!

—কোনো রকমে তাকে জানানো যায় না, ঠাকুরপো, যে—সে ওটা নিজেই নিক্। তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে বড় হোক...সে নামী হোক---

—বৌঠান!—দিব্যেন্দুবাবু রুমাল বের করে চোখ মুছতে-মুছতে বললেন,—মাতৃ-অন্তর যে কত মহৎ তা আজ ভাল করে জানলাম...

—নীতীশকে আমি ছেলেরই মতো দেখি ঠাকুরপো! অপরাধী ছেলেকে মা ত্যাগ করে না!

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবর হয়তো তাকে দেওয়া যেতে পারে, বৌঠান। কিন্তু...কিন্তু আমি 'মা' নই, আমি কঠিন বেত্রধারী মাষ্টার! যে-ছেলে এই মার বুকে এমন আঘাত করতে পারে তাকে আমি মাফ করি না...করতে পারি না...

—চলে যাচ্ছেন দিব্যেন্দুবাবু—, মা তাড়াতাড়ি বললেন,

—আমার বুকের ব্যথা আমি সয়ে যাব, ঠাকুরপো! আপনি খবর দিন। আপনি তাকে জানান, সে যেন ভয় না-করে। ওটা বিক্রী না-করে নিজেই যেন কাজে লাগায়—

—আমি ভেবে দেখবো, বৌঠান—বলেই চলে এলেন দিব্যেন্দুবাবু।

কিন্তু ভেবে তিনি কি দেখবেন আর? নীতীশকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। আজন্মা কৌমার্য্য-ব্রতধারী কঠোর বিজ্ঞানসাধক তিনি ; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য। তাঁর হাতে শিক্ষালাভ করে যে নীতীশ এতবড় অপরাধ...শুধু চুরি নয়, ঐ মায়ের অন্তরে আঘাত করতে দ্বিধা করলো না, তাকে ক্ষমা করা দিব্যেন্দুবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এতক্ষণে দিব্যেন্দুবাবুর মনে আর একটা চিন্তার জট-ও খুলে গেল। আশিস সেদিন ফোনে বলেছিল—'পারিবারিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে এই চুরিতে'...তখন কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি দিব্যেন্দুবাবু। এতক্ষণে বুঝলেন বৌঠানই চান না যে নীতীশ জেলে থাক্। বেশ! কিন্তু তাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে যে, 'তাকে ক্ষমা করা হোল!' না, এতবড় নৈতিক অপরাধ করতে পারবেন না দিব্যেন্দুবাবু।

আশা ল্যাবরেটরীতে দাঁড়িয়ে দেখছিল যন্ত্রগুলি—দিব্যেন্দুবাবু এসে ঢুকলেন। আশা এগিয়ে এসে বলল,

—কোথায় বসবেন, কাকাবাবু? ঐ বড় টেবিলটায়?

—না, মা, আগে তোমাকে যন্ত্রগুলোর কাজ কিছু বোঝাই। দেখ, কালিচরণ 'সুইচ-অন' করো তো।

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একটা জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ওকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন দিব্যেন্দুবাবু—

'—শোন—ল অব ট্রান্সফরমেশন অব্ মাস ইনটু এনার্জি...'

বেশ খানিকটা বলার পর অকস্মাৎ দিব্যেন্দুবাবু দেখতে পেলেন আশা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। নিজের ভুল বুঝে তিনি চাদরখানায় মুখ-ঘাড় মুছতে-মুছতে বললেন,

—আমার ভুল হয়েছে মা! তোমাকে গোড়া থেকে শেখাতে হবে। এসো, কতকগুলো সূত্র আজ বোঝাই তোমাকে...

—আমার মনে হচ্ছে, কাকাবাবু, আপনার মন যেন খুব চঞ্চল। কি হয়েছে, কাকাবাবু? শরীর ভাল আছে তো!

—হ্যাঁ মা, শরীর ভাল...ঐ বৌঠান মনটা খারাপ করে দিলেন। আমি তোমায় আজ কি পড়াব, ভাবি একটু। ততক্ষণ তুমি আমার জন্য একবাটি চা করে আনো।—চেয়ারে বসে পড়লেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

আশা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল চা আনতে। দিব্যেন্দুবাবু ল্যাবরেটরীর চারদিকে চাইতে-চাইতে ভাবতে লাগলেন—চোরকে তার মা ক্ষমা করতে পারে, মাসি ক্ষমা করতে পারে—মাষ্টার পারে না। শিক্ষাগুরুর কর্তব্যের এমন অমর্য্যাদা করবেন না তিনি।

কিন্তু কি তিনি করতে পারেন। বৌঠান তো অপর কাউকে দিয়ে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে কাগজে ছাপতে পারেন! না, তা ডাঃ দিব্যেন্দু হতে দেবেন না। তাড়াতাড়ি প্যাড বের করে তিনি বিজ্ঞাপন লিখলেন :

"ব্যক্তিগত : নীতীশ, তোমার কদর্য্য অপরাধ নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। অবিলম্বে এসে আত্মসমর্পণ কর—অন্যথায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যদি না আস তো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে।

—দিব্যেন্দু।"

তিনখানা কপি করে তিনটে কাগজে পাঠাবেন—কিন্তু আশা চা নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপন-লেখাটা ড্রয়ারে ভরলেন তিনি। আশাকে বললেন,

—কয়েকটা ছোট যন্ত্রপাতি আনতে হবে, মা! ওবেলা আমি কিনে আনবো। এবেলা শুধু তোমাকে বুঝিয়ে দিই, বর্তমান বিজ্ঞান মানুষকে কোথায় এনেছে।...

আশা নিঃশব্দে বসে শুনতে লাগলো ওঁর বক্তৃতা। সহজ সুন্দর করে বললেন উনি বেশ কিছুক্ষণ। আশার খুবই ভালো লাগছে। ওর পাঠ-পিপাসু অন্তরে যেন ক্ষুধা জাগছে আরও। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু খানিকক্ষণ বলেই বললেন,

—এবেলা আর থাক্, মা তুমি ভেতরে যাও! আমার কিছু কাজ আছে এখানে।

আশা চলে গেল। দিব্যেন্দুবাবু ড্রয়ার টেনে বের করলেন বিজ্ঞাপনটি। সবুর সইছে না ওঁর। তাড়াতাড়ি নিজেই তিনটি 'কপি' করে সম্পাদককে চিঠি লিখে খামে মুড়লেন। তারপর কালিচরণের হাতে দিয়ে তিনটি বিখ্যাত দৈনিক কাগজে পাঠিয়ে দিলেন পর পর তিনদিন ছাপবার জন্য।

অতঃপর উঠলেন তিনি। ভেতর দিকেই গাড়ীখানা রয়েছে। তাই অন্দরে এসে, গাড়ীতে উঠবার আগে বৌঠানকে বললেন,

—বিজ্ঞাপন আমি লিখে পাঠলাম, বৌঠান। যদি সে আসে তো আমার সঙ্গে আগে তার দেখা করবার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা, ঠাকুরপো! তাই হবে। কিন্তু নীতীশ তো এমন ছেলে ছিল না, ঠাকুরপো!

—ছিল না তো, হোল কি করে, বৌঠান! যে হতভাগাকে পুত্র-স্নেহে মানুষ করেছি, যার প্রতিভা দেখে গর্ব বোধ করতাম—সে কি-না...বৌঠান, আপনি তাকে ক্ষমা করলেন, আমি পারছি না! আমার মনে হচ্ছে...কি যে মনে হচ্ছে, বৌঠান, বলতে পারবো না!

চলে গেলেন দিব্যেন্দুবাবু। মা নিশ্চুপ খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ভেতরে গেলেন।

সাররাত ঘুম-জাগরণের ছায়াবাজি চলছে নীতীশের চোখে। কখন ঘুমিয়েছে মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ছে একখানা অভিমান স্ফুরিত কণ্ঠ। দুটি অশ্রুদীপ্ত আঁখিপল্লব। কিন্তু কার! কুমকুমের? না আশার? নাকি দুজনেরই? কার মুখখানা সারারাত দেখেছে নীতীশ?—কিছুতেই ও ঠিক করতে পারছে না, কার সে মুখ! নাকি দুটো মুখই এরকম? না তো! কিন্তু শোবার সময় নীতীশ কুমকুমকেই দেখেছে—হ্যাঁ, তাহলে কুমকুমকেই দেখেছে সারারাত স্বপ্নে।

দেখেছে আশাকেও। দেখেছে ল্যাবরেটরীর সিঁড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে থিসিস্‌খানা নিল সে আশার হাত থেকে। তাহলে আশাই ছিল ওর স্বপ্নে সারারাত! কুমকুম নয়। না, কুমকুমকে কেন দেখবে সে?...উঠছে নীতীশ। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে ওর। অকারণ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন তো বাস্তব নয়! স্বপ্নে-দেখার মূল্য কি? কিন্তু মূল্য আছে। নীতীশের মনে পাপ-প্রবণতার প্রকাশ ঐ স্বপ্ন। কথাটা মনে উদয় হতেই নীতীশ আবার বালিশে মাথা রাখলো।

এর থেকে কুমকুমকে স্বপ্নে-দেখা ভাল ছিল। কুমকুম বারনারী তাকে স্বপ্ন দেখার অধিকার সকলের আছে, এমনকি তার সঙ্গে প্রেম করলেও নিজেকে অপরাধী ভাববার খুব বেশী কারণ নেই। কিন্তু নীতীশ তো কুমকুমকে দেখেনি স্বপ্নে! দেখেছে আশাকে—এক সাধ্বী সতীর জ্বলন্ত মূর্তিকে—যে নীতীশের মতো দুরাত্মাকে 'নিজের স্বামী' বলে ভুল করেছে। নীতীশ তার স্বামিত্ব গ্রহণ করেছে, তাকে ছুঁয়েছে, তাকে ধরে...না, নীতীশ এসব কিছু করেনি...না, কিছু না!

—উঠুন! চা খান—কুমকুম-ই ডাক দিচ্ছে। আশা নয়, কুমকুম!

চমকে উঠলো নীতীশ। আকস্মিক আহ্বানটাও যেন আশার-ই নাঃ, নীতীশ তার ভুল সংশোধন করবে কুমকুমকে দিয়ে। কুমকুমের ওপর তার মোহটাকে বাড়িয়ে দিয়ে নীতীশ ভুলে যাবে আশার কথা। এ না-হলে নীতীশের অবস্থা ক্রমশ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যেন।

ত্বরিত মনে কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে নীতীশ উঠে বসল। বলল,

—রমানাথ উঠেছে নাকি? কোথায় সে?

—তৈরী হয়ে রয়েছে। আপনার ওষুধ কিনতে যাবে। টাকা দিন-গে—

—ও, তাইতো!—নীতীশ তাড়াতাড়ি এসে সুটকেশ খুলে টাকার ব্যাগটা বার করলো, তারপর বাইরে এসে দশখানা দশটাকার নোট দিল রমানাথের হাতে। রমানাথ আর একবার গুণে নিয়ে বলল,

—আমি একটার ট্রেনেই ফিরতে চেষ্টা করবো, যদি না পারি তো, চারটের ট্রেনে—

চলে গেল রমানাথ ট্রেন ধরতে। নীতীশও হাতমুখ ধুলো—চা খাবে। কুমকুম হাসছে। বেশ-মৃদুমধুর হাসছে। নীতীশ শুধালো,

—হাসছো কেন কুমকুম? কি হোল?

—আমি ভেবেছিলাম আপনার হোমিওপ্যাথি-করা কথার-কথা। কিন্তু দেখছি সত্যিই আপনি ঐ কাজ করবেন! আশ্চর্য্য লাগছে—

—কেন, আশ্চর্য্য কেন?—নীতীশ তাকালো কুমকুমের পানে।

—মানে—হাসিমুখেই বলছে কুমকুম,—রমাবাবুর কাছে শুনলাম আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-কথা ছাত্র। আপনি নাকি পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণ করেছেন।—চা খান। একটু হালুয়াও করেছি—দিলো কুমকুম।

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি!

—আপনি পড়াগাঁয়ে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করবেন, যার দৈনিক আয় বড় জোর এক থেকে দু'টাকা—তাও যদি চলে। আশ্চর্য্য নয়! এতে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

—কি মনে হচ্ছে, কুমকুম?—নীতীশ প্রশ্ন করলো।

—আপনি জোর কোন আঘাত পেয়েছেন মনে। হয়তো প্রেমে বঞ্চিত হয়েছেন ; হয়তো সেই বান্ধবী আপনাকে...আমার অনুমান ঠিক কিনা বলুন?

—তুমি কথাটা শেষ কর, কুমকুম।—নীতীশ চা খেতে খেতে বলল।

—ওর আবার শেষ কি! আপনি তাকে পেলেন না, তাই এই বৈরাগ্য।

—তোমার অনুমান ঠিক নয়, কুমকুম! আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না—আমি তাকে সুখী করবার যোগ্য নই, তাই তাকে যথাযোগ্য জায়গায় যাবার সুযোগ দিয়ে এলাম। 'আমাকে' ভুলে যাবার অবসর দিলাম!

—ওঃ! —কুমকুমের চোখ শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল।—আপনার প্রেমের মহিমাকে প্রণাম করি দাদা—সত্যি সে প্রণাম করলো নীতীশকে!—কিন্তু আপনি তো তাকে ভুলতে পারছেন না! আপনার গতি কী হবে!

—যা-হয় হবে!—বলে নীতীশ চা-খাওয়া শেষ করলো। কিন্তু কী নিদারুণ মিথ্যে কথা বলল নীতীশ। এই ঘটনার পর থেকে নীতীশ ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলছে। অথচ এর পূর্বে মিথ্যে সে খুব বেশী বলতো না। নীতীশ ভাবতে লাগলো সিগারেট ধরিয়ে —এই মিথ্যে কথাটা বলে কুমকুমের শ্রদ্ধার আসন লাভ করলো—কুমকুমের হৃদয়-ভরা শ্রদ্ধাকে মিথ্যার মূল্যে ক্রয়-করা, এটা কি চুরির থেকেও গুরু অপরাধ—গুরুতর যেন!

—কিন্তু আপনি তাকে সুখী করতে পারেন না কেন, দাদা। কোথায় অযোগ্যতা আপনার। ·

—সে-কথা মুখে বলা যায় না, কুমকুম! প্রত্যেকের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সে নিজে জানে।

নীতীশ কথাটা চাপা দিতে চায়, বুদ্ধিমতী কুমকুম বুঝলো। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। নীতীশ উঠানের গামলাগুলো দেখছিল। বলল,

ওতে অ্যালকোহল মেশাবার কায়দাটা তো দেখানো হোল না রমানাথকে!

—থাক্, ওর জন্য ব্যস্ত কি? আপনাকে 'ওর' জন্যই তিনি ডাকেননি!

—তাহলে?—নীতীশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো,—তাহলে কি জন্য ডাকলো?

—বেশী বুদ্ধিমানরা বেশী বোকা ব'নে যায়, দাদা, আপনি সেই বোকার দলে!—হাসলো কুমকুম!

—কেন কুমকুম?

—রমানাথবাবু গভীর জলের মাছ। বান্ধবীর ছবি-সমেত আপনাকে ট্রেনে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন আপনি প্রেম-জীবনে আঘাত পেয়েছেন নিদারুণ. তাই সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। সুযোগটা এই—হাসলো কুমকুম ক্লান্তহাসি—শ্যামলের কাছে আমি যে-অবস্থায় ছিলাম, রমাবাবুর কাছে তার থেকে ভাল থাকি না। বরং খারাপ। ওখানে কিছু টাকাকড়ি পেতাম, এখানে আমার যথাসর্বস্ব গেল। কিন্তু আমি এ-ক্ষতি স্বীকার করতে চেয়েছিলাম সমাজ-জীবনের মর্য্যাদা পাবার আশায়...বধূর সৌভাগ্য অর্জ্জনের আকাঙ্খায়! কিন্তু...অল্প সময় থামলো কুমকুম—কিন্তু আমাদের 'জন্ম' আমাদের বঞ্চিত করেছে! 'কর্ম' আমাদের কারাবদ্ধ করেছে এক বিশেষ শ্রেণীতে। আর, 'ভাগ্য' আমাদের বিড়ম্বিত করেছে পুরুষের বিলাস-লালসার বহ্নিতে!

—ব্যাপারটা খুলে বলো, কুমকুম!

—আপনার অবস্থা অনুমান করে রমাবাবু আপনাকে এখানে ডেকে এনেই আমাকে আদেশ করেছেন, আপনার মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে আমি আপনার ঘাড়ে চড়ে চলে যাই—কারণ, রমাবাবু আমাকে আর সইতে পারছেন না।

—কারণ কি?

—কারণ আমি তার বধূ হতে এসেছিলাম। বিলাস-সঙ্গিনী হতে চাইনি। এবং তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার যথাসর্বস্ব অপহরণের সময়। এখন তিনি চান যে, আমি চলে যাই। তাই আপনাকে আশ্রয় করতে বলছেন। কিন্তু, দাদা...কুমকুম করুণ হাসলো। কান্নার মতো করুণ! বলল,

—আপনি ঐ বান্ধবীর প্রেমে ভরপুর আছেন! আপনার সর্বনাশ কেন করবো আমি? আর, করে আমার কী লাভ হবে? আপনার প্রেম তো আমি পাব না!

নীতীশ নিঃশব্দে বসে রয়েছে। কুমকুম একটু থেমে বলল,

—আপনি আজই চলে যান, দাদা—নইলে আপনি বিপদে পড়বেন...

—কী বিপদ, কুমকুম!—বিস্মিত নীতীশ প্রশ্ন করলো।

—রমাবাবু যদি আর ফিরে না আসেন তো, কি করবেন আপনি। অথবা যদি ফিরেই আপনার নামে আমাকে জড়িয়ে কোনো কলঙ্ক দেন তো, কি করবেন? যদি আপনাকে আমার সন্তানের পিতা বলে প্রচার করেন তো, কি করতে পারেন আপনি?

ভয়ে নীতীশের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। এসব কি বলে কুমকুম! কিন্তু সে ধৈর্য্য ধরে সব কথা, সব পরামর্শ শুনে নিতে চায়। তাই প্রশ্ন করলো,

—এরকম মতলব তার আছে নাকি, কুমকুম? তুমি জানো?

—আমাকে বলবার মতো কাঁচা লোক তিনি নন, দাদা—আমি আন্দাজ করছি। ওর থেকে শ্যামল অনেক ভাল লোক ছিল। সে চরিত্রহীন, কিন্তু সমাজে সাধু সেজে, সমাজসেবক সেজে ভণ্ডামী করে না!

—রমানাথ ফিরবার পূর্বেই কি তুমি আমাকে চলে যেতো বলছো?

—না। তাতে আপনাকে 'চোর' অপবাদ দেওয়া বিচিত্র কিছু নয় তার পক্ষে। সে ফিরে এলে আমি জানাব যে, 'এতো তাড়াতাড়ি আপনাকে "ক্যাপচার" করা সম্ভব হোল না। দু'চারদিন পরেই আবার ফিরবেন, তখন আমি যা-করবার করবো।'—এই বলে ওকে

বুঝিয়ে দেব আমি। কিন্তু আপনি ওবেলা নিশ্চয় চলে যাবেন! কারণ রাত থাকলে কী যে হবে, আমি জানি না...

চলে গেল কুমকুম রান্নাঘরে। নীতীশ নিঃশব্দে বসে। কিন্তু কিছুই সে ভাবতে পারছে না। বুদ্ধিটা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওর। ওর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কে অপরাধ-বিজ্ঞানের যতটুকু ধরা আছে, তার কিছুই আজ কাজে লাগছে না। দীর্ঘক্ষণ নীতীশ চুপ করে বসে রইল। যখন উঠলো, তার সিগারেটের টিন খালি। নিঃশব্দে স্নান করে খেয়ে শুলো। এতক্ষণ প্রায় কোনো কথাই কয়নি সে কুমকুমের সঙ্গে। কুমকুমও। নীরবে দুটি প্রাণী যেন আপন-আপন চিন্তায় বিভোর।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর নীতীশের যেন কিছু চিন্তাশক্তি ফিরে এল।

—খাওয়া হোল, কুমু?— প্রশ্ন করলো সে ও-ঘরের কুমকুমকে।

—হ্যাঁ। ডাকছেন দাদা?—বলে কুমকুম এ-ঘরের দরজায় দাঁড়ালো এসে।

—রমানাথ ক'টায় ফিরবে?

—দেড়টায়। আর মিনিট কুড়ি পরেই। আপনার ভয় নেই, দাদা! আমি আপনাকে নিরাপদে বের করে দেব এখান থেকে।—কুমকুম এগিয়ে এল।

—কিন্তু কেন কুমকুম? কেন তুমি আমার জন্য এতটা করবে?

—আমার নিজের জন্যই করবো, দাদা!—মৃদু হাসলো কুমকুম। আপনাকে বিপন্ন করে লাভ তো কিছু নেই আমার, বরং লোকসান...আবার হাসলো কুমকুম। মৃত্যু-পাণ্ডুর হাসি!

কুমকুম চলে গেল। নীতীশও আর কিছু বলল না তাকে। কুমকুমের কথাগুলোই ভাবতে লাগলো। দরজা-খোলার শব্দে বুঝলো, কুমকুম সদর দরজাটা খুলছে! রমানাথ এলো হয়তো। কিন্তু রমানাথের বদলে কুমকুম ফিরে এল। বলল,

—আমি রমাবাবুকে বললাম 'আপনি ঘুমুচ্ছেন'। ঘুমিয়ে থাকুন।—চাপা গলায় বলেই চলে গেল সে।

নীতীশ চোখ বুজে পড়ে-পড়ে ভাবছে—একি বিপত্তি! একি দুর্ভাগ্য তার? অকারণ তাকে এক বারনারীর সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে! ধিক!...কিন্তু নিজেকে ধিককৃত করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল—'পাপের শাস্তি!' সে এক সতীর স্বামীত্ব চুরি করেছে। বিধাতার বিধানেই তার শাস্তি হবে। চুরি করেছে...হ্যাঁ, চুরি-ই করেছে। আশা তার ভুলের কথা জানার পরে নীতীশকে ঘৃণা না-করতে পারে, হয়তো লালন করতে পারে তার অন্তরে—নীতীশের ঐ মুহূর্তের দুঃসাহসের মাহমাকে, ঐ পাপ-প্রবণতার অতিমানবিক আবেদনকে। এমন হয়, এমন হয়েছে মানুষের জীবনেতিহাসে।...

চিন্তাটা করতে যেন ভয় পাচ্ছে নীতীশ। কিন্তু আনন্দ তো ওর কম হচ্ছে না। আশা যদি সত্যই তার ক্ষণিকের দুঃসাহসকে মুগ্ধহৃদয়ে লালন পালন করে তো ক্ষতি কি! 'ভিলেন' হয়েও তো নীতীশ আশার বুকে আসন রচনা করতে পারবে! আশার স্বপ্ন জাগরণের সঙ্গী হতে পারবে। হয়তো হয়েছে। হয়তো...

কুমকুম নিঃশব্দে ফিরে এসে চাপা-গলায় জানালো রমানাথ ওখানেই খেয়ে এসেছে। নীতীশকে জাগাতে বারণ করে নিজে সে শুয়েছে। বসলো কুমকুম ওর পায়ের কাছে। খুব আস্তে নীতীশ কথা বলল,

—তুমি মিথ্যে কথা কেন বললে, কুমকুম?

—ওরকম বলি আমরা। আমাদের জীবন মিথ্যার তেলমাখা মুড়ি! হাসলো কুমকুম মৃদুমধুর।—খুব হাল্কা আর খুব মুখরোচক দাদা!

—কিন্তু কিছু প্রয়োজনও হয়তো ছিল মিথ্যা বলার।

—হ্যাঁ, ছিল বইকি! আপনি জেগে আছে জানলে অনর্থক 'অনেক কথা' বলতে হোত।

নীতীশ আর কিছু বলল না। কুমকুমও না। বেশ কিছুক্ষণ ওরা বসে। অকস্মাৎ নীতীশ যেন একটা আবেগ অনুভব করলো কুমকুমের প্রতি। বলল,

—তুমি চলো, কুমকুম, আমার সঙ্গে চলো...হাতটা ধরতে যাচ্ছে নীতীশ ওর।

—না দাদা। ওতে কোন ভাল ফল হবে না।

—হবে। আমি সত্যি তোমায় ভালবাসবো!—নীতীশ ধবলো ওর বাঁ হাতের কব্জিটা।

—না, আপনার সেই বান্ধবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না আমি।—চ'লে গেল কুমকুম।

আরো কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বেরিয়ে এল ও-ঘর থেকে। নীতীশকে বলল,

—সব-রকম ওষুধ আর যন্ত্র-ও এনেছি আপনার জন্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ পড়াশোনারও তো দরকার...বই অবশ্য এনেছি আমি-—

—পড়ে নেব!—বলল নীতীশ চা খেতে খেতে।

—শুধু পড়লে হবে না, কিছু হাতে কলমে শেখা দরকার।—রমানাথ বলল।

—বেশ, আমি ফিরে আসবো দু'চারদিন পরেই। তখন শেখা যাবে আপনার কাছে।

নীতীশ বিদায় নিল। রমাবাবু বাইরের রিক্সাতে ওর সুটকেস আর ওষুধ চড়াচ্ছে— নীতীশ কুমকুমকে প্রশ্ন করলো যাবার সময়,

—কাল রাত্রে তোমার কান্নার মধ্যে কি ছিল, কুমকুম? রমাবাবুর কথামত অভিনয়, নাকি সত্যি তোমার হৃদয়ের ব্যথা!

—ওর জবাব নাই-বা দিলাম, দাদা! ও দিয়ে কি হবে আপনার?

—আমি জানতে চাই, কুমকুম! বলো, ওটা সত্যি না অভিনয়?

—অভিনয়! আমাদের প্রেম হয় না। অভিনয় করি।

জবাব দিয়েই সরে গেল কুমকুম ত্বরিতে। আজ আর কুমকুমের চোখে জল দেখতে পেল না নীতীশ।

এয়ার-মেলে দিব্যেন্দুবাবুর চিঠি পেল আশিস। নির্লজ্জ আশার অভিনয়-দক্ষতাই দীপ্যমান হয়ে উঠলো ওর কাছে। ভাবলো চমৎকার অভিনয় করতে পারে আশা। স্নেহশীল দিব্যেন্দুবাবুকে আচ্ছা ফাঁকি দিয়েছে। তাঁর কাছে এমন চমৎকার অভিনয় সে করেছে তার স্বামী আর সংসারের প্রতি একনিষ্ঠতার যে, বেচারা দিবোন্দুবাবু ওকে সাধ্বী সতী-সাবিত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। জড় যন্ত্রগুলিকে পর্যন্ত ঝেড়ে-মুছে, ধূপ দিয়ে, হয়তো ফুলমালা দিয়ে সাজিয়েও আশা 'কাকাবাবু'কে দেখিয়েছে যে সে একটা আদর্শ ভারতীয়-নারী। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে তো! কিন্তু বুদ্ধি ঐরকম কাল্‌প্রিট্‌ ক্লাসের মেয়েদের বেশী হয়। এ তো জানা কথা।

কিন্তু কাকাবাবু যে-ভাবে পত্র লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো পর পত্রেই আশিসকে বাড়ী ফেরার তাগাদা দেবেন। পিতৃসম এই বৃদ্ধকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই

আশিসের। তা ছাড়া আর একটা কারণ—কাকাবাবুকে যাই আশিস লিখুক, মা-ও তা জানবেন। কারণ কাকাবাবু মাকে সে-কথা বলবেনই। অতএব আশিস এখন করবে কি? আশা তো তাকে বেশ বিপদে ফেললো দেখা যাচ্ছে! আশিকের জীবনে আত্মীয়-বিরোধের অশান্তিও আসতে আরম্ভ হোল পর পর! অথচ কিছু, বলাব উপায় নেই। কিছু করবারও নয়। আশার সম্বন্ধে সব কথা জানালে. মাকে মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া হবে—এবং এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে কাকাবাবুও কম দুঃখ পাবেন না। কী এখন করা যায়!

একখানা ট্যাক্সি নিয়ে আশিস বোম্বাই এর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে বের হোল। ওর ইচ্ছে আরও কয়েকদিন বোম্বাইএ থাকবে। কিন্তু এভাবে চিঠির আঘাত আসতে থাকলে মনঃস্থির করা মুস্কিল। চলেই যাবে নাকি দেশ ছেড়ে? বিলাত না হয় আমেরিকা ঘুরে এলে কেমন হয়। কিন্তু বিদেশে যেতে হলে মার অনুমতি আবশ্যক—আর, তাহলে বাড়ী ফিরতে হয় এবং আশার মুখ দেখতে হয়—এবং...দুত্তোর! আশিস তা পারবে না।

একেবারে শহরের বাইরে এসে আশিস বসলো এক জায়গায়। সিগারেটও খায়নি এর আগে, আজ এক প্যাকেট কিনেছে। একটা ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলো। ভাবলো এইরকম অবস্থায় মানুষ মদ খায়—থিয়েটারের নাটকে দেখেছে আশিস। সে না-হয় সিগারেট-ই খেল দু'একটা। মদ তো খাচ্ছে না, বেশ লাগছে নরম সিগারেটের ধোঁয়া। এমনি করে ধোঁয়ার মতো চিন্তাগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না! না, চিন্তা ধোঁয়া নয়। চিন্তাকে চিতাব সঙ্গে তুলনা করেছেন পণ্ডিতগণ।

ইচ্ছে করলে আশিস এখানে দু'একটা বন্ধু বা বান্ধবী যোগাড় করে নিতে পারতো। কিন্তু সেরকম ইচ্ছা-ই হয়নি ওর। মনের অবস্থা এমন একটা শীতলতায় এসে থেমে আছে, যেখানে চঞ্চল জল স্থির তুষারে পরিণত হয়ে যায়। আশিস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবলো—কোনদিন কি গলবে তার জীবনের এই চির-তুষার—! কখনও কি আবার অলকানন্দা বইবে সেখানে? না! আশিস শুধু মার কথাই, মার বেদনার কথাই ভাবছে বেশী করে। মা একদিন নিশ্চয় জানবেন আশার কীর্তি। জানবেনই। সেদিন তাঁর স্নেহ-সমুদ্র সব শুষ্ক হয়ে যাবে আশার জন্য। কিন্তু নিজেও তিনি মরুভূমি হয়ে যাবেন। সেজন্যই আশিস মাকে কিছুই জানাতে পারছে না।

কিন্তু নীতীশের থিসিস্-চুরির ব্যাপারটা মা হয়তো আন্দাজেই বুঝে নিয়েছেন। নীতীশের অধঃপতনে মার মনের বেদনা অত্যলান্ত হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে দুঃখ মা সামলে যাবেন। কারণ নীতীশের সঙ্গে মার রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই। নীতীশের পাপ-প্রবণতার পরিপূর্ণ রূপ মা আজও কিন্তু জানেন না। তিনি জানেন না তাঁর আদরিণী বধূর অন্তর আগেই চুরি করে নীতীশ নির্মমভাবে ঠকিয়ে গেল মাকে!—এমনি মানুষ—এই মানুষের চরিত্র। ওর আবার নাম রাখা হয়েছে 'নীতীশ'! নীতি+ঈশ। 'হ্যাঃ'...

হেসে উঠলো আশিস।

—হোয়াটস্ দি ম্যাটার—ক্যা হুয়া? হাসলেন কেনো?

আশিস চেয়ে দেখলো একটা লোক হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে। পোষাকে খুবই সে আধুনিক। প্রায় ইউরোপীয়। হাতে একখানা 'কেস'। হয়তো বাঁশী আছে ওর মধ্যে। কিন্তু তার ডান পা-টা বাঁ-পা থেকে খাটো। খোঁড়া লোক।

—আমাকে খোঁড়া দেখিয়ে হাসলেন, বাবুজি?—বলে সে এগিয়ে এল।

—না-না, নেহি!—আশিস খুবই বিপন্ন বোধ করছে।

—তোবে কেনো হাসলেন?—বলেই সে বজ্রমুষ্টিতে ধরলো আশিসের হাতখানা। কঠিন স্বরে বলল আবার,—কেনো হাসলেন বলুন, না হোলে...

আশিস বাংলা-হিন্দী ইংরাজী ভাষায় প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বোঝাতে চাইল যে, তার খোঁড়া-পা দেখে হাসেনি। হেসেছে একটা ব্যক্তিগত চিন্তায়। কিন্তু খোঁড়া ছাড়বে না।

—কি সেই কারণ বোলেন? তোবে হামি বিশওয়াস করবে।

আশিস জানালো যে তার এক বন্ধু নাম নীতীশ। যার অর্থ 'নীতিমান হওয়া, নিষ্পাপ হওয়া।' অথচ সেই বন্ধু তার একটা মূল্যবান বস্তু চুরি করেছে। নামের অর্থের সঙ্গে কাজের অমিল দেখে আশিস হেসেছিল।

—ওঃ—ই তো বহুৎ দিখা যাতা, বাবুজী!—এতক্ষণে হাসলো লোকটি ; ছেড়ে দিল আশিসের হাতখানা। বসলো। বলল,

—কুস্তি তো করলেন বহুৎ! আব্ একঠো সিগারেট পিলাইয়ে! আপকো বাঁশি শুনা দেতা...

আশিস খুব বেঁচে গেছে! সিগারেটের প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে বলল,

—সব আপ্ পিজিয়ে! হাম ও পি-তা নেহি।

—তব্ পাকেট্মে কাহে রাখা?—প্রশ্ন করলো লোকটি।

—মতলব খারাব রহা তো একঠো মাঙা। পিয়াভি একঠো...বললো আশিস।

—শুনিয়ে—আপকো মতলব সাফ হো যায়গা—বলে ব্যাগটা খুলে বাঁশী বের করে বাজাতে আরম্ভ করলো সে। বাজাচ্ছে। সন্ধ্যার শোণিমা-লাঞ্ছিত আকাশ...জনবিরল পরিবেশ...হাওয়া থাকলেও বাঁশীর সুর খুব মন্দ লাগছে না আশিসের। ভালই বাজায় সে। খানিকক্ষণ বাজানোর পর লোকটি বলল,

—কেমোন লাগলো?

'বহুৎ আচ্ছা' বলে আশিস উঠবে!—কিন্তু লোকটি ওকে ধরে বসিয়ে বলল,

—সিনেমাওয়ালাদের দরজামে বহুৎ ঘুরলো, বাবুজী, কোই সমঝাতে পারলো না। বহুৎ দুখ্মে ও-কাম ছোড় দিয়েছে! আভি আপনমনে বাজাচ্চে, সাধনা করছে! কোই গুণী আদমি মিল যায় তো, কদর হো যায়েগা!

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক!' বলে আশিস আবার উঠতে গেল—ওকে আবার বসিয়ে সে বলল,

—আপ্না বাংলা-মুলুকমে যাবে—একটা চিঠি-উঠি লিখে দিন-না। হামি ছিলো বহুৎ রোজ বাংলা-মুলুকমে—লেকিন, বাঁশী কোই ঠিক সম্‌ঝে না—

আশিস তাকে জানালো যে তার চেনা-জানা বাঁশী-সমঝদার কেউ নেই। বলেই আশিস উঠে পড়লো, সটান এসে গাড়িতে চড়ে তার হোটেলে ফিরলো। হোটেলের ম্যানেজার ওকে শুধুলেন,

—কোথায় গিয়েছিলেন? বেড়াতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু এক বাঁশীওয়ালার পাল্লায় পড়ে প্রায় মার খাবার যোগাড়।

—ও, দয়ালচাঁদের খপ্পরে পড়েছিলেন বুঝি? হেসেছিলেন তাকে দেখে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কি ব্যাপার? কে ঐ দয়ালচাঁদ?

—খেয়ালী সুরশিল্পী। সারা ভারত ঘুরে বেড়ায়—বাঁশী-ই ওর সঙ্গী। টাকা-পয়সা কিছু

পৈতৃক আছে। কিন্তু ওর খোঁড়া-পা দেখে কেউ হাসলে আর রক্ষা নেই। নইলে লোকটা খুব নিরীহ। ওকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, দিল্লী সর্বত্রই পাবেন। আর বহুরকম ভাষাও জানে ও। বাঁশীও ভাল বাজায়, কিন্তু।...

—কি?—আশিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলো।

—লোকটি বড় দুখী। ওর বিয়ে হয়েছিল ছোটবেলায়। তখন ছোট বয়সে বিয়ে চলতি ছিল। বড় হয়ে ও বৌ এর সঙ্গে দেখা করতে গেল—ওর খোঁড়া পায়ের চলন-ভঙ্গী দেখে বৌটা এত হেসেছিল যে, সে-বউ নিয়ে ও ঘর করেনি। সেই থেকে বাঁশীই ওর সঙ্গী। ওকে দেখে হাসবেন না।

—না!—আশিস ম্যানেজারকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। কিন্তু ঐ খোঁড়া দয়ালচাঁদের ওপর একটা অসাধারণ সহানুভূতি জেগে উঠলো ওর অন্তরে। অঙ্গ-বিকৃতির জন্য লোকটার দুঃখের অন্ত নেই। নিজের বিয়ে-করা-বউ বিরূপ করেছে ওকে—ওর শিল্পীমন সহ্য করতে পারেনি সে বিদ্রূপ! তাই সব ছেড়ে বাউন্ডুলে হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। আহা, কী করুণ! ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে আশিস ওকে সব শুধোবে।

ওর সঙ্গে নিজের জীবনের যেন কোথায় মিল খুঁজে পাচ্ছে আশিস! হ্যাঁ, মিলই তো। যথেষ্ট মিল রয়েছে। দয়ালচাঁদের বৌ তার খোঁড়া পা দেখে বিদ্রূপ করেছে। আর আশিসের বৌ কিছু না-দেখেই তাকে বিদ্রূপ নয়, বিষ খাইয়েছে—বিষাক্ত করে দিয়েছে আশিসের অন্তর।

নিঃশব্দে ঘরে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল আশিস।...দূরে কোথায় একটা রেডিও-যন্ত্রের গান ভেসে আসছে, এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ আগে বাঁশী শুনে এল আশিস, গান আর এখন ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায় কি! অপরের রেডিও তো সে থামিয়ে দিতে পারে না! ঘরের শার্সিগুলো বন্ধ করে যথাসম্ভব কম আওয়াজ আসার ব্যবস্থা করবে কিনা ভাবছে—পাশের কামরা থেকে একটি বালিকা এল।

—আপনি তো বাঙালী? বাড়ী কোথায়?—প্রশ্ন করলো আশিসকে।

—বাড়ী?—বলে আশিস দেখলো মেয়েটিকে। ফ্রক-পরা বছর দশেকের মেয়ে। বেশ দেখতে। ওকেই প্রতিপ্রশ্ন করলো আশিস,

—তোমাদের বাড়ী কোথায়, খুকী? কলকাতায়?

—হ্যাঁ। আমার বাবা গবর্ণমেন্টের অফিসার এখানে।—কিন্তু আপনি যে বাঙালী হয়েও আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না—কেন?

—আমি কি করে জানবো তোমরা এখানে 'বাঙালী' আছ?

—বা-রে। আমরা কতো বাংলা-কথা বলি। মা আজ সকালেই জোরে জোরে বললেন—'ঐ ছেলেটি বাঙালী মনে হচ্ছে, নন্দা।

—নন্দা বুঝি তোমার নাম?

—হ্যাঁ। নন্দিতা শান্তিনিকেতনী নাম। মা আমার শান্তিনিকেতনে পড়া মেয়ে কিনা। কিন্তু ও নাম আমার পছন্দ নয়।—বলল নন্দিতা।

—তোমার কী নাম পছন্দ?—ওর বব্-করা চুলে হাত বুলিয়ে শুধোলো আশিস।

—'মন্দাকিনী'—বলে হাসতে লাগলো নন্দিতা।

—দ্যুৎ। ও খুব পুরোনো নাম।

—না—'মন-দা-কিনি'! শুনুন মানেটা। মন মানে আমি, দা মানে খাঁড়া, কাটারী। আর, কিনি মানে খরিদ করি। কেমন!

—বাঃ, খুব তো মানে মুখস্থ করেছ!—হা-হা করে হেসে উঠলো আশিস।

—দেখুন-না কাণ্ডটা! এসেই বক্‌বক্ আরম্ভ করেছে—বলে একটি পূর্ণ-যৌবনা নারী—বাঙালী—এসে দাঁড়ালো। বললো,—পরশু থেকে বায়না নিয়েছে আপনার সঙ্গে আলাপ করবে। তা আপনি তো ঘরের ভেতরেই থাকেন! আমাদের খোঁজখবর কি নিতে নেই? অবশ্য, আমাদেরই উচিত আগে খোঁজ করা—কিন্তু আপনি তো সুযোগই দিচ্ছেন না!

আশিস এই অভিযোগের উত্তরে কী যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অবশেষে বলল,—আমি জানতাম না যে পাশেই আমার দেশবাসী আছেন। কিন্তু, আপনারা তো নন্দাকে একবার পাঠালেই পারতেন! কি বলো, নন্দা?

—না, 'মন্দাকিনী' বলুন! 'নন্দা' আমি কিছুতেই হতে চাই নে। আমি কাল থেকে বলছি, 'মা, যেতে দাও, আলাপ করি'—তা মা ছাড়ে না!

—আচ্ছা, এবার থেকে দিনরাত বক্‌বক্ করো!—বলে মহিলা চলে যাচ্ছে।

—বসুন না, দিদি!—আশিস বলল,—তাড়া তো নেই আপনার?

—না ভাই, তাড়া নেই কিছু। উনি তো সেই রাত ন'টায় ফিরবেন।—বসল সে।

আশিস জানতে পারলো কথায় কথায়, এঁরা দিল্লীতেই থাকেন। সরকারী কাজে এখানে এসেছেন! দিন-দশ পরেই দিল্লী ফিরে যাবেন। বিদেশে একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আশিস খুশী হোল খুবই। মহিলাটির নাম চন্দ্রিমা দেবী, ওঁর স্বামীর নাম, শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়।

আলাপ-আলোচনায় আশিসের মন অনেক হাল্কা হয়ে আসছে, কিন্তু চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে আশার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এ খবরও জানতে পারলো আশিস।

মনটা ভাল হতে-হতে খারাপ হয়ে গেল ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় নামলো নীতীশ 'বাস' থেকে। গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের পাশেই তাপসীপুর। সামনের ঘরগুলোতে কামার-কুমার-তাঁতীদের বাস—যাঁরা শিল্পী এবং ব্যবসা করেন। ভেতর দিকে চাক্‌রে-বাবু আর চাষী-বাসীর ঘর। গ্রামখানা খুব বড়, প্রায় দু-আড়াই হাজার লোকের বসবাস। পাকা বাড়ী—একতলা, দোতলা, তিনতালা অনেকগুলি। তবে মেটে বাড়ী এবং কুঁড়ের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া ও-গ্রামে বড় মন্দির আছে মা-সর্বমঙ্গলার।

প্রাচীন ঠাকুরবাড়ী। তার ইঁট দেশলাই এর বাক্সের থেকে কিঞ্চিৎ বড়। ঠাকুরবাড়ীটি কিন্তু একেবারে গ্রামের মাঝামাঝি, বড় রাস্তার উপর। আর, ঐ মন্দিরের কাছে নীতীশের পৈতৃক ভিটে। রাস্তায় এপার-ওপর মাত্র।

গ্রামের এই জায়গাটাই জাঁকালো। ঐখানেই দু-তিনটে গোলদারী দোকান আছে, একটা কাপড়ের আর দুটো মনিহারী দোকান হালে হয়েছে। একজন অ্যালোপ্যাথী ডাক্তার ডিস্‌পেনসারী খুলেছেন বছরখানেক হোল; আর, একটি কবিরাজ আছেন ওখানে দীর্ঘদিন। সব মিলিয়ে ওটাকে 'হাটতলা' বলা হয়।

নীতীশের একতলা বাড়ীটা ওখানেই। তা-ই ভাড়া নিয়ে দোকান করবার জন্য বহুবার নীতীশকে অনুরোধ পত্র পাঠিয়েছে অনেকেই। ইদানিং গ্রামের যুবকরা ওখানে গ্রন্থগার করবার জন্য বিনামূল্যে নীতীশকে ওটা দিতে বলেছে। নীতীশ ওর কোনোটাই করেনি। অকস্মাৎ এসে নিজেই উঠলো বাড়ীতে।

সদর দরজা খুলতেই কতকগুলো চামচিকে ঝটপট করে উঠলো। হাতের টর্চ টিপে নীতীশ দেখলো অবস্থাটা। তিনখানা ঘরের সামনেরটাই বড়। বসবার ঘর। আর পাশের দু-খানা শোবার। নীতীশ তার জিনিস রেখে আবার তালা দিয়ে কাছেই হাটতলায় গেল: একটা লণ্ঠন, একগাছা ঝাঁটা আর কেরোসিন তেল কিনে লণ্ঠন জ্বেলে ফিরলো। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল নীতীশ বসবার ঘরখানা বাসযোগ্য করে তুলেছে।

নীতীশ-যে গ্রামে ফিরেছে এ-সংবাদ তার বাল্যবন্ধুদের কেউ-ই জানতে পারেনি। কারণ তাদের সেদিন ফুটবল-ম্যাচ ছিল। আর, অত আকস্মিকভাবে নীতীশের গ্রামে ফেরার আশাও কেউ করে না। ওর বাড়ীর জানালায় আলোর ছটা দেখে লোকে ভাবলো, বাড়ীটা ভাড়া হোল হয়তো। নীতীশও চায় না যে, কেউ আসুক তার কাছে এখন। নিজের মনেই ভাবতে লাগলো...সে চোর নয়। সে ভদ্র, সে বড়-বংশের ছেলে! চোর হোলে কলকাতার এত কাছে সে কখনো থাকতে পারতো না। বহুদূরে পালিয়ে যেত। সে চোর নয় বলেই এতো কাছে রইল! আশিস তার গ্রামের ঠিকানা জানে, এমন কি পিসিমা থাকতে এসেছে এখানে দু-বার। আশিস মনে করলেই এখানে আসতে পারবে। অন্তত চিঠি লিখতে পারবে। যদি লিখে তো, নীতীশ তার জবাব দেবে যে—মুহূর্তের ভুলের জন্য নীতীশের এই অধঃপতন। সে চোর নয়, পরনারী-লোভী শয়তান নয়, 'ভিলেন' নয়...

ঝাঁটাটা রাখলো নীতীশ ওপাশের বারান্দায়। এবার এক কলসী জল দরকার। পাতকুয়ো আছে, ওঘরে হাঁড়ি-কলসীও আছে ; কিন্তু জল তুলবার জন্য দাড়িটা খুঁজে পাচ্ছে না নীতীশ। কুয়োর কাছেই একটা জামরুল গাছ। দেখতে পেল তারই কাণ্ডে দড়িটা ঝোলানো। কেউ গাছে দড়ি বেঁধে কূয়োতে ঝুলবে নাকি!...

অকস্মাৎ কেন-কে-জানে নীতীশের ঐভাব মনে হল। হাসলো নীতীশ...কূয়োতে ডুবে-মরা এবং গাছে-দড়ি-বেঁধে মরা—এর যে কোনো একটাই মরবার পক্ষে যথেষ্ট। গাছে দড়ি বেঁধে কূয়োতে ডুববার কি দরকার? কিন্তু অনেক সময় দুটোই এক সঙ্গে করে মানুষ, মরণকে বেশী নিশ্চিত করবাব জন্য। বিষ খেয়েও কে নাকি নিজেকে রিভলভার দিয়ে মেরেছিল।...চিন্তাটা ওর মাথায় আসবার কোনো দরকার ছিল না। তবু এল! কেন এল। নীতীশ ভাবতেই বুঝলো—নিজেকে নিশ্চিন্ত 'ভিলেন' প্রমাণ করবার জন্য সেও দুটো কাজ একসঙ্গে করেছে। একটা—থিসিস্-চুরি, অন্যটা আশার স্বামিত্ব চুরি,...হ্যাঁ, দুটোই একসঙ্গে করেছে সে, ওর অন্তরস্থ ভদ্র শিক্ষিত নীতিমান নীতীশকে হত্যা করবার জন্য—হত্যাই করে ফেলেছে!...

নীতীশ চমকে উঠলো কূয়োর দড়িটা হাতে নিয়ে।

কিন্তু এ দড়িতে আর জল তোলা যাবে না। কতকাল-যে দড়িটা ঐ জামরুল গাছে টাঙানো আছে, কে জানে! রোদে জলে ওর আর কিছু অবশিষ্ট নেই, শুধু দড়ির আকারটাই রয়েছে। নীতীশও এখানে পড়ে থেকে এমনিই হয়ে যাবে! এমনি ভদ্র আকারধারী অকেজো আবর্জনা! নীতীশ আর 'নীতীশ' থাকবে না। তাকে দিয়ে আর ভদ্র সমাজের কোনো কাজই

হবে না!...

কিন্তু নীতীশ এসব কি ভাবছে!...নিজেকে সংযত করে নীতীশ দড়িটা ফেলে দিল। আবার বেরিয়ে গেল হাটতলায়। দড়ি এবং চিঁড়ে-মুড়ি-মিষ্টি কিনে ফিরলো সে এবার। রাত্রে তো কিছু খেতে হবে! কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করা দরকার। একদিকে একটুকরো তক্তা পড়ে ছিল, দেখলো নীতীশ। দোকান থেকে পান এনেছে দু'পয়সার, তার সঙ্গে এক-ঢেলা চুণ। নীতীশ সেই চুণটুকু দিয়ে তক্তাটায় লিখলো :

'হোমিও-বিজ্ঞান-মন্দির'

ডাঃ নীতীশ চট্টরাজ, এম. বি. (হোমিও)।

বাইরে টাঙিয়ে দিল সেটা।

অতঃপর জল তুলে হাতমুখ ধুলো। পিসিমার তোরঙ্গটা খুলে দেখলো, বিশেষ কিছু নেই। ওর মার আমলের বিছানা-বালিশ গাদা করা আছে একদিকে। ইঁদুরে বিস্তর তুলো কেটে বের করেছে। তার থেকে একখানা তোষক বেছে নিয়ে বিছানা পাতলো। এর পর খাবে। কিন্তু খাবার এখনও রাত হয়নি। হোমিওপ্যাথী বই খুলে নীতীশ পড়তে বসলো লণ্ঠনের আলোতে।

কতক্ষণ পড়ছে ঠিক নেই। হঠাৎ ওর মনে হোল, খুবই খিদে পেয়েছে। উঠে চিঁড়ে-মুড়ির সৎকার করে ফেললো। এবার শোবে, দরজা বন্ধই আছে। জানালাপথে বাইরে চেয়ে দেখলো হাটতলার সব আলো নিবে গেছে। তাহলে রাত অনেক হয়েছে নিশ্চয়। নীতীশও আলোটা নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার...নিদারুণ অন্ধকার! যেন কালো মার্বেল-পাথর—যেন 'কৃষ্ট্যাল'! যেন ওর কলমটার মতো কালো। কিন্তু অনেকক্ষণ আলোতে পড়ার জন্যই হয়তো অন্ধকার এতো বেশী বোধ হচ্ছে। নীতীশ চোখ বুজে শুলো।...

মশা কৈ?—মশা তো একটাও আসেনি! মশারা হয়তো এখনো টের পায়নি যে নীতীশ এখানে এসে রয়েছে। মানুষেও টের পায়নি। কাল সবাই জানবে নীতীশ গ্রামে এসেছে। 'হোমিওপ্যাথী' করবে। হাসবে অনেকেই। ঠাট্টা করবে বন্ধুরা। যা করে করুক! কিন্তু কেউ যদি না জানতো যে নীতীশ এসেছে তো বেশ হোত! নীতীশের কাছে খুব বেশী টাকা নেই। শ'খানেকও নেই। টাকা তার থাকবার কথাও নয়? যা ছিল, ভাগ্য-বলেই ছিল। টাকা থাকলে নীতীশ বহুদূরে কোথাও চলে যেতো কিছুদিন। কিন্তু কেন যাবে? নীতীশ চোর নয়। থিসিস্ সে নিয়েছে, কালই ডাকে ফিরিয়ে দেবে আশিসকে তার থিসিস্। কিন্তু...ঐ স্বামিত্ব-চুরি-করাটা ফিরিয়ে দেবে কি করে? সে চোর! চোর...চোর...

নিজেকে বিশ্লেষণ করা চিরদিনের স্বভাব নীতীশের—বৈজ্ঞানিক নীতীশ মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও। ওর এদিককার প্রতিভা বন্ধুমহলে বিশেষ সমাদৃত। কিন্তু কি হোল তাতে? কী লাভ করলো নীতীশ! এতখানি প্রতিভার অধিকারী হয়ে সে একটা 'চোর' হোল। একটা নিকৃষ্ট অপরাধী হোল! না, নীতীশ কিছুতেই তা হবে না। হতে পারে না! কাল সকালেই...না, আজই এখুনি নীতীশ কলকাতা গিয়ে আশিসকে ফিরিয়ে দেবে তার থিসিস্, আর আশার পায়ে ধরে বলবে—'সেদিন সন্ধ্যার অমার্জনীয় অপরাধ সে স্বীকার করতে এসেছে। শাস্তি নিতে এসেছে!'...

উত্তেজিত নীতীশ উঠে বসলো। আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখল, তেল এতো কম

দিয়েছিল যে—ও আলো আর জ্বলবে না। নিরুপায় নীতীশ সকাল হবার অপেক্ষায় পায়চারী করেছে। উত্তেজনায় ওর মানসিক উদ্বেলনের সঙ্গে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তরঙ্গায়িত হোতে লাগলো। যেন একটা তীব্র জ্বালার মতো বোধ হচ্ছে সর্বাঙ্গে, বিশেষ মাথায়। নীতীশ উঠানে নামলো। জামরুল গাছের দিকে এগুচ্ছে। চাঁদ উঠেছে—পাতলা অন্ধকারে সব-কিছুই বেশ দেখা যায়। আকাশের দিকে চাইল নীতীশ। কয়েকটা নক্ষত্র যেন দেখছে ওকে—চুরি করে পালিয়ে এসে গ্রামের অন্ধকার গৃহে লুকিয়ে-থাকা নীতীশকে! না-না-না, আগামী সন্ধ্যায় ঐ তারারা নীতীশকে দেখবে শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ নীতীশ রূপে! আজ সে চোর! না—চোরের অভিনয়কারী মাত্র, চোর নয়। কারও কিছু চুরি করেনি নীতীশ! দিনের প্রখর সূর্য্যালোকে সে ধুয়ে মুছে ফেলবে তার অভিনয়ের আবরণ মন থেকে, শরীর থেকে—সমস্ত জীবন থেকে! কিন্তু...

যার স্বামিত্ব সে চুরি করেছে, সে যদি ধুয়ে না-ফেলে নীতীশকে! সে যদি লালন করে নীতীশের ঐ দুর্বৃত্ততার ক্ষণিক স্মৃতি, ঐ দুঃসাহসিকতার বীর্য্য-দীপ্ত ক্ষণ-মহিমা! তাহলে নীতীশ একটা বন্ধু জীবনকে শুধু বিড়ম্বিতই করে এল না, সরল বালিকা-জীবনকে কীট-দষ্ট করে এল! এ অপরাধ অমার্জনীয়। এ অপরাধ অতি দানবীয়! 'নাঃ'—নীতীশ কি করবে ভাবতে পারছে না! মাথাটায় কেমন যেন উত্তাপ বোধ হচ্ছে। কেমন যেন জ্বালা ওর সর্বাঙ্গে! নীতীশ নতুন-কেনা দড়িটায় বেঁধে কয়েক কলসী জল তুলে মাথায় ঢাললো। শীত করছে।

বহুদিনের অব্যবহৃত কূপের অতি শীতল জল। বিষাক্ত। নীতীশ শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে পরনের কাপড় দিয়েই গা-মাথা মুছলো, তারপর একখানা লেপ টেনে এনে শুয়ে পড়ল গুটিয়ে। জ্বর হোল নাকি! হোক না, ওষুধ তো সঙ্গেই রয়েছে। ও এখন হোমিওপ্যাথ 'এম. বি। কিন্তু এম বি. তো সে পাশ করেনি...কখন করলো? করবে পাশ। পড়ছে নীতীশ হোমিওপ্যাথী। ওর মাথার মধ্যে হোমিওপ্যাথী-বইএ পড়া দু-লাইন কবিতা জাগছে:

"অ্যরমে মরণ-চেষ্টা, গভীর বিষাদ,
আর্সে অস্থিরতা, জ্বালা, তৃষ্ণা অবষাদ—"

ঠিক! ঠিক! ঐ লক্ষণটি তো হয়েছে এখন নীতীশের। কিন্তু অ্যরম খাবে না আর্সেনিক খাবে? দুটো লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে ওর শরীরে। না, অ্যরম নয়। মরণ-চেষ্টা জাগেনি তার! আর্সেনিক খাবে। তৃষ্ণা, জ্বালা অবসাদ সবই হচ্ছে। কিন্তু তৃষ্ণা কৈ...নাঃ, অ্যরম মেটালিকম-ই খেতে হোল—মরণ-চেষ্টা জাগছে বইকি ওর!...হ্যাঁ—নীতীশ চোর হয়ে গেল...নীতীশ পালিয়ে এল কলকাতার সমাজ থেকে। হয়তো এতক্ষণ পুলিশ তার খোঁজ করছে। হয়তো কাল সকালেই তাকে এসে ধরবে! না. তার চেয়ে মরণ ভালো। অনেক ভালো। নীতীশ অ্যরম-ই খাবেই! খুব হাই-পোটেন্সির অ্যরম খেয়ে নেবে এক ডোজ...

কিন্তু 'অ্যরম' তো ওষুধ। মরণ-চেষ্টা করা রুগীর জন্য ওষুধ ওটা! ও খেলে তো মরণ হবে না! মরণ চেষ্টা রোগটা ভাল হয়ে যাবে। না, নীতশ ও-রোগ আর ভাল করতে চায় না। ও রোগ তার থাক্!

কিন্তু নীতীশের কোন্ রোগটা হয়েছে? মরণ-চেষ্টা, আর বিষাদ, না-কি তৃষ্ণা...জ্বালা...অবসাদ, তৃষ্ণা জ্বালা বিষাদ...না, তৃষ্ণা বিষাদ মরণ...উহুঁ। মরণ তৃষ্ণা-অবসাদ...না-না-না—মরণ, বিষ বিষাদ...

নীতীশ 'বিষাদ' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অচৈতন্য হয়ে গেল...

সকাল হয়েছে। সারা গ্রাম জেগেছে, হাটতলার দোকানীরা। কিন্তু কেউ জানেই না পরিচিতদের মধ্যে যে, নীতীশ গতরাত্রে বাড়ী ফিরেছে ; অনেকটা বেলা অবধি কেউ জানতেই পারলো না ; হয়তো জানতে পারতোই না দু'চারদিন। কারণ নীতীশ জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান। মাঝে মাঝে বলছে,—জল...আশা...কুমকুম। আশা...জল...। কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট। শোনা যাচ্ছে না।

হাটতলায় এসেছেন গ্রামের অনেকেই। হাটবাজার করতে ব্যস্ত তাঁরা। হঠাৎ শম্ভু চক্রবর্তীর নজর পড়ল নীতীশের বাড়ীর দরজায় সাদামত কি-একটা লেখা রয়েছে। কী ওটা! বাজার থলি-হাতে কাছে এগিয়ে দেখলেন সাইনবোর্ডখানা।

কি ব্যাপার! নীতীশ এসেছে নাকি ফিরে? বিস্মিত হয়ে বারান্দায় উঠে ডাকলেন—'নীতীশ।' সাড়া নেই। অথচ অস্পষ্ট একটা শব্দ আসছে। কেউ গোঙাচ্ছে যেন। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, মেঝেতে তোষকে শুয়ে নীতীশ ছটফট করছে। শম্ভুবাবু ডাক দিলেন,

—নীতীশ—নীতীশ!

না, সাড়া দিতে পারলো না নীতীশ ; লাল দুটো চোখ মেলে চাইল শুধু! অনেক লোক জমে গেল এর মধ্যে। নীতীশ ঘরে অমন ভাবে পড়ে আছে কেন! নিশ্চয় খুব বেশী অসুখ তার। সকলে পরামর্শ করে একজনকে উত্তর দিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে গিয়ে দরজা খুলে দিতে বললেন। তাই করা হোল। শম্ভুবাবু এবং আরো কয়েকজন নীতীশের বিছানার কাছে গিয়ে দেখলেন,

ভুল বকছে নীতীশ...

তার সুটকেশ এবং হোমিওপ্যাথির সরঞ্জামও লক্ষ্য করলেন ওঁরা। কিন্তু ওসব দেখবার এখন সময় নয়, তাড়াতাড়ি ওঁরা গ্রামের ডাক্তারটিকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার দেখে বললেন,—জ্বর। তবে কেমন দাঁড়াবে এখন বলা যায় না—হয়তো খুবই 'সিরিয়াস' হতে পারে, না হয়, কিছুই না হতে পারে।

—ওকে বাঁচাতে হবে, ডাক্তারবাবু—ও আমাদের গ্রামের গৌরব। বলল ওর ছেলেবেলার বন্ধুরা! ডাক্তারবাবু বললেন,

—মরা-বাঁচা আমার হাত নেই। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে বাঁচাবার।

চিকিৎসা চলতে লাগলো। গ্রামের ছেলেরা পালা করে ওর সেবা করতে লাগলো—কিন্তু নীতীশ ক্রমাগত ভুল বকছে। কি যে বলে কে জানে!

—অন্ধকার... আশা... না-না, থিসিস... কুমকুম!... আরুমমেটালিকাম— আর্সেনিক—আর্জেন্টম্ নাইট্রিকাম...

ওর অস্পষ্ট কথার অসংলগ্নতা সকলকেই চিন্তিত করেছে, কিন্তু ওই কথার মধ্যেও সকলে অনুভব করতে লাগলো,—নীতীশের জীবনে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে, যে-ঘটনা ওর এই সাংঘাতিক অসুখে মূলে। সহানুভূতিতে সকলের মন সজল হয়ে উঠছিল। সেবা-যত্নের ত্রুটি যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে ওঁরা ত্রুটি করছিলেন না। এমন কি, ওর টাকা-পয়সা কোথায় আছে, মোটেই আছে কিনা, না-জানায় বন্ধুরা ক্লাবের তহবিল থেকে ওর

জন্য খরচ করতে লাগলো। কারণ নীতীশ সত্যি ওদের গ্রামের সর্বজনপ্রিয় যুবক।

দু'তিনদিন নীতীশের একবারে জ্ঞান নেই। রোগ কোন্ পথ নেবে কেউ বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একজন গ্রামবাসী একখানা খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন—

"দিব্যেন্দু নামক জনৈক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছেন যে নীতীশ গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে যেখানেই থাক, অবিলম্বে এসে আত্মসমর্পণ না করলে গুরুতর অবস্থা ঘটতে পারে।"

ইনি-ওঁর মুখের পানে চাইতে লাগলেন ওঁরা। 'কী অপরাধ করেছে নীতীশ? কে এই দিব্যেন্দু? কী শাস্তি দিতে চান তিনি নীতীশকে?' ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্ন জেগে উঠলো ওঁদের মনে। কিন্তু উত্তর পাবার কোনো আশা নেই, কারণ বিজ্ঞাপনে শুধু 'দিব্যেন্দু' নাম লেখা আছে। ঠিকানাও নেই যে, ওঁরা দিব্যেন্দুকে জানিয়ে দেবেন নীতীশ অত্যন্ত অসুস্থ। ঠিকানা অবশ্য কাগজের অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু কে করে অত ঝামেলা একজন অপরাধীর জন্য! গ্রামের সকলেই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন কী অপরাধ নীতীশ করতে পারে! খুন-খারাপি নয়তো! না,—তাহলে আত্মসমর্পণের কথা উঠতো না। চুরিও হতে পারে না। তাহলে পুলিশ-কেস হতো। তবে কি নারী-ঘটিতে কিছু? গ্রামে মাতব্বরগণ পরস্পর চেয়ে ব্যঙ্গ হাসলেন। বন্ধুর দলও কেমন যেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো নীতীশের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে। তারা ঠিক করলো নীতীশকে বাঁচাবার চেষ্টা তারা নিশ্চয় করবে; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওরকম অপরাধীর সঙ্গে বেশী সংস্রব রাখা কেউ আর পছন্দ করছে না।

চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনও নীতীশ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে কাটালো। সেবা-যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না কিছুই। কিন্তু যে আন্তরিকতা ছিল প্রথম দিকে, তা আর নেই। পাঁচ, ছয়, সাত দিন কাটলো। ডাক্তার বললেন—'বেঁচে যাবে। তবে মনে হচ্ছে কোথায় যেন ওর কী একটা বিস্মৃতি ঘটছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না!'

—হবে! কিংবা হয়তো অপরাধ এড়াবার জন্য বিস্মৃতির ভান করছে।

ভাবলো বন্ধুরা, এবং গ্রামের অন্যান্য লোকও। তবু তারা ওর সেবা এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে যথাসাধ্য। তবে আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ধীরে ধীরে কমতে কমতে প্রায় একেবারে শূন্য-ডিগ্রিতে এসে গেছে। কেউ কেউ বলল, নীতীশকে বিজ্ঞাপনের কথাটা বলা যাক্। কিন্তু ডাক্তার বললেন—'জ্ঞান সম্পূর্ণ না ফেরা পর্যন্ত ওসব কথা বলা চলবে না। ভাল হোক, তারপর যা বলবার বলবেন আপনারা।' সকলেই সে-কথা মানতে বাধ্য হোল।

আটদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকার পর ন'দিনের দিন নীতীশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান হোল। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেনা কী তার হয়েছে, কোথায় সে রয়েছে—কবে সে এখানে এল! অনুচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল নীতীশ,

—আমার কি হয়েছে? কোথায় আছি আমি? ক'দিন আছি এখানে?

—আপনার জ্বর হয়েছে। আছেন আপনার নিজের বাড়ীতে। আজ ন'দিন!

জবাব দিল সেবারত একটি ছেলে! নীতীশের থেকে অনেক ছোট। গ্রামের ক্লাবের মেম্বার। নীতীশ চাইল ওর পানে। বলল,

—তুমি কে! তোমার নাম?

—'চক্রধর'!—চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি ধ্বজাধারীর ছোট ভাই।

—ও, চক্রধর! ধ্বজাধারীর ভাই! হ্যাঁ। জল দাও তো একটু! নীতীশ জল খেল। কিন্তু চক্রধর বলল তাকে,

—আপনি ভাববেন না। কিছু ভাববেন না! ভাল হয়ে আসছেন আপনি, আর কোন ভয় নেই! এ-যাত্রা বেঁচে যাবেন।

নীতীশ আর কিছু বললো না, চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। ছেলেটি ওকে কিছু খাদ্য খাওয়ালো, তারপর অন্য একটি ছেলেকে 'ডিউটি' বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল ক্লাবের সকলকে খবর দিতে যে, নীতীশের জ্ঞান হয়েছে।

—'ভালই হয়েছে।'—বললো সব বন্ধুরা, কিন্তু বিজ্ঞাপনের খবরটা এখনি ওকে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে কেউ এল না ওর কাছে। ধীরে ধীরে বন্ধুরা যেন সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে। কে জানে কী মারাত্মক অপরাধ করেছে নীতীশ! আর ক'দিন তো পার হ'য়ে গেল! হয়তো এতক্ষণ দিব্যেন্দুরা পুলিসে খবর দিয়েছে। নীতীশের নামে পরোয়ানা এলেই সে খবর পাবে'খন...ভেবে ওরা চুপচাপ রয়ে গেল। তবে নীতীশের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা ওরা ভালরকমই করে চলেছে।

নীতীশ দীর্ঘক্ষণ পরে আবার চোখ মেললো। সেবারত অন্য ছেলেটি শুধোল,

—কি? কিছু বলছেন?

—না-না আমার কিছু মনে পড়ছে না-তো! কি-ভাবে আমি এখানে এলাম?

—তা তো আমরা জানি না! আপনি ঘরে শুয়ে গোঙাচ্ছিলেন—; শম্ভুকাকা প্রথম দেখে আমাদের সবাইকে ডাকেন। কিন্তু ওসব এখন ভাববেন না—

—না...হ্যাঁ...আমি যেন আশাকে—না না, কিসব বলছি...কুমকুমকে...দূর! না, মনে পড়ছে না। কাকে যেন কী বলেছি, কী যেন...করেছি...কুমকুম...

—গুম-খুন!...

উত্তর না পেয়ে ছেলেটি আবার শুধোলো—'গুম-খুন' করেছেন?

নীতীশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কথাটা যেন বুঝতেই পারছে না। ছেলেটি আরো কিছুক্ষণ জবাবের জন্য অপেক্ষা করে চলে গেল ক্লাবে।

ডিটেকটিভ বই-পড়া অতি উৎসাহী ছেলেটি ক্লাবে গিয়েই সকলকে জানালো যে, নীতীশের অস্পষ্ট কথায় জানা গেল সে কাকে গুম-খুন করে পালিয়ে এসেছে। সবাই এ-ওর মুখপানে চাইল। নীতীশের অকস্মাৎ গ্রামে আবির্ভাব, নিজের বাড়িতে চোরের মতো ঢুকে-পড়া এবং তার পরই এতোবড় অসুখ—নিশ্চয় এর পিছনে কোনো গভীর রহস্যের ইঙ্গিত করছে! তারপর 'দিব্যেন্দু' নামক ব্যক্তির বিজ্ঞাপন। খুন, চুরি অথবা নারী-ঘটিত কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার আছেই নীতীশের এমন-করে-এসে অসুস্থ হয়ে পড়ার মধ্যে। অতএব 'গুম্-খুন' কথাটা শুনে ওরা কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো না। কাগজের অফিসে গিয়ে যারা দিব্যেন্দুবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে নীতীশের অসুখের কথা জানাতে চেয়েছিল, তারাও থেমে গেল। বলল,—যে-কদিন অসুস্থ আছে, থাক্ পড়ে। পুলিশ তো এসে ধরবেই! আমরা কেন আর ধরিয়ে দিতে যাই।

নীতীশকেও বিজ্ঞাপনটা দেখানো আর কেউ প্রয়োজন মনে করছে না। তবু একজন বলল—বিজ্ঞাপনে আত্মসর্পণ করবার কথা আছে। নীতীশ পথ্য পেলে ওকে আত্মসপর্মণ করবার অনুরোধ করবে তারা। কিন্তু অনেকের মত যে সে সময় অতীত হয়ে গেছে। হয়তো

পুলিস জেনেছে ব্যাপারটা। এবার থানায় গিয়ে ওকে আত্মসমর্পণ করতে হবে!

নীতীশের প্রতি স্নেহ-মমতা অন্তর্হিত হয়ে গেল সকলের! মানুষের নৈতিক জ্ঞান এমনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, খুনীকে কেউ ভালবাসতে পারে না। তবু ওরা নীতীশের ওষুধ-পথ্যের জন্য ভালই ব্যবস্থা করলো। গ্রামের একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোককে রেখে দিল ওর সেবা যত্ন করবার জন্য। মেয়েটির নাম নাটেশ্বরী, ডাকনাম নাটু। বালবিধবা। সুশ্রী, স্নেহপরায়ণা।

নীতীশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর শরীর-মনে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেছে যেন! চেনা যায় না নীতীশকে। উঠে বসবার শক্তি নেই। কিন্তু নাটু ওর খুব যত্ন করে। ওষুধ-পথ্য ঠিক সময়ে খাওয়ায়। বেশী কথা বলায় না। নিজের মা, বোনের মতই দেখে নাটু ওকে। বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়। বেশী বই পড়তে দেয় না। নীতীশ বসে বসে শুধু ভাবে।

গ্রামের ছেলেরা কোথাও যাবার পথে নাটুকে প্রশ্ন করে,

—নীতীশ কেমন রয়েছে, নাটুদি?—পথ থেকেই প্রশ্ন করে তারা।

—অনেক ভালো গো দাদাবাবু—নাটু জবাব দেয়। চলে যায় প্রশ্নকারী। নীতীশ বলে,

—কে নাটু? কে ছিল?

—ঐ যে গো, ওপাড়ার রাজেন-দাদাবাবু।

—ভেতরে এলো-না কেন? ডাক্ ডাক্—

—আসবে না, বাবু! চলে গেছে। নিজের কাজ নিয়ে ঘুরছে সব!

নীতীশ নিঃশব্দে বসে ভাবতে থাকে, গ্রামের কেউ তাকে দেখতে আসে না! কেন আসে না? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কী সে কারণ? কিছুই ওর মনে পড়ে না। মনে করবার চেষ্টা করে নীতীশ : কোথা থেকে সে এখানে এলো, কখন তার অসুখ হোল? কিন্তু না, কিছুই মনে পড়ে না! আচ্ছন্নবৎ পড়ে থাকে সে। নাটুও তাকে বলে না কিছু।

ডাক্তার দেখতে এলেন। নীতীশ আজ অনেকখানি সুস্থ। শুধালো,

—আমার সারতে আর কতদিন লাগবে, ডাক্তারবাবু?

—সেরে তো গেছেন। এখন মনে করুন তো, কেন আপনি কলকাতা থেকে এলেন?

—কলকাতা থেকে! হ্যাঁ—কলকাতায় ছিলাম আমি—না? এলাম বাসে চড়ে।

—বাসে চড়ে কেন? ট্রেনে আসেননি?

—না...হ্যাঁ...না, বাসে চড়েই তো এলাম! আমার মনে হচ্ছে বাসে চড়ে এসেছি...

ডাক্তারবাবু নিরাশার সুরে বললেন,—আপনি কোত্থেকে কখন বের হয়েছিলেন, কেন হঠাৎ দেশে এলেন, ওখানে কি করছিলেন—সব মনে করবার চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে ভাবুন, বুঝলেন? আপনার কলকাতা থেকে এখানে চলে আসার মূলে কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

—হ্যাঁ—না না, কি জানি। হ্যাঁ, আছে! আছে কারণ।

—কী সেটা?

নীতীশ ভাবছে...

ডাক্তারবাবু উত্তর না পেয়ে আবার বললেন,—কী সে কারণ? পালিয়ে এসেছেন? সরকার-বিরোধী কিছু? ব্ল্যাক মার্কেট? চুরি? জাল-নোট ছাপার ব্যাপার? কোন খুন-খারাপি? নারী-ঘটিত কিছু?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, নারী ঘ-টি-ত...নারী-নারী—চুরি-চুরি করে...না ডাক্তারবাবু, মনে পড়ছে না।

—মনে করবার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে ভাবুন, কলকাতা থেকে তাপসীপুর কখন এলেন, কেন এলেন?

নাটুকে পথ্যাদির উপদেশ দিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। নাটু ওকে খাবার দিতে দিতে বলল,—ওসব এখন ভেবো না, দাদাবাবু। ভাল হও তারপর দেখা যাবে।

—হ্যাঁ, ভাল হই তারপর দেখা যাবে!—নীতীশ শুয়ে পড়লো চোখ বুজে।

নাটু ওকে হওয়া করতে লাগলো। মাথায় হাত বুলুচ্ছে।

কিন্তু নীতীশ ঘুমায়নি। সে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবছে ; স্বপ্নে-পাওয়া আশার বর-তনুর মধুর স্পর্শ ভুলতে পারছে না নীতীশ। সেই পরশটাই ওর মানসলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—সত্য হয়ে উঠছে...ভাবছে...কোনো একটা মেয়েকে যেন সে ছুঁয়েছিল...তার মাথা কোলে নিয়ে,...হ্যাঁ, কি সব কথা হয়েছিল দুজনে।...

নীতীশ কলকাত্যয় পড়তো। না, পড়তো না, টিউশনী, না হোমিওপ্যাথি—না...বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের গবেষণা করতো। উঁহু, নীতীশ হোমিওপ্যাথি করতো...না না, করবে এখানে, এই তাপসীপুরে! তাই এল এখানে...না কোনো মেয়েকে যেন ধরেছিল নীতীশ...কার যেন অসম্মান করেছে...না...ও কার কি যেন চুরি করেছে...

চুরি করেছে! না তো। নীতীশ চুরি করতে পারে না। নীতীশ=নীতি+ঈশ। সে কেন চুরি করতে যাবে! নীতীশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে এসেছে, এখানে। করবে চিকিৎসা। একটু ভাল হলেই আরম্ভ করবে। আবৃত্তি করলো,

—অ্যরমে গভীর চেষ্টা, অস্থিরতা জ্বালা—উঁহু, অ্যরমে...অ্যরমে...অ্য-র-মে...নাঃ, মনে পড়ছে না নীতীশের।

পাণ্ডুর মুখে নীতীশ জামরুল গাছটার দিকে চেয়ে রইল।

উঠানের সেই তক্তাপোষটায় শুয়ে ছিল কুমকুম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রদীপও জ্বেলেছে রোজকার মতই। কিন্তু কেন আর ওসব করা? কার জন্য! রমানাথ কোনোদিন তাকে বধূর সম্মান, অন্তত আধা-গৃহস্থের সম্মান দেবে এমন বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। জীবন এবং যৌবন অনর্থক এখানে অপব্যয় করছে কুমকুম!

পাশ ফিরে শুলো। এ সময়-শুয়ে থাকবার কথা নয়, এবং শরীরও সুস্থ আছে ওর। কিন্তু শুয়েই ভাবতে লাগলো। রমানাথ 'কল'-এ গেছে বর্দ্ধমানের বাইরে কোন্ এক পল্লীগ্রামে। রমানাথের মতো হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের বাইরের কল পাওয়া খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু রমানাথ পায় এরকম। কতকগুলো বিশেষ ধরনের রোগের ও ভাল চিকিৎসা জানে, যার ওষুধ সাধারণ ডাক্তাররা জানেন না। যেমন ভূত-ছাড়ানো, পেঁচোয়-পাওয়া, মারণ-জারণ-বশীকরণ। সহরে এ-সব রোগ খুব কম হয়, কিন্তু পল্লীতে এরকম রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী,—তারাই রমানাথকে 'কল' দেয়, পয়সাও দেয়। মোদ্দা কথা, রমানাথের দৈনিক রোজগার আট-দশ টাকা। এর কম হলে সে খুবই খুঁৎখুঁৎ করে।

খুঁৎখুঁৎ করাটা ইদানিং বড্ড বেড়েছে রমানাথের—এই আট-দশ দিন। 'কুমকুম কেন চলে যেতে পারলো না নীতীশের সঙ্গে? কেন গেল না!'—এই রমানাথের অভিযোগ।

কারণ তার ধারণা, নীতীশকে কুমকুম নিশ্চয় জালে ফেলতে পেরেছিল, তবু সে গেল না নীতীশের সঙ্গে—কারণ কি? নীতীশ বিদ্বান-বুদ্ধিমান, এবং নিশ্চয়ই একদিন জীবনে উন্নতি করবে। তাপসীপুরে অজানা পল্লীতে কুমকুমকে নিজের বিয়ে-করা বৌ বলে পরিচয় দেওয়া নীতীশের পক্ষে কিছুই কঠিন হোত না। রমানাথের পক্ষে এখানে সেটা সম্ভব নয়—কারণ কুমকুম বর্দ্ধমানে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে—তাকে এখানকার বহু লোকই চেনে। এখানে তাকে বধূর মর্য্যাদা দেওয়া রমানাথের পক্ষে অসম্ভব।

এতসব কথা গোপনে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও কুমকুম গেল না নীতীশের সঙ্গে। অথচ কুমকুমের কাছ থেকেই রমানাথ জেনেছে যে, নীতীশ তাকে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল—বধূর মর্য্যাদা দিতেও রাজী ছিল নীতীশ। রমানাথের বেশ মেজাজ-খারাপ হবার এই কারণ।

কিন্তু কুমকুম গেল না নীতীশের সঙ্গে। কেন গেল না, জানে কুমকুম। নীতীশকে দেবার মতো হয়ত তার কিছু থাকতে পারে, কিন্তু নীতীশের কাছ থেকে কিছুই তার পাবার নেই। কারণ নীতীশ দেউলে! তবু কেন কুমকুম ভাবছে নীতীশের কথা? কে জানে। কুমকুম না-ভেবে পারছে না। ভাবছে কুমকুম শুয়ে-শুয়ে।

তার ক্ষুদ্র জীবনের বেষ্টনীতে যে-কয়জনকে দেখেছে কুমকুম, তার মধ্যে নীতীশই একমাত্র পুরুষ, যে—নারীর মর্য্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। একমাত্র 'হৃদয়' ওই নীতীশেরই দেখলো কুমকুম—যে, প্রেমাস্পদকে সুখী করবার জন্য নিজের সব ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে মুছে দিয়ে পল্লীতে ফিরে এল হোমিওপ্যাথী করতে। নীতীশই তার জীবনে একমাত্র মানুষ যার নারীদেহের প্রতি লালসা অপেক্ষা নারীর অন্তরের প্রেমের প্রতি লোভ সমধিক! কিন্তু নীতীশের হৃদয় অন্যত্র বন্দী!

দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ল কুমকুম। চিৎ হয়ে আকাশের পানে তাকালো। নীল নিথর আকাশ অগণ্য-তারকাপুঞ্জ-ঝলমল। ঐ নির্মলতা তো কুমকুমের দেহে-মনে ফিরবে না আর! তবু নীতীশকে দেখে তার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়েছিল :

—"নিমেষে ধৌত নির্মল-রূপে বাহিরিয়া এল কুমারী নারী—"

কিন্তু হৃদয়ে সে যতই 'কুমারী' থাক, বাহিরের কৌমার্য্যই মূল্য পায়। এমন কি, বাহিরের কৌমার্য্য থাকলে হৃদয়ের কৌমার্য্য দেখতেই চায় না কেউ বড় একটা। সকলেই ভাবে, ও ঠিক আছে!

বাহিরে কৌমার্য্য হারালেও কুমকুম যেন এতকাল অন্তরে কুমারী-ই ছিল...হ্যাঁ ছিল!—এখন আর নাই নাকি। কেন থাকবে না! রমানাথের নির্দেশমত নীতীশের সঙ্গে গোটাগুটিই তো অভিনয় করেছে সে। হ্যাঁ, সবই অভিনয়! সেকথাও জানিয়ে দিল নীতীশকে যাবার সময় : কুমকুম কুমারীই আছে! কুমকুমরা বিবাহিতা হয় না—ওরা চিরকুমারী, ওরা আদ্যন্ত 'মিস'...

থিয়েটারের পোষ্টারে-লেখা কথাগুলো মনে পড়ছে—

'রাজকুমারী চিত্রা—মিস্ কুমকুম' বিজ্ঞাপন দিত থিয়েটারওয়ালা। থিয়েটারেই আবার ফিরে যাবে নাকি কুমকুম? গেলে মন্দ হয় না। রমানাথের কাছে আর থাকা যাবে না। টাকাগুলো তো নিয়েছেই, এখন গয়না ক'খানা আবার না নেয়! তাছাড়া সময় এবং বয়স—যার মূল্য কুমকুমের কাছে অমূল্য, তাই অনর্থক নষ্ট হচ্ছে। বধূর মর্য্যাদা কোথায়,

পাবে কুমকুম? এদেশে ওসব পাওয়া যায় না! অথচ কুম্‌কুম্‌ কোন্‌ পত্রিকায় এক ভাল লেখকের লেখায় পড়েছে—এই দেশেই বারনারীর একটা বিশেষ সম্মান ছিল। রাজসভাতেও নাকি তাঁরা আসন পেতেন, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিতে। এই দেশেই স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশীকে রাজা-পুরুষরা বিয়ে করে...থাক্‌, এসব ভেবে লাভ কিছু নেই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের-যুগ শুধু নয়, বর্তমান যুগ ব্যথা-জানাবার-যুগও। দরিদ্রের জন্য ব্যথা জানাও, বাস্তুহারার জন্য ব্যথার ক্রন্দনে কাগজ ভর্তি করে তোলো ; অন্ধ, কুষ্ঠ, মূক-বধিরদের জন্য চাঁদার খাঁতা খোলো—আর কুমকুমের মতো অভাগীদের জন্য বই লেখো, আইন করো, উচ্ছেদ করো তাদের বৃত্তির—বুক চাপড়ে বলো 'ট্রাফিক ওভার উইমেন'!—'কী অন্যায়, কী অবিচার!' বলে বলে লোকচক্ষে আরো ঘৃণিত করে তোলো তাদের জীবিকাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমরাই তো আসবে রাত্রির অন্ধকারে!...

ওরা না থাকলে তোমাদের চলে না, তবু 'ট্রাফিক ওভার উইমেন' বলে তোমরা চেঁচিয়ে ব্যথা জানাবে! তাদের বৃত্তির উচ্ছেদ ঘটাবে, কিন্তু তাদের সামাজিক সম্মান দেবার ব্যবস্থা করবে না। চমৎকার!

কিন্তু এসব ভেবে কি হবে? কুমকুম তো বক্তা নয় যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে তার অভিমত ; লেখিকা নয় যে, কাগজ-ভর্তি করে লিখে জানাবে তার অভিযোগ। কুমকুম অসহায়া এক ঝড়ে-ওড়া পাতা—তার গতি আছে, স্থিতি নেই—তার মন আছে, মান নেই, মর্য্যাদা নেই—তাকে নিয়ে বিহার চলে, চলে না সামাজিক ব্যবহার!...

উঠে বসলো কুমকুম—রান্না কিছু করে নেবে। অনর্থক না-খেয়ে থাকায় লাভ কি? শরীরটা ভাল রাখতে হবে। আর শরীর স্বাস্থ্যই একমাত্র সম্বল তার রোজগারের। হ্যাঁ, এটাই তো কিনতে আসে সব।...হাসলো কুমকুম। হাসলো আর ভাবলো 'কুমকুমরা' হাসে কেন। অন্তত একা যখন থাকে তখন তো ওদের হাসবার কোন কারণই নেই। ওদের জীবনে এমন কিছুই ঘটা সম্ভব নয়, যার জন্য ওরা হাসবে। হাসি নিশ্চয় ব্যঙ্গ ওদের নিজেদের উপর। তবু ওরা হাসে। অপরকে খুশী করতে হাসে হাসুক—নিজের মনে হাসে কেন?

রান্নাঘরে এল কুমকুম। কী রাঁধবে! রমানাথ বাড়ী থাকলে অবশ্যই ভাল কিছু রান্না করতে হোত—নিজের জন্য কে আর অত করে! আলু-সেদ্ধ ভাত-ই আজ খেয়ে নেবে কুমকুম। চড়িয়ে দিল।

মুরগী-মসল্লাম রান্না করলো নীতীশ সেদিন। রান্না না ছাই। ওর কি রান্না করার মতো মন আছে। সেই বান্ধবীর কথাই ভাবে দিনরাত। কী আশ্চর্য্য ভালবাসে ও সেই বান্ধবীকে। অসাধারণ প্রেমিক ছেলে! বান্ধবীটি কেমন কে জানে? তবে একজনের হৃদয়ে যে অমন করে আসন নিতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই সামান্য নয়! ভাগ্যবতী মেয়ে। একজনের হৃদয় তো পেয়েছে! কুমকুমের দেখতে ইচ্ছে করছে সেই মেয়েটিকে। 'আশা' নাম শুনেছে সে নীতীশের কাছে। কিন্তু নীতীশ ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল!...কে জানে আরো কী ব্যাপার আছে ভেতরে!...

নীতীশের মতো প্রেমিক পুরুষ আর দেখনি কুমকুম এযাবৎ। ওর জীবনে যে-কেউ এসেছে—প্রেমের ভান করেছে প্রচুর, কথা বলেছে বিস্তর—কবিতাও করেছে অনেক! সব ভুয়ো, মেকী, মিথ্যে! কিন্তু নীতীশ সেদিন ওর মাথাটা তুলে নিয়ে যে-কটা কথা

বলেছিল...নাঃ, কুমকুম খামোখা এতো সব ভাবছে। প্রেম ওদের জীবনে হতে নেই—হওয়া অপরাধ!...

ভাতের হাঁড়িতে আরো খানিক জল ঢেলে দিয়ে কুমকুম বাইরে এসে বসলো একখানা মাসিক কাগজ নিয়ে। পড়ছে। গল্পগুলোই পড়ে, আর সব বাদ দিয়ে যায় কুমকুম। কিন্তু আজ ও একটা শক্ত প্রবন্ধ পড়তে—পড়তে আরম্ভ করলো 'বৈদিক যুগে নারী' এক পঞ্চতীর্থের রচনা—সংস্কৃত শ্লোকে কন্টকাকীর্ণ, টীকা ভাষ্যে সুদুর্গম—পড়ে চললো কুমকুম। কিন্তু কি পড়ছে। আধঘণ্টা পরে ওর মনে হোল, কৈ কিছুই পড়ছিল না সে, অথচ চার-পাঁচ পাতা পড়ে গেছে। দূর! এ আবার নাকি পড়ে? কুমকুম পাতা উল্‌টে একটা কবিতা বের করলো! পড়ছে—

চাঁদের আলোতে পথ ভেঙে তুমি এলে
বলাকার মত সাদা অঞ্চল মেলে ;
ওষ্ঠে তোমার রঙ পাকা ডুমুরের—
চোখের কাজল ডীপ্ ব্লু কুইঙ্ক-এর ;
হাসিতে তোমার জিলেট্-ব্লেডের ধার,
শাড়ীতে তোমার 'এরিয়ান কাল্‌চার'!...

কবিতাটি ভালই লাগছিল কুমকুমের। আধুনিক যুগের কবিদের ভাষা কিন্তু চমৎকার, এখন বামপন্থীযুগ চলেছে সাহিত্যে—বাংলা সাহিত্য একটা নতুন রূপ ধরছে যেন! কিন্তু ভাত-ধরার গন্ধ আসছে। ভাত নামাতে-নামাতে ভাবছে—কী চমৎকার উপমা! হাসিতে জিলেট-ব্লেড! বাপ্‌স সে কেমন হাসি...

হেসে ফেললো কুমকুম নিজেই।

বোম্বাই-এ আশিসের অবস্থান খুবই সুখের হয়ে উঠতে পারতো ঐ বাঙালী পরিবারটির সাহায্যে। কিন্তু কাঁটার মতো একটা চিন্তা সর্বক্ষণ আশিসের বুকে বিঁধে থাকে—ঐ মহিলাটি আশাকে জানে। কতখানি জানে, খোঁজ করতেও যেন ভয় হচ্ছিল আশিসের। কিন্তু সে ভয় করলে কি হবে ; নন্দার মা-ই আশিসকে সেদিন জানিয়ে দিয়ে গেল আশা তার খুড়তুতো বোন—খুবই নিকট আত্মীয়া, রঙ্গ করবার জন্য সম্পর্কটা প্রথমেই তিনি বলেন নি! অতঃপর আশিসের অবস্থাটা অনুমান করবার মতো।

আসিস সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকে, কখন চন্দ্রিমা দেবী আশার সঙ্গে আশিসের ভাব ভালবাসা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবে। এতাবৎ সেটা হাতে পায়নি নন্দিতার জন্য। সে প্রায় সর্বক্ষণটি আশিসের কাছে থাকে—তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। আশিসও ইচ্ছে করে ধরে রাখে ওকে। আলাপের পরদিনই নন্দা বলেছিল,

—আপনাকে 'দাদা' বলবো ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু মাকে আপনি 'দিদি' বলায় মা বলল যে আপনি আমার 'মামা, হন।

—হুঁ, তারপর কি হোল?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—তারপর 'মা' হচ্ছে একবার 'ম'-এর আকার, কিন্তু 'মামা' দুবার। তাহলে 'মামা'...মনে ডবল 'মা'। কেমন?

—হ্যাঁ, 'ডবল মা'!—হাসি চেপে আশিস জবাব দিয়ে বলল,—তাইতো তুমি মামার

বাড়ীর আব্দার চালাচ্ছো—

—উহুঁ—না! আপনি তো 'মামা' হ্লেন না! 'মেসো' হচ্ছেন যে!

—ও! হ্যাঁ!—মেসো মানে কি হবে, নন্দা?

কথার মানে খোঁজা মেয়েটার যেন রোগ, একটা নেশা! খানিক চুপ করে থেকে বলে দিল,—মেসো—মে—সো—শো—শো মানে দর্শন ; প্রদর্শন...অর্থাৎ মে-শো মানে শুধু দর্শন...আপনাকে আমি মামা-ই বলবো, মেসো আমার পছন্দ নয়...

—তোর পছন্দতে সম্পর্ক বদলে যাবে নাকি!—বলে ওর মা এসে দাঁড়ালো।

আশিস হাসছে। কিন্তু চন্দ্রিমা দেবী বলল,

—হেসো না, ভাই! সব কথায় মানে খুঁজবে—আর খালি বক বক করবে। কী যে স্বভাব ওর!

—ভালই তো স্বভাব দিদি।

—না। কিন্তু এর কারণ কি জান? মার-পেটে-জন্ম ওর বাংলায় আর মাটিতে পড়েছে...

—বোম্বাই-এ!—আশিস হেসে বলল।

—না। বোস্টন-এ, আমেরিকায়। বড় হোচ্ছে বিলেত-দিল্লী-বোম্বাই-এ। বাংলায় ও গিয়েছিল বছর দুই আগে। মাসখানেক মাত্র ছিল। ওকে বাংলাভাষা শেখাবার জন্য কী কষ্ট আমাদের করতে হয়!

—হিন্দী তো রাষ্ট্রভাষা। সেটাই ভাল করে শেখান, দিদি।

—হ্যাঁ, হিন্দী ও শিখবে! কিন্তু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা রবীন্দ্রনাথের ভাষা—বাংলা আমাদের অন্তরের ভাষা, আশিস! সে ভাষা তো শিখতেই হবে, ভাই...চন্দ্রিমা দেবী বলেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ নিশ্চয়!—আশিস বলল,—বাংলাভাষার প্রতি আপনার টান তো খুবই, দিদি।

—তোমার নেই নাকি?—বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল চন্দ্রিমা দেবী।

—আমি বিজ্ঞান সেবক। আমার মনে হয়. ভাব-প্রকাশের যোগত্য থাকলেই—সেই ভাষা আমার আপনার। যেমন ইংরাজি...

—কিন্তু মাতৃভাষা মানুষের কাছে 'মা'—মা, দেশ মা, আর ভাষা-মা এক!

—উচ্ছ্বাসটা আমার কম, দিদি! ভাষাকে বাহন হিসাবেই দেখি আমি—মৃদু হেসে বলল আশিস।

—তোমার ভাবের বাহন মাথায় থাক, ভাই, তিনি হয়তো গরুড় না-হয় বৃষরাজ—আমরা রবীন্দ্র-শিষ্যা, আঁমাদের ভাবের বাহন হংস। অর্থাৎ বাংলাভাষা। কিন্তু আশিস, একটা কথা শুধোবো?

—বলুন।—আশিস হেসেই বলল, কিন্তু মনে-মনে সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে।

—তোমার উচ্ছ্বাস কম, এখুনি স্বীকার করলে। আশার সঙ্গে তোমার মেলে কি করে তাহলে? সে অবশ্য উচ্ছ্বাস-প্রবণ নয়, কাব্য প্রবণ বলা চলে তাকে। তার সঙ্গে তোমার ভাব-ভালবাসা হয়েছে তো?

—আপনার কি মনে হয়, ভাব হয়নি?

—ঠিক তা নয়। তবে আশা অতি অসাধারণ মেয়ে। আমার মনে হয় বর্তমান যুগে ওর জুড়ি কম।

—কেন দিদি? কী সে এমন!—আসিস জেনে নিতে চায় আশা সম্বন্ধে চন্দ্রিমা দেবীর অভিমত।

—সে কেমন তা-তো বলে দিতে হবে না, ভাই! ও একেবারে প্রদীপের মতো, স্পষ্ট—খাঁটি ঘিয়ে জ্বলছে মন্দিরের কোণায়। ওকে তুমি আলেয়া বা ইলেকট্রিক আলো ভেবে কিছুতেই ভুল করতে পারবে না।

—আপনি তো ওর সম্বন্ধে খুব বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, দিদি!—হাসলো আশিস।

—মোটেই না। সার্টিফিকেট ওর কোনো কাজে লাগবে না। ওকে চিনতে দু মিনিট দেরী হয় না! তুমি অল্পদিন ওকে দেখেছ, আর হয়তো তোমার গবেষণা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে, তাই আমার কথাটাকে 'সার্টিফিকেট' বলছো।

—না দিদি। আশা আমার মা'র নির্বাচিতা—আর, আমার মা ভুল করেন না!

—তাঁর নির্বাচনকে হাতজোড় করে নমস্কার করি আমি! শোনো আশিস, আমার থেকে প্রায় ষোল বছরের ছোট আশা, কিন্তু কী অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব! গতবার—বছর দুই আগে আমি যখন বাপের বাড়ী গেলাম, খোকাটা তখন পেটে—ওর বাবা আমাকে বিলাত নিয়ে যেতে যান। তাই কাকীমার কাছে, মানে আশার মার কাছে বলেছিলাম—'এসময় আমার অত দূরে দেশে যেতে ইচ্ছে করে না।' আশাওছিল সেখানে। সে আমার মুখপানে চেয়ে বলল,

—'সে কি, বড়দি! উনি যেখানে যাবেন তুমি সেখানেই যাবে। স্ত্রী স্বামীর ছায়া।'

—ছায়া কেন হতে যাব?—আমি প্রতিবাদ করেছিলাম আমার কথায়। তাতে ও বলল,

—'ও! ছায়া তুমি নয়? তাহলে স্ত্রী-ও নয়—তুমি মায়া মরীচিকা! তুমি তাকে দিক্ ভুল করিয়ে মজা দেখাবার জন্যই বিয়ে করেছ! ছিঃ বড়দি!...ওর সেই 'ছি, বড়দি', কথাটা আমি জীবনে ভুলবো না আশিস! আমি বললাম,

—আমার অসুবিধাটা দেখছিস নে আশা? তার উত্তরে আশা কিছু আর বলল না। কথাই কইল না। আমি আবার বললাম, কি করে যাব বল?

—'ছায়া হলে, যাবে। ছায়া কখনও কায়া-ছাড়া হয় না। মায়ারা, মরীচিকারাই কায়া ছাড়া থাকে।'

আমি বললাম আমার শারীরিক অসুবিধা ; তার উত্তরে ও বলল—'শরীরটা আর তোমার নয়। যাঁকে দিয়েছ, তিনি তা দেখবেন!'

আশিস নিঃশব্দে শুনছিল। বাইরে সে হাসি-মুখই দেখালো, কিন্তু ভেতরটা ওর পুড়ে যাচ্ছে! উঃ! কী অপরূপ সু-অভিনেত্রী ঐ আশা? বিলেত-আমেরিকা ফেরত শান্তিনিকেতন শিক্ষিতা চন্দ্রিমা দেবীকে মুগ্ধ করে দিয়েছে ; কিন্তু চন্দ্রিমা-দি যদি জানতেন আশার কীর্তি তো, সারা পৃথিবীতে ঘৃণা রাখবার জায়গা পেতেন না। চমৎকার অভিনয় করতে পারে আশা কিন্তু! সর্বদা সর্বত্র সে অভিনয় করে! কেমন স্বামীপরায়ণতাটি ফুটিয়ে তুলেছে এই চন্দ্রিমাদির কাছে! ওঃ!

—ওকে সঙ্গে আনলে না কেন, আশিস? আমি লিখে দেব আসতে?

না-না-না,—আশিস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—আমার মা একা থাকবেন। মা'র আর কেউ সঙ্গী নেই, বড়দি!—বলে আশিস যেন আত্মরক্ষা করলো।

নন্দা-বেচারা এদের কথার মাঝখানে কোথাও ঢুকতে পারছিল না। জানালার কাছে

দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। এতোক্ষণে কাছে এসে বলল,

—আমারও তো সঙ্গী চাই একটা।

—আমিই তো রয়েছি।—বলল আশিস।

—উহুঁ।—মাথা নেড়ে বলল নন্দা,—আপনি তো মার সঙ্গেই কথা বলেন।—মা তুমি লিখে দাও না আশা-মাসিমাকে আসতে। খুব মজা হবে।

—দিল্লীতে গিয়ে লিখবো। চল, তোর মেসোমশাইও তো যাচ্ছে দিল্লী!

চন্দ্রিমা দেবী বলল—কিন্তু আশিসের এখন দিল্লী যেতেও ভয় করছে। বৈকালিক চা খেতে খেতে এইসব কথা হওয়ার পর চন্দ্রিমা দেবী বলল,

—চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—

—না, বড়দি! আমাকে একবার ডাঃ চিন্তামনের কাছে যেতে হবে।

মিথ্যা কথা বলল আশিস। নির্জলা মিথ্যে বলল। কারণ, ওর সব সময় ভয় করছে কখন চন্দ্রিমা দেবী আবার আশার কথা পাড়বেন! এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে আশিস! কিন্তু পালাবে কোথায় এঁরা দিল্লীরই লোক—ওখানেও আশিসকে চন্দ্রিমা দেবী ছাড়বেন না আশার কথা শুনতে। আশাকে ওখানে ডেকে-আনাও ওঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এমন জানলে এ হোটেলে উঠতোই না আশিস। কী আর এখন করা যাবে!

ভাবতে ভাবতে পথ চলছে আশিস। ডাঃ চিন্তামনের বাড়ী নয়, সেখানে আজ কোনো কাজ নেই তার। কিন্তু কোথায় যাবে! অচেনা বোম্বাই। অপরিচিত মানুষ সব। আশিস বড়ই অস্বস্তি বোধ করছে। সেই দয়ালচাঁদকে পেলে বাঁশী শোনা যেত খানিক। ওর অন্তরের দুঃখটা অনুভব করছে আশিস। বিয়ে করা বৌ ঠাট্টা করায় লোকটার এই দুর্দশা। মানুষের জীবনে কত ব্যাপারই না ঘটে!

কিন্তু ঘটনার উপর কোনো হাত নেই মানুষের! চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে এখানে এসে আলাপিত-হওয়া একটা ঘটনা। কিন্তু আশিসের কোনো হাত নেই তাতে। এ যেন নিয়তি। আশার চিন্তাটা ভুলে যেতে চায় সে—কিন্তু ভাগ্য ওকে ভুলতে দিচ্ছে না! সব ঘটনাই এমনি।

ভাবতে-ভাবতে চলছিল, হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো—

—ও, স্যরি!—বলে সরে গেল লোকটি। আশিস চেয়ে দেখলো, দয়ালচাঁদ-ই। একেই বলে ভাগ্য। এমনি সব ব্যাপার যদি চাইবামাত্র পাওয়া যেতো!

—দয়ালচাঁদবাবু?—আশিস ডাক দিল জোরে। তৎক্ষণাৎ ফিরে দয়াল বলল,

—ক্যা? আপ্ পছানতে? ও' আঁপনি সেই বাঙালী আছে। কী খবর?

—কোথা যাচ্ছেন?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—আ-সেন, আপনাকে নিয়ে যাব জলসায়। আসেন-আসেন—টান দিল দয়াল ওর হাত ধরে। আশিসও চললো।

খানিকটা এসে এক বড় বাড়ী। দয়াল ঢুকলো আশিসকে নিয়ে। নাচ-গান বাজনার জলসা হবে। বিরক্ত লাগছে আশিসের। কিন্তু দয়াল ওকে ছাড়বে না। নিরুপায় আশিস বসে রইল। শেষ হলে ফিরবার পথে আশিস ভাবছিল—সমস্তক্ষণটা সে আশার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথাই ভেবেছে-নাচ-গান কিছুই শোনা হয়নি।

এমন করে অন্তরে বিষ পুষে রাখলে সে বাঁচবে ক'দিন ; এর একটা ইতি করা দরকার।

কিন্তু কী সে করতে পারে। হোটেলে ফিরতেই চন্দ্রিমা-দেবী প্রশ্ন করলো,

—ডাঃ চিন্তামন কি বললেন, ভাই? কবে যেতে হবে দিল্লী?

—দিন ঠিক হোল না। আপনারা কবে যাচ্ছেন?

দিন সাত পরে। তোমাকে নিয়ে একসঙ্গেই যাব ভেবেছিলাম।

তা আর হোল কৈ! আমাকে হয়তো মাদ্রাজ যেতে হবে। কোথায় যে যাব, কে জানে! তাই ভাবছি বিলাত চলে যাই।

—তোমার মার মত চাই তো? আর, আশারও চাই। নাকি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

—না ও মার কাছেই থাকবে—বলে আশিস নিজের ঘরে এল।

অগাধ চিন্তায় ডুবে গেল আশিস। দিল্লী-ই ওকে যেতে হবে। কারণ ডাঃ চিন্তামান তারই ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রিমা-দেবীর সম্পর্কটা যে ওখানেও যাবে!—এই আশিসের ভাবনা। অবশেষে পরদিন বাক্স-বিছানা বেঁধে আশিস মাদ্রাজ চলে গেল। চন্দ্রিমা দেবীকে বলে গেল—'দিল্লী পৌঁছে দেখা করবো।'

বোম্বাই ছেড়ে যেন বাঁচলো আশিস।

দিবেন্দুবাবুর বিজ্ঞাপন যথারীতি খবরের কাগজে বেরুনোর পর আরও কয়েকদিন কেটে গেল, নীতীশের কোনো খবর এল না। সে একখানা চিঠি লিখেও তো ক্ষমা চাইতে পারতো! কিন্তু ও সত্যিকার চোর, সত্যিকার অপরাধী। ক্ষমা চাইতে আসবে কেন? থিসিস্‌খানা সে নিশ্চয় নিজের কাজে লাগাবার ধান্ধায় ঘুরছে, অথবা এরই মধ্যে লাগিয়েছে কোথাও কিছু—এই ধারণা বদ্ধমূল হোল ডাঃ দিব্যেন্দুর মনে।

আশাকে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চিন্তা করেন—এই ল্যাবরেটরী আশিসের বাবা এবং তিনি তৈরী করেছিলেন। এখানে কত বিনিদ্র-রাত্রি কেটেছে তাঁদের বিজ্ঞানচর্চ্চায়। তারপর আশিসকে নিয়েও কত দিনকতক রাত তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। এখন আবার তাঁর পুত্রবধূকে বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন এই ল্যাবরেটরীতেই। কিন্তু কী হোল! এ পর্যন্ত এই ল্যাবরেটরী থেকে ভাল কিছু বের হোল না। ল্যাবরেটরীর মূক-যন্ত্রগুলোকে যেন অভিশাপ দিতে থাকেন দিব্যেন্দুবাবু! জড় যন্ত্রগুলোকে ওঁর জঞ্জাল বলে মনে হয়।

আশা কিন্তু আশ্চর্য্য যত্নে রক্ষা করে চলেছে যন্ত্রপাতি। ঝাড়া-মোছা থেকে আরম্ভ করে সাজানো পর্য্যন্ত—দেখে মনে হয়, যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাচ্ছে! ওর মতো শিক্ষানবীশ বৈজ্ঞানিকের কোনোই কাজে লাগে না এসব জটিল যন্ত্র। কিন্তু প্রতিদিন সে তাদের যত্ন করে যথাসাধ্য। দিব্যেন্দুবাবু দেখেন আর এই পরম নিষ্ঠাবতী বালিকাটির উপর 'অগাধ' স্নেহের-সমুদ্র উদ্বেল হতে থাকে তাঁর মনে। মনে মনে বলেন—'বৌঠানের নির্বাচন সত্যি আশ্চর্য্য!'

থিসিস্-চুরির কথাটা আশাকে সম্পূর্ণভাবেই গোপন করা হয়েছে। কারণ ওরকম একটা চুরির ব্যাপার জানলে আশা অত্যন্ত কষ্ট পাবে। নিজেকে 'অপয়া' ভাববে। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু সেদিন কথায়-কথায় বললেন,

—আশিসের চিঠিপত্র তুই পেয়েছিস্, মা? কবে সে আসবে, কিছু লিখেছে?

—না, কাকাবাবু! ওসব তিনি আপনাদের লিখবেন। আমাকে কেন?

'আমাকে কেন' এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত অভিমান জমাট বেঁধে রয়েছে।

কিন্তু ডাঃ দিব্যেন্দু সেটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন,

—ও বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ চলে গেছে। হয়তো কোনো সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজে গিয়ে কি করবে সে, আমি বুঝতে পারছি না, মা!

—আমি তো আরো-ই বুঝবো না, কাকাবাবু।

—তুই নীতীশকে জানিস, মা? নীতীশ আশিসের বাল্যবন্ধু।

—না, কাকাবাবু। ওঁর কোনো বন্ধুকেই তো জানি না আমি...

ডাঃ দিব্যেন্দু আর কিছু বললেন না। পড়াতে আরম্ভ করলেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক পড়াগুলোই তাঁকে পড়াতে হয়। আশা খুবই বুদ্ধিমতী। কিন্তু বুদ্ধিটা তার সাহিত্য-বিষয়ক। বিজ্ঞানও বুঝবার চেষ্টা সে করছে প্রাণপণে। কিন্তু বড় কঠিন লাগে। বলল,

—আমি কি বিজ্ঞান শিখতে পারবো কোনোদিন, কাকাবাবু?

—কেন পারবি না, মা? মানুষ কী-না পারে? আমি তোকে ভাল বৈজ্ঞানিক করবো। অবশ্য, সময় কিছু বেশী লাগবে।

—আপনার কত সময় নষ্ট করছি।

—সন্তানের জন্যই তো বাবা-মা'র যা-কিছু মা। তোকে আমার সব বিদ্যে দান করে যাব।

—আপনার সব বিদ্যে আমার মাথায় ধরবে তো, কাকাবাবু! আশা হাসে।

—ঠিক ধরবে। শোনো, পদার্থকে ভাঙতে-ভাঙতে বৈজ্ঞানিক..

পড়ানো আরম্ভ করলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

কালিচরণ ট্রে-ভর্তি চা-খাবার নিয়ে এল। পিছনে মা। এসেই প্রশ্ন করলেন.

--আশিস মাদ্রাজ কেন গেল, ঠাকুরপো?

—সেই কথা তো আমিও ভাবছি, বৌঠান। হয়তো ওখানে কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু সে-কথা তার লেখা উচিত ছিল।

আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুরপো—আশার পানে চাইলেন মা—বললেন,—আশিসের মন এখনও মেনে নিতে পারছে না দুঃখটা। আপনার কি মত?

—দুঃখ তো বড় কম নয়, বৌঠান! তাকে মেনে নেওয়া সহজও নয়। তবে আমার বিশ্বাস, আশিস ও-দুঃখ সয়ে যাবার শক্তি রাখে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক্, বৌঠান। আমি আশিসকে আজ চিঠি লিখবো বাড়ী ফিরতে।

দুজনেই দেখছেন, আশার মুখখানা দুশ্চিন্তায় পাংশু হয়ে গেছে। পাতলা ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে ওর। মা বললেন,

—তোর এসব নিয়ে মাথা ব্যথা কেন! এসব আমাদের বৈষয়িক কথা, মা।

—কি হয়েছে, মা।—আশা ওঁর কোল ঘেঁষে এসে বলল,—আমি কি জানতে পারি না সে-কথা?

—না, মা! তুই ওসব কথা জেনে কি করবি? যা, ভেতরে যা!

আশা তবু আধমিনিট দাঁড়িয়ে থাকলো। দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—এমন কিছুই নয়, মা—আশিসের 'ডক্টরেট' নিয়ে ব্যাপার—

আশা আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু ওর অসাধারণ বুদ্ধি ওকে বুঝিয়ে দিল এরা কিছু একটা লুকোচ্ছেন আশাকে। কী সে বস্তু? কেন আশাকে লুকোনো হচ্ছে! অন্দরের পথে

আসতে আসতে আশা এই কথাটাই ভাবছিল। আশিসের অকস্মাৎ বোম্বাই যাওয়াকে সে গবেষণা-সংক্রান্ত কিছু বলেই মেনে নিতে চেয়েছে। কিন্তু তার যাবার সময়ের ব্যঙ্গোক্তি—'অতিভক্তি' বার বার যেন বুঝিয়ে দেয় আশিসের আকস্মিক গৃহত্যাগের মধ্যে আশাও নিশ্চিত জড়িত আছে। আজ সে বুঝলো আশিসের গৃহত্যাগের বড় কারণটা আশা-ই। নইলে মা বা কাকাবাবু অত করে তাকে কথা লুকোতে চাইবেন কেন? কিন্তু আশা কী অপরাধ কোথায় করলো! তাকে কি পছন্দ হয়নি আশিসের? অথবা সে মডার্ন নয় বলে, কিংবা রূপটা তার উর্বশীর মতো নয় বলে:..কত কি যে ভাবতে লাগলো আশা, নিরাকরণ হয় না।

অন্দরে ওর কোনো কাজ নেই। খবরের কাগজ সকালেই পড়া হয়েছে বিজ্ঞানের বই পড়তে এখন আর ভাল লাগবে না। করবে কি আশা? গানও আজকাল বেশী গায় না সে। ওর চিন্তা-বিক্ষিপ্ত মনকে কোথাও স্থির করতে পারছে না! ওর বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্মরণ করতে লাগল।..

ঘড়িটা আজও পড়ে আছে তার কাছে। আশিস নেয়নি। আশার বাবার-দেওয়া ঘড়ি, তাই বুঝি নিল না। বাবার সম্প্রদান-করা আশাকেই নিল না...তা ঘড়ি! চোখ ফেটে জল আসছে ওর।

আশাকে ভিতরে-পাঠিয়ে মা বললেন দিব্যেন্দুবাবুকে।

—ওর কাছে কথাটা বলা আমাদের ঠিক হোল না, ঠাকুরপো! কিন্তু আশিসের কাণ্ড দেখে আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আজ বিশ দিন সে গেছে—আমাকে দশখানা চিঠি লিখলো, কিন্তু আশাকে একখানাও না। আমি ধরতে পারছি না, কী এর কারণ!

ওদের ভাব-সাব হয়েছে কিনা, আপনি জানেন বৌঠান?

—না-হবার তো কথা নয়, ঠাকুরপো! আজকালকার লেখাপড়া-জানা ছেলে-মেয়ে আর আশা আমার অত ভাল মেয়ে!

মার কণ্ঠস্বর স্নেহে, সহানুভূতিতে অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আশার ব্যথা যেন তিনি নিজের অন্তরেই অনুভব করছেন! আবার বললেন,

—অমন মেয়ে আর দেখিনি, ঠাকুরপো—ও এ-যুগের নয়। ও যেন তপস্বিনী উমা। আপনি শুনলে অবাক হবেন, ঠাকুরপো, অত অল্পবয়সী মেয়ে—ভাল করে গয়না-কাপড় পরে না, স্নো-পাউডার তো ছোঁয় না একেবারে! ভাল খাবার পাতে দিলে খায় না। আমি গোপনে দেখেছি আশিসের একখানা ফটোর সামনে বসে থাকে, আর ঝরঝর করে জল ঝরে চোখ দিয়ে! কী হবে, ঠাকুরপো! মেয়েটা হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বে...

—দিনকতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন, বৌঠান।

—ও যাবে না, ঠাকুরপো! সেদিন আমি বললাম—'মন-খারাপ করছে তো, যা, দু-চারদিন বাপের বাড়ী ঘুরে আয়!' তাতে বলল,

—'বাবা আমাকে আপনার সেবায় সঁপে দিয়েছেন, মা! সেখানে আমার তো আর কিছু কাজ নেই!'...শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম।

—অসাধারণ মেয়ে!—বললেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আপনি ওকে একটু 'সাধারণ' করে দিন, ঠাকুরপো—আমার ভয় করছে। মনে হয় ওর মনে তিলমাত্র ব্যথা দিলেও আশিসের কল্যাণ হবে না...

—সে কি, বৌঠান...দিব্যেন্দুবাবু যেন চমকে উঠলেন—ওসব বলবেন না।

—বলছি, ঠাকুরপো—ওর আশ্চর্য্য স্বামী-নিষ্ঠা দেখে আমার কেবলই মনে হয়, ওর চোখের জলে মা-মহাসতীর আসনও টলে যাবে! ওর সঙ্গে আশিসের বিয়ে আমি না-দিলেই ভাল করতাম, ঠাকুরপো!

—না, বৌঠান, ওসব ভাববেন না। আশিস খুবই ভাল ছেলে। আপনার নির্বাচনের উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। হয়তো ব্যস্ত আছে—মনও ভাল নেই তাই আশাকে চিঠিপত্র লেখেনি। আচ্ছা, আমি খবর নিচ্ছি।—উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বেরিয়ে গাড়ীতে চড়লেন এসে। কিন্তু মনটা যেন তাঁর নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। এত সুন্দর একটা মেয়ে, যাকে সুখী দেখবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রাণ উদগ্র-উন্মুখ!—আশিস তাকে অবহেলা করছে। অকারণেই করছে। তার থিসিস্-চুরির জন্য আশা তো দায়ী নয় যে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে আশিস! কিন্তু থিসিসের কথা মনে হতেই সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল নীতীশের উপর। সেই হতভাগ্যই এ বিপর্য্যয়ের মূলে। দিব্যেন্দুবাবুর ইচ্ছে করছে এখুনি পুলিসে খবর দিয়ে নীতীশকে গ্রেপ্তার করান। কিন্তু স্বয়ং বৌঠান বাধা! নইলে তিনি কী যে করতেন, কে জানে! কিন্তু আশাকে দেখতে হবে। ওর অসুখ হলে দিব্যেন্দুবাবুর চলবে না। আশা তাঁর স্নেহের একমাত্র অবলম্বন। চলতি গাড়ীখানা আবার ফিবিয়ে এনে তিনি আশাকে ডেকে বললেন,

—ওবেলা ভগবান-বুদ্ধ জন্মোৎসবে আমার নিমন্ত্রণ আছে, মা—তোকে নিয়ে যাব। পাঁচটা নাগাদ তৈরী থাকিস্।

—থাকবো, কাকাবাবু!

—একটু ভাল গয়না-কাপড় পরবি, বুঝলি? তুই অতবড় লোকের বাড়ীর বৌ—

আশা ক্ষীণ হাসলো, কোনো জবাব দিল না। দিব্যেন্দুবাবু চলে গেলেন।

—একটু-বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আয় মা,—নইলে অসুখ হয়ে যাবে!—মা বললেন।

আশা চুপ করেই রইল। বিকালে দিব্যেন্দুবাবু এসে ওকে নিয়ে গেলেন বুদ্ধ জন্মোৎসবে। আশা লালপাড় একখানা সুতীর শাদা শাড়ী পড়েছে। কান গলা আর হাতের মণিবন্ধে বারোমেসে গহনা-ক'টা। বিশেষ কোনো সাজই করেনি সে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবে ঐ শুভ্র-শাড়ীতে সজ্জিতা আশাকে যেন শ্বেতপদ্মের মতই সুন্দর দেখাচ্ছে! অতো অল্প সাজে অতো অপরূপ রূপ দেখা যায় না। শ্বেতপদ্ম অর্পণ করলো আশা ভগবান বুদ্ধের চরণমূলে। কিন্তু পিছিয়ে-পিছিয়ে ফিরে আসবার সময় সকলেই দেখলো তার আয়ত নয়ন অশ্রু-প্লাবিত! প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন জাগলো :

—কে মেয়েটি? কে এই অসামান্য ভক্তিমতী!

—ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের সঙ্গে এসেছেন। হয়তো ওঁর আত্মীয়া।

'আশা গান করবে' দিব্যেন্দুবাবু বলে রেখেছেন।

সে গাইতে লাগলো—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর..."

ওর কণ্ঠের সঙ্গীত জনমনকে অভিভূত করে দিল একেবারে। এমন আশ্চর্য্য কণ্ঠ কমই শোনা যায়। ওখানে একজন ছিলেন, যিনি গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করান। সভা শেষ হলে তিনি দিব্যেন্দুবাবুকে বললেন,

—ওঁর কণ্ঠ অপূর্ব। যদি দু-একখানা 'গান' রেকর্ড'' করান তো, ব্যবস্থা করতে পারি,

স্যার—আপনি একটু বলুন না!

—গান 'রকর্ড' করাবি রে মা?—আশাকে প্রশ্ন করলেন দিব্যেন্দুবাবু। আশা চুপ করে রয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু চান যে, আশা অন্য-কিছুতে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হোক। তাতে ওর মনের ভার অনেক লাঘব হবে। তাই আবার বললেন,

—দে-না, মা, দু-একখানা গান 'রেকর্ডে'। দিবি? আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে যাব—

—না, কাকাবাবু। আমার গান শুধু পুজোর জন্যে। ওকে বিক্রি করতে আদেশ করবেন না! যাঁর জন্য আমি গান শিখেছি, তিনি-ই আজও...আশার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল নামালো!

—থাক্ মা থাক্ থাক্! বুড়ো ছেলেকে তুই খুব শিক্ষা দিলি! আর কখনও একথা তোকে বলবো না আমি...আয়...

সবাই অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি বললেন,

—এমন কিন্নরকণ্ঠী উনি, স্যার...

দিব্যেন্দুবাবু কঠিন কণ্ঠে বললেন,

—ও কিন্নরী নয়, গৌরী! ও তপস্বিনী উমা!

আশাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। সবাই অবাক হয়ে গেল।

গাড়ী বাড়ী পৌঁছাতেই দিব্যেন্দুবাবু আশাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন,

—যা, মা—তুই বিশ্রাম করগে! বৌঠানের কাছে একটু বসি আমি।

আশা উপরে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তার উঠে-যাওয়া দেখলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

—এ মেয়ে অতি অসাধারণ, বৌঠান—ওকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো কি করে। আমার মনে হচ্ছে...কী যে মনে হচ্ছে, বৌঠান! ওঃ,...আশিস এতোটা বর্বর।

—আশিস আপনার-ই হাতে গড়া, ঠাকুরপো।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি। সে একটা মর্কট। একটা জাম্বুবান। একটা একটা যাচ্ছেতাই।—উত্তেজনায় কথা বেরুচ্ছে না ওঁর—

রাগে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো দিব্যেন্দুবাবুর।

—কিছু কারণ কি জানতে পারলেন, ঠাকুরপো? আশা কিছু বলেছে আপনাকে?

—না বৌঠান, না। ও কিছু বলবে না।—সিঁড়ির পানে তাকিয়ে বললেন,

—আশা আবার আড়ি পেতে নেই তো?

—না, ঠাকুরপো—ও সে-মেয়েই নয়। আদেশ অক্ষরে পালন করবে। ওকে যেতে বলা হয়েছে—কোন কারণেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

—হ্যাঁ, বৌঠান—আমার আবার ভুল হচ্ছিল ওর সম্বন্ধে।—হ্যাঁ, শুধু জানতে পারলাম, ওর সঙ্গে আশিসের কোনো কথাই হয়নি—

—কি করে জানলেন? আশা বলল আপনাকে?

—না। ওর আশ্চর্য্য কণ্ঠের গান শুনে সভার সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। রেকর্ডে গান দিতে অনুরোধ করলেন একজন। তাতে ও আমাকে বলল—'যার জন্য আমার গান শেখা, তাকেই আজও'...অর্থাৎ আশিস ওর একটা গান অবধি শোনেনি!—কথাটা আশা মনের আবেগে বলে ফেলেছে বৌঠান। কিন্তু ওতেই বোঝা যায় তার মনের অবস্থা কী সাংঘাতিক! কি এখন করা যায়, বৌঠান!

—আমি কি বলবো, ঠাকুরপো! আমার শুধু মনে হচ্ছে অত তাড়াতাড়ি কনে পছন্দ-করা আমার ভুল হয়েছে। আশিসের হয়তো ওকে মনে ধরেনি।

—মনে ধরেনি। 'হোয়াট ডু ইউ মীন টু সে? মনে ধরেনি। কী বলছেন আপনি! এ কি বাজারের 'আম' খরিদ, নাকি ওর বিজ্ঞানের বকযন্ত্র! একটা মানুষের জীবন-নিয়ে খেলা চলবে নাকি!

—তাই চলছে, ঠাকুরপো!

—চলতে দেওয়া হবে না, বৌঠান! আর কিছুদিন এভাবে চললে, আশা-মা শুকিয়ে ঝরে যাবে। একটা ফুটন্ত গোলাপ...না-না, বৌঠান, গোলাপ ও নয়। ও নিষ্কলক শ্বেত শতদল, অগাধ জলশায়ী, যার ধারে-পাশেও অগাছা জন্মাতে পারে না। একটু থেমে বললেন,—আশিসকে আমি ক্ষমা করতে পারছিনে, বৌঠান!

—করবেন না! তাকে শাস্তি দিন আপনি। কিন্তু কেন এমন হোল, তা তো জানা দরকার, ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ, সেই কথাই ভাবছি। 'থিসিস্-চুরি' আশিসের বাড়ী থেকে পালানোর কারণ হতে পারে না, বৌঠান! বোম্বাই তার না-গেলে চলতো। মাদ্রাজে তার কোনো কাজ নেই। আমাকে আবার লিখেছে, মাদ্রাজ থেকে সে নাকি কন্যাকুমারীর দিকে যেতে চায়।

—সে কি, ঠাকুরপো! আমাকে তো ওসব লেখেনি?

—লিখবে হয়তো পরে। কিন্তু এভাবে তার পালিয়ে-বেড়ানোর মূলে অন্য কিছু নেই। আশাকে নিয়েই কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী, ঠাকুরপো!—মা সাগ্রহে চেয়ে আছেন উত্তরের জন্য।

—কালিচরণকে প্রশ্ন করে আমি জেনেছি বৌঠান, থিসিস্-চুরির দিন সন্ধ্যায় নীতীশ এসেছিল ল্যাবলেটরীতে একা—আশা তখন ছিল ওখানে। হয়তো আশা কথা বলেছে নীতীশের সঙ্গে।

—যদি বলে থাকে তো, কী ক্ষতি হয়েছে, ঠাকুরপো! নীতীশ তো ছেলের মতই ছিল—আশা তাকে কোনো-কিছু বলে থাকতে পারে—

—না। আমি আশাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সে নীতীশকে চেনে না। আশা মিথ্যে বলবে, আমি বিশ্বাস করি না, বৌঠান! আমার অন্য সন্দেহ জাগছে মনে।

—কী, ঠাকুরপো...

ডাঃ দিব্যেন্দু চুপ করে আছেন। ঘরে একটামাত্র আলো যেন অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে চোখে তাঁদের। মা বললেন,

—কী সন্দেহ, ঠাকুরপো? বলুন। এখানে অন্য কেউ নেই। বলুন!

—আশাকেও আমি প্রশ্ন করেছি, পার্টির দিনে সে কেন যায়নি, কোথায় ছিল সে তখন? আশা বলল, পার্টির খবর সে জানতো না। পরে শুনেছে। ঐদিন সন্ধ্যায় আশিস ল্যাবলেটরীতে এসে সেফ্ খুলছিল। আশা ছিল আলমারীর পাশে লুকিয়ে। সেফ্ থেকে একটা চামড়ার কেস্ বের করে টেবিল রেখে আশিস সেফ্ বন্ধ করে। কিন্তু যাবার সময় কেস্টা নিতে ভুলে যায়। আশা তখন ওকে ডেকে কেস্টি দেয় 'আশিস'-এর হাতে।

—এতে কী প্রমাণ হয়, ঠাকুরপো?

-প্রমাণ হয় যে, আশিস ল্যাবরেটরীতে আসেনি। এসেছিল নীতীশ। সেফ খেলার

পর আশাকে দেখে সে ভয় পেয়ে কেস্‌টা ফেলেই পালাচ্ছিল। কিন্তু আশা তাকে 'আশিস' ভেবে ডেকে সেটা দিয়েছে। আর আমার বিশ্বাস সেইটি-ই থিসিস্‌।

মা হাঁ করে চেয়ে আছেন ডাঃ দিব্যেন্দুবাবুর দিকে। বেশ দু-এক মিনিট কেটে গেল। দিব্যেন্দুবাবুই বললেন,

—আশিসের মনে আশার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ জেগেছে, বৌঠান!

—অ্যাঁ! বলেন কি, ঠাকুরপো! মা যেন আঁৎকে উঠলেন।

—হ্যাঁ, আশিস আর মানুষ নেই। সে একটা জানোয়ার, একটা 'ভিলেন'—একটা 'রাক্ষস'!—উঠে দাঁড়ালেন দিব্যেন্দুবাবু।

—কি এখন করবেন তাহলে!

—মুস্কিল, বৌঠান! ওর মনের যা অবস্থা এখন, আমাদের কারও কথা সে বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমরা আশাকে ভালবাসি তাই এসব সাজিয়ে বলছি। ওর নিশ্চিত ধারণা, আশা নীতীশের সঙ্গে যোগাযোগ করেই থিসিস্‌খানা তাকে দিয়েছে...

—আমার কথাও বিশ্বাস করবে না, মনে হয়?

—না-করতেও পারে। পত্নীর চরিত্র যার অবিশ্বাস হয়, বৌঠান, সে আর মানুষ থাকে না, সে হয় তখন রাক্ষস!

—আপনি কি সব-কথা তাকে লিখে জানাবেন, ঠাকুরপো!

—না। আমি ওকে বাড়ী আসতেই লিখবো। আপনিও শুধু বাড়ী ফিরতে লিখবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু দিবেন্দুবাবু আশার অন্য দিকটাই ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর ভুল হচ্ছে না তো আশা-সম্বন্ধে! সত্যিই কি তার স্বামিনিষ্ঠা অতখানি অদ্ভুত! অত বেশী যুগাতীত! অত অসম্ভব রকম অবাস্তব! এ যুগে তো এরকম কোথাও দেখা যায় না! তবে কি কোথায় ভুল হচ্ছে তাঁর? আশা কি সত্যি ওরকম নয়!...বেশ খানিক চিন্তা করতে করতে নিজের বাড়ী পৌঁছালেন তিনি। ভাবছেন-ই...

আশার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশত তিনি ভুলও তো করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভুল হওয়া চলে না। তাঁকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। ডাঃ দিব্যেন্দু রায় ঘটনাটা অন্যদিক থেকে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন :

নীতীশ এসেছিল চুরির দিন সন্ধ্যায়। চুরি করতেই সে এসেছিল, কিন্তু আশা কেন সেইদিন-ই গেল ওখানে! আর তো সে কোনদিন যায়নি। অপরকে কেউ নিজের স্বামী বলে ভুল করতে পারে না। আশা অতখানি ছেলেমানুষ নয়। প্রায় কুড়ি-বছর তার বয়স! নীতীশের হাতে সে থিসিস্‌টা স্বহস্তে তুলে দিয়েছে, দেখেছে কালিচরণ। কিন্তু আশা বললো যে, নীতীশকে চেনে না। মিথ্যে বলেছে আশা। নীতীশকে না-চিনতে পারে, আশিসকে সে নিশ্চয় চিনবে। চেনা তার উচিত। আশা নীতীশকে শুধু চেনে না নয়, ভালই চেনে। ভালবাসে তাকে। আশা ইচ্ছে করেই নীতীশকে সাহায্য করেছে থিসিস্‌ চুরি করতে। স্বামী-নিষ্ঠার অতখানি বাড়াবাড়ি দেখানোর মধ্যে 'অভিনয়' ছাড়া অন্য কিছু নেই, এমনও তো হোতে পারে।...

হঠাৎ একটা চিন্তা মনে আসতেই দিব্যেন্দুবাবু ফোন-এর ডায়াল ঘুরিয়ে ডাকলেন কালিচরণকে। সে সাড়া দিলে শুধুলেন,

—চুরির দিন, আশা চলে-যাওয়ার পর আশিসের, শোবার-ঘরটা কী অবস্থায় ছিল,

কালিচরণ? ঠিক ঠিক মনে করে জবাব দাও।

—এজ্ঞে, বইগুলো গুছান ছিল না। বিছানা ভাল করে পাতা ছিল, আর মেঝেতে—

—কী ছিল মেঝেতে?

—এজ্ঞে—ফুল ছড়ানো ছিল মেঝেতে, আর বিছানাতেও। আমি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম।

—কতগুলো ফুল ছিল?

—এজ্ঞে, তা অনেক।

—হুঁ, আচ্ছা। হয়েছে।—ফোন ছেড়ে দিলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

স্ত্রীয়াচ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং...ভাবতে লাগলেন তিনি। কঠোর নীতিমান চিরব্রহ্মচারী ডাঃ দিব্যেন্দুর মুখখানা ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। দ্রুত একপাক ঘুরে এলেন তিনি বারান্দায়। পরিচারক খাবার তৈরী করে অপেক্ষা করছে—দিবোন্দুবাবু তাকালেন না। ভাবতে লাগলেন, অতটুকু একটা মেয়ে ডাঃ দিবেন্দুকে এমন করে ঠকিয়ে দিল! ওঃ...আশিস যখন এসেছিল তখন অনেক রাত। আশা তখন ছিল না। তাহলে ফুল কার জন্য? নিশ্চয় নীতীশের জন্য! কিন্তু আশার চোখ-মুখের অবস্থা? তার শীর্ণ-শুষ্ক আকৃতি? নিশ্চয় নীতীশের জন্যই! নীতীশকে তো সে আর পাচ্ছে না! নীতীশের বিপদের কথা ভেবে, এবং তার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভেবেও তো সে শুকিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তার প্রতিটি কথা...ও-সব ভণ্ডামী। ওগুলো অভিনয়!...

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠলেন ডাঃ দিবোন্দু। আশিস তাঁর হাতে গড়া ছেলে—অকারণ সে পত্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করবে না, অবহেলা করবে না! নিশ্চয় সে আরো বেশী কিছু জেনেছে, যা দিব্যেন্দুবাবু এখনও জানতে পারেননি।...

ভুল হয়েছে বৌঠানের। অমন আকস্মিকভাবে তাঁর বধূ-নির্বাচন-করা অন্যায় হয়েছে। আশিসের জীবনটাই এখন জ্বালাময় হয়ে উঠলো! ওঃ কী শয়তান মানুষ ঐ নীতীশ আর আশা! না. এ তিনি সহ্য করবেন না! আশাকে ওখানে, ওবাড়িতে রাখাই উচিত হবে না আর...

বৌঠান হয়তো বিশ্বাস-ই করতে চাইবেন না যে, আশার স্বামী-নিষ্ঠা আগাগোড়া অভিনয়। কিন্তু বৌঠানকে বোঝাতে হবে...

একটা অসতী মেয়ে ঘরে রেখে আশিসের জীবন যন্ত্রণাময় শুধু নয়, বিপন্ন করা চলবে না!...ভাবলেন ডাঃ দিব্যেন্দু! অতখানি সতীপনা আবার থাকে নাকি কোনো মেয়ের? অসম্ভব! ঐ বাড়াবাড়ি দেখে গোড়াতেই সন্দেহ করা উচিত ছিল তাঁর। মেয়েটার আশ্চর্য্য অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আশার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রমাণ—তার ঐদিনই ল্যাবরেটরীতে আসা। প্রকাণ্ডতর প্রমাণ, থিসিস্‌টা হাতে করে নীতীশকে দেওয়া। প্রকাণ্ডতম হচ্ছে 'ঐ ফুল'! নীতীশের সঙ্গে বসে সে...কথাটা আর ভাবলেন না ডাঃ দিব্যেন্দু। আর কোনো সন্দেহ নেই আশার চারিত্রিক পতন সম্বন্ধে। বৌঠানকে সব কথা বলে বুঝিয়ে তিনি আশাকে বিদায় করে দেবেন বাপের বাড়ী!

* * *

পরদিন সকালে আশা ল্যাবরেটরিতে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে...ডাঃ দিব্যেন্দু এলেন না। আশা অবশেষে ফোন করলো। একজন চাকরকে দিয়ে ডাঃ দিব্যেন্দু বলালেন,

—'বলে দাও, খুব ব্যস্ত আছি, যেতে পারবে না।'

কথাটা মিথ্যে হবে, কিন্তু মিথ্যে তিনি বলেন না, তাই ডাঃ দিব্যেন্দু সত্যিই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনটা 'অভিনয়' মনে করেছে আশিস। দিন-রাত ওর প্রায় অশান্তিতে কাটে। বোম্বাই থেকে মাদ্রাজে এল—ঘুরলো কয়েক দিন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দিরের অপরূপত্ব ওকে তিলমাত্র শান্তি দিল না। ধনুষ্কোটি সেতুবন্ধ, কন্যাকুমারী ঘুরে শেষে আশিস আবার ফিরে এল বোম্বাই-এ। কোথাও সে দু'দিনের বেশী অবস্থান করেনি, অতএব বাড়ীর চিঠিও পায়নি। কিন্তু বোম্বাই-এর হোটেলের পৌঁছে দেখলো পাঁচখানা চিঠি জমা আছে। মার তিনখানা, দিব্যেন্দুবাবুর একখানা, আর অন্য একখানা চন্দ্রিমা দেবীর—দিল্লী থেকে লিখেছে। লিখেছে, আশিস যেন দিল্লী পৌঁছেই দেখা করে ওর সঙ্গে।

বিছানায় নিঃশব্দে পড়ে রইল আশিস। মার পত্রের কথাই ভাবছে—মা অবিলম্বে বাড়ী ফিরতে লিখেছেন। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু লিখেছেন অন্য রকম। তাঁর এবারকার চিঠিতে আশার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তিনি লিখেছেন, আশিস বোম্বাই বা বাঙ্গালোর যেখানেই হোক কিছু গবেষণা করুক। সে যেন বসে না থাকে। যেটা চুরি গেল, তা নিয়ে আর চিন্তা করার আবশ্যক নেই। চিঠিতে গবেষণার একটা বিষয় সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছেন, আশিস ভেবে দেখতে পারে। বাড়ীর সংবাদে লিখেছেন—তিনি প্রায় খবর নেন ; বৌঠানেরা ভাল আছেন।

আশিস ভাবতে লাগলো—এর আগের পত্রে আশার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখা কাকাবাবুর চিঠির সঙ্গে এই চিঠিখানার এতোই বিস্ময়কর প্রভেদ যে, চিন্তা না করে পারা যায় না! আশা হয়তো বাপের বাড়ী গেছে। কিন্তু মা লিখেছেন আশা তাঁর কাছেই আছে। তবে কাকাবাবু আশার বিষয় কিছুই লিখলেন না কেন এ পত্রে! তবে কি কাকাবাবু আশার অভিনয় নৈপুণ্য ধরতে পেরেছেন? হয়তো পেরেছেন? কারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তিনি! আর আশিস জানে কাকাবাবুর নৈতিক জ্ঞান প্রবাদবাক্যের মতো টনটনে। সে জ্ঞান পোড়া হাঁড়ির মতো বাজে। মাও টের পাবেন। দেরী নেই! বেশিদিন ওসব মেয়ে অভিনয় ঠাট বজায় রাখতে আর পারবে না।...

কিন্তু আশিস এখন করবে কি! বোম্বাইয়ে থাকবে নাকি? অথবা আর কোথাও গিয়ে কিছুকাল বাস করবে?—ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না।

পরদিন সকালে ডাঃ চিন্তামন-এর সঙ্গে দেখা করলো আশিস। তিনি বললেন যে, বোম্বাই অথবা বাঙ্গালোরের জন্য কিছু করা সম্ভব হোল না। দিল্লীতে নতুন একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে অণুবিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য। আশিস যদি রাজি হয়, তিনি ওকে নেবার জন্য ওখানকার অধিকর্তা এবং ডাঃ চিন্তামন-এর বন্ধু ডাঃ সীতানাথকে চিঠি লিখে দেবেন।

আশিস অগত্যা রাজী হোল দিল্লী যেতে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নানা-বিষয়ক 'গবেষণা'-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লীর এই গবেষণাগারটি সেই নব প্রতিষ্ঠিতগুলির অন্যতম। এখনও এটা সাধারণ্যে বিশেষ নাম করতে পারেনি। নতুন একটা গবেষণাগারে প্রথম থেকে থাকলে হয়তো অনেক সুবিধে

হবে; কিন্তু ওর অসুবিধাটাও প্রচুর। বোম্বাই-এর কাছে ট্রম্বেতে যে পরমাণু চুল্লী হচ্ছে, সেখানেই থাকতে পারলে সুবিধা হোত আশিসের। অন্তত বাঙ্গালোর ইন্‌স্টিটিউট অব সায়ান্স'-এ যেতে পারলেও বেঁচে যেতো। কিন্তু হোল না। বিধাতা ওকে চন্দ্রিমা দেবীর খপ্পরে ফেললেন। দিল্লীর এই গবেষণাগার শেষ পর্য্যন্ত কতখানি কি হবে, এখনও জানা নেই। যন্ত্রপাতি মাত্র আসতে আরম্ভ করেছে। কাজ সামান্যই হচ্ছে। তবু আশিসকে ডাঃ চিন্তামন এখানেই পাঠালেন।

ডাঃ সীতনাথ আশিসকে গ্রহণ করলেন।

আশিস ঠিক করলো কিছুতেই চন্দ্রিমা দেবীদের সঙ্গে দেখা করবে না। আগে সে জেনেছিল চন্দ্রিমা দেবীর ঠিকানা। সে-ঠিকানা থেকে যতটা সম্ভব দূরে নিজের বাসা করলো আশিস। পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত রইল। নব-নির্মিত গবেষণা-মন্দিরে ওর কাজ ঠিকমত চলছে না। কিন্তু যায় কোথায়? নিজের বাড়ী যাবার পথ বন্ধ! সেখানে আশা আছে। বিদেশে যাবার উপায় নেই ; মা ছাড়বেন না। বোম্বাই বা বাঙ্গালোরে সে চান্স পেল না! দিল্লীতে তার মনের-মতো কিছু না-পেলেও, কিছু একটা করবার মতো যোগাড় হয়েছে—আপাতত কিছুদিন সে এখানে কাটাবে। কারণ বেকার বসে থাকলে তার অবস্থা আর মানুষের মতো থাকবে না। অতঃপর সে ডাঃ দিব্যেন্দু এবং মাকে জানিয়ে দিল যে—সে দিল্লীতে রয়েছে, ভালই আছে। দু-একমাস পড়ে বাড়ী ফিরবে।

ডাঃ দিব্যেন্দু খবরটা পেয়ে খুসী হতে পারলেন না। কারণ দিল্লীতে গবেষণাসংক্রান্ত কাজ কেমন হচ্ছে, জানা নেই তাঁর। কিন্তু আশিস বাড়ী এসে মনমেজাজ খারাপ করে অসুস্থ হোক, এটাও চান না তিনি। থাক্ এখন মাসকতক!—ভেবে তিনি আশিসকে লিখে দিলেন আপাতত ওখানেই থাকতে।

আছে আশিস দিল্লীতে। নিতান্ত দরকার না-হলে বের হয় না। বই পড়ে, না-হয় যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালায় নিজের ঘরে। কিন্তু ভগবান যার প্রতি বিরূপ তার আর আশ্রয় কোথায়! সেদিন নিতান্ত দায়ে পড়ে আশিস দরজীর দোকানে গেছে স্যুট-তৈরীর অর্ডার দিতে। না গিয়ে উপায় ছিল না। ওখানে ধরলো তাকে নন্দিতা! সে তার মায়ের সঙ্গে এসেছিল পোষাকের মাপ দিতে। দেখেই চিনে ফেললো।

—মেসো-মশাই!

'কী জ্বালা।'...আশিস মুখ লুকিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু নন্দিতা ধরলো এসে। রাস্তায় গাড়ীতে স্বয়ং ওর মা চন্দ্রিমা দেবী। ওঁরা কাজ শেষ করে ফিরছিলো। আশিস আর একমিনিট পরে গেলে কোনো গোল হোত না, এখন আর উপায় নেই।

—চলো কোথায় থাকো আগে দেখে আসি। পলাতক কোথাকার।...

—বড় ব্যস্ত আছি, বড়দি।

—রাখো তোমার ব্যস্ততা। ওঠো গাড়ীতে।—নন্দা, ধর তো, টেনে তোল ওকে।

অতঃপর আর উপায় রইল না। পোষাকের মাপ দিয়ে আশিসকে যেতে হোল চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে।

নিজের অদৃষ্টকে নিন্দে করা আশার স্বভাব নয়, তার বিশ্বাস ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুর সেদিনের ব্যবহারটা আশা বুঝতে পারছে না। তিনি চাকর দিয়ে বলে দিলেন

ব্যস্ত আছেন, আসতে পারবেন না। বেশ—কিন্তু রোজই কি ব্যস্ত। তারপর প্রায় হপ্তাখানেক কাটলো, দিব্যেন্দুবাবু তো এলেন না আশাকে পড়াতে। ব্যাপার কি? কেন এমন হচ্ছে। সবাই যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আশার কাছ থেকে, আশার স্নেহ-পরিধি থেকে। এখনও আছেন মা—কিন্তু কে জানে, কবে তিনিও সরে যাবেন। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে।

আশা বেশ বুঝতে পারে, তার আসার পর এ বাড়ীতে একটা বড়রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে। কিন্তু কী সেটা, কেউ ওকে বলে না। সকলেই—মা, কাকাবাবু, কালিচরণ, ঝি'রা—সকলেই সতর্কভাবে এড়িয়ে যায় ওকে। এতেই বোঝা যায় ঘটনাটা আশাকে নিয়েই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘটনা, তাকেই কিছু জানানো হচ্ছে না—এ কেমন ব্যাপার? আশিস তাকে পছন্দ করেনি, এইটাই বেশী করে মনে হয় আশার। তা ছাড়া অপর কোনো কারণও খুঁজে পায় না। কিন্তু তাতে কাকাবাবুর মতো প্রবীণ ব্যক্তিও আশাকে মনকষ্ট দেবেন! না। অন্য কোনো কারণ আছে, এবং সে কারণ নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক।

কাকাবাবু গত পরশু এসেছিলেন ; সকালে নয় ; দুপুরে। মার সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা কথা বললেন চুপি চুপি। আশ্চর্য্য যে, আশাকে একবার ডাকলেনও না! উনি চলে গেলে মা অবশ্য আশাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি সংসারের কাজের কথা ছাড়া কিছুই বললেন না আর।...চিন্তা করতে করতে আশা অস্থির হয়ে উঠলো। ওর মনে হতে লাগলো মার পায়ে ধরে সে প্রশ্ন করবে—'কী সে করেছে কী তার অপরাধ।'

হঠাৎ আশার মনে হোল, তার বাবা কি কোনো যৌতুক দিতে অক্ষম হয়েছেন বলে এদের আক্রোশ। না, তাহলে মা বলতেন। আর আশা জানে বাবা সবই ঠিক-ঠিক দিয়েছেন। আর এঁরা এত বড়লোক যে, কারও দেওয়া গ্রাহ্যও করেন না।

কী মনঃকষ্টে যে আশার দিন কাটছে, তার অন্তরাত্মাই জানে! অবশেষে সে আজ মাকে বলে ফেললো,

—আমাকে আপনারা কিছু-একটা লুকোচ্ছেন, মা! আপনি আর কাকাবাবু। কী সে কথা? কেন লুকোচ্ছেন? আমাকে বলুন! নইলে আমি মরে যাব—

—না, মা ষাট্! মরে যাবি কেন! একটু থেমে বললেন, আশিস এতোকাল পরিশ্রম করে যে থিসিস্‌টা লিখেছিল সেটা চুরি হয়ে গেছে!—মা কঠিন হয়ে তাকালেন ওর পানে।

—চুরি!—পাংশুমুখে আশা বলল,—কখন চুরি হোল, মা—কোথায় চুরি হোল?

—ঐ ল্যাবরেটরীতে। পার্টির দিন সন্ধ্যাবেলা। তুই যেদিন ওখানে গিয়েছিলি। ঠাকুরপো বলছেন, তুই ওটা চুরি করে কাউকে দিয়েছিস...

—আমি! মা,...মা...বসে পড়লো আশা মাটিতে।

—হ্যাঁ, তুই দিয়েছিস্! কাকে দিয়েছিস বল, আশা? যদি সত্যি বলিস, আমি তোর সব অপরাধ মাফ করবো। বল! ভয় নেই—

আশার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। সে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কিন্তু মা এবার কঠিন কণ্ঠে বললেন,

—তোকে অতখানি বিশ্বাস করা আমার ভুল হয়েছিল আশা—মা চলে গেলেন। আশা পাথরের মতো বসে রইল পাথরের মেঝেতে! নির্বাক নিস্পন্দ ওর দেহ। নিমেষহীন ওর চোখ 'দেবমূর্তির' পানে চেয়ে আছে।

মা বাইরে এসে দেখলেন ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়ি থেকে নামছেন। মার অনুরোধ মতো তিনি

আজ আশাকে পড়াতে এসেছেন। মা সংক্ষেপে আশার সঙ্গে তাঁর এখুনি যে-কথা হোল, জানালেন দিব্যেন্দুবাবুকে। শুনে তিনি প্রশ্ন করলেন,

—এখন আপনার কি মনে হচ্ছে, বৌঠান?

—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, ঠাকুরপো ; যে আশা চোর, আশা অসচ্চরিত্রা।...না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।

—আপনি ভুল করছেন, বৌঠান! ওর সমস্তটা অভিনয়। আশিসও আমাকে লিখেছে সেই কথা! আপনি আদেশ করেছেন তাই আমি আজ পড়াতে এসেছি, নইলে ওর মুখ দেখতাম না আমি! চলুন তো দেখি, সে কোথায়।

দুজনে এলেন পূজার ঘরে। আশা তেমনি নিস্পন্দ যেন প্রস্তর-প্রতিমা। চোখের দৃষ্টি স্থির—অনড়!

—আশা! আশা! আশা...সজোরে ডাকলেন মা,—আ-শা...

আশা নড়ে উঠলো। মূর্তির পানে চেয়ে হাতজোড় করে রইল দু-সেকেন্ড, তার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো মূর্তিকে।

দিব্যেন্দুবাবু ব্যঙ্গহাসি হাসছেন মার দিকে তাকিয়ে।

নাগিনীর মতো উঠে দাঁড়ালেন আশা। ভিজে চুলগুলো একবার এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেল ওর। সতেজ কণ্ঠে বলল,

—আপনার ছেলেকে ছাড়া ও-কথার জবাব আর কাউকে দেওয়া যায় না, মা! তাকে ডাকুন, আমি জবাব দেব! ইচ্ছে করলে আপনি ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ও সেখানে থাকতে পারবেন,...চলে যাচ্ছিল, কিন্তু থামলো অকস্মাৎ। বলল,—আর শুনুন, মা! যতদিন আমার এই কলঙ্ক মোচন না হবে, আমি আপনার পূজার ঘরে ঢুকবো না।

চলে যাচ্ছে আশা, মা তাড়াতাড়ি বললেন,

—তোর কাকাবাবু তোকে পড়াতে এসেছেন, মা!

—ওঁকে বলে দিন, আমাকে পড়াবার ওঁর আর কোনো অধিকার নেই।

চলে গেল। ঘরে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল অকস্মাৎ! ডাঃ রায় স্তম্ভিতবৎ কিছুক্ষণ থেমে বললেন,—

—একি মেয়ে, বৌঠান! একি মেয়ে!

—এতবড় 'জোর যার মনে' সে দক্ষ-দুহিতা সতী! ঠাকুরপো, আপনারা নিদারুণ ভুল করেছেন...

মার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল অকস্মাৎ। বললেন আবার,—কালিচরণ খুব বিশ্বাসী, ঠাকুরপো—কিন্তু তারও তো ভুল না হলেও নীতীশ কী অবস্থায় ওটা আশার কাছ থেকে নিয়েছে, কালিচরণ জানে না। চাকরের কথার ওপর নির্ভর করে এক সতীর চরিত্রে কলঙ্ক!—ঠাকুরপো, আমি সহ্য করতে পারছি না! আপনারা কী করলেন, ঠাকুরপো।...

ডাঃ দিব্যেন্দু নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন!

সকাল। প্রতি সকাল-ই বিস্বাদ লাগে ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের কাছে। অথচ মাসখানের আগে তিনি প্রতিদিন এই সকালটির জন্য অপেক্ষা করতেন—আশাকে পড়াতে যেতেন। জীবনের প্রথম দিকে পড়া বিজ্ঞানের সূত্রগুলো আর একবার ঝালাতে হয়েছিল তাঁকে। যথাসম্ভব সহজ করে তাকে বোঝাবার ভাষাও খুঁজতে হয়েছিল—কিন্তু কী আনন্দই না ছিল সেই

জটিল বিজ্ঞানকে সহজ ভাষায় বলার মধ্যে!

মাসাধিক হয়ে গেল, আশা আর পড়ে না তাঁর কাছে। পড়ে না। পড়বে না। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ডাঃ দিব্যেন্দুর আর তাকে পড়াবার অধিকার নেই। কী ক্ষুরধার সে ভাষা—কী মর্ম কঠিন সে মুখ। কিছুতেই ভুলতে পারছেন না ডাঃ দিব্যেন্দু রায়। মনে হল পাথরের এক প্রতিমা যেন অভিশাপ দিয়ে উঠলো অকস্মাৎ! প্রতি সকালে সে-অভিশাপ স্মরণ করে উনি। মানুষ যেমন ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে, ঠিক তেমনি।

কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি গত রাত্রি থেকে ; কারণ অন্য কিছু নয়—বৌঠান গত সন্ধ্যায় ফোন করে বলেছেন যে ; আশার অবস্থা দেখে তিনি অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সে কঠিন হতে কঠিনতর পাথর হয়ে উঠছে দিন দিন। হাসে না, কান্নাও ভুলে গেছে। সে যেন একটা কলের পুতুল—নির্দিষ্ট কাজগুলি নির্দিষ্ট ভাবে করে যায় রোজ। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু প্রাণ নেই, নেই কিছুমাত্র আবেগ বা উদ্বেগ। যেন যন্ত্র!

কথাটা শোনার পর থেকে ডাঃ দিব্যেন্দু আর স্থির হতে পারছেন না। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে আশার এই অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। তাঁর প্রথম চিন্তাধারাই হয়তো ঠিক ছিল, বিপরীত চিন্তা করে তিনি এমন সাংঘাতিক ভুল করলেন—যে আশাকে অসচ্চরিত্রা ভাবতে দ্বিধা করলেন না। আশার বিষয় আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করা তাঁর উচিত ছিল।

আশাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে তাঁর। গাড়ী আনতে বললেন। তারপর সকালে যেমন আসতেন আশাকে পড়াতে, তেমনি খান দুই বই হাতে বেরিয়ে এলেন—এসে পৌঁছালেন বৌঠানের কাছে। আশাও ছিল, কিন্তু ডাঃ দিব্যেন্দুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেই সে চলে গেল ওপরে।

—আশা চলে গেল কেন, বৌঠান? আমার উপর রেগে আছে।

না। রাগলে তো বেঁচে যেতাম, ঠাকুরপো! রাগ করে না—কিছুই করে না! সব সময় পুতুলের মতো উদাস-চোখে চেয়ে থাকে। না হাসি, না-বা কান্না!

—ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন, বৌঠান।

—যাবে না। আমি যেতে বলায় বলল—'আপনার চরণ ছেড়ে, আমাকে যদি কোথাও যেতে হয়, মা, তো—আপনার ছেলের কাছে, না-হয় পৃথিবী ছেড়ে! এ ছাড়া যাবার আমার জায়গা নেই!

—ঠাকুর-ঘরে ঢোকে না?

—না! আমি ডেকেছিলাম—আয় মা, ভেতরে আয়! তা বলল—আমি ভিক্ষা চাইছি মা, আমাকে দিয়ে আপনার আদেশের অসম্মান যেন না করান। আমি যাব না পূজার ঘরে! আপনার ঠাকুর যদি সত্যি হন তো তিনি বুঝবেন, কেন আমি যাব না।

—এ কি অসাধারণ মেয়ে, বৌঠান।—বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন ডাঃ রায়।—

—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, ঠাকুরপো—কোন্ দিন জীবন নিয়ে কিছু না-করে বসে! ও-বয়সের মেয়েদের জানেন তো—আত্মহত্যা করা ওদের খেলা!

—হ্যাঁ, বৌঠান, আপনার কথা খুবই সত্যি। ওকে কাছে কাছে রাখুন।

...থাকে। ছায়ার মতো আমার কাছে থাকে সব সময়। আমি পূজার ঘরে ঢুকলে বাইরে বসে থাকে। প্রসাদ দিলে হাত পেতে নেয় ; যেন কলের পুতুল। গানের যন্ত্রগুলোতে ধুলো জমেছে। রেডিওর চাবি খোলে না, মাসিক-পত্রের মোড়ক খোলে না—আলমারির ডালাও

খোলে না কাপড়-জামা বার করতে। ঐ খান-তিন চার সুতীর শাড়ী-ব্লাউজ এই এক-দেড়-মাস ধরে প'রে চলেছে। বললে বলে 'আমি ভিক্ষা চাইছি মা, আমাকে আদেশ করবেন না!'

—ল্যাবরেচরিতে যায় না?

—যায়। ঠিক যেমন যেত। যন্ত্রগুলো তেমনি করে ঝাড়ে-মোছে। ওর শ্বশুরের ফটোতে মালা পরায়—প্রণাম করে চলে আসে। ঐ একটু যা সময় আমার কাছ-ছাড়া হয় ও।

—শোয় কোথায়?

—আমার কাছে। আমার বড় পালঙ্কের পা-তলে গুটিয়ে শুয়ে থাকে। এমন আশ্চর্য্য মেয়ে আমি দেখিনি, ঠাকুরপো! শুনিনি কখনও।

ডাঃ দিব্যেন্দু নিঃশব্দে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন,

—আমার সঙ্গে কি ও দেখা করতে চায় না, বৌঠান?

—না। আমি বলেছিলাম, পড়া বন্ধ করলি কেন? তার জবাবে বলল, মা একটু থামলেন, তারপর বললেন—পরিষ্কার কণ্ঠে বলল,

'গুরুর প্রতি শিষ্যার আর শিষ্যার প্রতি গুরুর শ্রদ্ধা আর স্নেহ থাকা দরকার, মা। আমাদের পরস্পরের প্রতি সেটা আর নেই। উনি তো মাইনে নিয়ে পড়াতেন না, স্নেহ করে পড়াতেন। সে স্নেহের দাবী মুছে গেছে। উনি পরিবারের হিতৈষী—আমার স্বামীর গুরু। দূর থেকে ওঁকে প্রণাম জানাই।'...

—হুঁ—মেয়েটা ভুল করে এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে, বৌঠান। কিন্তু কিছু উপায় তো একটা করতে হবে? আশিস লিখেছে সে এখন বাড়ী আসতে পারবে না। অর্থাৎ ইচ্ছে করেই সে আসবে না।

—হ্যাঁ, আমিও লিখেছিলাম।—মা বললেন—তাতে আশিস লিখেছে, বড় রকম কী একটা বিষয়ে সে গবেষণা করছে ওখানে। সময় নেই এখন। হয়তো বিলাত পর্যন্ত যেতে হবে তাকে। আমার খুবই ভয় করছে, ঠাকুরপো। কিভাবে ওদের মিলন ঘটাতে পারবো, ভেবে পাচ্ছি না।

—বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যোগ দিতে আমি দিল্লী যাব, বৌঠান। আশাকে শুধোন তো, সে আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছে কিনা?

—আমার সঙ্গে ছাড়া সে কোথাও যেতে চায় না, ঠাকুরপো। সেদিন ওর বাবা এসে বললেন, তাঁরা পুরী যাবেন রথ দেখতে—আশা যদি যেতে চায় তো চলুক। ও বাবাকে জবাব দিল—'পুরী' পরমার্থ সব আমার এখানে, বাবা! আমি কোথাও যাব না। তোমরা যাও।'

—ওর সম্বন্ধে আমি সত্যিই কদর্য্য ভুল করেছি, বৌঠান!

ডাঃ দিব্যেন্দুর গলার স্বর ধরে এল।

একটু থেমে বললেন,—আশিস যখন বাড়ী ফিরছে না—তখন যেভাবে হোক আশাকে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। ও যদি আমার সঙ্গে যেতে না চায়, তাহলে আপনাকেও যেতে হবে।

—হ্যাঁ, আমিও যাব। কারণ ওকে আমি একা ছাড়তে ভয় করি।—মা বললেন।

—ওকে বলুন তো, আপনি গেলে সে যেতে রাজী আছে কিনা?

—যাবে। আশাকে আমি ডাকছি।—মা ঝিকে বললেন আশাকে ডাকবার জন্য।

আশা এখান থেকে গিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাবরেটরীর দিকে মুখ করে। নিশ্চল প্রতিমার মতো অনড়! দূর থেকে মনে হয় একটা স্ট্যাচু সাজানো রয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলেন ডাঃ দিব্যেন্দু এখান থেকেই।

আশা ভাবছিল...আজ আবার ডাঃ দিব্যেন্দু এসেছেন। কে জানে কী পরামর্শ করেছেন তিনি মার সঙ্গে। কিন্তু জানবারও ইচ্ছে নেই আশার। সে জানে সে নিরপরাধ। তার নিশ্চিত ধারণা আশিস স্বয়ং থিসিস্‌খানা তার হাত থেকে নিয়েছে। ঐ চামড়ার কেস্‌টাই থিসিস্ নিশ্চয়। কিন্তু কেন আশিস সেটা হাতে নিয়ে এখন অস্বীকার করছে, বুঝতে পারছে না আশা। আশিস ভুলে গিয়েছিল—আশা তাকে ডেকে 'ওটা' দিয়েছিল। আশার সঙ্গে অতি অল্প কথাই বলেছিল আশিস। কিন্তু যতটুকু বলেছিল—কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আশার। ছুঁতে এসেছিল, ছোঁয়নি! কথাও বলেছিল—'আজ সে দেখা করবে'। তারপর ধন্যবাদ দিয়েছিল যাবার সময়। এত ব্যাপক এমন করে অস্বীকার করার অর্থ কি? আশিস কি অপর কোনো মেয়েকে ভালবাসে! তাই আশার নামে চুরির বদনাম জড়িয়ে তাকে এ-বাড়ী থেকে বিদায় করতে চায়? অথবা আশিসের অপর কোনো উদ্দেশ্য আছে, তাকে এভাবে বিপন্ন করার মধ্যে। এ তো রসিকতা নয়—একটা নারী-জীবনের জীবন মরণ সমস্যা।...

আশার ঐ থিসিসটা দেওয়ার সময় অন্য কেউ ছিল না ওখানে, যাকে আশা সাক্ষীস্বরূপ খাড়া করতে পারে। কালিচরণ বাজারে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগে আশা প্রেমালাপটুকু করেছিল আশিসের সঙ্গে। আশিস একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল অমন আকস্মিকভাবে আশাকে দেখে। মুখ ফেরায়নি। ভাল করে কথাও বলেনি। কিন্তু যতটুকু বলেছিল—কিছু খারাপ তো বলেনি। অবশ্য তার পরদিন যাবার সময় 'অতিভক্তি' শব্দটা বলে গিয়েছিল। সবই স্পষ্ট মনে আছে! নিদ্রায় নয়, নেশায় নয়—সুস্থ সহজ অবস্থায় ঘটা এই ব্যাপারটাকে এমন অস্বাভাবিক করে তোলবার কারণ কি। আশার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে—আশিস অপর কোনো মেয়েকে ভালবাসে, যাকে পেল না বলেই আশার উপর তার আক্রোশ। তাই বিয়ের পর সে দেখা করলো না আশার সঙ্গে। আশা দেখা করলো তো, একটা কদর্য্য অপবাদ দিল আশার চরিত্রে!...চিন্তাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করে আশা।

—মা আপনাকে ডাকছেন, বৌরাণী।—ঝি বলল এসে।

আশা ধীরভাবে মুখ ফিরিয়ে একবার চাইল ঝি'র পানে, তারপর নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগলো। ওর পদক্ষেপ অত্যন্ত সংযত—ওর সারা অবয়ব পাথরের মতো স্থির। এসে দাঁড়ালো আশা মার পেছনে। ওর মুখ জানালার দিকে ফেরানো। দিব্যেন্দুবাবু সমস্তক্ষণ নজর রেখেছেন।

—তোর কাকাবাবু যাচ্ছেন দিল্লী। তোর দিদি আছেন দিল্লীতে?—ওখানেই উঠবি গিয়ে। যা ওঁর সঙ্গে—উনি আশিসের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন...

—আপনার সঙ্গ ছাড়া আমি কোথাও যাব না, মা।—আশার কণ্ঠ সুস্পষ্ট।

—বেশ, আমিও যাব। তোদের কি হয়েছে, আমাকে জানতে হবে। নইলে তুইও মরছিস্। আমিও মরে আসছি।—আপনি ব্যবস্থা করুন ঠাকুরপো—আমিও যাব। যা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। পরশু যেতে হবে।

—গোছানো আছে মা।

—গোছানো আছে কি। তোকে কি আমি ঝি'র মতো নিয়ে যাব?—মা অত্যন্ত রেগে উঠলেন—গহনা-কাপড় সব গুছিয়ে নে। যেমন তোর যাওয়া উচিত তেমনি সেজে গুজে যেতে হবে।

—সাজ-গোজ করবার দিন যদি পাই, মা—তো করবো। আশা অতি ধীরে বসে পড়লো ওঁর পায়ের কাছে। চোখদুটো তেমনি শুকনো, তেমনি মলিন। কিন্তু জল নেই—ওর অন্তরের উত্তাপে সব জল যেন শুকিয়ে গেছে।

ব্যথার পাহাড় ভেঙে পড়ছে ডাঃ দিব্যেন্দুর বুকে, কিন্তু তবু তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মা-ও কিছু বলেছেন না আর। আশা বলল,

—আমার বড়দির বাড়িতে আপনি উঠবেন তো, মা?

—হ্যাঁ। তাছাড়া হোটেলে তো আমি উঠতে পারি নে, বাছা...

—তাহলে বড়দিকে লিখে দি'?

—দে—

আশা নিঃশব্দে চলে গেল, দিব্যেন্দুবাবুর পানে একবার তাকালোও না। অবাক হয়ে যাচ্ছেন ডাঃ দিব্যেন্দু রায়। বললেন,

—কালিচরণকে ও কিছু প্রশ্ন করেনি, বৌঠান?

—না, ও করবে না। ওর আত্মমর্য্যাদায় বাধে, ঠাকুরপো। সেদিন থেকে আমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি ও।

ডাঃ দিব্যেন্দু আর কিছু বললেন না। কিন্তু মা বললেন আবার,

—নীতীশ ওটা আশার কাছ থেকে কি-ভাবে নিয়েছে, তা তো জানা যাচ্ছে না, ঠাকুরপো! 'আশিস চাইছে' বলেও তো নিতে পারে?

—আশাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, বৌঠান?

—না, আমার ভয় করে। ওর যা বলবার আশিসকেই বলুক। আমি ওর চরিত্র কোথাও দাগ দেখিনে, ঠাকুরপো! আশিসের থেকে ও আমার বেশী স্নেহের হয়ে উঠেছে এই ক'মাসে। আমার বিশ্বাস, আমার কোথাও ভুল হয়নি।

—কালিচরণ নীতীশকে ঠিকই দেখেছে, বৌঠান!

—তাতেই প্রমাণ হয় না, ঠাকুরপো, যে আশা চোর বা অন্য কিছু। একটা মেয়ের চরিত্র নিয়ে 'খেলা' চলে না! তুচ্ছ একটা চাকরের কথায় আমার ঘরের-লক্ষ্মীকে আমি অপমান করতে পারিনে। চলুন, আশিস কি বলে শোনা যাবে।

—হ্যাঁ, বৌঠান! সেই ভাল। তাহলে ওই-ই ঠিক রইল।

ডাঃ দিব্যেন্দু চলে গেলেন। মা আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে এসে দেখলেন, আশা চিঠি লেখা শেষ করে দাঁড়িয়ে আছে। বললেন,

—কাউকে দে চিঠিটা, ডাকে দিয়ে আসুক।

—আপনি পড়ুন, মা, কী আমি লিখিলাম—দেখুন!

—না, আমি কি দেখবো! তুই কি আমার মাইনে-করা বাঁদী নাকি যে, তোর খবরদারী করতে হবে সব কাজে!

—মা!—আশা ওঁর কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো এসে। মা ওর মুখপানে চেয়ে কাঁধে ধরে

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

—আমি জানি তুই পুজোর ফুলের মতো পবিত্র। ভয় কি রে, ভয় কি তোর? আমি কারও কথা বিশ্বাস করিনে, মা!

আশা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। মা আবার ওকে নাড়া দিয়ে বললেন,

—পুতুল হয়ে যাচ্ছিস্ যে, মা। কাঁদ। কাঁদ দেখি একটু। কেঁদে একটু মানুষের মতন হ'! আহাম্মক মেয়ে কোথাকার।—মা নিজেই কেঁদে ফেললেন।...

এতোদিন পরে আজ আশার চোখে জল এল।...

না! রমানাথের সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব হোল না।...ভাবছিল কুমকুম। ক'দিন থেকেই নানা বখেড়া চলছে রমাবাবুর সঙ্গে। কারণ অতি তুচ্ছ, কিছুই নয় বললেই চলে। কিন্তু রমাবাবু সেই-সব-তিলকে তাল করে কুমকুমকে গালাগালি দিচ্ছেন—মারবার জন্যও হাত তুলেছেন দু'একবার।

নাঃ! আর থাকা গেল না।...কিন্তু কোথায় যাবে কুমকুম! সে কি সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে রাস্তার ধারে দাঁড়াবে গিয়ে? না, ওতে আর পেট ভরে না। আর ভাবলেও, কুমকুম ও কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কী করবে? অদৃষ্টের বহু দুঃখ আছে, তাই কুমকুম বধূর মর্য্যাদা পেতে এসেছিল রমানাথের মতো এক অতি স্বার্থপর মানুষের কাছে! ঝগড়ার মুখে সেদিন কুমকুম বলল,

—আমার টাকা ফেরত দাও! আমি চলে যাচ্ছি—

—টাকা ফেরত কিসের, হারামজাদী! তোকে এতোকাল ভাত-কাপড় দিয়ে পুষলাম কি অমনি-অমনি? টাকা কে ধারে তোর?

ওদের জাতের মেয়ে অত সহজে টাকা ছাড়বার পাত্রী নয়। কিন্তু কুমকুম কিছু আলাদা ধাতের! কেলেঙ্কারী সে করতে চায় না। টাকার মমতা ছেড়েই দিয়েছে কুমকুম—এখন যে ক'খানা গহনা আছে, তাই নিয়ে সরে পড়তে পারলেই সে বাঁচে! কিন্তু যাবে কোথায়?

নীতীশের কথা প্রায় ভুলে এসেছিল কুমকুম—ভুলেই যেতে হয় ওদের! প্রেম ভালবাসার কথা মনে পুষে রাখা ওদের পক্ষে পাপ। ভুলেই গিয়েছিল সে—কিন্তু ঐ রমানাথ-ই সেদিন মনে করিয়ে দিল—

—তখন বললাম যে, চলে যা তোর ঐ পেয়ারের নীতীশবাবুর সঙ্গে...

—নীতীশবাবু আমার পেয়ারের কি জন্যে হতে যাবে।—বলেছিল কুমকুম।

—হয়েছিল যে হারামজাদী! আমি কি দেখিনি মনে করেছিস? বলে রমানাথ যে-কথা বলেছিল, তারপর কুমকুমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়নি। চুপ হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু রোজ রোজ এমন অশান্তিতে মানুষ বাস করতে পারে না। গতকাল রমানাথ বলেছে যে অবিলম্বে কুমকুম বাসা ছেড়ে দিক্, কারণ রমানাথ তার বিবাহিতা বধূ আর কন্যাকে এখানে আনবে দেশ থেকে। যদি কুমকুম এর মধ্যে চলে না যায় তো, বউ-এর খ্যাংরা তাকে খেতে হবে!

ভয় পায়নি কুমকুম। ভয় পাবার মেয়ে সে নয়। 'বধূ' শব্দটার উপর ওর যেন কেমন মোহ আছে। রমানাথকে বলেছিল,

—বেশ, তার খ্যাংরা-ই খাব আমি। আনো তুমি তোমার বউকে। আমি দেখতে চাই, তোমার মতন শয়তানের বউ-এর ভাগ্যিটা আমার থেকে কতখানি ভালো...আনো তাকে।

আমি যাব না।

কুমকুম না-গেলে রমানাথ কিছু করতে পারবে না সহজে। কারণ কুমকুম প্রায় দু'বছর রয়েছে এখানে—পাড়ার সকলেই জানে। এমন কি কুমকুম ইচ্ছে করলে রমানাথকে আদালতেও নিয়ে যেতে পারে, জানে রমানাথ। তাই মিষ্টি করে বলেছিল,

—অনর্থক অশান্তি হবে, কুমকুম—তুমি চলে যাও। থিয়েটারে তো তোমাকে নিতে চাইছে—

কুমকুম আর জবাব দেয়নি। থিয়েটারে গেলে হয়তো ওর চাকরী হবে। কিন্তু ওর ইচ্ছে নয়। ওর মোহ আর নেই থিয়েটার বা সিনেমায়, আশ্চর্য্য বিচিত্র মানুষের মন। এই আধুনিক যুগে যখন ঘরের কন্যা-বধূরা চিত্রতারকা হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সেই ভীষণ প্রগতির দিনে, সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুমকুম অভিনয়ে আসতে চায় না। ওর আকাঙ্ক্ষা একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ, ছোট্ট নীড়—ধূপ-দীপ-শাঁখ, স্বামী-পুত্র-কন্যা—শাকান্ন হোক, শান্তির অন্ন চায় সে। কিন্তু কোথায় পাবে কুমকুম? ওদের যে এসব পেতে মানা। বিধাতার নাকি বিধান এটা।

চলেই যাবে কুমকুম। নিজের সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে নিল। গহনাগুলো দেখে নিল, রমানাথ গিল্‌টির গহনা দিয়ে বদলে নিয়েছে কিনা। খান দুই মাসিক কাগজও নিল পড়বার জন্য ; তার পর বেরিয়ে এসে ট্রেন ধরলো। কলকাতায় যাবে। ওর আগের পরিচিতা বিন্দুদিদি আছে। তারই বাড়ীতে উঠবে এসে। মেয়ে-কামরায় চড়লো কুমকুম।

বর্দ্ধমানে গাড়ী দীর্ঘক্ষণ থামে। প্ল্যাটফর্মের লোক-চলাচল দেখেছে কুমকুম। কে জানে কতদিন পরে আবার সে বর্দ্ধমানে ফিরবে! ওর জন্মভূমি এই বর্দ্ধমান শহর। বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনেরও অনেকটা কাটলো এখানে। লতা বিতানে-ঘেরা বর্দ্ধমান, তরুবীথি-শোভিত বর্দ্ধমান—দীর্ঘকার কাকচক্ষু-জল-হিল্লোলিত বর্দ্ধমান!...কুমকুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।...হয়তো বর্দ্ধমান তার আর আসা হবে না।

অভিনেত্রীর জীবন-ই আরম্ভ করবে কুমকুম। এছাড়া ওর আর তো কোনো উপায় নেই। আর কোনো আশ্রয় নেই! এখন অভিনেত্রীর চাকরী একটা পেলে হয় ; নইলে ওকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। মুখখানা করুণতর হয়ে উঠেছে কুমকুমের।

—কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতা?—প্রশ্ন করলো এক সহযাত্রিণী।

—হ্যাঁ। —জবাব দিল কুমকুম। তাকালো মেয়েটির পানে। গহনা-কাপড়ে ঝলমলে। নব-বিবাহিতা বধূ হয়তো। কুমকুমও শুধালো,

—আপনি কোথায়?

—কলকাতা। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, ভাই।—হাসলো মেয়েটি। ওর হাতের কৃষ্ণচূড়ায় নাম লেখা 'পদ্মালয়া' দেখলো কুমকুম। বলল,

—ক'দিন বিয়ে হয়েছে?

—গত বছর। প্রথম যাচ্ছি বিয়ের পর। দ্বিরাগমনে।

—বর কি করেন?—কুমকুম সাগ্রহে শুধালো।

—চাকরী করেন। পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেন্টে চাকরী।—মধুর হাসলো সে। কুমকুম ওকে আর প্রশ্ন করলো না ; দেখতে লাগলো। স্বামীর মাইনে এমন কিছু বেশী হবে না। সামান্য চাকরী। কিন্তু স্বামী গৃহে যাবার আনন্দ যেন আচ্ছন্ন রয়েছে মেয়েটির সারা দেহ-মনে।

এ জীবন কুমকুমের পাবার নয়! কুমকুম এমন একটা কাউকে পেল না তার জীবনে, যার উপর তার দাবী থাকবে—যার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহ, এমন-কি মারধোরও। আপনার লোকের সঙ্গে হচ্ছে ভেবে সয়ে যেতে পারবে কুমকুম। শাকান্ন না পেলে উপোষ দিয়েও যেখানে অন্তরের পবিত্র শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। না, পেল না কুমকুম! কী এমন অপরাধ করেছিল কুমকুম তার আগের জন্মে। করেছিল বৈকি! না হলে, এমন হবে কেন?

কর্ণ বলেছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদারত্তং হি পৌরুষম্"। কিন্তু পৌরুষ কর্ণের যতই থাক, তিনি সূতপুত্রই রয়ে গেলেন! কী দুর্ভাগা জীবন। অতবড় বীর, অতবড় দাতা—আহা!

কর্ণের কথা ভাবতে-ভাবতে কুমকুম তার থিয়েটারের জীবনের কথাগুলো মনে করতে লাগলো। সামান্য একটা বছর। কিন্তু ওর স্মৃতি ভুলবার নয়! তারপর এলো শ্যামল—সেখানেও কুমকুমের জীবন-স্মৃতি প্রচুর...তারপর রমানাথের সঙ্গে...

—কী অতো ভাবছেন আপনি, দিদি?—পদ্মালয়া শুধালো।

—আমি তোমার দিদি? না ভাই, আমি ভাল মেয়ে নই। আমি বাজারের মেয়ে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে নেই।

—ও!—পদ্মালয়া এক মুহূর্তের মধ্যে যেন নিবে গেল। দেখলো কুমকুম। দেখবার জন্যই কথাটা বলেছিল সে। দেখলো, কী নিবিড় ঘৃণা ওদের কুমকুমদের প্রতি। আঠারো বছরের একটা বাচ্চা বউ, তারও চিত্তে ঘৃণা জাগে কুমকুমের উপর এই-ই কুমকুমের জীবন।

নিশ্চুপ বসে রইল কুমকুম। পদ্মালয়াও আর কথা বলছে না ওর সঙ্গে। মাঝের একটা ষ্টেশনে তার স্বামী একখানা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিলেন পদ্মালয়াকে। কিন্তু পদ্মালয়া জানালাপানে তাকিয়ে। কাগজটা তুলে নিল কুমকুম। সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখা ওর একটা নেশা। খুলতে গিয়ে অন্য একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো 'একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানে শিশুদের লালন-পালনের জন্য কয়েকজন সেবাপরায়ণা নারী দরকার। মাইনে এবং থাকা খাওয়া দেওয়া হবে।'

চেষ্টা করবে নাকি কুমকুম? ঠিকানাটা লিখে নিল সে। শিশু প্রতিষ্ঠানটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ওখানের চাকরীও পাকা। দেখা যাক-না, কুমকুমের বরাতে কি আছে।...

হাওড়ায় নেমে কুমকুম সটান চলে গেল সেই শিশু-প্রতিষ্ঠানে। কর্তৃপক্ষ জানালেন, ছাপা ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে। কুমকুম ফর্ম নিয়ে লিখলো—'নাম কুমুদিনী চট্টরাজ, স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র চট্টরাজ। পোষ্ট ও গ্রাম : তাপসীপুর, জেলা : বর্দ্ধমান।' দিল সে দরখাস্তটা 'ফাইল' করে। নিজের মনেই হাসছে কুমকুম। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর ডাক হোল 'ইন্টারভিউ' দেবার জন্য। ওকে দেখে এবং কথা বলে প্রীত হয়ে চাকরীটা সত্যিই দিলেন ওঁরা ওকে। মাইনে একশো টাকা।

ব্যস্। কুমকুম হাতে স্বর্গ পেল যেন। কোনো নোংরা জীবনে ওকে আর যেতে হবে না ; কিন্তু কুমকুম একটা নিদারুণ মিছে কথা লিখেছে। চাকরী করার কারণ সে লিখেছে—'স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না'। ছিঃ, এ কাজ কেন করল কুমকুম? কিন্তু ঐ রকম না লিখলে এখানে চাকরী হবার আশা ছিল না। চাকরী যে হবে, তা সত্যি ভাবেনি কুমকুম। তবু হোল। বেশ! কুমকুম যোগ দিল চাকরীতে।

ওরা পাঁচজন শিশুদের দেখবার জন্য ; কিন্তু শিশু, বালক এবং বালিকা প্রায় শ-খানেক।

আর, কী দুরন্ত সব। হোক। কুমকুম একটা সম্মানের জীবন পেয়েছে। সবাই ওকে 'মিসেস্ চট্টরাজ' বলে। খাতিরও করে বেশ। রমানাথের বলা 'হারামজাদী' ইত্যাদি কথাগুলো মনে পড়লে হাসে কুমকুম। আমোদ বোধ হয় ওর।

বেশ কাটাচ্ছে কুমকুম এখানে। বরাতগুণে চাকরীটা জুটে গেছে। এখন যদি একদিন রমানাথের সঙ্গে দেখা হয় তো বেশ হয়। তাকে দেখাবে কুমকুম যে, সে মানুষের মর্য্যদা লাভ করেছে, মা'র মর্য্যাদাও।

মাসকয়েক কাটার পর কিন্তু কুমকুমের মন-খারাপ হতে আরম্ভ করছে। কারণ আর কিছু নয়, সহকর্মিণীরা প্রশ্ন করে—স্বামীর সঙ্গে কেন তার বনল না ; আর কোনো চেষ্টা সে করবে কিনা স্বামীর ঘর করবার জন্য' ইত্যাদি। কুমকুম তাই একদিন ঠিক করলো, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসবে। এসে বলবে যে, স্বামীর ঘরই সে করে এল।

দরখাস্ত করে দিল কুমকুম। ছুটিও পেল। কিন্তু কোথায় যাবে কুমকুম? সহকর্মিণীরা উৎসাহের সঙ্গে ওর জন্য সিটি-বুকিং থেকে বর্দ্ধমানের টিকিট কিনিয়ে দিল—ষ্টেশনে এসে গাড়ীতেও তুলে দিল। নেহাৎ দায়ে পড়ে যেন কুমকুম বর্দ্ধমানেই নামলো এসে। অতঃপর সত্যি সে 'বাস' ধরে এল তাপসীপুর।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়—কুমকুম সটান্ গ্রামে ঢুকে একটা বাচ্চা ছেলেকে প্রশ্ন করলো,

—নীতীশবাবুব বাড়ী কোনটা খোকা।

—নীতীশদা? হৈ-যে। হৈ-হাটতলায়—সোজা চলে যান।

কুমকুম চলে এল সোজা-ই কিন্তু কোন্‌টা বাড়ী নীতীশের? অকস্মাৎ তার নজরে পড়ল—একটা বাড়ী থেকে একজন লোক বের হচ্ছে—চুল দাড়ী ভর্ত্তি মুখ, চোখগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। কে ও? কুমকুম ভাল করে দেখে চিনলো—নীতীশ!

চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে দেখা হবার পর আশিসকে প্রায়ই যেতে হয় তার বাড়ী। ধরে নিয়ে যায় নন্দিতা। অবশ্য চন্দ্রিমা দেবীকে ভয় করলেও নন্দিতাকে বড়ই ভাল লাগে আশিসের। খুব স্ফূর্ত্তিবাজ মেয়ে নন্দিতা। গান-গল্প হাসিতে ভরপুর। ওকে নিয়ে আশিস হস্তিনাপুর, কুতুব-মিনার, এমন কি পাণিপথ, ভীমগদা পর্য্যন্ত ঘুরে এল। রোজই প্রায় আসে নন্দিতা। আর আশিসের কোনো কাজ নেই, যার জন্য বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করবে। আশিস প্রায় বেকার এখানে।

আজও আশিস বেড়াতে যাবে নন্দিতাকে নিয়ে—কৃষি-প্রদর্শনী দেখতে যাবে ; পোষাক পরে অপেক্ষা করছে—নন্দিতার আসতে দেরী হচ্ছে। কী কারণ বুঝতে পারছে না আশিস। অথচ বেরুতেও পারে না নন্দিতাকে ছেড়ে। গতকাল বিজ্ঞান কংগ্রেসের মিটিং ছিল সন্ধ্যায়, নন্দিতার ওসব ভাল লাগবে না, তাই আশিস যায়নি। আজও যাবে না ঠিক করে রেখেছে। বিজ্ঞানকে ও এখন প্রায় বাদ দিয়েই চলেছে। মনের অবস্থা এমন এক স্তরে এসেছে যে, জীবনের কোনো আস্বাদই যেন নেই ওর কাছে। তার চেয়ে অবোধ বালিকা, নিষ্পাপ নন্দিতাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যেন অনেক ভাল।

চেনা গাড়ীখানা মোড়ের মাথায় দেখা যেতেই আশিস আনন্দিত হয়ে উঠলো। আসছে নন্দিতা, ওকে আর নামতে দেওয়া হবে না—আশিস-ই গিয়ে উঠবে ; ভেবে সে বেরুতে

যাচ্ছে—গাড়ীখানা এসে থামলো দরজায়। নামলেন স্বয়ং মা। ডাঃ দিব্যেন্দু, এবং পিছনে কে ও? আশা নাকি!

চমকিত হয়ে থেমে গেল আশিস। মা'র এভাবে খবর না-দিয়ে আসার কারণ কি? দিব্যেন্দুবাবু বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন হয়তো। কিন্তু এঁরা কেন? আধ-মিনিটেই কথাগুলো ভেবে নিয়ে আশিস মাকে এবং দিব্যেন্দুবাবুকে প্রণাম করলো। আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। ওর কঠিন মুখখানায় কোনো ভাবের অভিব্যক্তি নেই।

—কী ব্যাপার মা! তোমরা এমন অকস্মাৎ?—বিস্মিত আশিস প্রশ্ন করলো।

—অকস্মাৎ নয় আশিস, আমরা গতকাল এসেছি। উঠেছি চন্দ্রিমার বাড়ীতে।

ডাঃ দিব্যেন্দু বললেন,—কাল তোমাকে বিজ্ঞান কংগ্রেসে দেখতে পাব ভেবে এখানে খবর দেওয়া হয়নি। আমি ওখানে যাওয়ায় এখানে আসতে পারিনি।

—আমার কংগ্রেসে যাওয়া হয়নি, কাকাবাবু। নন্দাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে নন্দা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়।—কিন্তু রাত্রে আমাকে খবর দিলেই আমি যেতাম।

—আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই খবর দেওয়া হয়নি। চলো, বসা যাক্।

সবাই এসে বসলেন ভেতরে। আশা বসলো মার কাছে। দিব্যেন্দুবাবু আশিসের সামনা-সামনি বসলেন। মা এতক্ষণে বললেন,

—তুই আজ ছ'মাস বাড়ী-ছাড়া। তোকে আমি দেখতে এলাম।

—বেশ, মা—কিন্তু আমাকে খবর দিলে না কেন? আমি ষ্টেশনে যেতাম—

—তোকে খবর দিতে চন্দ্রিমাকে নিষেধ করা হয়েছিল। কারণ যেভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, আমরা আসছি শুনলে আবার কোথাও চলে যেতে পারিস। শুনলাম এখানে তোর বিশেষ কোনো কাজ নেই। এখানকার গবেষণাগার হতে এখনও বহু বিলম্ব। কেন তুই বাড়ী ফিরছিস না, আশিস? কী কারণ—

মা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আশিসের পানে। আশিস মাথা নীচু করে একখানা বই উল্টোতে লাগলো।

—আমার কথার জবাব দে, আশিস। বিয়ের পর থেকেই তোর এই পরিবর্তন আমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে। বৌমার বিষয়ে তোর কি কোনো মন্দ ধারণা হয়েছে?

—'মা।'—বলে আশিস চুপ হয়ে গেল। মা আধামিনিট থেমে থেকে বললেন,

—বল। আমি শুনতেই এসেছি। একটা নিরপরাধ মেয়েকে বিয়ে করে এনে, কেন তুই এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করছিস। অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছিস—শতদোষ মার্জনা করবি প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে এভাবে অবহেলা করবার কী তোর অধিকার? কী তার অপরাধ?

আশিস চুপ করে আছে দেখে দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—তুমি জবাব দাও, আশিস! অনর্থক একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে—আর একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট হতে বসেছে। বলো। জবাব দাও।

আশিস নিঃশব্দে বসে রয়েছে তখনো। বেয়ারা একখানা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এনে দিল। আশা চা তৈরী করছে দু-কাপ—দিব্যেন্দুবাবু আর আশিসের জন্য। ঘরের অবস্থা স্থির

অবস্থা—থমথমে।

আশা চা তৈরী করে এগিয়ে দিল ওঁদের। মা বললেন,

—তুই চা খাবি নে?

—না, মা।—বলে আশা আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে বলল আস্তে,

—মা-কাকাবাবু! আপনারা অনুমতি করলে আমি ওঁকে কিছু প্রশ্ন করি।

—করো, মা। তুমিই প্রশ্ন করো।—দিব্যেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। আশা ধীরে ধীরে বলল ;

—আমার অপরাধ নেবেন না। চরম অশান্তি না ঘটলে কোনো মেয়ে এভাবে স্বামীকে প্রশ্ন করতে আসে না।—আশা দাঁড়ালো আস্তে আস্তে ; বলল,—আমি আসবার পর থেকে আপনি বাড়ী-ছাড়া। এর কারণ কি আমি-ই? যদি তাই হয়, তাহলে কেন? কোথায় আমার অপরাধ, কি আমি করেছি—যার জন্য-আপনি বাড়ী-ছাড়া?

আশিস চায়ে চুমুক দিল, কথা বলল না। আশা বলল,

—আপনার থিসিস্ কী বস্তু আমি জানি না—অথচ আমি শুনলাম, আমি-ই নাকি সেটা চুরি করে অপর একজন কাকে দিয়েছি। এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমি জানতে চাই, এ অভিযোগ কি আপনার?

—হ্যাঁ।—আশিস কঠিন কণ্ঠে বলল,—এবং প্রমাণ হয়ে গেছে যে—তুমি আমার আয়রন-সেফ্ খুলে আমার জীবনব্যাপী-সাধনার-ধন তোমার এক...বিলিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে! চক্রান্ত করে।

—'আমি' দিয়েছি? কে তিনি? কাকে আমি দিয়েছি?

—তুমি খুব ভাল জান, সে 'কে'। পার্টির দিন সন্ধ্যাবেলা ল্যাববেটরীতে গিয়ে ফুল ছড়িয়ে তুমি এই উৎসব সমাধা করেছ—কঠিন দৃষ্টিতে চাইল আশিস—অগ্নিময় সে দৃষ্টি। আশা নতমুখে ছিল, কিন্তু আশিস বলল,—এদিকে তাকাও।

আশা ধীরে ধীরে মুখ তুললো। আশিস কঠিন স্বরে বলল,

—যাকে দিয়েছ থিসিস্খানা, তার সঙ্গে কতদিনের বন্ধুত্ব তোমার? কখন এই চক্রান্তটি করেছিলো।

আশা পড়ে যাচ্ছিল, টেবিলের কোণাটা ধরে ফেললো। মা ওকে ধরলেন জড়িয়ে। কিন্তু নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে চলেছে আশিস...

—স্বামীর সাধনার 'ধন' অপরকে বিলেয়ে দিয়ে স্বামীকেই প্রশ্ন করতে আসতে তোমার লজ্জা করলো না।—তোমার অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করি। সত্যি চমৎকার।

—আশিস!—মা ধমক দিয়ে উঠলেন,—হুঁসিয়ার হয়ে কথা বল। আমার ঘরের লক্ষ্মীর অসম্মান আমি সহ্য করবো না। খবরদার!

আশার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে—ওর দাঁড়াবার আর অবলম্বন নেই। ওর অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা দেহখানা দু'হাতে ধরলেন মা। মুখপানে চেয়ে দেখলেন, সে-মুখ মৃতের মুখের মতো রক্তহীন,—যেন মোমের মুখ।

—আশা, আশা।—আশা? মা জোরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকলেন দু'তিনবার, —জল খাবি?—টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে ধরলেন ওর মুখে। আশা দু'ঢোক জল খেল। মা ওর মুখ মুছে দিলেন আঁচল দিয়ে। বললেন,

—তুচ্ছ একটা চাকরের কথায় তুই আমার বধূর চরিত্রে অপবাদ দিস, এতবড় তোর আস্পর্দ্ধা? তুই ভেবে দেখলিনে, কখন কী অবস্থায় কেমন করে নীতীশ থিসিস্ খানা নিয়ে গেল? তোর নাম করেও তো সে ওর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে সেটা। তুই নীতীশের খোঁজ করেছিস?

আশা এর মধ্যে কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে। বলল,

—থাক, মা। ও নিয়ে আর কিছু ওঁকে বলবেন না। স্বামী হয়ে যিনি এত তুচ্ছ কারণে পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করেন—তাঁকে কি আর বলবো, মা!

—তুমি প্রমাণ করো যে, তুমি দাওনি থিসিস্‌খানা নীতীশকে—

—দিয়েছি।—আশা মার-কাছ-ছাড়া হয়ে, সরে এসে সোজাভাবে দাঁড়াল—কাকে দিয়েছি, জানি না, দিয়েছি একজনকে। এখানে আসার আগে পর্য্যন্ত জানতাম সেই লোকটি আপনি স্বয়ং। যাক্, এখন বুঝলাম তার নাম 'নীতীশ'। কিন্তু আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি না—করতে ঘৃণা বোধ করি আমি।...

—কি করছো তাহলে?

—আপনার অমানুষোচিত ব্যবহারগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুধু সহধর্মিণীর কাজ করে যাব। শুনুন। ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত যুবক আপনি, একটা কুড়ি-বছরের মেয়েকে বিয়ে করে এনে তার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত না-বলা কোন্‌দেশী স্বামীত্ব? ফুলশয্যার রাত্রে ঘুমন্ত স্ত্রীর সোফায় ঘড়ি রেখে দিয়ে সেটা আর ফিরিয়ে নিতে না-যাওয়া কোন্ রসিকতার পরিচয়? দীর্ঘ ছাব্বিশ দিনের মধ্যেও বউ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময়াভাব—অন্দরে একবার আসবার মতনও সময়াভাব, বধূর প্রতি প্রীতির কি রকম লক্ষণ? একটা অপরিচিতা মেয়েকে স্বামী চিনবার সুযোগ পর্য্যন্ত না-দেওয়া কোন্ শিক্ষিত সমাজের স্বামীগৌরবের পরিচয়। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি এই অবহেলার মূলে কোন রহস্য, জানবার অধিকার আমারও আছে! কিন্তু...চোখ দুটো যেন জ্বলছে আশার। কঠিনতর কণ্ঠে বলল,

—যে-স্বামী অকারণ পত্নীর সন্দেহ পোষণ করে, তার কাছে পরীক্ষা দিয়ে 'অযোধ্যার রাণী' হতে যাবার মতো 'সীতা' আমি নই। পরীক্ষা দেবার আগে আমি পাতাল-প্রবেশ করবো। কিন্তু মনে রাখবেন, এ ভুল আপনার ভাঙ্গবে। ভাঙ্গবেই। সেদিন আমার স্বামীত্ব গ্রহণ করবার যোগ্য হয়ে যান যেন আমার কাছে!

—আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা তুমি খুলে বলবে, আশা!—আশিসের কণ্ঠস্বর স্নেহময়।

—না!—আশা কঠিন ধমক দিল—আমাকে কোনো প্রশ্ন করবার আপনার অধিকার নেই। স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টাকেও আমি ঘৃণা করি। তাঁকে 'স্বামী' স্বীকার করতে আমার বাধে। মনে রাখবেন, আজ থেকে আমার স্বামীত্ব আপনাকে অর্জন করতে হবে। যদি না পারেন, আসবেন না। আমি এ-জন্মটা মার চরণ-সেবা করেই কাটিয়ে দেব।...

আশা বারান্দায় দাঁড়ালো গিয়ে।

মা একবার দেখলেন আশার চলে যাওয়া। তারপর আশিসকে বললেন,

—আমার চোখের সামনে তুই আমার ঘরের-লক্ষ্মীকে অপমান করলি, আশিস। বুঝলাম আমার উপরও তোর বিশ্বাস নেই। আমি জানতাম না, তুই এত নীচ্।

রাগে মার যেন কথা বেরুচ্ছে না—বললেন,—আমি ওর জন্য ওকালতি করতে চাই

নে আশিস। তার দরকার হবে না। তোকে আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, 'চোখের জলে যেন তোর এই ভুল ভাঙ্গে।'

মা এসে আশার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরের গাড়ীতে উঠলেন গিয়ে। দিব্যেন্দুবাবু আশিসকে বললেন,

—আশাকে আমরা সাত মাস দেখছি আশিস, তোমার মতো আমারও ভুল হয়েছিল। আমি সে ভুল সংশোধন করলেও, মা আমাকে মাফ করেনি আজও।

—আমি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি, কাকাবাবু...

—প্রমাণ অকাট্য হয় না, আশিস। বিজ্ঞানের সূত্রই হোল 'সত্যও সীমিত'। তোমার সত্য-নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়গুলো সসীম, তাই তোমার জ্ঞাত সত্যও সসীম হতে বাধ্য। চলো, কংগ্রেসের সময় হয়েছে।

দুজনে বাইরে এসে দেখলেন, গাড়ীখানা মা আর আশাকে নিয়ে চলে গেল। নিরুপায় হয়ে ওরা ট্যাক্সি করে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে গেলেন। আশিস ক্রমাগত ভাবছে কোথায় ভুল হয়েছে! ভুল যে হয়েছে, এ বিষয়ে আশিসের সন্দেহ নেই। আশার অসাধারণ তেজ, অনমনীয় দৃঢ়তা—তার সঙ্গে আপন জননীর কঠিন তিরস্কার আশিসকে বুঝিয়ে দিল সে অন্যায় করেছে, ভীষণ অন্যায় করেছে। আশা পরোক্ষে তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আশিস ভদ্রসমাজের অযোগ্য। আশিস অপরিণামদর্শী। আশিস অনুপযুক্ত আশার স্বামীত্ব লাভের।...

এতোখানি যার মনের জোর, সে কি মেকী হতে পারে। না! আশার বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান তো করেনি আশিস! সত্যিই তো তাকে স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ সে দেয়নি।

থিসিস্‌খানা নিয়ে নীতীশ কোথায় গেল, তাও তো জানা হয়নি। নীতীশ, কি—কোথাও থিসিসটা দাখিল করেছে, এমন সংবাদও পায়নি আশিস। তাহলে ব্যাপারটা কি?

দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—নীতীশের ঢাকুরিয়ার বাসা খুলে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে, যাতে সে এলাহাবাদ যাবার কথা লিখে গেছে।

এলাহাবাদ যাওয়ার কথা সত্যি নয়—কারণ, সেখানে গেলে হয়তো চিঠি লিখতো নীতীশ। কিন্তু গেল সে কোথায়? তার স্বগ্রাম তাপসীপুরেই গেল নাকি? কিন্তু চুরি যদি সে করে থাকে, তাহলে কলকাতার অত কাছে এবং আশিসের জানা জায়গায় থাকতে সাহস করবে কি করে? যাই হোক—নীতীশের খোঁজ করতে হবে ঠিক করে, আশিস বিজ্ঞানসভা শেষ হলে ডাঃ দিব্যেন্দুকে হোটেলে তুলে দিয়ে চন্দ্রিমা দেবীর বাসায় এসে শুনলো রাত্রি আটটায় 'এয়ার'-এ মা আর আশা কলকাতা চলে গেছেন।

খবরটা শুনে আশিস বাক্যহীন হয়ে গেল!

সন্ধ্যার আলোতে দেখলো কুমকুম অদ্ভুত-চেহারার নীতীশকে। একি সত্যি নীতীশ! বিশ্বাস করতে পারছে না কুমকুম। কিন্তু নীতীশ বেরিয়ে গেল একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে। হোমিওপ্যাথী ওষুধের ব্যাগ আর গলায় স্টেথিস্কোপ! কুমকুমের মনে হোল নীতীশ অত্যন্ত অসুস্থ। তবু কেন সে বেরুলো!...নীতীশের চোখ দুটো দেখে ভয় করছে কুমকুমের।

ঘরের বারান্দায় শাণ-বাঁধানো চেয়ারে বসলো কুমকুম—দরজায় তালা-বন্ধ করে গেছে নীতীশ। আশ্চর্য্য! কুমকুমকে এতো কাছে দেখে চিনলো না? একজন আধাবয়সী লোক যাচ্ছিলেন—কুমকুম তাকে প্রশ্ন করলো,

—নীতীশবাবু কোথায় গেলেন, বলতে পারেন?

—নীতীশ!—বলে থেমে গেলেন শম্ভু চক্রবর্তী।—আপনি কি কোনো রুগী?

—না। আমি তাঁর আত্মীয়া—আমাকে দেখেও উনি চলে গেলেন কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হোল ওঁকে। ওঁর কি অসুখ?

—হ্যাঁ, অসুখ নিয়েই এসেছিল এখানে মাস-সাতেক আগে। সে অসুখ ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু তার পর থেকে ওর কেমন-যেন বিস্মৃতি ঘটেছে কোনো একটা ব্যাপারে। কোথাও খুন-জখম করে পালিয়ে এসেছিল মনে হয়!

—খু-ন?

—সেইরকম তো আন্দাজ করি আমরা। তবে এখন ও আর প্রকৃতিস্থ নেই। দিনরাত হোমিওপ্যাথী বই পড়ে। চিকিৎসা করে যত গরীব-দুঃখীদের। অবশ্য, চিকিৎসা খুবই ভাল করে। অনেক কঠিন রোগেও আরাম করলো এই ক'মাসে। কিন্তু কেমন-যেন আত্মবিস্মৃত—পূর্বের কথা কিছুই মনে করতে পারে না।

—সে কি! কিছু কি মনে করে বলতে পারেন না?

হ্যাঁ, বলে কত-কি! কিন্তু বোঝা যায় না, কি বলছে। আমরা ওর সঙ্গে আর খুব বেশী মেলামেশা করিনে, মা—বুঝছোই তো, খুনী আসামী! তুমি অপেক্ষা করো—ও এলেই বুঝতে পারবে।—

বলেই চলে গেলেন শম্ভুবাবু।

কুমকুম নিঃশব্দে বসে রইল সেই শাণের চেয়ারটায়। দু'দিনটি রুগী এল। গ্রামের গরীব লোক তারা, দেখেই বোঝা যায়। একটি মেয়ে, কোলে একটি শিশু। কুমকুমকে দেখে কাছে এসে শুধালো,

—ডাগদারবাবু কোথায় গেলেন?

—বাইরে। এখুনি আসবেন। তোমার হাতে কি?

—গাছের দুটি বেগুন। ডাগদারবাবুকে দেব। পয়সা তো নেই মা! উনিও চান না।

—উনি কেমন ওষুধ দেন?

—ভাল। খুব ভাল! আমাদের মা-বাপ! ওষুধ দেন, পয়সা নেন না। রাত দুপুরে রুগী দেখে বেড়ান।—কিন্তু মা, ওঁর খুব শরীর-খারাপ! খাওয়া-দাওয়া নাই, দিনরাত পড়া আর ওষুধ দেওয়া। আপনি বুঝি ওঁর...

—কে বলো তো?...কুমকুম হেসে শুধুলো।

—বউ—হেসে দিল মেয়েটি।—আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি এখনও—না?

—না—বলে কুমকুম ওকে আবার শুধালো,—ও নাকি আগের কথা কিছু বলতে পারে না?

—না, মা, তা কেন? কত-কি বলেন, আমরা বুঝি না। কিন্তু ওষুধ যা দেন, মা, এক দাগ কি দু'দাগেই ব্যামো সেরে যায়। ভদ্দরলোকেরা তো কেউ ওঁকে ডাকে না—উনি আমাদের গরীবদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে রোগী দেখে বেড়ান। নিজে রান্না করে খান—যে

যা দেন তাই সিদ্ধপক্ক, আর নাহয় মুড়ি-নারকেল।

—কে জানে, মা! ওকে কেউ ডাকে না, ওঁর সঙ্গে কেউ কথাও বলে না। গাঁয়ের—

কুমকুম ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না। আর কিছু প্রশ্ন না-করে বসে রইল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এল নীতীশ। এসেই আবৃত্তি করলো,

'—সতীর নয়ন-বহ্নি! জ্বাল্ তবে বহ্নিচক্র জ্বাল—
আশীর্বাদ পড়ুক এ শিরে...'

—হ্যাঁ, কার কি অসুখ? এদিকে এসো—এদিকে। দেখি হাতখানা—

—এই বেগুন দুটি আমার গাছে ফলেছে বাবা। প্রথম ফল।

—ও! প্রথম ফল প্রথম প্রেমের মতই অমৃত..না-না, বিষ! দাও! 'বিষষ্য বিষমৌষধম্'...তোমার খোকাকে দিচ্ছি 'ইপিকাক্ দু-শো, নাও। 'ইপিকাকে বিবমিষা লালা রক্তস্রাব—তিন দাগ। দুঘণ্টা অন্তর। বুঝলে? কাল খবর দিও—তুমি?...

নীতীশ পরের রোগীর খবর নিচ্ছে...পেট-ব্যাথাটা সারেনি এখনো? আচ্ছা পেটব্যথা, ও আর কি এমন ব্যথা! ও কিছু না, জীবনের ব্যথা কত জানো?—জানো, বেঁচে থাকার ব্যথা কী ভয়ানক? জানো না!—হাঃ-হাঃ, পেটব্যথা! দেখি 'কলোসিন্থ-এ পেটব্যথা চাপে শান্তি হয়'...নাও, এক খোরাক—ব্যাস!...তোমার কি গো?...

কুমকুমের দিকে চাইল নীতীশ। কুমকুম কি বলবে! নীতীশই বলল,

—'সীতা আনিয়াছি। গৃহে! সীতা মোর মৃত্যু আশীর্বাদ' কি হয়েছে তোমার?...

—আমি কুমকুম। চিনতে পারছেন না? সেই মুরগী মসল্লাম...

—ও মাই গড্! কুমকুম কস্তুরী মৃগনাভী আমার ছিল নাকি? কৈ না তো! হ্যাঁ, আমার জীবনে 'আশা ছিল...আশা—বিষ—আশা নাগিনী! আশা-বহ্নি! বাট্...আই রিমেম্বার ইউ নাউ! কুমকুম...মুরগী-মসল্লাম, হ্যাঁ—আচ্ছা, কুমকুম, আমি অসুস্থ, দেখছো তো—তুমি বেগুনের মুরগী-মসল্লাম খাওয়াতে পার?

—হ্যাঁ। দেখি আপনার গা?—কুমকুম হাত দিল নীতীশের কপালে।

উত্তপ্ত অঙ্গ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন নীতীশের। কুমকুম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট, তারপর বলল,

—আপনার জ্বর হয়েছে, নীতীশদা—আসুন, শুইয়ে দিই।

—না। ও ম্যালেরিয়া অনেকদিন হয়েছে। ওষুধ খাইনি, আশা-বিষ খেয়েছি! এক সতীর স্বামীত্ব চুরি করা....আহা, না—আমি কারো কিছু চুরি করিনি—হ্যাঁ।—কুমকুম তোমার নাম? তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো! নীতীশ চাইল কুমকুমের পানে।

—বর্দ্ধমানে। রমানাথবাবুর বাড়ীতে। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ—কিন্তু তোমাকে তো আমি ছুঁইনি—তোমার স্বামীত্ব আমি চুরি করিনি! কারও কিছু চুরি করিনি আমি...আমি হোমিওপ্যাথ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি গরীবদের। তুমি কেন এখানে এসেছ, কুমকুম? আমার কাছে কিছু পাওনা আছে?

—না, দেনা আছে! কুমকুমের চোখ জলে ভরে আসছে। বলল,—তোমাকে ভালোবাসতে এসেছি! তুমিই আমাকে বধূর সম্মান দিতে চেয়েছিলে...

—ও-ইয়েস্! চেয়েছিলাম নাকি? বেশ, তুমি নাও। আমার বধূ হবার যোগ্যতা তোমার আছে? আছে—আছে। গাঁয়ের কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না ; আমাকে ঘৃণা করে

ওরা—তুমি ভালবাসতে পারবে?

—হ্যাঁ। এসো তোমাকে শুইয়ে দিই।

দাও। ফুলশয্যা হোক তোমার সঙ্গে। কিন্তু ফুল এনো না—আমি সহ্য করতে পারবো না।

—কেন?—নীতীশের হাত ধরে বিছানায় নিয়ে যেতে-যেতে শুধুলো কুমকুম।

—জানো না? ফুল শুধু পুজোতে লাগে? অভাগার কবরে ফুল দিতে নেই! "গরীব-গোরে দীপ জ্বেলো না, দিও না কেউ ভুলে।"

নীতীশ কবিতা আবৃত্তি করেছে। কুমকুম ওকে শুইয়ে মাথায় জলপট্টি দিল। নীতীশ আবার আবৃত্তি করল,

—"শ্যামাপোকায় দাগা না পায়, ব্যথা না পায় বুলবুলে..."

—কি-সব বলছো তুমি?—কুমকুম ধমক দিল—'চুপ করো!'

—না।—"শত পুত্র সহস্র পৌত্রের চিতাবহ্নি জ্বলে মোর বুকে,

জ্বলে ভোগতৃষ্ণা অবিরাম—

আমার সোনার লঙ্কা দাউ দাউ করে দগ্ধ হয়ে যায়—

দগ্ধ হয় ব্যর্থ মনস্কাম—তবু আমি বেঁচে রবো?..."

—কি বলছো?

—রাবণ!—রাবণ—চুরি করে সীতার স্বামী হতে গিয়েছিল, স্ববংশে মরলে ব্যাটা?—পড়নি রামায়ণে?— "সীতা আনিয়াছি গৃহে—"

কুমকুম সুটকেস খুলে টাকা বের করে হাটতলায় গেল। কয়েকটা নিতান্ত দরকারী বস্তু কিনে ওখানকার ডাক্তারবাবুকেও ডেকে আনলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন,

—জ্বর খুব বেশী। কে জানে কিসে দাঁড়াবে!

—অ্যাঁ!—কুমকুমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল—ভাল হবে তো, ডাক্তারবাবু?

—চেষ্টা করা যাক্! কিন্তু দামী-দামী ওষুধ দরকার। ওর তো টাকা-পয়সা কিছুই নেই—

—আমার আছে, ডাক্তারবাবু—আমার যা-কিছু সব টাকা, গহনা—দু'তিন হাজার টাকার গহনা—আপনি ওকে ভাল করুন, ডাক্তারবাবু!...কেঁদে ফেল্‌লো কুমকুম।

—আচ্ছা, মা, বুঝেছি! তোমাকে কি ও খবর দিয়েছিল?

—না। আমি হঠাৎ এসে পড়েছি।

ডাক্তার ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। কুমকুম সমস্ত রাত্রি নীতীশের কপালে জলপট্টি দিল আর পাখার হাওয়া করলো। নীতীশ ক্রমাগত ভুল বকছে।

—ও—ও-ওঃ—বুকে হাত দিল নীতীশ।

—ব্যথা করছে বুকে?—কুমকুম শুধুলো।

—না, বুকে কেন? বুকে বিষ আছে? বিষস্য বিষমৌষধম্ 'Simili Similibus-Curantum' বুকে আশা—বহ্নি...ফুলবহ্নি,—ক্ষণবহ্নি—উঃ!—নীতীশ যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে উঠলো।

তিনদিনের দিন ডাক্তার বললেন—'রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি অন্য ডাক্তার আনান।'

কুমকুম পাড়ার একটি ছেলেকে পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে বড় ডাক্তার আনালো। তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন,

—ডবল-নিউমোনিয়া। খুবই খারাপ অবস্থা! শুরু থেকে সাবধান না-হয়ে জ্বরের মধ্যে স্নান করেছে, ঘুরেছে—দুটো সাইড্-ই জখম...

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে ডাক্তার চলে গেলেন, কিন্তু কোনো ভরসাই তিনি দিয়ে গেলেন না। নিরূপায় কুমকুম কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। বিশেষ কিছুই সে জানে না নীতীশের সম্বন্ধে। এ যেন নিয়তি! তাই নীতীশের এমন অসুখের সময় কুমকুম এসে পড়েছে। কিন্তু কী করবে কুমকুম। ওর কোথাও কেউ আত্মীয় আছে কিনা, সে জানে না। অবশেষে কুমকুম নীতীশের টিনের সুটকেসটা খুলে ফেললো ; যদি কারও চিঠিপত্র থাকে, যাতে ঠিকানা পেতে পরে। এ যাবৎ ওটা খোলা হয়নি মনে হয়। কাপড়-জামার তলায় কুমকুম পেল একখানা বড় খাম। সীল-করা। নাম লেখা : আশিস আচার্য্য—২৫, সূর্য্য সাহা লেন, কলিকাতা।' 'ইনি নিশ্চয় নীতীশের কোন আত্মীয়' ভেবে কুমকুম ঐ ঠিকানায় একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিল :

"মহাশয়, নীতীশ চট্টরাজ সম্ভবত আপনার বিশেষ পরিচিত। তিনি স্বগ্রাম তাপসীপুরে মৃত্যুশয্যায়। যদি সম্ভব হয় তো, অবিলম্বে এসে দেখা করবেন। ইতি : নিবেদিকা—কুমুদিনী।"

টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় হাতের একগাছা চুড়ি বিক্রি করে কুমমুম ওষুধ আনালো। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে নীতীশের জীবন-দীপ নিবে আসছে। সে আর কথা বলে না, উপর পানে চেয়ে কি যেন ভাবে—মাঝে মাঝে শুধু একটি মাত্র কথা বলে :

—'আশা—আশা-বিষ! আশা বহ্নি!'...

একটা কুলুঙ্গীতে নীতীশের বান্ধবীর সেই ফটোখানা রয়েছে। কুমকুম জানে ঐ মেয়েটির নাম 'আশা'। ফটোটা এনে নীতীশকে দেখালো,

—দেখো তো!—চিনতে পারো?...

—না-না, এনো না! ও সীতা! নারী-চোর রাবণকে ও ধ্বংস করবে!... না, এনো না!—নীতীশ চিৎকার করে উঠলো,—কিন্তু মনে রেখো, রাবণ সবটাই চোর নয়! সে পাপীদের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধতে চায়! সে সীতাকে-হাতে পেয়েও ভ্রষ্ট করেনি। সে পাপী হলেও কৃপার পাত্র! তার জন্য একটু কাঁদবে তোমরা, একটু কাঁদবে...

কুমকুম সত্যি কেঁদে ফেলে। নীতীশ বলতে থাকে,

কুমকুম আমাকে ভালবেসেছিল—জানো? কুমকুম একটা বাজারের মেয়ে, কিন্তু বাজারের মেয়েরাও 'মেয়ে'—তারাও ভালবাসতে জানে! তাদেরও প্রেম পবিত্র হতে পারে। তুমি বিশ্বাস করো না? উর্বশী অর্জ্জুনকে ভালোবাসলো, তুমি বিশ্বাস কর না! অর্জ্জুন সে-ভালবাসা নিল-না বলে অভিশাপ দিল উর্বশী...কুমকুম অভিশাপ দিল...

—না-না, কুমকুম তোমাকে অভিশাপ দেয়নি। না।—কুমকুম বার বার বলতে থাকে,—তুমি ভাল হও—কুমকুম তোমার সেবায় তার সারাজীবন শেষ করবে! ভাল হও তুমি...

কিন্তু ভাল হচ্ছে না নীতীশ! নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কলকাতা থেকে আশিসবাবুও তো এলেন না! কুমকুম পথের পানে চেয়ে থাকে।

দুখানা মোটর এসে থামলো দরজায়। নামলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তার একখানা থেকে, অন্যটায় মা আর আশা। মা এসেই প্রশ্ন করলেন,

—তুমি কে মা? তুমি কি...?

—আমার পরিচয় এখন থাক্ মা—ওঁকে দেখুন! কুমকুম জবাব দিয়ে আশাকে দেখছে—হ্যাঁ—এরই ফটো! এরই নাম 'আশা'! ডাক্তার দেখলেন নীতীশকে। মাথা নাড়লেন তিনি! না, কোনো আশা নেই আর। বললেন,

—খুব দেরী হয়ে গেছে! এখন আর ওষুধ দেওয়া বৃথা।

—মা!—আশা আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠলো।

নীতীশ আশার দিকে চেয়ে কি-যেন মনে করবার চেষ্টা করছে...

আশা গিয়ে নীতীশের কপালে হাত দিয়ে বলল,

—বলুন—কি বলতে চান বলুন। বলুন...

নীতীশ চাইল আশার মুখপানে। কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। ও যেন মূক হয়ে গেছে। ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আশা ভাবছে তার পবিত্রতার একমাত্র সাক্ষী 'মৃত্যুপথযাত্রী'। নীতীশের চোখে-মুখে জল দিয়ে সে আবার শুধলো,

—বলুন! কি বলছেন, বলুন...

না, নীতীশ কথা বলতে পারছে না।

বাক্যহারা আশিস কোনোরকমে বেরিয়ে এল চন্দ্রিমা দেবীর বাড়ী থেকে। কিন্তু সে ভাবছে, ক্রমাগত ভাবছে। কোথায় তার ভুল হয়েছে একটা। একটা সাংঘাতিক ভুল সে ধরতে পারেনি—কিন্তু কোথায় সে ভুল? কোনখানে?

নিজের বাসায় না-এসে আশিস আবার ছুটল ডাঃ দিব্যেন্দুর হোটেলে। বাসায় ফিরতে ওর মন চাইছে না—মা'র কঠিন তিরস্কার আশিসকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে! তারপর আশার আশ্চর্য্য ভাষা :

"আমার স্বামীত্ব আপনাকে অর্জন করতে হবে। নইলে আসবেন না!" ওঃ, কী অসাধারণ জোরালো ওর মন! কী বজ্রকঠিন দৃঢ়তা। একবার একমুহূর্তের জন্য আত্মহারা হয়েছিল আশা কিন্তু পারক্ষণেই সহস্র সতী-শক্তিতে দক্ষ-যজ্ঞ বাধিয়ে দিল! এ মেয়ে অসতী? না-না-না!

আশার স্বামীত্ব সত্যিই ওকে অর্জন করতে হবে এবার। সে স্বামীর সাত-পাকের মালাবদলে নয়, সাত-সমুদ্রের জলতল থেকে মুক্ত তুলে আনতে হবে—নইলে আশাকে সে হারালো।

বোম্বাই-এর দয়ালচাঁদের কথা মনে পড়লো। তার বউ অঙ্গবিকৃতি দেখে হেসেছিল, তাই দয়াল তাকে নিয়ে ঘর করলো না। নির্বোধ দয়াল! প্রকৃতি তার মধ্যে অপরের হাসি-উদ্রেকের উপাদান দিয়েছেন—বউ-এর দোষ কি? ঐ সামান্য ব্যাপারে সংসার ছাড়লো দয়ালচাঁদ! আশিসই বা ওর থেকে বুদ্ধিমান কিসে? আশার সম্বন্ধে এবং নীতীশের বিষয়ে যথাযোগ্য না-করেই তো সেও সংসার ছেড়েছে প্রায়!...

হোটেলে এসে পৌঁছাল আশিস। ডাঃ রায় বললেন,

—কী ব্যাপার? এখুনি এলে আবার?

—মা বাড়ী চলে গেছেন, কাকাবাবু। মা আমাকে মাফ করবেন না।

—কেন করবেন! তুমি 'কালপ্রিট্'। তুমি—তুমি...আচ্ছা আশিস, কি দেখে তুমি আমার আশা-মার উপর সন্দেহ করলে? কী প্রমাণ?

—কালিচরণের কথা আমি অবিশ্বাস করতাম না, কাকাবাবু—কিন্তু?

—বলো, আর কি প্রমাণ তুমি পেয়েছিলে? বলো সব আমায়।

—মেঝেতে বিস্তর ফুল পড়েছিল—ভারী পায়ের জুতোয় সেগুলো পিসে গিয়েছিল—যাতে ছিল বাইরের কাদার দাগ...

—থামো থামো!—ডাঃ রায় চীৎকার করে উঠলেন, ইউ ফুল! ইউ ইডিয়ট্! ভালবেসে দেওয়া-ফুল কেউ জুতো দিয়ে মাড়ায় না, এইখানেই প্রমাণ হয় যে, মা আমার গঙ্গাজলের মত পরিষ্কার, পবিত্র। ওঃ,—ইউ আহাম্মক—ইউ জরদ্গব, ইউ জাম্বুবান...তোমার এই সাধারণ জ্ঞানটা হোল না!...

রাগে ডাঃ রায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। আশিসের মাথায় যেন চিন্তার বিদ্যুৎ রেখে গেল। কিন্তু ডাঃ রায় আবার বললেন,

—গেট-আউট!—চলে যাও আমার সামনে থেকে! তুমি আমার 'মা'র অসম্মান করেছো। তুমি একটা 'ভিলেন'—একটা...একটা অতি নীচ! অতি বর্ব্বর...রাগে কথা বেরুচ্ছে না ডাঃ রায়ের মুখ থেকে।

—সবাই আমাকে তাড়াচ্ছেন, কাকাবাবু? কোথায় আমি দাঁড়াবো...

আশিসের কথাগুলো কান্নার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু ডাঃ রায় বললেন,

—চোখের জল! চোখের জল ছাড়া তোমার আশ্রয় নেই। তুমি, তুমি 'ইডিয়ট্' তুমি একটা সতী মেয়ের চরিত্র নিয়ে, জীবন নিয়ে খেলা করবে?

—আমি তার কাছে দোষ স্বীকার করবো, কাকাবাবু।

—হ্যাঁ—যাও, এখুনি যাও—গো ইউ ম্যাস্ট। গো নাউ! যাও...

—সকালের 'প্লেন'-এ যাব আমি, কাকাবাবু!—আশিস প্রণাম করতে গেল।

—না, প্রণাম এখন নয়। আমার মায়ের হাত ধরে এসে প্রণাম করবে। সে-বেটির কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। অল্ রাইট, সকালে যাবে। যাবেই—

ডাঃ রায় তৎক্ষণাৎ আশিসের যাবার ব্যবস্থার জন্য ফোন করলেন এরোপ্লেন-বুকিং-অফিসে। আশিসকে ওখানেই রাখলেন তিনি সে-রাত্রে। সকালে নিজে এসে তুলে দিলেন 'প্লেন'-এ।

আশিস কলকাতায় এল।

ট্যাক্সি করে বাড়ী পৌঁছে শুনলো মা এবং আশা গেছে তাপসীপুর। নীতীশের খুব অসুখ। আশিস এককাপ চা পর্যন্ত খেল না। তৎক্ষণাৎ ঐ ট্যাক্সিটা নিয়েই তাপসীপুর রওনা হোল।

দীর্ঘ পথ। বেলা শেষ হয়ে আসছে—অভুক্ত, অস্নাত আশিস প্রায় সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুলো নীতীশের বাড়ীর কাছাকাছি। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, হেঁটে এল সে নিঃশব্দে ঐ মিনিটখানেকের পথ—ট্যাক্সির আওয়াজে অসুবিধা হবার আশঙ্কায়। দেখলো, তাদের গাড়ী দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বহু লোক বারান্দায় বসে-দাঁড়িয়ে।

ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না আশিস! এতো বেশী অসুখ নীতীশের?

কিংবা হয়তো এমন কিছু নয়—পল্লীগ্রামে ডাক্তার না পাওয়ার জন্য মাকে খবর দিয়েছে. কিন্তু অত লোক কেন? নীতীশ অবশ্য খুবই জনপ্রিয় এখানে, তাই গ্রামবাসীরা তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু সবাই কেমন যেন বিমর্ষ—বিষাদ-মলিন মুখ।

আশিস অতি ধীরে বারান্দায় উঠলো। কেউ কিছুই বললো না। বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছে—ভেতরে নীতীশের জীর্ণ দেহখানা! তার দৃষ্টি সিলিং-এর দিকে—সে দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই, কোনো ভাব নেই।—সে যেন পাথরের চোখ! মাথার কাছে মা—পায়ের কাছে কে একজন অপরিচিতা। আর ওধারের জানালার রড ধরে আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে! আশিস ঘরে না ঢুকেই অবস্থানটা দেখে নিল।

—'মা' ;—ঘরে ঢুকে আশিস ডাক দিল।—

—আয়।—নীতীশ আমার আর নেই!—মা এতোক্ষণ কেঁদে ফেললেন—অভাগা ছেলে আমার, আত্মগ্লানি সহ্য করতে পারলো না—

—নীতীশ সত্যি নেই, মা!

—না! তুই যদি তখুনি ওর খোঁজ করতিস, আশিস...

ও অভিযোগের উত্তর আর কি দেবে আশিস—নিঃশব্দে চেয়ে রইল নীতীশেব মুখের পানে!

রাশি রাশি ফুল আনছে গ্রামের ছেলেরা নীতীশের মৃতদেহ সাজাবার জন্য। কুমকুম চীৎকার করে উঠলো,

—না! ফুল দেবেন না!—ফুল ও সহ্য করতে পারতো না।—না-না! ফুল আমি দিতে দেব না...

বিস্মিত আশিস প্রশ্ন করলো,—আপনি কেন এ কথা বলছেন, দিদি?

—ওর শেষ কথা 'গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না, ফুল দিওনা কেউ ভুলে।..'

কুমকুমের মুখের সব-হারানো রিক্ততা—আশিস অসহায় চোখে দেখলো, তারপর শুধুলো,

—আপনি-ই কি মাকে খবর দিয়েছিলেন নীতীশের অসুখের? নীতীশ-ই কি বলেছিল ঠিকানা?

—না। আশিস আচার্য্য-র নামে একখানা সীল-করা খাম ছিল ওর বাক্সে, তাতেই ঠিকানা পাই...

—দেখি সে-খাম।

কুমকুম টিনের সুটকেস থেকে বের করে দিল সীল-করা খামটি।

আশিস শিরোনামাটা দেখলো, তারই নাম লেখা—সিল-করা ; রেজেষ্টারী করবার জন্যই সীল-করা হয়েছে, কিন্তু ডাকে পাঠানো হয়নি। খামের উপরে প্রেরকের নাম এবং তারিখও দেখলো আশিস : টাইপ-করা ক্লিপ-আঁটা থিসিস্‌খানা আর একখানা চিঠি রয়েছে।

চিঠিটা পড়ছে আর একবার করে নীতীশের খোলা চোখের পানে চাইছে আশিস—কিন্তু আশিস পড়তে পারছে না চিঠিখানা!...জল—জল—আর জল।

সাত সাগরের সমস্ত জল ওর চোখে।..